প্রথম ভাগ] [১ম খণ্ড

ভারত দর্পণ।

মাননীয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে এই গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে
ভারতবর্ষের দেশ, জনপদ, নগর, নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতির প্রাচীন
ও আধুনিক নাম ও তৎসমুদয়ের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিবরণ, সার
ডবলিউ. ডবলিউ. হণ্টার, থরণটন, কনিংহাম ও অন্যান্য
অনেক পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় গ্রন্থকারদিগের
দুষ্প্রাপ্য এবং বহুমূল্য গ্রন্থ হইতে
সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত
হইতেছে।

শ্রীরাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়

সংগ্রহকার ও প্রকাশক।

HARE PRESS : CALCUTTA.

1894.

মূল্য প্রতি খণ্ড ।০ চারি আনা মাত্র।

ভূমিকা।

ইংরেজি এবং ইউরোপীয় অপরাপর ভাষায় সাইক্লোপিডিয়া নামক এক প্রকার বৃহদভিধান আছে, তাহাতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েরই বৃত্তান্ত বর্ণমালা অনুসারে লিপিবদ্ধ থাকে। আজকাল এইরূপ বৃহদভিধানের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থে, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশেরই সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস সম্বন্ধীয় কথাই অধিক থাকে। বড়ই আক্ষেপের কথা, কোন ভারতীয় ভাষায় ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তাদৃশ কোন বৃহদভিধান এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অস্মদ্ দেশীয় ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ কোন শিক্ষিত ব্যক্তি ভারতের ভূগোল, ইতিহাস, কৃষি, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বাণিজ্য, শিল্প কি অন্য কোন বিষয়ের কোন বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে তিনি কোন অভিধান দেখিয়া তাঁহার বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে সহজে পারেন না। যাঁহারা ইংরেজি জানেন তাঁহাদিগের পক্ষেও ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত-অর্থকর উপায়, অথবা উদ্ভিজ্জ সমৃদ্ধি কি অন্য কোন বৈজ্ঞানিক কি ঐতিহাসিক কি ভৌগোলিকতত্ত্ব অবগত হওয়া সহজ নহে। অনেক ইউরোপীয় গ্রন্থকার ভারতের নানাবিষয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সমুদয় গ্রন্থ অতীব মূল্যবান, বৃহদায়তন এবং আয়াসলভ্য; সুতরাং, যাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, তাঁহারা ইচ্ছা থাকিলেও কেহ বা অর্থ, কেহ বা সময় অভাবে, কেহ বা গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন না। তজ্জন্য আমি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থনিচয় হইতে ভারতবর্ষের ভূগোল, ইতিহাস, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া "ভারত দর্পণ" নাম দিয়া এই বৃহদভিধান খানি প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। ইহার প্রথম ভাগে, বর্ণমালানুসারে ভারতবর্ষের দেশ, জনপদ, নগর, নদ নদী, পর্ব্বত প্রভৃতির প্রাচীন ও আধুনিক নাম ও তাহাদিগের সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। দ্বিতীয় ভাগে, ভারতীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী এবং বনৌষধিবর্গ ও অন্যান্য অর্থকর উপায়াদির নাম ও তাহাদের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে। তৃতীয়ভাগে, আর্য্যদিগের দেব, দেবী, মুনি, ঋষি, রাজা, মহারাজা এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসোক্ত স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত এবং চতুর্থভাগে, ভারতের জীব ও সমাজতত্ত্ব, জাতি ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নাম ও তাহাদিগের সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য সমস্ত বিবরণ বর্ণিত হইতেছে।

কৃতবিদ্য, বহুজ্ঞ এবং মহানুভব কতকগুলি লোকের আন্তরিক সাহায্য ব্যতীত এরূপ মহান্ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

এই গ্রন্থ নূতন প্রণালীর বটে, কিন্তু যে সমস্ত উপকরণে ইহা প্রস্তুত হইল তাহা নূতন নহে। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থে যে সমুদয় ভারতীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহাই সংগ্রহ পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতেছি।

অনেক ভারতবাসী ভারতবর্ষের প্রাচীন কি আধুনিক কোন বৃত্তান্তই প্রকৃতরূপে অবগত নহেন। আজ কাল ভারতের লোক অপেক্ষা ইউরোপীয় ও মার্কিনগণ ভারতের অনেক কথা জানেন ও জানিতে ইচ্ছুক। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অনেক অর্থ ব্যয় ও বহু পরিশ্রমে আমাদিগের জন্মভূমির প্রাচীন ও আধুনিকতত্ত্ব সম্বলিত অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সমস্ত পুস্তক হইতে এবং অনুসন্ধান দ্বারা যাহা কিছু আমরা অবগত হইয়াছি, তাহাই ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। কোন কাল্পনিক বা অপ্রমাণিত কথা এই পুস্তকে নাই। সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত ইমারসন (Emmerson) বলিয়াছেন "A step forward is worth more than all the censures" উন্নতির দিকে এক পদ অগ্রসরও সহস্র নিন্দা অপেক্ষা অধিক ফলদ। আমি এই সুবিখ্যাত পণ্ডিতের উক্ত সারগর্ভ বচনটীকে মূলমন্ত্র স্বরূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম, কতদূর কৃতকার্য্য হইব, আদৌ কৃতকার্য্য হইব কি না, তাহা ভবিষ্যৎ এবং বিধাতার উপর নির্ভর। মানুষ কেবল যত্ন করিতে পারে, কিন্তু ফলাফল বিধাতার হাতে। আমাদের যত্নের ত্রুটি হইবে না ; ফলের জন্য ফল-বিধাতার উপর নির্ভর করিলাম।

"ফলং পুনস্তদেব স্যাৎ যদ্বিধের্মনসি স্থিতং।"

এই কার্য্যে আমি শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এমে. বি এল. শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, মিঃ, সি. সেন, ব্যারিষ্টার য়্যাট ল এবং অন্যান্য কয়েক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ও হইতেছি এবং তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীরাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়।

ভারত-দর্পণ।

অকাল কোট।—বম্বাই প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। উত্তর পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিজামের রাজ্য,—পশ্চিমে সোণাপুর জেলা। পরিমাণ ফল ৪৯৮ বর্গ-মাইল। লোক সংখ্যা ৫৮০৪০। মোট রাজস্ব ৩৪,৩,৪৩০৲ টাকা, ব্যয় ৩৪,৫,৭৭০৲ টাকা। এ প্রদেশ সমতল, কোন খানেই পতিত জমি বা জঙ্গল নাই। জি, আই, পি, রেল এই রাজত্বের মধ্য দিয়া গিয়াছে। কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে, ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎ নদীটীতে বৎসরে অনেক সময়ে জল থাকে না। আর তাহার জল বেশ ঠাণ্ডা ও প্রীতিপদ। জ্বর, বাত, পেটের পীড়া প্রভৃতি রোগ এ দেশের প্রধান ব্যাধি। কোন রূপ খনিজ দ্রব্য এরাজ্যে নাই,—চিনি, চাল, ছোলা, গম, তিসি ও ভুট্টা এ দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। অধিবাসীর প্রধান জীবনোপায় কৃষিকার্য্য। এতদ্ব্যতীত কাপড় পাগড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া প্রায় ৬ শত লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

অকাল কোট পূর্ব্বে মুসলমান রাজ্য ছিল, পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাতারার রাজা সাহু জনৈক মহারাষ্ট্র সেনানীকে এই রাজ্য প্রদান করেন,—অকাল কোটরাজ যুদ্ধের সময় সৈন্য দ্বারা মহারাষ্ট্রাধিপতিকে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। বর্ত্তমান রাজা এই মহারাষ্ট্র সেনানীর বংশসম্ভূত। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সাতারা রাজ্য ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে অকাল কোট ইংরাজের অধীন একটী করদ রাজ্য হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সেনা সাহায্যের পরিবর্ত্তে রাজা ১৪,৫৯০৲ টাকা গভর্ণমেণ্টকে দিতে থাকেন। এই রাজবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হওয়ার রীতি ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। রাজার কোন সৈন্য নাই, ৫৯ জন পুলিশ আছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজ্য শাসনে অক্ষম বলিয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় ও তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত রাজ্য

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনে (১৮৭০) রহে। পরে তাঁহার দুই বৎসর বয়স্ক পোষ্যপুত্র রাজা হয়েন। তিনি যে পর্য্যন্ত নাবালক ছিলেন,—তত দিন সোণাপুরের কলেকটর এরাজ্য শাসন করিতেন। ইনি বম্বাই প্রদেশস্থ একজন প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দার,—কোলাপুরের রাজারাম কলেজে রাজা শিক্ষা পাইয়াছেন। অকালকোটে একটী ডাক্তারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে,— এ ছাড়া এ রাজ্যে ১৯টী বিদ্যালয় আছে।

অগস্তীশ্বরম্।—মান্দ্রাজের মধ্যবর্ত্তী ত্রিবাঙ্কুরের একটি তালুক। লোকসংখ্যা—১৮৮১ খৃঃ অঃ ৭৮৯৭৯ ছিল।

অগ্রদ্বীপ।—বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীস্থ একটি গ্রাম। এই স্থানে প্রতি বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সপ্তাহব্যাপী উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় অন্ততঃ পঁচিশ সহস্র লোকের সমাগম হয়।

অগ্রহ।—পঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার জেলার মধ্যবর্ত্তী ফতেবাদ তহসিলের একটি প্রাচীন নগর। হিসার হইতে ১৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। আগরওয়ালা বেণিয়াগণের প্রাচীন অধিনিবেশ স্থান। এক সময়ে অগ্রহ একটি প্রধান স্থান ছিল। আধুনিক অগ্রহ গ্রামের অর্দ্ধ মাইল দূরে, এখনও একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভূগর্ভস্থ অর্দ্ধ নিহিত ইষ্টক ও প্রস্তর স্তূপ সকল ইহার পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক্ষণে ইহার গৌরব প্রকাশক কিছুই নাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এখানে ১১৫৬ জন লোকের বাস ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহাবুদ্দিন ঘোরি ইহা দখল করেন, তদবধি আগরওয়ালা বেণিয়াগণ ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।—এই জাতির মধ্যে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে।

অগ্রোর।—(উষী) পঞ্জাবের হাজারা জেলার মধ্যবর্ত্তী মানসারা তশীলস্থ একটি প্রান্ত উপত্যকা। কুলাহার নদীর উত্তর সীমাস্থ তাবৎপ্রদেশ অগ্রোর উপত্যকার অন্তর্গত। পার্ব্বতীয় উপত্যকার তিনটী শাখা লইয়া এই প্রদেশ গঠিত; ইহা দৈর্ঘ্যে ১০০ মাইল এবং প্রস্থে ৬ মাইল, নিম্ন ভাগ সুন্দর সুন্দর কুসুমাদিতে পূর্ণ। স্থানে স্থানে গ্রাম, পল্লী, বৃক্ষকুঞ্জ সমস্তই মনোরম বৃক্ষশ্রেণী আবৃত পর্ব্বত মালায় বেষ্টিত। যে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন তথা হইতে, সময় সময় তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়। এই সকল উপত্যকা একই ভাবাপন্ন, সমতল ভূমি ইহাতে নাই, মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত হইতে ছাদের ন্যায় ক্রমশ নিম্ন দিগে ঢালু হইয়া গিয়াছে। যথা সময়ে নিয়মিতরূপে বৃষ্টি হয় বলিয়া জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তজ্জন্য এ প্রদেশে জলের অভাবে ফসল নষ্ট হয় না। অধিবাসিগণের মধ্যে স্বাতী ও গুজরাতীই অধিক। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের সংখ্যা ১০৬৬৬ ছিল। মুসলমান ধর্ম্মই এপ্রদেশের প্রধান ধর্ম্ম। দেশী বস্ত্রই প্রধান উৎপন্নদ্রব্য; ব্যবসাবাণিজ্য সম্পূর্ণ রূপে স্বদেশে সীমাবদ্ধ. কেবল অল্প পরিমাণে ভূষিমাল বাহিরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। এই উপত্যকা প্রদেশ অগ্রোরের খাঁর অধীন, তবে ইংরাজ

গবর্ণমেণ্টও একটী থানা স্থাপন করিয়াছেন। থানার ভার এক জন ইন্‌স্পেক্টরের উপর ন্যস্ত আছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে বিপ্লব ঘটায় খাঁকে এক রূপ বন্দিভাবে লাহোরে রাখা হয়, কিন্তু এক্ষণে—তাঁহাকে পুনরায় পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। প্রান্ত সীমার বহির্ভাগ হইতে দস্যুগণ আসিয়া কখন কখন এ প্রদেশে লুটপাট করে এই জন্ত এখানে একদল সৈন্তও রাখা হইয়াছে।

অচলাবসন্ত।—(অক্ষয় উৎস) কটক জেলার অন্তর্গতঃ এসিয়া পাহাড় শ্রেণীর একটি শৃঙ্গ; (লাটি. ২০° ও ৮´ উ, ল. ৮৬.°৬ পূর্ব্ব) পর্ব্বতের পাদদেশে মাঝিপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে এই পাহাড়ের অধিপতি ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ এই স্থানে বাস করিতেন, কিন্তু এক্ষণে পুরাতন দ্বার, প্রস্তর নির্ম্মিত মঞ্চ, ভগ্ন প্রাচীর প্রভৃতিই কেবল ইহার পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিতেছে।

অজনালা।—পঞ্জাবের মধ্যবর্ত্তী অমৃতসর জেলার একটি তশীল। পরিমাণ ফল ৪২৮ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২০১১৭২। (১৮৮১ খৃঃ গণনানুসারে) জেলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এই তশীল অবস্থিত এবং পশ্চিমে রাবি নদী কর্ত্তৃক বেষ্টিত।

অজনালা।—অমৃত সর জেলার একটি গ্রাম; অজনালা তশীলের সদর কাছারী। অমৃত সর হইতে যে রাস্তা শিয়াল কোট গিয়াছে, সেই রাস্তার উপর অমৃত সর হইতে ১৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। লোক সংখ্যা ১৯৩৬ (১৮৮১)। শিখ রাজত্ব কালে সাক্কী নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মিত হয়, সেই পুরাতন সেতু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নাজার জাট জাতীয় বাগা নামক এক ব্যক্তি এই গ্রাম স্থাপন করেন। এই জন্ত গ্রামের নাম নাজারালা হয়, তাহা হইতে বর্ত্তমান অজনালা নাম হইয়াছে। এখানে আদালত প্রভৃতি সকলই আছে।

অজন্ত।—(ইন্দ্রাদ্রি) অজন্ত সাতমালা ও চান্দর নামেও বিদিত। ইহা একটী পর্ব্বত শ্রেণী। বেরারের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত সীমা হইতে আরম্ভ হইয়া নিজাম রাজ্য ভেদ করিয়া বম্বাইয়ের খান্দেশ জেলার প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের বিস্তৃত উপত্যকায় ইহা উত্তরাংশে বিস্তৃত;—গোদাবরী ও তাপ্তি নদীর শাখা প্রশাখা সমস্তই এই পর্ব্বত শ্রেণী হইতে উত্থিত হইয়া গোদাবরী ও তাপ্তিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বত শ্রেণীর শাখা প্রশাখা (যাহা সাতমালা পর্ব্বত বলিয়া বিদিত) সমস্ত বাসিম উন জেলা ও বেরারের বুলদামা জেলার দক্ষিণার্দ্ধাংশ পূর্ণ,—ইহার শৃঙ্গ মধ্যে মধ্যে দুই সহস্র হস্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। নদীর তীরবর্ত্তী সমতল প্রদেশ ব্যতীত এই পর্ব্বত শ্রেণী সমস্তই অসমতল ভূমে পূর্ণ। এই সকল স্থান সুন্দর বৃক্ষ মালায় সুশোভিত,—ইহাদের প্রাকৃতিক শোভা বড়ই মনোহর।—সমস্ত অরণ্য নানাবিধ বন্য জন্তুতে পূর্ণ।—এই সকল পর্ব্বত বন্য জাতির প্রিয় আবাস ভূমি। নিজাম রাজ্যের মধ্যস্থ ইহার একটী গিরিসঙ্কটে বিখ্যাত অজন্ত গিরিমন্দির অবস্থিত।

অজন্ত।—এই নামে নিজাম রাজ্যের মধ্যে একটী গ্রাম ও পার্ব্বত্য পথ আছে। অজন্ত কিম্বা ইন্ধাদ্রি পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে ও বেরার ও খান্দেসের প্রান্ত সীমা হইতে যে গিরিপথ বা "ঘাট" গিয়াছে তাহারই উত্তরাংশে এই গ্রাম অবস্থিত। ইহা বম্বাই হইতে উত্তর পূর্ব্বে ২২০ মাইল, আরঙ্গাবাদ হইতে উত্তর পূর্ব্বে ৫৫ মাইল, এবং আসাই নামক বিখ্যাত যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে ১৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। সহর হইতে উত্তর পশ্চিম ৪ মাইল দূরে গিরিমন্দির; এই গিরিমন্দির হইতেই সহরের নাম অজন্ত হইয়াছে। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হায়েং থাজেং পুলাকেশী রাজ্যের যে গিরিমন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন,—তাহাই অজন্ত গিরিমন্দির। বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই বিখ্যাত ও সুন্দর গিরিমন্দির দেখিবার ইচ্ছা করিলে জি. আই. পি. রেলওয়ে দিয়া বম্বাই হইতে পাচোরা ষ্টেসনে যাইতে হয়,—তারপর গরুর গাড়ী করিয়া ফর্দাপুর যাইতে হইবে। এই খানে ভ্রমণকারী দিগের একটী বিশ্রামাগার আছে। একটী অপরিসর পথ দিয়া ফর্দাপুর হইতে লেনাপুর (৩½ মাইল) যাইতে হয়,—লেনাপুরেও এই গিরি মন্দির। অজন্ত গ্রাম হইতে যাওয়া অপেক্ষা লেনাপুর হইতে গেলেই গিরিমন্দির ভাল রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত গিরি উপত্যকা অরণ্যে পরিপূর্ণ, ও নির্জ্জন—অসমতল ও অতি মনোরম। একটী বিস্তৃত পর্ব্বত কাটিয়া ও খুদিয়া এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এটী ২৫০ ফিট উচ্চ,—ইহার নিম্নে ওসারা স্রোতস্বতী বহমানা,—এই ক্ষুদ্র নদীর পর পারে একটী বৃক্ষ শোভিত পর্ব্বত শৃঙ্গ। এই গিরিমন্দির বা গুহা পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ⅓ মাইল বিস্তৃত,—নদী হইতে কোন কোন স্থানে ৩০ ফিট, কোন কোন স্থানে ১১০ ফিট উচ্চ। এই গিরিপথ আরও একটু উচ্চে গিয়া একটী জল প্রপাতের নিকট শেষ হইয়াছে। এই জলপ্রপাত সাত স্থানে পতিত হইয়া সপ্ত কুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। উচ্চতা ৭০ ফিট হইতে ১০০ ফিট। এই গিরিমন্দিরে যাইবার পথ এত দুর্গম ছিল যে লোকে দৈবাৎ এই সকল দেখিতে যাইত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ফারগুসন সাহেবের "ভারতীয় গিরিমন্দির" নামক পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় অনেকের এই সকল দেখিতে কৌতূহল জন্মিয়াছে।

পঁচিশটী "বিহার" (বুদ্ধসন্ন্যাসীগণের বাস গৃহ) ও পাঁচটী চৈত্য (মন্দির) পর্ব্বত কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাদের অনেক গুলি বড় বড় স্তম্ভের উপর স্থাপিত, এই সকলে অতি সুন্দর খোদাইয়ের কাজ করা হইয়াছে ও অতি মনোহর চিত্র আছে। আমরা এই গিরি মন্দিরের যে সঙ্ক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করিলাম তাহা বম্বাইয়ের আরকিওলজিকাল সারভেয়ার বারজেস সাহেবের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।—যে পাঁচটী মন্দির আছে তাহার সকলগুলিই প্রস্থে যত, লম্বে তদপেক্ষা দ্বিগুণ,—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ৯৪½ ফিট ও প্রস্থে ৪১¼ ফিট। প্রত্যেক মন্দিরের পশ্চাদভাগ প্রায়ই গোল ছাদ খুব উচ্চ ও খিলানযুক্ত, কতকগুলিতে কাঠের কড়িও আছে, কতকগুলিতে পাহাড় কাটিয়া ঠিক কড়ির মত করা হইয়াছে। অতি প্রাচীন ভারতীয়

গিরিমন্দিরের স্তম্ভগুলি প্রায়ই সাদা লম্বা—নিম্নে বেদিও নাই উপরে কার্ণিসও নাই। কিন্তু আধুনিক স্তম্ভগুলির এই উভয়ই আছে। এতদ্ব্যতীত এই সকল স্তম্ভে সুন্দর ভাস্কর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। গহ্বরের গোল অংশে "দাঘোবা" (বেদি) একটী বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড। উহার উপরে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তৃত অংশ ইহার নাম "গর্ভ",—গর্ভের চারিদিকে চতুষ্কোণ "তোরণ"। ২৪টী "বিহারে" অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে, সেগুলি প্রায় সমচতুষ্কোণ। এই সকল প্রকোষ্ঠ যে সকল স্তম্ভশ্রেণীর উপর সংস্থাপিত, তাহা কোথাও বা প্রকোষ্ঠগুলিকে বেষ্টন করিয়া মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ প্রকোষ্ঠ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, কোথাওবা সমান্তরাল চারি শ্রেণীতে বিরাজিত আছে। বড় বড় গহ্বর গুলিতে একটী বিস্তৃত বারান্দা আছে, ঐ বারান্দার দুই পার্শ্বে দুইটি প্রকোষ্ঠ। ঠিক মধ্যস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রকোষ্ঠ বা "হল"। তৎপশ্চাতে একটি কুঠারি,—ঐ কুঠারিতে বুদ্ধদেবের একটী প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তিও আছে। তিন দিকের প্রাচীর খনন করিয়াক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে,—এই সকল প্রকোষ্ঠে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ বাস করিতেন। এই প্রকোষ্ঠে পর্ব্বত কাটিয়া বারান্দা, বারান্দার পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। এইগুলিকে বিহার বলে। এই সকল গহ্বরের অতি অল্প সংখ্যকই সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত ও অনেকগুলিই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে, কিন্তু প্রায় সকল গুলিই নানাপ্রকার চিত্রে চিত্রিত, যে সকল ভাস্কর্য্য আছে তাহাও অতি সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত। সংস্কৃতও মাগধি ভাষায় ২৫ টী স্মরণ লিপি খোদিত আছে, ইহার মধ্যে ভিতরে ১৭টী অঙ্কিত ও বাহিরে ৮টী পর্ব্বতাঙ্গে খোদিত। সকল গুলিই পুণ্যবান নির্ম্মাণকর্ত্তাদিগের নাম প্রচার করিতেছে।

একটী বিহারের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাস্কর্য্যে বিচিত্র। কিন্তু সাধারণত এই সকল বিহারের দ্বার ও গবাক্ষ গুলিতেই ভাস্কর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। "বিহার" গুলি অপেক্ষা "চৈত্য" গুলিকেই এই রূপ নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে। অতি প্রাচীন গুলির প্রায় সমস্ত খোদাইয়ের কাজ, কিন্তু আধুনিক গুলির কোন প্রাচীর, দাঘবা প্রভৃতিতেই সেরূপ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল ভাস্কর্য্যে প্রকৃত শিল্পচাতুর্য্য নাই বলিলেই হয়। প্রায় সকল গুলিই বুদ্ধদেব অথবা বৌদ্ধসন্ন্যাসী গণের মূর্ত্তি, এই সকল মূর্ত্তির অবস্থানভঙ্গি নানাবিধ।

আরকিওলজিকাল সারভেয়ার বারজেস সাহেব বলেন, "বরং চিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত উত্তম, এই সকল চিত্র যে সময়ে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই সময়ের ইয়ুরোপীয় চিত্র অপেক্ষা এ গুলি উৎকৃষ্ট। মনুষ্য মূর্ত্তি সকল নানাবিধ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় চিত্রকরগণের শারীর সংস্থানবিদ্যায় কিছু জ্ঞান ছিল। মূর্ত্তি গুলির হাত অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত এই সকল চিত্রের আলোক ও ছায়াপাত মন্দ নহে। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ ঋষিগণের মূর্ত্তি ব্যতীতও রাজপথ, সংকীর্ত্তন দল, বৃদ্ধ গৃহের অভ্যন্তর ভাগ, তথায় গৃহ-

বাসিগণ নানা প্রাত্যহিক কার্য্যে নিযুক্ত, প্রেমের চিত্র, বিবাহের চিত্র, মৃত্যুশয্যা, স্ত্রীলোক-গণ নানা পূজায় নিযুক্তা, এতদ্ব্যতীত শিকারের চিত্রও অনেক আছে, এই সকল চিত্রে বড় বড় মহিষ হত ও আহত হইতেছে, বৃহৎ হস্তী হইতে সামান্য ক্ষুদ্র ভেক পর্য্যন্ত সকল প্রকার প্রাণীই চিত্রিত হইয়াছে। বড় বড় সর্প, মৎস্য, জাহাজ প্রভৃতিও আছে। প্রাত্যহিক ব্যবহার্য্য বাসনাদির চিত্র বড় অল্প; মাটির কলসী, লোটা (ঘটি) জলপাত্র খাবার বাসন, বারকোস, কুঁজা, শীল নোড়া প্রভৃতি দেখা যায়। যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্রও অধিক অঙ্কিত হয় নাই। সোজা ও বাঁকা তরবার, নানা প্রকারের বল্লম, বড় লাঠি, তীর, ধনু, (বেয়নেটের) সঙ্গিনের ন্যায় একরূপ অস্ত্র, নানাবিধ ঢাল, এতদ্ব্যতীত আর কোন অস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীকদিগের ন্যায় যুদ্ধ টুপীও (হেলমেট) একটা চিত্রিত আছে। একস্থানে তিনটী অশ্ব একত্র সংযুক্ত, কিন্তু ইহা কোন যুদ্ধরথের সহিত সংযোজিত ছিল কি না তাহা আর এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল রঙ্গে এই সকল চিত্র চিত্রিত, এই সকল চিত্রে চিত্র কার্য্যেরও বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। কোন কোন স্থানে রং বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতাঙ্গে বসিয়া গিয়াছে। কোন সময়ে এই সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, তবে ইহাও স্থির যে এই সকল চিত্রের সকল গুলিই এক সময়ের নহে। বুদ্ধদেবের ও জাতকের ঘটনাবলী, শিশু বুদ্ধের নিকট অসীতার গমন, মায়া কর্ত্তৃক বুদ্ধ দেবকে প্রলোভিত করণ, প্রাতিহার্য্য (অলৌকিক ঘটনাবলী) রাজা শিবির জাতক, নাগগণের ইতিবৃত্ত, শিকার দৃশ্য, যুদ্ধক্ষেত্র, প্রভৃতি বিষয়ই এই সকল চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।

রাজা অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিনাশাবধি ৮০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত বৌদ্ধ শিল্পের জ্বলন্তদৃষ্টান্ত অজন্ত গিরিমন্দির। ইহাদের অতি প্রাচীন গুলি খ্রীষ্টাব্দের ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে চিত্রিত, অতি আধুনিক গুলিও ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী নহে। কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণ ও অবিমিশ্র বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ ভাব কিরূপ ছিল, তাহা এই সকল চিত্রে সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। অতি আধুনিক "চৈত্য" গুলিতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকটা হিন্দু ধর্ম্মের সহিত সংমিলিত হইয়া গিয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে মেজর জিল অজন্ত গহ্বরে বাস করিয়া এই সকল চিত্রের প্রতিলিপি তুলিয়া লইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের খ্রীষ্টাল পেলেস (Crystal Palace) লণ্ডনের শিস মঞ্জিলের অগ্নিকাণ্ডে এই সকল সুন্দর চিত্র দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছে, তবে স্পায়ার সাহেব প্রণীত লাইফ ইন এনসিয়াণ্ট ইণ্ডিয়া (Life in Ancient India) নামক গ্রন্থে দুই খানি চিত্র দেখা যায়। [যাঁহারা অজন্ত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত পুস্তক দেখিবেন—মিষ্টার গ্রিফিথ্‌স "ইণ্ডিয়া এনটিকুয়ারি" ২ ভলম্‌. ১৫০ পৃ; ৩ ভলম ২৫ পৃ। মিষ্টার ফারগুসান প্রণীত "হিস্‌টরি অব্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ আর্কিটেকচার" ১৮৭৬। বারজেস প্রণীত "বুদ্ধ রক টেম্পল্‌ অব,

অজন্ত।" বারজেস প্রণীত"কেভ টেম্পল্ অব ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া" ১৮৮১ ; এবং ফরাসি গ্রন্থকার গুস্তেভ্ ল বঁ প্রণীত ভারতীয় প্রাচীন শিল্প নামক গ্রন্থ।]

অজয়।—বাঙ্গালা দেশের একটী নদ। হাজারিবাগ, মুঙ্গের ও সাঁওতাল পরগণার এই তিন জেলার প্রান্ত সীমার মধ্য স্থলে অজয় উত্থিত হইয়া সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত ভেদ করিয়া চলিয়াছে। পরে ইহা দক্ষিণ পূর্ব্ববাহী হইয়া ভেদিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমা রূপে বহমান হইতেছে। তৎপরে সম্পূর্ণ পূর্ব্ববাহী হইয়া কাটোয়ার ঠিক উত্তরে ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণা হইতে অজয় যেখানে বর্দ্ধমান জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, বর্ষাকালে সেই পর্য্যন্ত বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু অন্য সময়ও এই নদীর সর্ব্বত্র নৌকা যাতায়াত করিতে থাকে। বর্দ্ধমান হইতে বীরভূমের পথে শাঁকাইয়ে এই নদীর উপর একটী খেওয়া আছে। ভাগীরথী ও অজয়ে প্রায়ই "বন্যা" হয়, ইহাতে জল তীর ভাসাইয়া চারি দিক প্লাবিত করিয়া ফসলের বিশেষ ক্ষতি করে। এই রূপ বন্যা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশকে রক্ষা করিবার জন্য এই নদীর দক্ষিণতীরে মোট ২২ মাইল বাঁধ তিন স্থানে প্রস্তুত করা হইয়াছে। বাম তীবেও তিন মাইল বাঁধ আছে। প্রধান শাখা— সাঁওতাল পরগণায় দারুয়া, পাত্র, জয়ন্তী ; বীরভূমে হিঙ্গলা নদী ;—বর্দ্ধমানে তুনী ও কান্নরনদী। অজয়ের উর্ব্বরতাময় দুই তীরে যে ফসল জন্মে তাহা এক্ষণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বোলপুর ষ্টেসন হইয়া কলিকাতা ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে যায়। বীরভূম জেলায় বোলপুর ষ্টেসন অতি শীঘ্র একটী প্রধান ষ্টেসনে পরিণত হইয়াছে।

অজয়গড়।—মধ্য ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী বুন্দেল খণ্ডের একটী দেশীয় রাজ্য ও দুর্গ। ইহার উত্তরে চারকারি রাজ্য, ও বান্দা জেলা ; দক্ষিণ ও পূর্ব্বে পান্না রাজ্য এবং পশ্চিমে ছত্তরপুর রাজ্য। কালিন জায়া হইতে ১৬ মাইল, বান্দা হইতে ৪৭ মাইল, এবং এলাহাবাদ হইতে ১৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। বিস্তৃতির পরিমাণ ৮০২ স্কোয়ার মাইল, গ্রাম সংখ্যা ৩২১, গৃহ সংখ্যা ১৪০৭৬, লোক সংখ্যা পুরুষ ৪২৪০৯ ও স্ত্রীলোক ৩৯০৪৫, মোট ৮১৪৫৪ জন। হিন্দুর সংখ্যা ৬৮৪২৭, মুসলমান ২৭৬৮, জৈন ২১৪, অন্যান্য ৪৫। পার্ব্বতীয় দুর্গ অজয়গড় ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ লইয়া এই রাজ্য। এতদ্ব্যতীত জাসো ও পান্নার মধ্যবর্ত্তী স্থানও এই রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী। যে পাহাড়ের উপর প্রাচীন দুর্গ অবস্থাপিত, তাহারই উত্তর পাদাংশে নশহর নামক একটী সুন্দর ক্ষুদ্র নগর আছে, রাজা এই নগরে বাস করেন। পাহাড়ের উপরাংশ সমুদ্র হইতে ১৩৪০ ফিট উচ্চ, চারিদিকস্থ প্রদেশ ৮৬০ ফিট উচ্চ, দুর্গ ১৭৪৪ ফিট উচ্চে অবস্থিত।

উক্ত দুর্গের উপরাংশ সমস্তই গ্রানিট প্রস্তরে গঠিত ; ইহার উপর একস্তর সাণ্ডষ্টোন আছে, চারিদিকে প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ প্রস্তর সকল দণ্ডায়মান। প্রধান পাহাড়ের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত একটী গভীর খাদে পরিণত করিয়া বিহঙা শৃঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। পাহাড়ের

দক্ষিণাংশে দুর্গ অবস্থিত; এবং এই দুর্গের চারিদিক অতি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। এই দুর্গপ্রাচীর প্রাচীন জৈন মন্দির সকলের অবশেষাংশ কার্ণিস, মঞ্চ, বারান্দা প্রভৃতিতে সজ্জিত। পর্ব্বতের উপরাংশ সমস্তই ভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি, ভগ্ন অট্টালিকাবশেষ, ভগ্ন প্রাচীর প্রভৃতিতে পূর্ণ। যখন এই মন্দির নূতন অবস্থায় ছিল, তখন নিশ্চয়ই ইহা বড়ই সুন্দর ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই স্থান বড় বড় বানর ও ভয়াবহ বিষাক্ত সর্পের আবাসস্থল হইয়াছে। কালিঞ্জর দুর্গের ন্যায় এই দুর্গও নবম খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অজয়গড় এক সময়ে বিখ্যাত বুন্দেলা সর্দ্দার ছত্তরসাল কর্ত্তৃক শাসিত হইত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ছত্তরসালের মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার রাজ্য বিভাগ হয়, তখন অজয়গড় তাঁহার পুত্র জগতরায়ের অংশে পতিত হয়। কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ছয় সপ্তাহ অবরোধের পর মহারাষ্ট্রগণ এই দুর্গ দখল করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের কিয়দংশ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইলে অজয়গড় দখল করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হয়, কিন্তু এই দুর্গের শাসনকর্ত্তা ঘুঁস লইয়া লক্ষ্মণ দেব নামক একজন দস্যুপতিকে এই দুর্গ ছাড়িয়া দেন। দেশে শান্তি সংস্থাপনের জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট লক্ষ্মণ দেবকে অজয়গড়াধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে দস্যুপতির পুনঃ পুনঃ দৌরাত্ম্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কয়েকদিন ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ হওয়ার পর ইংরেজ সৈন্য কর্ত্তৃক অজয়গড় অধিকৃত হয়। তখন লক্ষ্মণ দেব রাজ্য পরিত্যাগ করিলে, ইংরেজগণ ভূতপূর্ব্ব বুন্দেলারাজ ভক্তসিংহকে এই রাজ্য প্রদান করেন। তাঁহারই বংশধরগণ এখনও অজয়গড়ে রাজত্ব করিতেছেন। ইহাঁদের উপাধি "সাওয়াই মহারাজা"। ইনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে ৭০০১ টাকা কর প্রদান করিয়া থাকেন।

অজানুর—মান্দ্রাজের অন্তর্গত দক্ষিণ কানারা জেলার মধ্যবর্ত্তী কাশারগোদ্‌কের একটি সহর। লোক সংখ্যা (১৮৮১) ৬৩০৯; গৃহ সংখ্যা ১২৮০ মঙ্গলোর ও কানানোরের মধ্যবর্ত্তী রাস্তার উপর অবস্থিত।

অজ্ঞান।—ব্রিটীস ব্রহ্মের অন্তর্ব্বর্ত্তী রেঙ্গুন জেলার রাজস্ব বিভাগ, রেঙ্গুন নদীর উত্তর পূর্ব্ব দিগে অবস্থিত। এইস্থান সমুদ্রতীরবর্ত্তী, ভূমি বালুকাময়, জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উত্তরাংশে বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর, অল্প পরিসর, উচু নীচু, ভিতরে বিস্তৃত মৎস্য পরিপূর্ণ বিল। অধিবাসিগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক কৃষিকার্য্য দ্বারা, এবং অধিকাংশ মাছ ধরিয়া ও লবণ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সম্প্রতি অজ্ঞানকে দুইটি রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; ইহার একটীর নাম উত্তর অজ্ঞান ও অপরটির নাম দক্ষিণ অজ্ঞান।

অজ্ঞানপুর—মোগলপুর।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মুরাদাবাদ জেলার একটি সহর; ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোক সংখ্যা মোট ৫২৭৬ ছিল, ইহার মধ্যে ২২৭৪ জন হিন্দু অবশিষ্ট ৩০০৩ জন মুসলমান।

অনজেঙ্গো।—মান্দ্রাজ প্রদেশে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি সহর। লোক সংখ্যা ২৫৩৪। এই সহর কুমারিকা অন্তরীপ হইতে ৭২ মাইল উত্তর পশ্চিমে আরব্যোপ-সাগরের তীরে অবস্থিত। সহরের নিকট একটি বিস্তৃত হ্রদ আছে। পূর্ব্বে অনজেঙ্গো একটি প্রধান সহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এখানে জাহাজ বাঁধিবার কোন উপযুক্ত স্থান নাই, বিশেষতঃ পানীয় জলের একান্ত অভাব নিবন্ধন কোনরূপ ব্যবসা বানিজ্যের সুবিধা নাই। ১৬৮৪ খৃঃ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি অতিঙ্গলের রাণীর নিকট হইতে এই স্থান লাভ করেন, ১৬৯৫ অব্দে এখানে একটি কুঠি ও দুর্গ নির্ম্মাণ করা হয়। তৎকালে এইস্থানে ব্যবসায়ের সুবিধা না থাকিলেও ভবিষ্যতে সুবিধা হইবে এই ভরসায় এখানে কুঠি সংস্থাপিত হয়। এক সময়ে অনজেঙ্গো ইংরাজদের একটি প্রধান বন্দর ছিল, কিন্তু ইহার স্বাভাবিক অসুবিধা বশতঃ শীঘ্রই হীনাবস্থা হইয়া পড়িল। এই স্থানে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রবার্ট অরমি জন্ম গ্রহণ করেন, ষ্টার্ণের প্রণয়িনী এলিজা ডে্পারও এই বন্দরে বাস করেন।

অনন্তপুর।—মান্দ্রাজের একটী জেলা। ইহার উত্তরে কারনুল জেলা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মহীসুর রাজ্য, পূর্ব্বে কডাপা জেলা। পরিমাণ ফল ৫১০৩ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৫৯৯৮৮৯। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের লোক সংখ্যা ৭০৮৫৪৯। হিন্দু ৬৫৫১০৫ মুসলমান ৫১৩৩৩ খৃষ্টান ১৭৮৩ বৌদ্ধ ৬।

প্রাকৃতিক ভাব।—এ প্রদেশ শৈলময়, বৃক্ষাদির বড়ই অভাব। যেখানে যেখানে গ্রাম, কেবল সেই সেই স্থানেই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জেলার দক্ষিণে চিত্রাবতী নদী। এখানে তাম্র, সীসা, আনটিমনি, ফিটকারী যথেষ্ট জন্মে। তাদপত্রী ও গুটিতে হীরকের খনি আছে। জঙ্গলে ব্যাঘ্র, চিতা, নেকড়ে, ভল্লুক, তরক্ষু, হরিণ প্রভৃতি আছে; নানা জাতীয় পক্ষীও এ প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতিহাস।—ইহা পূর্ব্বে বিজয়নগর রাজ্যের একটী অংশ ছিল। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তালিকটের যুদ্ধে বিজয়নগরাধিপ রামরাজা, বিজয়পুর, গোলকুণ্ডা, দৌলতাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের মুসলমান অধিপতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন। আধুনিক অনন্তপুর বিজয়নগরাধিপের দেওয়ান চিকপ্পা উদায় সংস্থাপন করেন। এক সময়ে নাইডু জাতির ইহা একটী সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। গুটী দুর্গ এখনও মহারাষ্ট্র বিক্রমের চিহ্ন স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবজীর মৃত্যু হইলে আরঙ্গজিব এই সমস্ত প্রদেশ অধিকার ও লুণ্ঠন করেন, কিন্তু এ প্রদেশ হইতে রাজস্ব কখনও নিয়মিতরূপ দিল্লীতে প্রেরিত হইত না। আরঙ্গজিবের মৃত্যুর পর এ দেশের সর্দ্দারগণ সকলেই স্বাধীন হয়। এদিকে এই সময়ে মহীসুরাধিপতি হাইদার আলি এ প্রদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা পাইলেন। গুটি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রদেশ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল, গুটি অনেক দিন পর্য্যন্ত নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। ইহার পর হাইদার আলি দুই বৎসর এই

থানে রাজধানী সংস্থাপন করেন। অনন্তপুরের চতুর্দ্দিকে পলিগর সর্দ্দারদিগের যতগুলি রাজ্য ছিল তাহা ক্রমে হাইদারের হস্তগত হইল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সর্দ্দারগণ স্বাধীন হইল। হাইদারের পুত্র টিপু সুলতান ইহাদিগকে আবার স্ববশে আনয়ন করেন। এই সময়ে টিপু সুলতান ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধাবসানে তিনি এ প্রদেশ নিজামকে প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে নিজাম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সৈন্য রাখার খরচার পরিবর্ত্তে কতকগুলি প্রদেশ অর্পণ করেন। অনন্তপুর ঐ সকল প্রদেশের অন্যতম। ইংরেজেরা কর আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হয়, কিন্তু জেনারেল কাম্বেল শীঘ্রই ইহাদিগকে দমন করেন।

কৃষি।—এ দেশের প্রধান ফসল কাম্বু, চোলাম, রাজি, ও কোরা। এতদ্ব্যতীত নারিকেল, কলা, তামাক, লঙ্কা প্রভৃতি অন্যান্য নানা দ্রব্যও জন্মে।

ব্যবসা বাণিজ্য।—পণ্য দ্রব্যের মধ্যে এই জেলার দক্ষিণে চাউল ও উত্তরে তুলাই প্রধান। এই উভয় দ্রব্যই চারিদিকে রপ্তানি হইয়া থাকে, কাপড়, দড়ি, এবং ফিতা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। আক, নীল, শোণ প্রভৃতিতেও অতিশয় অধিক ব্যবসা চলে। অনেক স্থানে কাচের চুড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এদেশে যথেষ্ট লবণ উৎপন্ন হইত; এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ইহা বন্ধ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ রেলের একটি শাখা এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। অধুনা এ জেলায় অনেকগুলি ভাল ভাল রাস্তাও নির্ম্মিত হইয়াছে।

অনন্তপুর সহরের লোকসংখ্যা ৪৯০৭। এখানে আদালত, জেল, ডাক্তারখানা স্কুল, ডাকঘর, ডাক বাঙ্গালা প্রভৃতি আছে।

অন্ধ্র।—পূর্ব্ব ভারতের ইহা একটী অতি প্রাচীন রাজ্য, এক সময়ে সমস্ত তেলিঙ্গিনা রাজ্য লইয়া ইহা বিস্তৃত ছিল। টলিমি হইতেও প্রাচীন (পিউটিনজেরিয়ান) পত্রে অন্ধ্র রাজ্যের উল্লেখ আছে। টলেমি কলিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্ধ্রের করেন নাই। প্লিনি ও হুয়ান থিয়াং এ উভয় রাজ্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উইলসন্ সাহেব বলেন যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮ বৎসরে মগধে একজন অন্ধ্র রাজা রাজত্ব করেন। তেলুগু ভাষাকে সংস্কৃতে অন্ধ্র ভাষা কহে।

অন্নমুকন্দ।—ওরাঙ্গেল রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। হাইদ্রাবাদ হইতে ৮৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার প্রথম রাজা সামান্য একজন রাখাল সর্দ্দার ছিলেন, ক্রমে তিনি নিজ আধিপত্য বৃদ্ধি করিয়া অন্নমুকন্দে এক রাজধানী সংস্থাপিত করেন। ইহাঁরা গণপতি বংশ বলিয়া খ্যাত;—১৩২৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান গণ ইহা দিগকে পরাজিত করেন। তেলিঙ্গনার বর্ণনা কালে ইহার বিশেষ ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হইবে।

অনুপসহর।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বুলেন্দাসহর জেলার মধ্যস্থিত অনুপ-সহর তসীলের প্রধান সহর। উহা গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত;—জাহাঙ্গিরের রাজত্ব কালে অনুপ রাই কর্ত্তৃক এই সহর সংস্থাপিত হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আমেদ সা আবদালী এই

স্থানে তাঁহার সেনানিবাস সংস্থাপিত করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব ও ইংরেজগণ অনুপসহরে তাঁহাদের সৈন্য সমাবেশ করিয়া মহারাষ্ট্র যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েন। এই সহরের লোকসংখ্যা ৮২৩৪। কার্ত্তিক পূর্ণিমায় এখানে এক বৃহৎ মেলা হয়। এক সময়ে অনুপ সহর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এক্ষণে ইহার হীনাবস্থা হইয়াছে।

অভানা।—মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত দামো জেলার মধ্যবর্ত্তী দামো তহ্শীলস্থ এক গ্রাম। জব্বলপুর যাইবার পথে দামো সহর হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটি অতি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীতে জলচর পক্ষী ও মৎস্য প্রচুর, নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিবার উত্তম স্থান আছে। লোক সংখ্যা দুই সহস্রের কম।

অমথী।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ ফরেক্কাবাদ জেলার একটি গ্রাম। গঙ্গার দক্ষিণ তটে ফরেক্কাবাদের পূর্ব্ব দিকে এক মাইল দূরে অবস্থিত। ইহাকে ফরেক্কাবাদের সহরতলী বলিয়া গণনা করা যায়। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ২০ আইনের বিধান মতে পুলিস রাখার জন্য এবং নগরের পথ ঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার জন্য অধিবাসিগণের নিকট হইতে যৎসামান্য টেক্স আদায় হইয়া থাকে। এই নগরের নিম্নে পার ঘাটে গঙ্গার উপরে একটি নৌসেতু আছে। রোহিল খণ্ডের ট্রাঙ্ক রোড্ এই সেতুর উপর দিয়া গিয়াছে।

অমরনাথ।—বোম্বাই প্রদেশের টানা জেলার অন্তর্গত একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা তিন শতের অধিক নহে। গ্রামের পূর্ব্ব দিকে ন্যূনাধিক এক মাইল দূরবর্ত্তী উপত্যকা মধ্যে একটি অতি প্রাচীন হিন্দু মন্দির আছে। এই মন্দিরের নির্ম্মাণকৌশল প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শ স্থানীয়। সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। এই মন্দিরে একখণ্ড প্রস্তর ফলক আছে যাহাতে ৯৮২ শক (১০৬০ খৃষ্টাব্দ) অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের কল্যাণ প্রদেশাধিপতি চালুক্যের অধীন করদ রাজা চিত্রারাজাদেবের পুত্র মম্বানিরাজা কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের দ্বার পশ্চিম দিকে, তবে মণ্ডপের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই দ্বার আছে। প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে ছাদযুক্ত ক্ষুদ্র বারান্দা আছে, চারিটী স্তম্ভের উপর এই ছাদ অবস্থিত, দুইটী স্তম্ভ প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন। ইহার চারি দিকেরই দৈর্ঘ্য ২২ ফিট ৯ ইঞ্চি। চারিটী সুন্দররূপে খোদিত স্তম্ভের উপর এই মণ্ডপ অবস্থিত। প্রত্যেক স্তম্ভের কারুকার্য্য ভিন্ন প্রণালীর; তবে অজন্ত মন্দিরের ন্যায় প্রত্যেক দুইটি এক ভাবাপন্ন। দেব গৃহটী ১৩ ফিট ৯ ইঞ্চ চতুষ্কোণ, ইহার শিল্পসৌন্দর্য্য প্রায়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে কেবল একটী শিবলিঙ্গ আছে, তাহাও ভূগর্ভে বসিয়া গিয়াছে। মন্দিরটীর বহির্ভাগের শিল্পসৌন্দর্য্যও অতি মনোহর। এই মন্দিরের প্রধান প্রস্তর মূর্ত্তি একটী ত্রিমস্তক বিশিষ্ট পুরুষ ও তাহার ক্রোড়ে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি,—সম্ভবতঃ শিব ও দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি। মন্দিরের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে একটী কালীমূর্ত্তিও আছে। এ মন্দিরস্থ ভাস্কর্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাস্কর্য্য বোম্বাই প্রদেশে আর নাই।

অমদ।—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে ব্রোচ জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। পরিমাণফল ১৩৬ বর্গ মাইল; লোক সংখ্যা ৩৯৬৪১। বীদর নদীর সন্নিহিত স্থান সমুদায় জঙ্গলময়, এখানে তুলার চাষ খুব বেশী হয়; লোকের বড়ই জল কষ্ট।

অমর নাথ।—কাশ্মীর মধ্যস্থ একটী গহ্বর উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। এটী হিন্দু দিগের একটী তীর্থ স্থান, কথিত আছে যে এই গহ্বরে শিব অধিষ্ঠান করেন। এখানে প্রতি বৎসর সলুনা মেলা হইয়া থাকে। ডাক্তার ভিঙ তাঁহার প্রণীত "কাশ্মীর ভ্রমণ" নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

অমরাপুর।—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গতঃ অনন্তপুর জেলার মদকশিরা তালুকের একটি সহর। এখানে ৯৩৬টি বাড়ী, তাহাতে ৩১৬৫ জন লোকের বাস। পূর্ব্বে এই সহরের নাম ছিল "নাদিমাপালী।" বর্ত্তমান সহরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে প্রাচীন সহরটির অবস্থান ছিল, ইহার নিকটে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর ক্রুয়াপেয়ার অর্থাৎ নারিকেল বৃক্ষের বাগান আছে। শীতলদুর্গ হইতে চিতোর যাইবার পথে এই সহর পাওয়া যায়। এখানে সপ্তাহে একদিন একটী বড় হাট বসিয়া থাকে।

অমরাপুর।—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গতঃ রেওয়া কান্থার মধ্যে পাণ্ডু মেবানের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণফল ১$\frac{1}{8}$ বর্গ মাইল। বার্ষিক রাজস্ব ৫০০ টাকা। বরদার গুই কুমারকে প্রতি বৎসর ২০০ টাকা কর দিতে হয়।

অমরাপুর।—ব্রহ্মদেশের একটী সহর, ইরাবতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রূপে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়; ক্রমে ইহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইহার লোক সংখ্যা ১৭০ হাজার হয়। সেই বৎসর এই সহরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হইয়া ইহার বিশেষ ক্ষতি হয়, তৎপরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ও রাজদরবার এখান হইতে অন্তত্র চলিয়া যাওয়ায় ইহার ক্রমেই অবনতি ঘটিতে থাকে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অমরাপুর এই দেশের রাজধানী ছিল, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার লোকসংখ্যা ৩০ হাজার মাত্র ছিল। পরে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই সহরে এক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া ইহার বিশেষ ক্ষতি হয়। এই দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজধানী এই নগর হইতে মান্দালা সহরে লইয়া যান। অমরাপুরে মন্দির ব্যতীত আর সমস্ত গৃহই বংশ নির্ম্মিত, তবে এই সকল গৃহ সুন্দর রূপে সুবর্ণরঞ্জিত হওয়ায় দেখিতে বড়ই মনোহর। দর্শনীয়ের মধ্যে বুদ্ধদেবের মন্দির সর্ব্বপ্রধান; এই মন্দির সুবর্ণ রঞ্জিত সার্দ্ধ দ্বিশত স্তম্ভোপরি সংস্থিত; এই মন্দিরে ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত বুদ্ধ দেবের একটী বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। নগরের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরাপুরের সমৃদ্ধির সময়ে নগর রক্ষার জন্য একটী চতুষ্কোণ দুর্গ ছিল, দুর্গের চারিদিকে প্রশস্ত পরিখা এবং ৬॥৴০ হাত লম্বা উচ্চ প্রাচীর ছিল। এই নগরের যে অংশে চিন দেশীয় বণিকগণ বাস করিত তথায় ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাসাদের অভাব ছিল না।

অমরাবতী।—বেরারের চিফকমিসনরের অধীন পূর্ব্ব বেরার বিভাগের একটী জেলা। ইহার উত্তরে বিটল জেলা, পূর্ব্বদিকে বর্দ্ধা নদী, দক্ষিণে বাসিন ও উন জেলা, পশ্চিমে আফলা ও ইলিচপুর জেলা। পরিমাণফল ২৭৫৯ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ২৩২৭ বর্গমাইল ভূমি আবাদী, ১০৮ বর্গমাইল আবাদের উপযুক্ত ও অবশিষ্ট ৩২৪ বর্গমাইল ভূমি আবাদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এখানকার লোকসংখ্যা ৫৫৭৩২৮। এখানে ১০১৫টি নগর ও পল্লিগ্রাম এবং ৪টি রাজস্ব আদায়ের মহকুমা আছে। এই জেলার মোট রাজস্ব ২০২০৯৯০ টাকা। নিম্নলিখিত তালুক কয়েকটি এই জেলায় অবস্থিত,—অমরাবতী, চান্দুর, মারতাজপুর। অমরাবতী নগরে এই জেলার সদরকাছারী, পূর্ব্ব বেরার বিভাগের কমিসনরের কাছারীও এই স্থানে অবস্থিত।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।—সমস্ত জেলাটি সমতলক্ষেত্র। সমুদ্র গর্ভ হইতে ইহার ভূমি ৮০০ ফিট উচ্চ। ইহার কোন কোন অংশ অতিশয় উচ্চ। অমরাবতী ও চান্দুর নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। এই সকল পাহাড়ে বৃক্ষ লতাদি নাই। এখানকার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় উর্ব্বরা; কেবল উচ্চতর প্রদেশের মাটি কঙ্কর-ময় ও অনুর্ব্বর। এ জেলার পশ্চিমাংশে পূর্ণা নদী প্রবাহিতা। অমরাবতী জেলার যে অংশে বর্দানদী প্রবাহিত আছে, সেই অংশের নদীর অগভীরতার জন্য নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। এই জেলার জঙ্গলে বড় বড় শিকার পাওয়া যায়। অমরাবতীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে যে সকল বনভূমি আছে, তৎসমুদায়ের পরিমাণ ফল ৭৮ বর্গমাইল। ১৮৮০।৮১ অব্দে এই জেলা হইতে ৫৮৯১০৲ টাকা বনকর আদায় হয়.তন্মধ্যে ব্যয় হয় ৯০৫০৲ টাকা।

ইতিহাস।—কিংবদন্তী আছে রুক্মিণীর বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার স্বয়ম্বর উৎসব দেখিবার জন্য অনেক বরাহী জাতীয় বীরগণ এই স্থানে সমাগত হয় এবং অবশেষে এই প্রদেশে অবস্থান করে। তাহাদের নামানুসারে এই প্রদেশের নাম বেরার হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত রাজপুত নরপতিগণ এই প্রদেশে আধিপত্য করেন। বেরারের অবশিষ্টাংশ ও অমরাবতী দিল্লীশ্বর ফিরোজ খিলিজীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতার হস্তগত হয়। বাহমেনি (ব্রাহ্মণি) বংশের অভ্যুত্থান ও পতনের সময় বেরারের ইমাদসাহী অধিপতিদিগের স্বাধীন রাজত্ব ও অবশেষে আকবর কর্ত্তৃক ১৫৯৬ খৃঃ অঃ তদধিকার প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা, অমরাবতীর ইতিহাসে না হইয়া বেরার প্রদেশের ইতিহাসে উল্লিখিত হওয়া উচিত। সম্রাট আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর দক্ষিণাপথের শাসনকর্ত্তা চিনকিনলীচ খাঁ, নিজাম উল্-মুলুক উপাধি গ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত রাজ্যবিভাগ করিয়া লয়েন। এই সময় হইতে বেরার নামে মাত্র হায়দরাবাদের অধিপতিগণের শাসনাধীন ছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে সমগ্র বেরার প্রদেশ নিজামের হস্তগত হয়। ১৮৫৩ ও ১৮৬১ খৃঃ অব্দের সন্ধির নিয়মানুসারে নিজাম ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে যে সকল প্রদেশ প্রদান করেন তন্মধ্যে অমরাবতী বেরারের অংশ বলিয়া ঐ সকল প্রদেশের অন্তর্

হয়। লোকসংখ্যা মোট ৫৭৫৩২৮ জন। খৃষ্টান, শিখ, পার্শী, হিন্দু, মুসলমান জৈন, এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নানাজাতীয় লোক এখানে বাস করে। প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয় পল্লীগ্রামে একজন পেটেল ও একজন পাটওয়ারী থাকার নিয়ম আছে; ইহারাই গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত। সচরাচর কুনবী জাতীয় লোকেরাই পেটেলের কার্য্য করে। কোন কোন ব্রাহ্মণও পেটেল হইয়া থাকেন। প্রতি বৎসর কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায় গো মহিষাদির সম্মানের জন্য ওলা নামক একটী মহোৎসব হয়। এখানে সাতটি প্রধান প্রধান মেলা হয়, এই সকল মেলাতে স্থানীয় লোকের অনেক প্রকার কৌতুকাবহ আচার ব্যবহার দেখা যায়। অমরাবতী, করঞ্জা, বাদ্‌নেরা, কোলাপুর, ডেলগাও, মঙ্গরস, মোরর্ষী, নেরপিঙ্গলে, সিন্দুরজান, ওয়ারাদ, মরতাজপুর, আন্‌জান্‌গাঁওবারী এই জেলার প্রধান প্রধান সহর। এখানে যে এক হাজার পনেরটি (১০১৫) টী গ্রাম আছে তাহার ৩৭৫ টির মধ্যে প্রত্যেকটিতে, ২০০ শত অথবা তদপেক্ষা কিছু কম লোকের বাস। ৩৩০টির মধ্যে ২০০ শত হইতে ৫০০ শত লোক বাস করে; ১৮৮ টির মধ্যে ৫০০ হইতে ১০০০; ৭৭টি গ্রামের মধ্যে প্রত্যেকটিতে ১০০০—২০০০; ২১টির প্রত্যেকটিতে ২০০০—৩০০০; ১৪ টির প্রত্যেকটিতে ৩০০০—৫০০০; ৮টির প্রত্যেকটিতে ৫০০০—১০০০০ এবং ২টির প্রত্যেকে ১০০০০ অপেক্ষা অধিক লোকের বাস। এখানকার অধিবাসিগণের ব্যবসা সেনসস্ রিপোর্টে নিম্নলিখিত ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে চাকরী ৮৩৪৩, গৃহকর্ম্ম ২৪৫২, বাণিজ্য ৬৪৩১, কৃষি ১৫০৯৪১, শ্রম ৩০৯৩৭ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কার্য্যে ৯৮৯৪৭ জন লোক নিযুক্ত আছে। দেশের প্রচলিত ভাষা মহারাষ্ট্রীয় এবং উর্দ্দু।

কৃষি।—তুলাই এখানকার প্রধান ফসল ও বাণিজ্য দ্রব্য।

জমির রাজস্ব।—দেশের অধিবাসী কৃষক ও কর সংগ্রাহকদিগের ভূমিতে ব্যবহার জনিত স্বত্ব এবং তৎসংলগ্ন কূপ ও বাগিচাদিতে মালিকী স্বত্ব আছে। এ ছাড়া ভূমিতে তাহাদের অন্য কোন প্রকারের স্বত্ব কলেক্টার দিগের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। বোম্বাই প্রদেশে ইংরেজেরা যেরূপ ভূমি সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা বলবৎ করিয়াছেন এপ্রদেশেও তাহাই প্রচলিত। কতকগুলি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া কোন কোন জমীর অধিকারীকে ভূ-স্বামী সাব্যস্ত করা হয়। ভূমির নিরিখ প্রথমতঃ ৩০ বৎসরের জন্য অবধারিত হইয়া থাকে, তৎপর উপযুক্ত কারণ থাকিলে খাজানার হার বৃদ্ধি হইতে পারে। এই ব্যবস্থা থাকায় ভূমির মালিকেরা, পরস্পর একে অন্যের সহায্যে কার্য্য করে। কতকগুলি বড় বড় জমিদার, বেতনভোগী লোক অথবা মজুরের দ্বারা জমিতে চাস আবাদ করান, তাঁহারা নিজে কেবল মাত্র বীজ, গোরু ও লাঙ্গল সরবরাহ করিয়া থাকেন। দান ও পুণ্য কার্য্যে এবং গ্রামের কাছারির আবশ্যক খরচাদি নির্ব্বাহের জন্য নায়েরাজ অর্থাৎ নিষ্কর জমি দেওয়া হয়।

প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা।—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় অনেকগুলি গ্রামের অধিকাংশ লোক দলবদ্ধ হইয়া সাগরের ছাওনীর ভিতর দিয়া আগরা অভিমুখে চলিয়া যায়। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা পথে যাহা কিছু পাইয়াছে তাহাই উদরসাৎ করিয়া অনেকে পীড়িত ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখানে সময়ে সময়ে ঝটিকা ও শিলাবৃষ্টিতে ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়া থাকে।

শিল্প।—মোটা সূতার কাপড় ও কতকগুলি গৃহব্যবহার্য্য কাঠ কাঠরার দ্রব্য ভিন্ন এখানে দেশীয় অন্য কোন প্রকারের শিল্পজাতদ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কোলাপুরে প্রাচীন রেশমের কারখানা আছে।

বাণিজ্য।—তুলার জন্য অমরাবতী বিখ্যাত। পূর্ব্বে গরুর দ্বারা গঙ্গাতীরবর্ত্তী মির-জাপুর সহরে তূলা রপ্তানি হইত। অমরাবতী হইতে মিরজাপুর ৫০০ শত মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮২৫ খৃঃ অব্দে পার্শি সওদাগরেরা অমরাবতীর তূলা বোম্বাই সহরে প্রেরণ করেন। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনেনসুলা রেলওয়ে (যাহাকে জি. আই. পি. রেলওয়ে কহে) হওয়ায় তূলার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। অমরাবতীতে কতকগুলি তূলার গাঁট বাঁধার কল আছে। এই সহরে মসলা, লবণ, সূতারবস্ত্র ও হরেক রকম বিলাতি জিনিষ নাগপুর হইতে আমদানি হয়। দিল্লী হইতে চিনি, গুড়, পাগড়ি এবং বেনারস (বারাণসী) হইতে নানাপ্রকার কিংখাপ আমদানি হইয়া থাকে। সাপ্তাহিক হাটে এপ্রদেশের স্থানীয় কেনা বেচা হয়। কোন্দানপুর, ভিলটেপ, অমরাবতী, মোর্ষী চাঁদুর, মারতাজয় পুর, বাদনেরা এই সাতটি স্থানে হাট হয়।

রেলরাস্তা ও সড়ক।—১৮৮১ খৃঃ অব্দে এপ্রদেশে ৫২২ মাইল বাঁধা সড়ক ছিল। ১৮৮১ সালে এখানে রেলপথ হইয়াছে। এই পথে, অল্প অল্প ব্যবধানেই ষ্টেসন আছে। বেদনারা জংসন হইতে অমরাবতী পর্য্যন্ত ৫।৷০ মাইল ষ্টেট রেলওয়ে আছে। শেষোক্ত রেলওয়ে হইতে ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ৩৯৪২ টাকা আয় হইয়াছিল। একজন ডেপুটি কালেক্টার এ জেলার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ২০ জন তহসিলদার তাঁহার সাহায্যার্থ নিযুক্ত আছে।

আবহাওয়া (Climate)।—বৈশাখ মাস হইতে গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভ; তৎ-কালে উত্তর ভারতে যেরূপ উত্তপ্ত পশ্চিমে বাতাস বহিতে থাকে, এ প্রদেশে তদনুরূপ বাতাস বহে না। আষাঢ় মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গরম থাকে, তার পর বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়; বর্ষা এ প্রদেশে তিনমাসব্যাপী। এই কালে শীতল ও জলীয় বায়ু প্রবাহিত হয়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুই মাস অতিশয় গরম ও অস্বাস্থ্যকর হয়। কার্ত্তিক মাসের মধ্য ভাগ হইতে ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত শীত থাকে। শীতকালের দুই প্রহরের সময়ে সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর থাকে। এই সময়ে কুজ্ঝটিকা অতি বিরল। জ্যৈষ্ঠ মাসে তাপমান যন্ত্রে ১১৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ হইতে দেখা যায়। অগ্রহায়ণ মাসের উত্তাপের হ্রাস

হইয়া তাপমানের পারদ ৫১ ডিগ্রিতে নামিয়া আসে। কলেরা, মেলেরিয়া, জ্বর, উদরাময় এবং চর্ম্মরোগ প্রভৃতি এদেশের প্রধান ব্যাধি।

অমরাবতী।—বেরার প্রদেশের অমরাবতী জেলার সদর এবং এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। ১৮৮১ অধিবাসীর সংখ্যা ২৩৫৫; (১৮৮১)। ইহার ১৭৬৭৫ জন হিন্দু, ৪৭২৫ মুসলমান, ৮৫১ জৈন, ২৬৬ খৃষ্টান, ২০ শিখ ও ১৩ জন পার্শি। ছয় মাইল ব্যবধানে একটি ষ্টেট রেলওয়ে এই সহরকে গ্রেটইণ্ডিয়ান পেনেনসুলা রেলওয়ের বেদনারা নামক ষ্টেসনের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। বেদনারা বম্বাই হইতে রেলওয়ের পথে ৪১১, নাগপুর হইতে ১৪০ এবং কলিকাতা হইতে ১৩৩২ মাইল দূরে। ২০ ফিট হইতে ২৬ ফিট উচ্চ, প্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুদৃঢ় প্রাচীর নগরের চতুর্দ্দিকে প্রায় ২½ মাইল স্থান পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এই প্রাচীরে পাঁচটি বড় ফটক ও চারিটি খিড়কী আছে। পিণ্ডারীদিগের উৎপাত হইতে এই স্থানের ধনশালী ব্যবসায়ীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিজামের গবর্ণমেণ্ট ১৮০৭ খৃঃ অব্দে এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই প্রাচীরের একটী খিরকীর নাম খুনারীখিড়কী। কথিত আছে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই খিরকীর নিকট যে লড়াই হইয়াছিল, তাহাতে ৭০০ লোক নিহত হয়। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে আকুলার তালুকদারদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বহু সংখ্যক লোক আকুলা হইতে অমরাবতীতে আসিয়া বাস করে। ৪০ বৎসর অতীত হইল ঐ কারণে আর একবার অমরাবতীর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই সহরে অতিশয় জলকষ্ট, অধিকাংশ কূপের জলই লবণাক্ত। এখানকার অট্টালিকা সকলের মধ্যে ভবানীর মন্দিরই উল্লেখযোগ্য; এই মন্দিরকে অম্বার মন্দিরও বলিয়া থাকে। এই মন্দিরের নাম হইতেই সহরের নাম অমরাবতী হইয়াছে। লোকে বলে সহস্র বৎসর অতীত হইল এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে আরও সাতটি ছোট ছোট মন্দির আছে। অমরাবতীর তূলা অতি উৎকৃষ্ট এবং তুলার ব্যবসায়ই এখানে অধিক পরিমাণে প্রচলিত। গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনেনসুল রেলওয়ে (G. I. P. Railway) হওয়াতে তুলার কারবার বোম্বাইয়ের সহিত চলিতেছে, কিন্তু উক্ত রেলওয়ে সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বলদ পৃষ্ঠে তুলা মিরজাপুরে প্রেরিত হইত। এই মিরজাপুর সহর গঙ্গার উপর অবস্থিত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে একজন সওদাগর এক লক্ষ বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই তুলা, মিরজাপুরের পথ দিয়া কলিকাতা প্রেরণ করে। তুলার বাণিজ্য সম্বন্ধে খাল গাঁয়ের নিম্নেই অমরাবতীর বন্দর স্থান। বেরার প্রদেশের মধ্যে ইহা একটী অতীব সমৃদ্ধিশালী নগর। এখানে অনেক ধনশালী ও যোত্রবান লোকের বাস ১৮৮০।৮১ খৃষ্টাব্দে রেলযোগে এখানে ৫৩৮২৪৭ পাউণ্ড মূল্যের বাণিজ্যদ্রব্য আমদানি ও ৭২৭৯৫১ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য এখান হইতে রপ্তানি হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ালগড় অধিকার করিয়া জেনারেল ওয়েলেস্‌লি এই স্থানে আসিয়া শিবির

সন্নিবেশ করেন। তখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়, এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের আধিক্য ছিল না। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের শাসন সময়ে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন জোওয়ারের দর অত্যন্ত চড়িয়া যায়; তাহাতে ধনরাজ সাহু নামক একজন ধনাঢ্য বণিককে এখানকার লোকেরা হত্যা করে। ধনরাজ অনেক চাউল খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই তাঁহার অপরাধ। "প্রমোদ সিন্ধু" নামক একখানি সংবাদ পত্র অমরাবতী হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখানে একটী হাই স্কুল আছে। এখানে অনেকগুলি তুলার কল ও পশমের কারখানা থাকায় বহুলোকের জীবিকার সংস্থান হয়।

অমরাবতী।—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ত্রিচনোপল্লী ও কোহিম্বাটুর জেলার একটি নদীর নাম। অঞ্জনপদ উপত্যকায় অনমলয় নামে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহার উত্তর পূর্ব্বাংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সম্মিলনে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। কাপপুরম্ গ্রামের নিকট দিয়া ইহা কোহিম্বাটুর জেলার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তথা হইতে উদমল পেটার, ধারাপুরম্ এবং কারুর তালুকের মধ্য দিয়া, তিরুমাকুদল গ্রামের নিকটে কাবেরী নদীতে পতিত হইতেছে। তিরুমাকুদল গ্রাম ত্রিচনোপল্লীর সীমান্তে অবস্থিত। অমরাবতী নদী দীর্ঘে ১২২ মাইল, ইহাতে ১৬টি কাটা খাল ও ৬টি বাঁদ আছে। নদী পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রে জল দেওয়ার জন্যই ইহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এক এক সময় সেচনের কার্য্য এত অধিক হইয়া থাকে যে, অমরাবতীর প্রবাহ কাবেরী নদীতে পতিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার জল নিঃশেষিত হইয়া যায়। এখানকার নিম্ন ভূমিতে ধানের আবাদ হয় এবং অমরাবতীর জলে ঐ সকল ভূমির সেচনের বিশেষ সুবিধা হয়। এই নদীর তটভূমির উপর কারুর এবং ধারাপুরম নামক দুইটি প্রধান নগর আছে। ছোট ছোট নৌকা এই নদীতে যাতায়াত করিতে পারে।

অমরাবতী।—ইহাকে অমরেশ্বর ধর্ম্মিকোটা এবং সময়ে সময়ে দীপালদীনা বলে। এটি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কৃষ্ণাজেলার মাতলা তালুকের মধ্যে স্থিত।

অমলনার।—বম্বাই প্রদেশের খান্দেশ জেলার একটি মহকুমা। পরিমাণ ফল ৫২৭ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৮৮৯৮৬। প্রায় সমস্ত প্রদেশই সমতল, তবে দক্ষিণ দিকে পাহাড় শ্রেণী দৃষ্ট হয়। তাপ্তি নদী উত্তরে প্রবাহিত; ইহার শাখা, বারি ও পানঝরাও এই মহকুমার মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই তিনটি নদী প্রবাহিত থাকায় এ মহকুমায় জলের অভাব হয় না।

অমলাপুর।—মান্দ্রাজ প্রদেশের গোদাবরী জেলার একটি তালুক। পরিমাণ ফল ৫০৬ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২২৭১৫৭। রাজস্ব ৫৭২৭০০৲ টাকা। আবিনিকট নদীর লনা, জ্ঞানভরম, ও অমলাপুরম নামক তিনটী শাখা এই প্রদেশের মধ্য এবং

পার্শ্ব ভাগ দিয়া গিয়াছে; এ তালুক বিশেষ উর্ব্বরা, নারিকেল কলা প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ। বশিষ্টগোদাবরী নদীর মধ্যে কয়েকটি অতি উর্ব্বরা দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থান হইতে নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ পণ্যদ্রব্য মান্দ্রাজের নানা স্থানে রপ্তানি হয়, এখানে কেবল লবণ আমদানি হইয়া থাকে। এই তালুকে নিম্ন লিখিত কয়টি সহর আছে :—

(১) অমলাপুরম্।
(২) পালিভেলা।
(৩) রালী।
(৪) অম্বাজি পেটা।

অমসিন।—অযোধ্যার ফয়জাবাদ জেলার একটি পরগণা। উত্তরে গারোনদী, পূর্ব্বে টাণ্ডা পরগণা, দক্ষিণে মাধ নদী, পশ্চিমে পচিমরথ পরগণা। প্রাচীন ভারজাতিয়দিগের অনেক ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকাদি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভারগণ আর নাই। এই পরগণার অধিকাংশ মহারাজা মানসিংহের জমিদারী। কৃষি এ পরগণায় উত্তমরূপে হইয়া থাকে। এখনকার পরিমাণফল ৯৯ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৫৩৮৭৪। দশটি গ্রামে বাজার আছে। আউদ (অযোধ্যা) ও রোহিলখণ্ডরেল এই পরগণার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

অমানি গঞ্জ হাট।—বাঙ্গালার মালদহ জেলার মধ্যস্থ প্রধান রেসমের হাট। মুরসিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি জেলা হইতে ব্যবসায়িগণ এই হাটে আসিয়া রেসম ও রেসমের কাপড় ক্রয় করিয়া থাকে। প্রতি হাটে ২০।২৫ হাজার টাকার রেসম বিক্রয় হয়।

অমেত।—রাজপুতনার অন্তর্গত উদয়পুর রাজ্যের একটি নগর। বানাস নদীর শাখা চন্দ্রভাগার তটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত বেষ্টিত একটি অতি সুন্দর উপত্যকা ভূমির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। ৪১ খানি পল্লিগ্রামের অধিপতি একজন অতি প্রধান রাজপুত সর্দ্দার এই নগরে বাস করেন। নগরটি প্রাচীর বেষ্টিত।

অমেথী।—অযোধ্যা প্রদেশে সুলতানপুর জেলার একটি পরগণা। ইহার উত্তরে কিশোণী এবং সুলতানপুর পরগণাদ্বয়, পূর্ব্বে টপ্পা আজল, দক্ষিণে প্রতাপগড় জেলা, পশ্চিমে রক্ষ্যাজইস পরগণা। অমেথী একটি প্রধান পরগণা, এখানে বন্ধালঘাটী ক্ষত্রিয় দিগের বাস। ইহার মধ্যে ৩৬৫ খানি গ্রাম আছে, তাহার ৩৬৪ খানি বন্ধালঘাটী দিগের অধিকারে। রাজা মাধবসিংহ ৩১৮ খানি গ্রামের ভূস্বামী; তাঁহার ভূসম্পত্তির পরিমাণফল ২৬৫ বর্গ মাইল। তিনি ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টকে অনুমান ২০১৩০টাকা খাজনা দেন। কেবল মাত্র অমেথী পরগণার মধ্যেই বন্দেলঘাটীদিগের সম্পত্তি আছে। এ পরগণার বাহিরে একখানি মাত্র গ্রামেও তাহাদিগের অধিকার দেখা যায় না। এই

বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ হাসনপুরের রাজার ঔরসে কোন এক ডোম জাতীয়া রমণীর গর্ভ সম্ভূত বলিয়া প্রথিত আছে। এইরূপ শুনা যায় যে, কোন শুভকার্য্য উপস্থিত হইলে এই সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়গণ বাঁশ কাটিবার অস্ত্র বাঁকার (এক প্রকার দায়) নিকট নৈবেদ্যাদি দিয়া থাকে। বন্দেলঘাটীয় ক্ষত্রিয়গণ এই জন্ম বৃত্তান্ত স্বীকার করেন না। জয়পুরের বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, ইহারাও সেই সূর্য্য-বংশীয় দিগের একটি শাখা ইহতে উৎপন্ন বলিয়া, আপনাদের পরিচয় দেন। বন্দাল-ঘাটীয়গণ এসম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়া থাকেন। গল্পটি এই যে—৯০০ শতবৎসর পূর্ব্বে জয়-পুর রাজবংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে অযোধ্যায় উপস্থিত হন। তৎকালে রজনীযোগে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনিও তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে এই দেশের অধিপতি হইবেন। এই স্বপ্নের ফলে তিনি আর দেশে ফিরিয়া না গিয়া এই থানেই বসবাস করেন। বন্দেলঘাটিরা বলেন যে তাঁহারা ইহারই বংশাবলি। এই পরগণার পরিমাণফল ২৯৯ বর্গ মাইল; তাহার ১৩১ বর্গ মাইল ভূমিতে চাস আবাদ হয়। লোক সংখ্যা ১৫৯৬১৮. ইহার ১৫১১০৪ জন হিন্দু, ৮৫১৪ জন মুসলমান।

অমেথীধনগর।—অযোধ্যার অন্তর্গত লক্ষ্ণৌ জেলার একটি নগর; সুলতানপুর যাইবার পথে এই নগর অবস্থিত। এটি ওড়দিগের প্রাচীন আবাস স্থান; ইহা বহু দিন হইতে কখন হিন্দু কখন বা মুসলমান দিগের অধিকারে ছিল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে এখানকার বাটীর সংখ্যা ১১৫১। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা ২৭৩৯, মুসলমান ২৯২২, মোট লোক সংখ্যা ৫৬৫৪। গো মহিষাদির শৃঙ্গ ও চামড়া এখান হইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়। বস্ত্রাদি বয়নের ব্যবসাও এখানে অধিক পরিমাণে প্রচলিত। পুলিস ও কন্সারভেন্সির জন্য এখান হইতে ট্যাক্স আদায় হইয়া থাকে।

অমোদ। অমোদ মহকুমার প্রধান নগর। এখানে একজন বড় জমিদারের বাস। ইহারা ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। বাৎসরিক আয় ৮০০০০ টাকা। এখানে যে সকল কর্ম্মকার আছে তাহারা ছুরি, ক্ষুর, এবং অন্যান্য নানাপ্রকার ধারাল অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে অতিশয় পটু। অধিবাসীর সংখ্যা ৫৮২৯ (১৮৮১)। ইহার ৪৮১৯ জন হিন্দু, ৭৭১ মুসলমান, ৫৫৯ জৈন, ১০ পার্শি এবং অবশিষ্ট ২৯৩ জন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

অম্ব। পঞ্জাবের অন্তর্গত হাজরা জেলার উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি জায়গীর। স্বাধীন পাঠান রাজ্য হইতে সিন্ধুনদী দ্বারা এই জায়গীর ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে। ইহা একটি ২০৪ বর্গ মাইল আয়তনের শৈল প্রদেশ। পঞ্জাব অধিকার কালে পূর্ব্বোক্ত সমগ্রভূভাগ এখানকার নবাবের বংশধর দিগকে চিরকালের জন্য জাইগীর স্বরূপ দান করা হয়। সীমান্ত প্রদেশের সরদারদিগের মধ্যে অম্বের বর্ত্তমান নবাব ইংরাজ রাজ্যের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আগরোর উপত্যকার যুদ্ধে ইনি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বড়ই উপকার করিয়াছিলেন। তাহার পুরস্কার স্বরূপ ইহাকে সি. এস্. আই. উপাধি

প্রদত্ত হইয়াছে। হাজারা জেলার বৃটিশ শাসনাধীন জাইগীর ভিন্ন এই জেলার উত্তর পশ্চিম কোণাংশে, সিন্ধুনদীর অপর পার্শ্বস্থ তানবাল রাজ্য ও সমগ্র স্বাধীন অম্বদেশ নবাবের অধিকারের অন্তর্গত। সিন্ধুনদীর দক্ষিণ তটে অম্বগ্রাম অবস্থিত। এখানে প্রস্তর ও বালুকা নির্ম্মিত ৩০০ শত বাটী আছে। এই গ্রাম একটি গিরিশঙ্কটের দক্ষিণে অবস্থিত। কথিত গিরিশঙ্কটের উত্তরদিকে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ আছে। এই দুর্গ মধ্যে নবাবের বাসভবন।

অম্বগড়চৌকি। মধ্য প্রদেশে চাঁদা জেলার একটি জমীদারী। পরিমাণফল ২০৮ বর্গমাইল। ইহাতে ১৭৯টি পল্লিগ্রাম আছে। লোক সংখ্যা ২৯৮৫৪ (১৮৮১)। রাইপুরেরদিকে বেশ চাষ আবাদ হয়, তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই জঙ্গল ও পাহাড়। এখানে অত্যুৎকৃষ্ট লোহার খনি আছে। এ প্রদেশে গন্দ ও গলীস জাতির বাস। গত কয়েক বৎসরে এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অম্বগড়চৌকি সহরে ১৪১৯ জন লোকের বাস ছিল।

অম্বগাও। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত চাঁদা জেলার একটি পরগণা। পরিমাণফল ১০১২ বর্গমাইল। এখানে ৬৭টি পল্লিগ্রাম ও ৪টি জমিদারী আছে। বেণগঙ্গা নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন অন্যান্য সকল স্থানই পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ এবং উক্ত নদীর শাখা সমূহের দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন। এখানে প্রধানতঃ চাউল, রেশম, গুটি ও অন্যান্য আরণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব উপকূল হইতে এখানে প্রচুর পরিমাণে লবণ আমদানী হয়। দক্ষিণ ভাগে তেলিগু ও উত্তরভাগে মারহাট্টাভাষা প্রচলিত। তৈলঙ্গিগণ এই দেশের স্থানীয় কারবারী লোক। এই পরগণার মধ্যে মারকণ্ডি একটি বর্দ্ধিষ্ট স্থান। ঘরচিরোলী ও চামরসী দুইটি গণ্ডগ্রাম।

অম্বটা। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সাহারাণপুর জেলার একটি নগর। লোক সংখ্যা ৬৩৯২ (১৮৮১)। এখানে হিন্দু, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি জাতির বাস। পরিমাণফল ৫৫ একার। এই নগরে সৈয়দ বংশের পীরজাদা পরিবাবের বাস। সা আবুল মজিলী এই পরিবারের এক জন পূর্ব্বপুরুষ। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত লোক। অম্বটা নগরের মধ্যে তাঁহার, চূড়াস্তম্ভ যুক্ত সুন্দর সমাধি মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। আবুল মজিলের বংশধরগণের অধিকারে অদ্যাপি কতকগুলি লাখরাজ ভূমি আছে। নগরে অনেকগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। বাজার দুইটী প্রশস্ত সড়কের উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে মোগল সৈন্যের সেনানিবাস ছিল। এই নগরটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এখানে সম্রাট হুমায়ুনের আমলের দুইটি মসজিদ, একটি বর্দ্ধিষ্ট স্কুল, একটি শাখাডাকঘর, একটি পুলিস আউটপোষ্ট আছে।

অম্বদ। (২১২) নিজাম রাজ্যের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত হায়দরাবাদের

একটি তালুক। পরিমাণফল ৮৬০ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ১১৬১৬৮ (১৮৮১)। ইহার ৬৮৫ বর্গমাইল ভূমি আবাদী, ১৩৮ বর্গমাইল আবাদের উপযুক্ত, অবশিষ্ট ৩৭ বর্গ-মাইল আবাদের অযোগ্য পতিত ভূমি। ভূমির কর ৩২৭২৩০৲ টাকা। নূতন বন্দোবস্তের কার্য্য ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হইয়াছে, অনুমান হয় কার্য্য শেষ হওয়ার পর ভূমির কর বৃদ্ধি হইবে। অম্বদ, ঝামকর, রোহিলগড়, বিহামন্দর, গঙ্গাসঙ্গি ও একটুনী এই কয়েকটি এই তালুকের প্রধান নগর। এই তালুকের মধ্যে ২৪১টি গ্রাম আছে। তাহার ২২টি হস্তান্তরিত হইয়াছে। মারহাট্টাদিগকে শেষবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট, অম্বদ জেলা ও আর কয়েকটি প্রদেশ আপনাদের হস্তগত করেন। পরে এই সকল জেলা নিজামের হস্তে অর্পিত একটী সরকারে বা প্রাদেশিক বিভাগে পরিণত হইয়াছে। এই সরকারে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি জেলা আছে যথা—ভীরুল, ফুলমবারী, হারসুল। ওয়ালুজ, চিকলী, জলনা, রাক্ষসভুবন এবং বদনপুরা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে অম্বদ একটী জেলায় পরিণত হয়। পাথরী, পূর্ভাণী, ঝালন্নাগপুর, নরশী, পয়তান এবং অম্বদ এই ছয়টি তালুক ইহার এলাকাধীন করা হয়। চারি বৎসর পরে এই নূতন বন্দোবস্ত রদ হইয়া, ইহার সদর কাছারী আরঙ্গাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এবং অম্বদ আরঙ্গাবাদ জেলার একটি তালুক বলিয়া পরিগণিত হয়।

অম্বদ। নিজাম রাজ্যে হায়দরাবাদের এলেকায়, আরঙ্গাবাদজেলার অন্তর্গত অম্বদ তালুকের প্রধান নগর। উপরোক্ত তালুকের প্রায় মধ্যস্থলে অসমতল ভূমির উপর এই নগর অবস্থিত। ইহার তিন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। প্রবাদ এই যে, অম্ব নামক জনৈক হিন্দুরাজা, ভারতবর্ষের উত্তর সীমাস্থ স্বীয় রাজ্য শাসনের চিন্তায় একান্ত ক্লান্ত হইয়া, এই নগরের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত একটি পর্ব্বতের ক্ষুদ্র গহ্বর মধ্যে বাস করেন। নগরটি তাঁহার দ্বারা সংস্থাপিত হয় বলিয়াই তাঁহার নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। যে গহ্বরে রাজা বাস করিতেন তথায় এক্ষণে একটি সুন্দর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে এই নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এক্ষণে পূর্ব্ব গৌরবের অতি অল্পমাত্র চিহ্ন আছে। প্রধান ব্যবসায়-দ্রব্য তুলা ও ভুট্টা; লোক সংখ্যা ৪০০০। এখানে কোন প্রাচীন কীর্ত্তি নাই। নগরের পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ আছে তথায় তহসিলদার বাস করেন ও কাছারী করেন।

অম্বর।—রাজপুতনা প্রদেশে জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এখন ইহার ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগর জয়পুর রাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী জয়পুর নগরের পাঁচ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ৫০৩৬ (১৮৮১)। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম এবং দর্শক মাত্রেরই চিত্তাকর্ষক। গণ্ডশিলাময় পর্ব্বতের (gorge) সম্মুখে এই নগর অবস্থিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। সহরের সম্মুখেই একটি অতি রমণীয় ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। তাহার পার্শ্বে সুন্দর অট্টালিকা-

শ্রেণী। যে সকল ক্ষুদ্র পাহাড় এই হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে বিদ্যমান আছে, বর্ষাগমে তৎসমুদয় নানা জাতীয় হরিৎপল্লবাদিতে সুশোভিত হয়। জয়পুর হইতে অম্বর যাইবার একটী অতি সুন্দর প্রশস্ত পথ আছে; সেই পথে ঘোড়ারগাড়ি যাতায়াত করিতে পারে, কিন্তু রাজভবন বা প্রাচীন নগর দেখিতে হইলে গাড়ীতে যাইবার সুবিধা নাই, অশ্বারোহণে যাইতে হয়। ভ্রমণকারিগণ অম্বর নগর দর্শনে প্রকৃতই অদ্ভুত আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

টলেমী প্রণীত গ্রন্থে অম্বর নগরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া ইহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে কচ্ছ রাজপুতগণ এই অঞ্চলে আসিয়া কিছু দিন বাস করিবার পর শ্বশ্বত মিনাশ নৃপতির হস্ত হইতে অম্বর সহর জয় করিয়া লয়। রাজা বহুদিন পর্য্যন্ত উক্ত রাজপুতদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাভূত হন। ঐ সময় হইতে রাজপুতদিগের রাজধানী অম্বর নগরে স্থানান্তরিত হয়। নগরের নাম অনুসারে রাজ্যেরও নামকরণ হইয়াছিল। এই নগরে অনেক মনোরম পদার্থ আছে। এখানকার রাজভবন রাজপুত শিল্পের আদর্শ। গোয়ালিয়র রাজপ্রাসাদের পরেই এটী উল্লেখযোগ্য। গোয়ালিয়র রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণের এক শত বৎসর পরে, ১৬০০ সালে, কাশীর মানমন্দিরের সংস্থাপনকর্ত্তা বিখ্যাত মানসিংহ অম্বরের রাজভবন নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিওয়াই জয়সিংহ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করাইয়া ছিলেন। ১৭২৮ খৃঃ অব্দে তিনি অম্বর হইতে জয়পুরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, এই রাজপ্রাসাদে একটী অতি সুন্দর তোরণ নির্ম্মাণ করান। তোরণটি তাঁহারই নামে আখ্যাত হয়। গোয়ালিয়রের রাজপ্রাসাদে হিন্দুদিগের শিল্পনৈপুণ্যের যে সতেজ ভাব ও চিরনবীনতার পরিচয় পাওয়া যায় অম্বরের রাজপ্রাসাদে যদিও তাহার অনেকাংশে অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রথম দর্শনে বোধ হয় যেন এই প্রাসাদ চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতময় ভূভাগের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া, আপনার জনমনোহর সৌন্দর্য্য নিকটস্থ জলাশয়বক্ষে প্রতিবিম্বিত করিতেছে। ইহার মধ্যভাগের নির্ম্মাণ প্রথাও অতি উৎকৃষ্ট। উভয় পার্শ্বস্থিত গৃহনিচয় এরূপভাবে নির্ম্মিত যে তাহাদের সকলগুলির মধ্যভাগ হইতেই নিকটস্থ হ্রদের রমণীয় দৃশ্য নয়নগোচর হয়। আজকাল হিন্দুদিগের শিল্পকার্য্যের মধ্যে ক্রমে যেপ্রকার নিস্তেজভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই প্রাসাদের সাজ সজ্জা ও কারুকার্য্যে তদ্রূপ কোন নিস্তেজতা বা হীনতা পরিলক্ষিত হয় না। সম্রাট আকবরের সময়ের অট্টালিকাদিতে স্বভাবসুলভ তেজস্বীতার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, অম্বর রাজপ্রাসাদেও তদ্রূপ তেজস্বিতার চিহ্ন সকল বিদ্যমান আছে।

অম্বর নগরে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। এক সময়ে এখানে বহুসংখ্যক যোগী-ঋষির সমাগম হইত। এখানে একটী ক্ষুদ্র কালীমন্দিরের সম্মুখে প্রত্যহ একটী

ছাগ বলি হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে রাজপুতদিগের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে এই দেবীর মন্দিরে প্রত্যহ নরবলি হইত। আজকাল অম্বরের দুই একটী মন্দিরে মাত্র নিয়মিত সেবা হইয়া থাকে। এই নগরের গৌরবরবি এক্ষণে অস্তমিত। রাজ-ভবনটীর অবস্থা অদ্যাপি ভাল আছে বটে, কিন্তু একেবারে জনশূন্য, নিস্তব্ধ। সময় সময় এখানে জয়পুরের রাজা আগমন করিয়া থাকেন মাত্র। ভূতল হইতে চারি পাঁচ শত ফিট উচ্চে পাহাড়ের উপর যে দুর্গ আছে তদ্দ্বারা রাজভবন সুরক্ষিত। দুর্গের সহিত রাজপ্রাসাদের যোগ আছে। অতি পূর্ব্বকালের রাজারা এই দুর্গে আপন আপন ধনরত্ন রক্ষা করিতেন ও এখানে কয়েদীগণ অবরুদ্ধ থাকিত। মীনাশ নরপতির হস্ত হইতে যৎকালে কচ্ছরাজপুতেরা দুর্গ কাড়িয়া লয়, তখন তাহারা চিরকাল এখানে আপনাদের ধনাদি রাখিবে এই অঙ্গীকার করিয়াছিল।

অম্ব সমুদ্রম্। মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত তিনিবল্লী জেলার একটি তালুক ইহাতে ৯২টি পল্লীগ্রাম আছে। পরিমাণফল ৫৬৯ বর্গমাইল। ইহার ৯০২৬ একার জমি-দারী, ৭৯৪৩ একার আয়মা এবং অবশিষ্ট গবর্ণমেণ্টের খাসমহাল। গবর্ণমেণ্ট খাস ভূমির ৬৩৬৮৫ একার ভূমিতে চাস হয়, অবশিষ্ট ৬২৯১২ একার পতিত আছে। এই তালুকের মধ্য দিয়া তাম্রপাণি (তাম্রপর্ণি) নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত; ইহা ৪ কি ৫ মাইল প্রবাহিত হইয়া সরভিয়ের নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সরভিয়ের পাঁচটি প্রপাতে বিভক্ত হইয়া পাপনাশন নামক সুবিখ্যাত স্থানে তাম্রপর্ণিতে পড়িতেছে। প্রতি বৎসর এই সম্মিলন স্থানে সহস্র সহস্র লোক সমাগত হয়। এই তালুকের মধ্যে পঞ্চাশটি শিবমন্দির আছে, এই সকল মন্দিরের বার্ষিক নগদ আয় ১৬৪৭০ টাকা, তদ্ভিন্ন প্রায় ৫৭১১০ টাকা মূল্যের দেবোত্তর ভূমি ও জহরতাদি আছে। সঙ্গমপত্তি ও উরকাদ নামক দুইটি তালুক এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

অম্বিকা। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে সুরাট জেলার একটি নদী। বাঁশদ-পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী বরদা রাজ্যের মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হই-তেছে। অনন্তর দুইটী প্রবাহে বিভক্ত হইয়া সুরট জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তৎপর জলালপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী বালুকাময় ভূমির উপর দিয়া বক্রভাবে কিছু দূর গিয়া পুনার ১৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে পড়িতেছে। নদীর মোহানা হইতে পোনের মাইল দূরে গামদেবী নগর পর্য্যন্ত জোয়ার আইসে। সমুদ্র হইতে ৬ মাইল দূরে অম্বিকা নদীর উপরে ৮৭৫ ফিট লম্বা একটি রেলওয়ে সেতু আছে। কাবেরী ও খারিয়া নামক দুইটি বৃহৎ নদী অম্বিকার সহিত মিলিত হইয়াছে। সম্মিলন স্থানের কিছুদূর ভাটিতে এই তিনটি নদীর জলস্রোত একত্রিত হইয়া একটি সুপ্রশস্ত মোহানা হইয়াছে। এই মোহানার দেড়মাইল দূরে একটি জল পরিমাপক দণ্ড প্রোথিত আছে। ভাটার

সময় ইহার তিন চারি ফিট জলে ডুবিয়া থাকে। জোয়ারের সময় ইহার ২২ ফিটের দাগ পর্য্যন্ত জল উঠে। মোহানা হইতে ৬ মাইল উজানে বিলিমোরা পর্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে। তাহার পর ৫০ টন ও তদপেক্ষা কম বোঝাই নৌকাদি পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারে। কাবেরী ও থারেরা এই উভয় নদীর উপর যথাক্রমে ৬৮৮ এবং ৬২৫ ফিট দীর্ঘ রেলওয়ে সেতু আছে।

অম্বেলা।—পঞ্জাবের অন্তঃপাতি পেশাবার জেলার উত্তর পূর্ব্বে ব্রিটীশ রাজ্যের বাহিরে এই নামে একটি পার্ব্বত্যপথ আছে। ভারতপ্রান্তে যে সকল দুর্দ্দান্ত লুণ্ঠনরত পার্ব্বতীয় জাতি বাস করে, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য এই অম্বেলার পথ দিয়াই ব্রিটীশ সৈন্যসমূহ যাতায়াত করে। এইজন্যই অম্বালার পথটির প্রয়োজনীয়তা বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই সকল পার্ব্বতীয় জাতির দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য যে অভিযান প্রেরিত হয়, তাহাই বিশেষ প্রসিদ্ধ ও উল্লেখ যোগ্য। শেয়াতদেশের অন্তঃপাতি শীতালা গ্রামে একদল ওয়াহাবী মুসলমান আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে। কতকগুলি ধর্ম্মান্ধ ফকির, বিদ্রোহী সৈন্য, এবং গুরুতর অপরাধী ও রাজনীতি-সূত্রে ব্রিটীশরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত লোক আসিয়া উপনিবেশ বাসীদিগের দলপুষ্টি করিতে থাকে। পঞ্জাবপ্রদেশ ব্রিটীশ রাজ্যভুক্ত হওয়ার পর হইতেই এই সকল দুর্দ্দান্ত লোকের দ্বারা পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট নানারূপে উত্যক্ত হইতে থাকেন। এই ধর্ম্মোন্মত্ত সম্প্রদায় ১৮৫০ খৃঃ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ব্রিটীশ শাসনের বিরুদ্ধে বৈরভাব প্রকাশ করিয়া, সীমান্ত প্রদেশের লোক দিগকে উত্তেজিত করিতেছিল। কিন্তু তাহারা কোন কালেই সুশিক্ষিত যোদ্ধৃগণের ন্যায় ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষ দিগের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা ইংরেজরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সমর বিভাগস্থ ব্রিটীশ কর্ম্মচারীর ছাউনি আক্রমণ করে। কাজেই ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অম্বেলার পথ দিয়া, পাঁচ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশে প্রেরিত হয়। নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এই সকল সৈন্য কতকগুলি পল্লি-গ্রাম ধ্বংশ করে। পরে ব্রিটীশ সৈন্যগণ ঐ স্থানের দুইটি দুর্গ উড়াইয়া দেয় ও শীতলার উপনিবেশ একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। অনন্তর এই সকল প্রান্তবাসী জাতির সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হয়। তদনুসারে তাহারা আর কখন এই সকল মুসলমান ধর্ম্মোন্মত্ত ফকির দিগকে তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না এরূপ স্বীকৃত হয়। এক জাতীয় পর্ব্বতবাসীর হস্তেই শীতলারাজ্য অর্পিত হয়, কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বিদ্রোহীগণ পুনরায় পর্ব্বত নিবাসী অন্যান্য অসভ্যজাতীয় লোকদিগকে স্ববশে আনিয়া, পুনরায় ব্রিটীশরাজ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করে।

ক্রমে ক্রমে এই সকল উপদ্রবকারী সম্প্রদায় প্রশ্রয় পাইয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার

ইংরেজ সৈন্যদলের ছাওনি আক্রমণ করে। এবার সম্পূর্ণরূপে ইহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য পঞ্জাবে সাত হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য সংগৃহীত হয়। এই সমবেত সৈন্যদল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখে জেনারেল সার নেভীল চেম্বারলেনের অধীনে ছাউনি হইতে বহির্গত হইয়া, পর দিন সন্ধ্যাকালে অম্বেলার পার্ব্বত্য পথে উপনীত হয়। পার্ব্বতীয়গণ সকলেই বিদ্রোহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ২০শে অক্টোবর তারিখে সৈন্যগণ পূর্ব্বোক্ত পথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া, দল-পুষ্টির জন্য আরও সৈন্য চাহিয়া পাঠায়। পার্ব্বতীয়গণ সংখ্যায় ষষ্টি সহস্র, ইহারা নানারূপে ব্রিটীশ সৈন্য দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একাল পর্য্যন্ত ইংরেজসৈন্য আত্মরক্ষার্থেই নিযুক্ত ছিল, পরে ডিসেম্বর মাসে তাহাদের দল পুষ্ট হইলে, তখন ৯০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য পার্ব্বত্যগণকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হয়। এদিকে রাজনৈতিক কৌশলে পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে দলাদলি বাধাইবার উদ্যম করা হয়। তাহাতে কতকগুলি প্রধান প্রধান সরদার দল পরিত্যাগ করিয়া যায়, কতকগুলি কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকে। ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে ইংরেজসৈন্য শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে। ১৬ই তারিখে অম্বেলাগ্রাম লুণ্ঠিত ও দগ্ধীভূত হয়। ইহাতে পার্ব্বতীয়দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। বুনেয়ার জাতীয় লোকেরা ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করে; তাহারা সমস্ত ওয়হাবীদিগকে তাহাদের দুর্গ মধ্যে পোড়াইয়া মারিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে। সাতদিন অতীত না হইতেই একদল সুশিক্ষিত ইংরেজসৈন্য বুনেয়ার দিগের সাহায্যে পার্ব্বতীয় পথ দিয়া ওয়াহাবীদিগের আবাস স্থানে উপনীত হয় ও তাহা অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া দেয়। ২৩শে ডিসেম্বর এই সকল সৈন্য অম্বেলার গিরিপথে ফিরিয়া আসে এবং ২৫ শে তারিখ ব্রিটীশ অধিকারে পুনঃপ্রবেশ করে। প্রত্যাবর্ত্তন কালে ইহা-দিগকে একটি ফাকা আওয়াজও করিতে হয় নাই। এই অভিযানে ইংরেজ পক্ষে ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্যের ২২৭ জন হত, ৬২০ জন আহত হয়। শত্রু পক্ষের প্রায় ৩০০০ লোক হত ও আহত হইয়া ছিল।

অযোধ্যা।—অযোধ্যা প্রদেশের মধ্যস্থিত ফয়জাবাদ জেলার একটী প্রাচীন সহর। গগরানদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার জন্যই অযোধ্যা বিখ্যাত। এক্ষণে প্রাচীন সহর প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ভগ্নস্তূপ সকল দেখিয়াই ইহার পূর্ব্বতন গৌরব বুঝিতে পারা যায়। অতি প্রাচীনকালে অযোধ্যা ভারতের মধ্যে একটী বৃহৎ ও সুন্দর নগরী ছিল। কথিত যে এই সহর ১২ যোজন বা ৯৬ মাইল লইয়া বিস্তৃত ছিল। ইহা কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল; দশরথ রাজা এইখানে রাজত্ব করিতেন। রামায়ণের আদিকাণ্ডে অযোধ্যার সৌন্দর্য্য ও গৌরবের সবিশেষ বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য রামচন্দ্র দশরথের পুত্র। সূর্য্যবংশের

সুমিত্রা রাজার সময় হইতে অযোধ্যার অবনতি আরম্ভ হয় ও ক্রমে ইহা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। এই রাজবংশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সময়ে সময়ে নানা দেশে যাইয়া রাজ্য সংস্থাপন করেন, এইরূপে জয়পুর, উদয়পুর, প্রভৃতি রাজবংশ গুলি সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হয়। সূর্য্যবংশের শেষরাজার মৃত্যুর পর বৌদ্ধ অধিকার বিস্তৃত হয়। হিন্দুধর্ম্ম পুনসংস্থাপনের সময় রাজা বিক্রমাদিত্য অযোধ্যাকে উদ্ধার করেন। কথিত যে তিনিই রামায়ণ লিখিত পবিত্র স্থান গুলি ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন ও সেই গুলি পুনর্নির্ম্মিত করান। ইহার মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়টী প্রধান, যথা (১) রামকোট, দশরথের দুর্গ ও প্রাসাদ। (২) নাগেশ্বর নাথ শিব মন্দির। (৩) মণিপর্ব্বত। এই সকল স্থানে বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের পরে কোশল রাজ্য সমুদ্রপাল, শ্রীবাসতম ও কনোজ রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল; তৎপরে মুসলমানগণের অধিকারে আইসে। কোশল রাজ্য বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান বলিয়া বিখ্যাত, দুইটি ধর্ম্ম সংস্থাপকই এই রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ৭ম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং অযোধ্যায় ২০টী বৌদ্ধ মন্দির তিন হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখিতে পান। এখানে অনেক জৈন মন্দির আছে, তবে এ গুলি সমস্তই আধুনিক। এখানে আর কয়েকটী জৈন মন্দির আছে, প্রায় দেড় শত বৎসর হইল এই গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। পাঁচ জন জৈন মহাত্মার জন্মস্থানে এই সকল মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বাবর ও আরঙ্গজীব তিনটী প্রধান হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তিনটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। একটীর নাম জন্মস্থান—এই স্থানে রাম জন্ম গ্রহণ করেন; আর একটীর নাম স্বর্গদ্বার,—এই স্থানে রাম চিতারোহণ করেন; আর একটীর নাম (ত্রেতাকা) তরিতাকা ঠাকুর,—এখানে রাম একটী বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। আধুনিক অযোধ্যার লোক সংখ্যা ১১৬৪৩। এখানে ৯৬টী মন্দির, ৬৩৬টী মসজিদ আছে। প্রতি বৎসর রামনবমীতে এখানে এক বৃহৎ মেলা হয়, এই মেলায় প্রায় ৫ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অলকনন্দা।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ঘারোয়াল (গাড়োয়ান) জেলার একটী নদী। ইহা গঙ্গার একটী প্রধান শাখা। হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া ঘারোয়াল জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। হিন্দুর নিকট এটী একটী পবিত্র নদী। যে যে স্থানে এই নদীর সহিত অন্যান্য নদী সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানই হিন্দুদিগের এক একটী তীর্থস্থান ও হিমাচল যাত্রীগণের বিশ্রামের স্থান। ধলী ও সরস্বতীর সম্মিলনে অলকনন্দার উৎপত্তি। পথে মন্দাকিনী, পিণ্ডার ও নন্দাকিনী এই তিনটী নদীর সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে প্রয়াগে ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই কয়েকটী নদীর সম্মিলনে যে জলস্রোত উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই গঙ্গা নামে অভিহিত। ঘারোয়াল জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর সহর অলকানন্দার উপরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নদীতে স্বর্ণ রেণু পাওয়া যাইত।

অলাবক্ষ।—বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার মধ্যে বেনিয়াগ্রামে এই নামে একটী বিখ্যাত মেলা হয়। প্রতি বৎসর রাসপূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা উপলক্ষে এই মেলা হয়। এই মেলা ৮ দিন হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকে; ইহাতে প্রায় ৭০।৮০ হাজার লোক আসিয়া থাকে।

অহঙ্কারীপুর।—(গোঁসাই গঞ্জ) অযোধ্যার অন্তর্গত ফয়জাবাদ জেলার একটি সহর; ফয়জাবাদ হইতে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে এখানে ২৭১৬ হিন্দু, ১৪৫৫ মুসলমান, মোট ৪১৮০ লোকের বাস। অহঙ্কারী রায় নামক একজন বারোয়ার জাতীয় রাজার নামে এই সহরের নাম করণ হইয়াছে। এখান হইতে কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চামড়া রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল আছে। আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের এটি একটি প্রধান ষ্টেসন। ষ্টেসনের নিকটে একটী বাজার আছে।

অহোবলাম।—মান্দ্রাজের অন্তর্গত কার্ণুল জেলার একটি দেবমন্দির ও গ্রাম। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা ১০৮, গৃহ সংখ্যা ৪১। গ্রামের নিকটস্থ একটি পাহাড়ের উপর তিনটী মন্দির আছে। অধিবাসিগণ এই তিনটী মন্দিরকে বড়ই পবিত্রজ্ঞান করে। এই মন্দিরত্রয় একটী পর্ব্বতের পাদদেশে, একটী মধ্যস্থলে ও অপরটি পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিত। প্রথম মন্দিরটি বড় সুন্দর। এই মন্দিরের প্রাচীরে রামায়ণের ঘটনাবলি অতি সুন্দরভাবে খোদিত আছে। মন্দিরের সম্মুখে দুইটী প্রস্তর নির্ম্মিত মণ্ডপ আছে। প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের উপর এই মণ্ডপদ্বয় স্থাপিত।

অমৃতসর—পঞ্জাবের লেঃ গভর্ণরের অধীনস্থ একটী জেলা ৩´১০১০ এবং ৩২,১১৩ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭´৪, ২৪১ এবং ৭´৫, ৭২১ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ফল ১৫৭৪ বর্গমাইল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে যে আদম সুমার হয়, তাহাতে জেলা অমৃতসরের জনসংখ্যা ৮৯৩২৬৬ নির্ণীত হইয়াছিল। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের সেনসেস্ রিপোর্টেও এই জেলার লোক সংখ্যা ৯৯২,৬৯৭ লিখিত আছে। এই জেলার উত্তর পশ্চিমে রাভি নদী, রাভির অপর পারে জেলা শিয়ালকোট, উত্তরপূর্ব্বে গুরুদাসপুর জেলা দক্ষিণ পূর্ব্বে বিপাসা নদী, বিপাসার অপর পারে কপূর্রতলা রাজ্য, দক্ষিণ পশ্চিমে লাহোর। এই জেলার প্রধান নগর অমৃতসর।

প্রাকৃতিক দৃশ্য—অমৃতসর জেলা একটী বৃহৎ আয়ত ক্ষেত্র। বারিদোয়াব অর্থাৎ রাভি নদীর মধ্যস্থিত অসমতল প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ লইয়া ইহা সংগঠিত। যদিও এ প্রদেশ দেখিতে সমতল কিন্তু বাস্তবিক ইহা সমতল নহে। পূর্ব্ব দিক্ হইতে পশ্চিম দিকে যে ইহার ভূমী ক্রমে ঈষৎ ঢালু হইয়া গিয়াছে তাহা সীমান্ত প্রদেশস্থ নদী সমুদায়ের গতি, এবং তাহাদের জলের অবনতির তারতম্য দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বিপাসা নদীর দক্ষিণ তট উচ্চ ও খাড়া, তটের

উপরিভাগে কতকগুলি বালুকাময় স্তূপ ও পাহাড় আছে, এই সমস্ত স্তূপ ও পাহাড়ের কোন কোনটী ৬০ ফিট উচ্চ। এই অংশ হইতে রাভি নদীর খাতের দিকে ঢাল ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গিয়াছে, রাভির পূর্ব্বপার অল্প কয়েক ফিটমাত্র উচ্চ, ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদায়ে মৃত্তিকার ২০ ফিটেরও কম নিম্নে জল পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্ববিভাগে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্থান সমুদায়ে ২৫ ফিটের নিম্নেও জল পাওয়া কঠিন। বিপাশা ও রাভি এই উভয় নদীর গর্ভে ও খাদের দুই পার্শ্বে, খাভার নামক এক প্রকার পলিমাটীর রেখা দৃষ্ট হয়। প্রতি বৎসর বন্যার তারতম্য অনুসারে ঐ রেখার পরিবর্ত্তন ঘটীয়া থাকে। আজ কাল যে খাতে বিপাশা প্রবাহিত হইতেছে, এক বৎসর পূর্ব্বে তাহার সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে অপর একটী খাত দিয়া উহা প্রবাহিত হইত। সেই প্রাচীন খাতের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উজীরভোলা নামক স্থানে শীতকালে বিপাসা নদীর ৩০০ কি ৪০০ ফিট বিস্তার থাকে, কিন্তু বর্ষাকালে ইহার পরিসর প্রায় ১ এক মাইল হয়, তখন ইহার স্রোত বেগ অতীব তীব্র হইয়া উঠে ও নদীগর্ভে প্রায় ৩৫ ফিট জল থাকে পুনরায় শীত ঋতুর সমাগমে নদীর কলেবর একবারেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তখন ইহাতে ছয় ফিটের অধিক জল থকে না। এমন কি কোন কোন স্থানে অনায়াসে হাঁটিয়া নদী পারে যাওয়া যায়। এই উজিরভোলাতেই গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোড ও পঞ্জাব দিল্লী রেলপথ বিপাশা নদী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এখানে নদীর উপর একটী সুন্দর রেলওয়ে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে তদ্ভিন্ন এগার জায়গায় খেয়া ঘাটের বন্দোবস্ত আছে। বসন্ত ও শীত ঋতুর কয়েক মাস রাভির সর্ব্বত্রই প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। বর্ষাকালে জল ১৮ হইতে ২০ ফিট পর্য্যন্ত গভীর হয়, প্রধান প্রধান পারঘাটে খেয়ার বন্দোবস্ত থাকে। অমৃতসর হইতে গুজরণওয়ালা যাইবার পথে কক্কর নামক স্থানে নদীর উপর বর্ষার ৪ চারি মাস ভিন্ন অন্য সকল ঋতুতেই একটী নৌসেতু রাখা হয়।

গুরুদাসপুর জেলা হইতে কতকগুলি কৃত্রিম খাল বহির্গত হইয়া অমৃতসর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বর্ষাকালে জেলার সমুদয় উচ্চভূমি হইতে যে সমস্ত জল-রাশি পতিত হয় তাহা এই সকল খালের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। সর্ব্বপ্রধান খালটির নাম সাক্কী অথবা কিরাণ। অমৃতসর জেলার সর্ব্বত্রই পলিমাটি এই মৃত্তিকা উত্তম এবং চাষ আবাদের পক্ষে বেশ উপযোগী, কিন্তু কোন কোন স্থানের ভূমি বালুকা ও কালার নামক একপ্রকার লোণা পদার্থে আবৃত।

এই প্রদেশে রাখ নামক কতকগুলি পতিত জমি আছে, ঐ সকল জমিতে মোটা মোটা এক প্রকার ঘাস ও এক প্রকার নিকৃষ্ট জাতীয় শালগাছ জন্মিয়া থাকে, এই সব জমির কতকগুলি ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আছে। এবং কতকগুলি গো মহি-ষাদির চারণ ভূমির জন্য রাখা হইয়াছে। আজকাল রাখ-জমির সংখ্যা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার সংখ্যা যত বেশি ছিল আয়তনও তদ্রূপ বৃহৎ ছিল।

এখানে এখন কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। দেশীয় সৈন্যদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান সরদারগণ, রাথ ভূমির মধ্যে বড় বড় জায়গীর পাইয়াছে।

অমৃতসর ও লাহোরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ হইতে সৈনিক শ্রেণী ভুক্ত করিবার জন্য চিরকালই লোক সংগৃহীত হইত। তজ্জন্য এই জনপদকে "মাঞ্ঝা" বলে, সৈন্যগণ আপন আপন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর স্ব স্ব আবাসভূমির নিকট এই স্থানে কিয়ৎপরিমাণে ভূমি পাইবার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিত।

রাথভূমি ভিন্ন দেশের অন্য কোন স্থানে বিশেষতঃ দক্ষিণদিকে গাছ পালা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রাম বা ক্ষেত্রের পার্শ্বে যে সকল গাছ আছে, তাহা স্বভাবজ নয়, তৎসমুদয়ই রোপিত। পুলাহি, ফারাশ, ঢাক ও ঝাণ্ডা প্রভৃতি বৃক্ষ অমৃতসর প্রদেশে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল উদ্ভিদের মধ্যে 'ঝাণ্ডা' এক প্রকার জঙ্গলী গাছ, ইহার গায়ে গাইট্ আছে। জ্বালাইবার কার্য্যে লাগে বলিয়া লোকে এই জাতীয় গাছের বড় আদর করে। কঙ্কর (ঘুটিং) ছাড়া অমৃতসরে অন্য কোন খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। মাটির কয়েক ফুট নীচে ঘুটিঙের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা রাস্তা বান্ধানের কাজ চলে ও চূণ তৈয়ারি হয়।

পূর্ব্বে কালার ক্ষেত্রের নোনা মাটী হইতে একপ্রকার লবণ প্রস্তুত হইত। এখন জেলাম প্রদেশের খনি হইতে উৎকৃষ্ট লবণ পাওয়া যায় বলিয়া এখানকার লবণের কারখানা বন্ধ হইয়াছে।

মৃগয়ার জন্য অমৃতসর জেলার তত সুখ্যাতি নাই। ইহার দক্ষিণ অঞ্চলের অর্দ্ধেকাংশে কৃষ্ণসার ও চিঙ্কারা হরিণ এবং এক-জাতীয় কাল খড়্গাশ পাওয়া যায়। রাথ ভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলে মধ্যে মধ্যে বন্যবরাহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিংস্র পশুর মধ্যে কেবল সচরাচর নেকৃড়ে বাঘ দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য কুক্কুট, কাল ও সাদা তিতর, পাতি হাঁস, রাজ-হাঁস, কাদা খোঁচা এবং বক, এবং অন্যান্য অনেক জলচরপক্ষী আছে। বিপাশা নদীতে মাশীর নামক এক জাতীয় উৎকৃষ্ট মৎস্য আছে। রাভি নদীতেও এই জাতীয় মৎস্য অনেক আছে সত্য, কিন্তু তাহারা টোপ খায় না সুতরাং ঐ সকল মৎস্যকে ছিপ দ্বারা ধরা দুষ্কর। এই কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারি না। যাহারা মাছ ধরিতে বিশেষ পটু, সেই সকল লোক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে বিশেষ এক প্রকার টোপ ও ভাল রকম সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার করিলে কখন খালিহাতে ফিরিতে হয় না। জেলেরা রাভি ও বিপাশা নদীতে রুইমাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে।

অমৃতসর জেলার কোন প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় না। শিখ জাতির অভ্যুত্থানের সময় হইতে এই জেলার ইতিবৃত্তের সূত্রপাত। নানকের উত্তরাধিকারী ও প্রধান গুরু অঙ্গ শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই জেলার দক্ষিণাংশে "খাদুর" নদীর তীর-বর্ত্তী "খাদুর" নামক গ্রামে বাস করিতেন। ১৫৫২ খৃঃ অব্দে এই গ্রামেই তাঁহার মৃত্যু

হয়। খাডুরের সন্নিহিত "গোবিন্দওয়াল" গ্রামে তৃতীয় গুরু অমর দাস থাকিতেন। ১৫৭৪ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় জামাতা "রামদাস" তাঁহার গদীতে উপবিষ্ট হন। তিনি এই উদয়োন্মুখ শিখ সম্প্রদায়ের চতুর্থ গুরু। ১৫৮১ খৃঃ অব্দে রামদাস মানবলীলা সম্বরণ করেন। দিল্লীর সুবিখ্যাত সম্রাট "আকবর" গুরু রাম দাসকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই ভূমির উপরই বর্ত্তমান অমৃতসরনগরের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। যে জলাশয়ের নাম অমৃতসর ও যাহার নামে জেলার ও সহরের নাম করণ হইয়াছে সেই জলাশয়ও রাম দাস খনন করান। চতুঃপার্শ্বে জলাশয়, মধ্যস্থলে একটীক্ষুদ্র দ্বীপ, সেই দ্বীপের উপর তিনি একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এই মন্দিরটী কালক্রমে শিখসম্প্রদায়ের উপাসনার কেন্দ্র ভূমি হইয়া উঠে। রামদাসের উত্তরাধিকারী অর্জ্জুন শিখদিগের পঞ্চম গুরু। তাঁহার জীবদ্দশাতেই এই মন্দির নির্ম্মাণের সমস্ত কার্য্য শেষ হয়। তিনি এই মন্দিরের চতুষ্পার্শে সুবৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী অমৃতসর নগরের সমাবেশ হইতে দেখিয়া যান।

নানাপ্রকার নিগ্রহ সহ্য করিয়াও শিখ সম্প্রদায় কালক্রমে দলে বলে পুষ্ট হইয়া উঠিল। লাহোরের তদানিন্তন মুসলমান শাসন কর্ত্তার সহিত একদা, শিখগুরু অর্জ্জুনের ভয়ানক বিবাদ বাধে, এই বিবাদের ফলে অর্জ্জুনকে কারারুদ্ধ হইয়া ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে বন্দিদশায় প্রাণত্যাগ করিতে হয়। অর্জ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ সম্রাটের শাসন অমান্য করিয়াছিলেন, সম্রাট তজ্জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। হরগোবিন্দ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু শেষে তাঁহাকে পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি দূরদেশে গিয়া নির্ব্বাসিতের ন্যায়, ১৭৪৪।৪৫ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। নানক হইতে গুরুগোবিন্দ দশম গুরু। এই গুরু গোবিন্দই শিখ সম্প্রদায়কে যুদ্ধনিপুণ করিয়া তুলেন। শিখদিগের মধ্যে পদমর্য্যাদায় সকলেই সমান এবং তাহাদের সকলেই রণ-দক্ষ। গুরু গোবিন্দের পরমসুহৃদ ও প্রধান শিষ্য "বন্দুই" শিখদিগের শেষ গুরু। ইনি অমৃতসরে প্রত্যাগত হইয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আপন শিষ্যদিগকে উত্তেজিত করেন। এই সময় হইতে মুসলমানদিগের শাসনে বিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্ত শিখগণ এক প্রকার স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করে। তখন অমৃতসরই বিবাদের কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠে। এই সকল যুদ্ধে শিখগণ কখনও বা জয়ী কখনও বা পরাজিত হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রথমে তাহারা লাহোরের শাসন কর্ত্তার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পরিশেষে আমেদ-আবদালী দুরানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাহারা অনেকবার যুদ্ধে পরাজিত এবং তাহাদের প্রধান নগর শত্রুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইলেও, শিখদিগের উৎসাহ বা অধ্যবসায়ের অণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে শিখদিগের ভাগ্যে শেষ বিপৎপাত হয়, এই বৎসর পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আহম্মদ সাহ সমগ্র শিখ সৈন্যকে সম্পূর্ণ রূপে

পরাভূত করেন এবং তাহাদিগকে শতদ্রু পার করিয়া দেন। স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় "আমেদ আবদালী" অমৃতসর নগর ধ্বংস করিয়া যান। বারুদের দ্বারা তথাকার সুন্দর মন্দির উড়াইয়া দেন, কর্দ্দম রাশি দ্বারা পবিত্র অমৃতসর নামক পুষ্করিণী পূর্ণ করিয়া তাহার বিলোপসাধন এবং গোহত্যা করিয়া সেই স্থানের পবিত্রতা বিনষ্ট করেন।

বিজয়ী যবন সসৈন্যে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করার কিয়ৎকাল পরেই পুনরায় শিখগণ অভ্যুত্থিত হয় এবং যবনদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারণের জন্য এরূপ উপায় অবলম্বন করে যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের জাতীয় স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয় ও তাহাই বহুকাল অক্ষুণ্ণ ও নিরাপদ থাকে। আমেদ আবদালী যে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া যায়। সেই মন্দির পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অমৃতসরই কিয়ৎ কালের জন্য পঞ্চনদ প্রদেশের প্রধান নগর রূপে পরিণত হইল। এই প্রধান নগরে প্রত্যেক শিখরাজ্যের এক একটী আড্ডা ছিল। বিভাগ সময়ে ভাঙ্গীওয়ালার অংশে রাজস্বের অধিকাংশ পড়ে। রণজিৎ সিংহ যখন লাহোর অধিকার করেন তৎকালে তিনি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলি আপন অধিকার ভুক্ত করিয়া লয়েন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গীওয়ালা সরদারগণ পরাভূত হন, তাহার অনতিবিলম্বে সমস্ত অমৃতসর জেলা পঞ্জাব কেশরী রণজিতের হস্তগত হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই সমগ্র শিখরাজ্য ও পঞ্জাবের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ গুলি বৃটিশ অধিকার ভুক্ত হয়। প্রথমতঃ নরবল সবডিবিসন অমৃতসর জেলার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই সব ডিভিসনটী শিয়াল কোট জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। সময় সময় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজ্যের কোন কোন স্থান এক জেলা হইতে অন্য জেলার সামিল হইয়াছে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় অমৃতসরের প্রাচীরের বাহিরে যে দুর্গ আছে তাহা রক্ষা করিবার জন্য বড়ই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুর্গ মধ্যে যে সকল সৈন্য ছিল তাহারা সকলেই বিদ্রোহী রেজিমেণ্টের সিপাহী, কেবল তোপ খানার কয়েক জন সৈন্য মাত্র ইউরোপীয় ছিল। এই সময় নগরের অধিবাসিগণ সকলেই স্থিরভাবে ছিল, আবশ্যক হইলে কৃষকগণ মিলিত হইয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দিগের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু মিয়ানমির হইতে গো যানে এক দল বৃটিস পদাতিক সৈন্য সময়মত উপস্থিত হওয়ায় কোন বিপৎপাত হইতে পারে নাই।

জন সংখ্যা।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এই জেলার জনসংখ্যা ছিল ৭২০৩৭৪ সাত লক্ষ বিশ হাজার তিনশত চুয়াত্তর। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আটলক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত আটত্রিশ। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে

৮৯৩২৬৬। অমৃত সহর জেলার যে ৫টী প্রধান নগর আছে নিম্নে তাহার প্রত্যেকটীর নাম ও ১৮৯১ খৃঃ অব্দের জন সংখ্যা প্রদত্ত হইল।

	মোট লোকসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	হিন্দু	শিখ	জৈন	মুসলমান	খৃষ্টান	পারসী	অন্যান্য
১। অমৃতসর	১৩৬৭৬০	৭৮৭৮৬	৫৭৯৮০	৫৬৬৫২	১৫৭৫১	১৪৩	৬৩৩৬৬	৮৪৮	৫	০
২। ঝান্দিয়ালা	৭৭৩২	৪০৭৩	৩৬৫৯	২৫৯৫	৬৩০	৪২৬	৪০৬১	২০	০	০
৩। মাজিঠা	৬৪১৭	৩৩৭৫	৩০৪২	২১১৭	১১৬৫	১	৩১২৫	৯	০	০
৪। তরণ তারণ	৩৯০০	২১৭৩	১৭২৭	১১২১	১৩১২		১৪২০	৪৭	০	০
৫। ভেরোওয়াল	৫৫২৪	২৮৫৯	২৬৬৫	১৩৬১	৪৬১	৫৪	৩৬৪৮			

এই পাঁচটি প্রধান নগরেই মিউনিসিপালিটী আছে।

অমৃতসর নগরই অমৃত সর জেলার সদর অর্থাৎ এখানেই জেলার দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টরী প্রভৃতি বিভাগের প্রধান প্রধান কার্য্যালয় আছে।

পাঞ্জাবের মধ্যে দিল্লী নগরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, দিল্লী অপেক্ষা অমৃতসর আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও রাজনৈতিক গুরুত্বে পঞ্জাবের কোন নগর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই নগর শিখদিগের প্রধান তীর্থস্থান। এ জেলার অন্যান্য সহর গুলির কেবল স্থানীয় প্রাধান্য আছে মাত্র।

অগ্রহায়ণ মাসে দেওয়ালীর সময় অমৃতসরে একটী জাঁকাল মেলা হয়, এপ্রেল (বৈশাখ) মাসে আর যে একটী মেলা হয় তাহাকে বৈশাখী মেলা বলে, এই উভয় মেলাই আদৌ ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে হইত, কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইতে এই সব মেলায় গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ পশ্বাদিরও ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে এই সব মেলায় উপহার বিতরণের ও নিয়ম হইয়াছে। চৈত্র ও ভাদ্র মাসে তরণ তারণে আরও দুইটী বড় রকমের মেলা হয়। অমৃতসর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে "রাম তীর্থ।" ইহা হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান। অগ্রহায়ণ মাসে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। সেই সময় এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গোবিন্দওয়াল "ডেরা নানক" খাডুর এবং শিখদিগের অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রেও অনেক মেলা হইয়া থাকে।

কৃষি—অমৃতসর জেলার ভূমি কৃষির বড়ই উপযোগী। এখানে আবাদের অযোগ্য জমি অতি অল্পই আছে। বড় দোওয়ারের খালের জলে অধিকাংশ ভূমিরই জল সেকের কাজ চলে। গুরুদাসপুর জেলার মধ্য দিয়া রাভিনদী প্রবাহিত। রাভির জলেই বড় দোওয়াব খালের কলেবর পুষ্ট হয়। অমৃতসর জেলার মধ্য দিয়া প্রধান খালটী ও আর একটী ক্ষুদ্র শাখা খাল প্রবাহিত হইয়াছে। শাখা খালটী জেলার পশ্চিম দিক দিয়া লাহোরাভিমুখে গিয়াছে। খালের জল ভিন্ন কূপের জলেও এ জেলার

জল সিঞ্চনের কাজ চলে। কোন কোন স্থানের কূপ সকল খেতের কার্য্যে খালের সহকারিতা করিতেছে। কোথাও বা কেবল কূপের জলেই খেতের কার্য্য চলিতেছে। বৃটীশ শাসনে ক্রমে দেশ যতই উপদ্রব শূন্য হইতেছে ততই কৃষিরও উন্নতি হইতেছে। অমৃতসর জেলায় ১৮৫১ খৃ: অব্দে মোট ৫৯৫৭৪৮ একর ভূমি আবাদ হয়। তন্মধ্যে খালের জলের সাহায্যে আবাদ হইয়াছিল ১৪৯৪৮৩ একর ভূমি। ১৭৬৪ খৃঃ অঃ মোট ৬৩৩১৮১ একর ভূমিতে আবাদ হয়। তন্মধ্যে খালের জলের সাহায্যে হইয়াছিল ১৯৯১৪ একর-ভূমি। ১৮৮১ ও ৮২ খৃঃ অঃ সেচ আবাদী ভূমির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ঐ বৎসর মোট ৭৬৬৭৭৩ একর ভূমি আবাদ হয় তন্মধ্যে ২৪২৯১৩ একর সেচ আবাদি। এই সেচের উপায় বিদ্যমান থাকায় শুকার জন্য অমৃতসর জেলার লোকদিগকে বিশেষ আশঙ্কিত হইতে হয় না। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে জল পাওয়া যায় বলিয়াই অনাবৃষ্টি হইলেও অনেক ভূমির শস্য রক্ষা হয়।

গম, যব ও ছোলা এ প্রদেশের রবিখন্দ অর্থাৎ বসন্তঋতুতে এই সকল ফসল জন্মিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন সরিষা, শণ, মসুর ও গবাদির খাওয়ার জন্য এক প্রকার ঘাস এবং পোস্ত তামাকের চাষও এই ঋতুতে হয়। ধান্য, ভূট্টা, কলাই, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি এ প্রদেশের ক্ষারিপখন্দ ও বিশেষ প্রয়োজনীয় ফসল। এদেশজাত ধান্য ও অন্যান্য শস্য দ্বারা স্থানীয় লোকদিগেরই অভাবপূরণ হয় কেবল তুলা ও চিনি বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

শাসনকার্য্যাদি।—এই জেলায় ভূমির রাজস্বাদি গবর্ণমেণ্টের খাস তহসীলে আদায় হয়। তজ্জন্য ১৩ জন রাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। ইহাদের হস্তে দেওয়ানি ও ফৌজদারী উভয়বিধ বিচার কার্য্যের ভার অর্পিত আছে।

জলবায়ু।—পঞ্জাবের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অমৃতসর জেলা গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে। এই জেলার নিকটে পর্ব্বতশ্রেণী এবং এখানে অনেকগুলি কৃত্রিম খাল থাকাতে গ্রীষ্মের সময় উত্তাপ ততদূর কষ্টদায়ক হইতে পারে না। এখানকার অধিকাংশ ভূমি চাষ আবাদ হওয়া এইরূপ গ্রীষ্মাধিক্য হইতে না পাওয়ার অন্যতর কারণ। শীতঋতুর সমাগমে এই জেলার জলবায়ুর অবস্থা অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। এই সময় প্রায়ই কুয়াসা হইয়া থাকে। সচরাচর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে তাপমান যন্ত্রের ৯১-১° ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উঠে। কিন্তু ১৮৮১ সালে বৈশাখ মাসে তাপমান যন্ত্রে ১১৩° ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উঠিয়াছিল। শীত ঋতুতে সচরাচর ৫৫-৬ ডিগ্রি উত্তাপ থাকে।

অম্বালা—পঞ্জাবেরলেফটনেন্ট গবর্ণরের অধীন বৃটিশাধিকৃত জেলা। ২৯' (ডিগ্রি) ৪৯' (মিং) ও ৩১'-১২' উত্তর lat. অক্ষাংশ মধ্যে ও ৭৬'-২২' এবং ৭৭°৩৯' পূর্ব্ব-দ্রাঘিমা long. মধ্যে স্থিত। (area)—পরিমাণফল ২৬২৭ বর্গমাইল।

জনসংখ্যা—১৮৯১ খৃঃ অব্দের সেনসস রিপোর্ট অনুসারে

মোট—	পুরুষ—	স্ত্রী—	হিন্দু—	শিখ—
৭৯২৯৪	৪৭৫১১	৩১৭৮৩	৪০৩৩৯	২৪০৭
জৈন—	**মুসলমান—**	**খৃষ্টীয়ান**	**পারসি**	**অন্যান্য**
১১১৯	৩০৫২৩	৪৮৯৯	৬	১

অম্বালা—অম্বালা বিভাগের মধ্যবর্ত্তী জেলা।

চতুঃসীমা। ইহার উত্তর পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বত। উত্তরে শতদ্রু নদী। পশ্চিমে পাতিয়ালা রাজ্য ও লুধিয়ানা জেলা এবং দক্ষিণে কর্ণাল জেলা ও যমুনা নদী। অম্বালা সহর জেলার শাসনকর্ত্তাদের প্রধান আবাস স্থান।

প্রাকৃতিক দৃশ্য—শতদ্রু ও সিন্ধুর মধ্যবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রের কিয়দংশ লইয়া অম্বালা জেলা। ইহা হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ইহা পাতিয়ালা রাজ্যের কিয়দংশ দ্বারা দুই অয়ন অংশে বিভক্ত হইয়াছে। অতি প্রাচীন সময় হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে অম্বালা ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর (বর্ত্তমান নাম কাগার) মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড হিন্দুদিগের মধ্যে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। ভারতের আর্য্যগণ এই স্থানে প্রথমে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিলেন, এই স্থানে তাঁহাদের ধর্ম্ম সংগঠিত হইয়াছিল; এইজন্য বর্ত্তমান সময়েও ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ সরস্বতীকে পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কেবল পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে নয়, উড়িষ্যা ও সুদূরবর্ত্তী বঙ্গদেশ হইতেও হিন্দুরা এই স্থানে আসিয়া থাকেন। ইহার উভয় তীরে সর্ব্বত্রই হিন্দুদেবালয় সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে রহিয়াছে। কিন্তু থানেশ্বর ও পিহোইয়া (Pihoia) যাত্রীদের প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। থানেশ্বরে একটি জলাশয় আছে—সরস্বতীর পবিত্র জলে ইহা পূর্ণ হইয়া থাকে। এই পবিত্র জলাশয়ে প্রতি বৎসর তিন লক্ষ লোক অবগাহন করে। মহাভারতোক্ত কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ সংক্রান্ত কিম্বদন্তীতে এই স্থান পরিপূর্ণ, কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর চীনদেশীয় বৌদ্ধপরিব্রাজক হিউএনসঙ্গ হইতেই আমরা সর্ব্বপ্রথম এই বিভাগের প্রাচীন ও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ প্রাপ্ত হই। হিউএনসঙ্গ ইহা একটি সমৃদ্ধিপূর্ণ ও সভ্যতাসম্পন্ন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। শ্রুঘ্ন এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। কনিংহাম সাহেব বর্ত্তমান সুঘ নামক পল্লিকে প্রাচীন শ্রুঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থানে বহুসংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রুঘ্ন মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত বিজয়ের সময় পর্য্যন্ত জনাকীর্ণ ছিল।

উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় অম্বালাও ক্রমান্বয়ে গজনী ও গোর বংশীয়দের হস্তগত হয়। কিন্তু তাঁহাদের বিজয় বৃত্তান্তে ইহার বিশেষ উল্লেখ নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট ফেরোজ সাহা হিসার নগরে জল আনয়ন জন্য যমুনা হইতে

একটি খাল খনন করেন। সম্ভবতঃ এই খালই বর্ত্তমান পশ্চিম যমুনার খালের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

আকবরের সময়ে অম্বালা—বিভাগ সর্হিন্দ সুবার একটি অংশ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অংশে শতদ্রুর দক্ষিণভাগে যখন শিখ রাজ্যের অভ্যুদয় হয় তখন হইতেই অম্বালার স্থানীয় ইতিহাস সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে থাকে ; একদিকে মহারাষ্ট্রী দিগের পরাক্রমে অপরদিকে আফগানদিগের আক্রমণে যখন মোগল সম্রাটের ক্ষমতা শিথিল হয়, তখন বহুসংখ্যক দেশবিলুণ্ঠনকারী শিখ পঞ্জাব হইতে শতদ্রুর বহির্ভাগে বলপূর্ব্বক অধিকার বিস্তার করে। ক্রমে যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী স্থান তাহারা অধিকার করিয়া বসে, ১৮০৩ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা ইংরাজদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে, এই সময়ে ঐ সমগ্র ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, এবং নভার রাজা হইতে সামান্য সর্দ্দার পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শিখ প্রধানেরা আধিপত্য করিতেন। কিন্তু শেষে রণজিৎসিংহ পঞ্জাবের বিভিন্ন শিখ জনপদসকল এক রাজ্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়া ১৮০৮ খৃঃ অব্দে শতদ্রু পার হন এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী শিখ ভূপতিদিগের নিকট কর চাহেন।

রণজিৎ কর্ত্তৃক এইরূপে নিপীড়িত হইয়া শিখভূপতিগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন, ভাবিলেন তাঁহাদের স্বদেশীয়দিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে তাঁহাদিগের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিবে, তজ্জন্য সকলে সমবেত হইয়া ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যাধিপতিদিগকে তাহাদের ক্ষমতাপন্ন প্রতিবাসীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে নিরস্ত থাকিলেন না। ১৮০৯ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত রণজিৎসিংহের সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধিতে স্থির হইল যে রণজিৎসিংহ ভবিষ্যতে উত্তর দিকে অন্যায়রূপে অধিকার বিস্তার করিতে পারিবেন না। ১৮১১ খৃঃ অব্দের ঘোষণা পত্রের দ্বারা কেবল এই সকল শিখ জনপদের আভ্যন্তরিণ যুদ্ধ বিগ্রহ নিবারিত হইবে। ইহা ব্যতীত শিখভূপতিদিগের ক্ষমতা ও অধিকারের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। ছোট বড় প্রত্যেক ভূপতির স্বাধিকারের দেওয়ানি, ফৌজদারী এবং রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিল, কেবল এই বিষয়ের অনুমোদনের ভার আম্বালাস্থিত গবর্ণর জেনারেলের এজেন্টের উপর থাকিল।

যদিও এই সকল রাজা যুদ্ধ বিগ্রহের সময় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন তথাপি ইহাদের নিকট কর গ্রহণ বা সৈন্য প্রার্থনা করা হয় নাই। উক্ত শিখ ভূপতিদিগকে রক্ষা করিবার বিনিময়ে গবর্ণমেণ্ট কেবল তাঁহাদের বিধিসিদ্ধ উত্তরাধিকারীর অবর্ত্তমানে বা তাঁহাদের বিদ্রোহাপরাধে তদীয় সমগ্র ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার অধিকার গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে প্রথম শিখ যুদ্ধ ও শতদ্রু সমরের সময়ের এই সকল গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় অধিপতির রাজভক্তি পরীক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

সে সময়ে ইহাঁদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই প্রকাশ্য বিদ্রোহে লিপ্ত না হইলে কার্য্যতঃ যথোচিত রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাদের সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহাদের পূর্ব্বতন ব্যবহার দেখিয়া সেই নীতির অনুসরণে উৎসাহ প্রদান করেন নাই। ইহাদের অধিকৃত জনপদ বৃটিশ গবর্ণ- মেণ্টের অধিকারভুক্ত হইলে তত্রত্য কৃষক সম্প্রদায় বৃটিশ শাসনে যেরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল তদ্দারাই ইহাদের শাসন বিশৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

ভারত-দর্পণ।

ভূগোল।

আ।

আকট।—বেরারের অন্তঃপাতী আকোলা জেলার একটী সহর; তুলার কারখারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার হাটে প্রতি বৎসর ৩৭। ৩৮ লক্ষ টাকার তুলা বিক্রীত হয়। দেশীয় এবং য়ুরোপীয় সওদাগরগণ আকটের হাটে তুলা খরিদ বিক্রয় করে। এখানে উত্তম উত্তম গালিচাও প্রস্তুত হয়। আকটে ভাস্কর্য্য-বিচিত্রিত কয়েকটী সুন্দর পাথরের বাড়ী, একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, একটী ডাক বাঙ্গলা, কয়েকটি স্কুল এবং কতকগুলি কাছারিবাড়ী আছে। এখানে প্রতি সপ্তাহে দুইটী বাজার বসে—(বুধবারে, শনিবারে)। লোকসংখ্যা (১৮৯১ খৃঃঅব্দে) মোট—১৫৯৯৫, পুরুষ—৮৪১৭, স্ত্রীলোক—৭৫৭৮, হিন্দু—১২০৬০, মুসলমান—৩৭৯৪, অন্যান্য জাতি—১৪১।

আকরাণী।—বোম্বাই প্রদেশের মধ্যস্থিত খান্দেশ জেলার তালুদা মহকুমার অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণাটী সাতপুরা পর্ব্বতের উপরিস্থিত ৬০ মাইল দৈর্ঘ্যের ও ১৫ হইতে ৩০ মাইল প্রস্থের একটী অধিত্যকা। ইহার উত্তরে নর্ম্মদা নদী, পূর্ব্বে বারয়ানি রাজ্য ও তুরাণমল পাহাড়। দক্ষিণে সুলতানপুর ও মহাকো রাজ্য। পশ্চিমে মহাবেশ রাজ্য। এখানকার ভূমির রাজস্ব ৬১০০৲ টাকা। এই পরগণার মধ্যে ১৭২ খানি গ্রাম আছে; তন্মধ্যে ১৫৫ খানিতে লোকজনের বাস আছে; অপর ১৭ খানিতে লোক জনের বাস নাই। আকরাণী পরগণাটী পর্ব্বতাকীর্ণ। এই সকল পর্ব্বতের উচ্চতা ১০৬৬ হইতে ১৬৬৬ হাত পর্য্যন্ত; পর্ব্বতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলে আবৃত। এই সকল জঙ্গলে নানা প্রকার জড়িবুটি ও গাছড়া ঔষধ পাওয়া যায়; লোকে বলে এই সমস্ত পাহাড়ে রূপা, তামা ও লোহার খনি আছে। এ পরগণায় ভীলদিগের বাস। এখানকার রাণা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট

বার্ষিক ২৮৬১৲ টাকা বৃত্তি পান। দুইটী মাত্র গ্রামে তাঁহার অধিকার আছে। এই রাণা কুলমর্য্যাদায় অতি প্রধান, বরদার গুইকুমার ও ছোট উদয়পুরের রাণার ঘরে ইঁহাদের বংশের পুত্রকন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। যে বৎসর বেশ ফসলাদি হয়, সে বৎসর সকল রকমে এ পরগণা হইতে ১৫০০০৲ হাজার টাকা আয় হইয়া থাকে।

আকা পাহাড়।—ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত একটী পার্ব্বতীয় প্রদেশ। আকা নামক এক স্বাধীন জাতি এই প্রদেশে বাস করে বলিয়া ইহার নাম আকা পাহাড়। ইহার দক্ষিণে দারাং জেলা, পূর্ব্বে দাপলা পাহাড়, পশ্চিমে স্বাধীন ভুটিয়া জাতির বাস।

আকেনকয়েল।—মান্দ্রাজের ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের মধ্যস্থিত চিনগানুর তালুকের বিখ্যাত মন্দির, গ্রাম ও গিরিপথ। এই গিরিপথ মান্দ্রাজের টিনিভেলি জেলার সহিত ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্য সংযুক্ত করিয়াছে, কিন্তু আরিকাভু পথ হইতে মালামাল এ পথে লইয়া যাওয়া অধিক ক্লেশকর বলিয়া এ পথে অধিক লোক গমনাগমন করে না। মন্দিরে ষষ্ঠ নামক শিবমূর্ত্তি আছে। পর্ব্বতের অতিশয় দুর্গম অংশে এই স্থান অবস্থিত।

আকোলা।—হাইদ্রাবাদ দেশের বেরার প্রদেশের মধ্যস্থ একটী জেলা। ইহার উত্তরে সাতপুরা পর্ব্বত; দক্ষিণে অজন্ত পর্ব্বতশ্রেণী, পূর্ব্বে ইলিচপুর ও অমরাবতী জেলা, এবং পশ্চিমে বলদেনা ও খান্দেস জেলা। পরিমাণফল ২৬৬০ বর্গ মাইল,—মোট রাজস্ব ২৩৮৭৮৫০৲; লোকসংখ্যা ৫৯২৭৯২। মরণা নদীর তীরস্থিত আকোলা সহর এই জেলার প্রধান নগর,—ইহার অধীনে পাঁচটী তালুক আছে, যথা, আকোলা, আকট, বালাপুর, জালগাওন, খামগাওন।

প্রাকৃতিক ভাব।—এ প্রদেশ সম্পূর্ণ সমতল; এই প্রদেশের মধ্য দিয়া পূর্ণা নদী প্রবাহিত,—এই নদীতে নৌকা চলে না,—ইহার সহিত সাতটী শাখানদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এ প্রদেশের জমি অধিকাংশই অতিশয় উর্ব্বরা। জঙ্গলে বাবলা বৃক্ষই অধিক,—পাহাড়ে শিয়াগোষ, তরক্ষু, ভল্লুক ও বন্য বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। চাষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র এ প্রদেশ হইতে দূরীকৃত হইতেছে; এক্ষণে এ অঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায় না। সম্বর বাঘ ও অন্যান্য জাতীয় হরিণ, ময়ূর, হংস প্রভৃতি পক্ষী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়,—নদীতে মৎস্যও প্রচুর।

এ প্রদেশে প্রাচীন অট্টালিকাদি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বালাপুরে আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি রাজা জয়সিংহ নির্ম্মিত কৃষ্ণ প্রস্তরের প্রমোদ-প্রাসাদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ প্রদেশে ১৯টী দরগা আছে, ইহার মধ্যে ধারুরের পির নামক আউলিয়া অম্বিয়ার দরগাই প্রধান। বামাপুরের নিকট শাপুরে আকবরের পুত্র সুলতান মুরাদ নির্ম্মিত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এ প্রদেশে ১৬৯টী মন্দির ও ৫৬টী মসজিদ আছে। এই অঞ্চলে অতি বিস্ময়কর লবণ-কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণা নদীর দুই তীরে অন্তঃসলিলা লবণের খাদ আছে; এখানে কূপ খনন করিলেই

অত্যন্ত লবণাক্ত জল নিঃসৃত হয়। পূর্ব্বে সেই জল জ্বালাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হইত,—এখন ইহা গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ইতিহাস।—জনশ্রুতি এই যে, মুসলমানদিগের পূর্ব্বে ইলিচপুরের রাজারাই এ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন, ইহাঁরা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন এ প্রদেশ হস্তগত করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দুগণ পুনরায় নিজ আধিপত্য সংস্থাপন করে, কিন্তু ১৩১৯ খৃষ্টাব্দে দেওগড়ের রাজা মুসলমান কর্ত্তৃক হত হইলে সেই অবধি এ প্রদেশে মুসলমানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বামনি রাজবংশ ও ইমাদসাহী নরাধিপতিগণ ১৫৯৪।৯৬ পর্য্যন্তও এ প্রদেশে আধিপত্য করেন,—পরে আকবর শাহ ইহাকে বেরারের সহিত সম্মিলিত করিয়া একটী বাদসাহী প্রদেশরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। আকবরের পুত্র এ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন এবং ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে আকবর শাহের মৃত্যু হইলে মালিক অম্বর এ প্রদেশ দখল করেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি পরাভূত হয়েন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ ফেরক শা এ প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়গণকে প্রদান করেন,—কিন্তু ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম-উলমুলুক ফেরকশাকে পরাস্ত করিয়া এ প্রদেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। তদবধি বেরার নিজাম রাজ্যের একটী অংশ; কিন্তু সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিজামের সহিত মহারাষ্ট্রীয়-গণের ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে। জেনারেল ওয়েলেস্‌লি আরগামের যুদ্ধে রঘুজি ভোন্‌-সলাকে পরাস্ত করিয়া বেরার প্রদেশ নিজামকে প্রদান করেন। নিজামের কর্ম্মচারি-গণের অত্যাচারে মধ্যে মধ্যে এ প্রদেশে বিদ্রোহ হইতে থাকে,—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মগন্দ রাওয়ের চেষ্টায় জামোদ সহরে মহারাষ্ট্র-পতাকা উড্ডীয়মান হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আপা সাহেব আরও গোলযোগ উপস্থিত করেন। অবশেষে ইংরেজ সৈন্য গিয়া এই গোলযোগ নিবারণ করে। ১৮৫৩ ও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে স্বীয় রাজ্যে বৃটিশ সৈন্য রাখার খরচের সরবরাহ করার জন্য নিজাম বেরার প্রদেশ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন।

লোক-সংখ্যা।—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশের লোকসংখ্যা ৪৬০৬১৫ ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ৫২৩৯১৩ আন্দাজ করা হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ৫৯২৭৯২ হয়।

কৃষি।—হৈমন্তিক শস্য, তুলা, জোও, বজরা, তিল প্রভৃতি ও রবি শস্য যব, গম, ছোলা, সরিষা, প্রভৃতি। বালাপুরের নিকট পাটও অল্প পরিমাণে জন্মে। এ প্রদেশে অশ্বের সংখ্যা অতি অল্প, তবে অশ্বতরই অনেক। এ দেশের বলদ খুব বলিষ্ঠ ও সুন্দর, এখানে বলদে গাড়ি টানে ও লোকে বলদে চড়িয়াও থাকে।

দৈব দুর্ঘটনা।—অনাবৃষ্টি হইলে এ প্রদেশের বিশেষ হানি হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মধ্যে মধ্যে বিসূচিকা রোগেরও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

বাণিজ্য ব্যবসায়।—প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক বড় গ্রামে ও সহরে সাপ্তাহিক হাট বসে। এই সকল হাটে বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে অনেক ক্ষুদ্র দোকানদার আইসে। পাতুর, সেনানা ও আকোটে তিনটী বড় মেলা হয়, এই জেলার বহুদূর হইতে ব্যবসায়িগণ আসিয়া কেনা বেচা করে। চিনি, লবণ, বিলাতি দ্রব্য, ধুর, তৈল, আফিম, নারিকেল, চাউল প্রভৃতি প্রধান আমদানি দ্রব্য এবং তুলা, যব, তিল, ঘি, নীল, গরু প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। তুলার জন্য এ প্রদেশ ক্রমেই বিখ্যাত হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে বলদে এ প্রদেশের দ্রব্যাদি লইয়া যাইত, এক্ষণে রেলে মালামাল বাহিত হইতেছে। জি, আই, পি রেল হইতে একটী ৪ মাইল দীর্ঘ শাখা-রেলপথ খামগানে গিয়াছে, এইটীই এক্ষণে বেরার প্রদেশের প্রধান তুলার হাট। খামগান হইতে ১১ মাইল দূরে জি, আই, পি রেলওয়ে ষ্টেশন সিওগানও একটী বৃহৎ তুলার হাট, এতদ্ব্যতীত আকোট ও আকোনাড়ে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা বিক্রয় হয়।

শাসন-প্রণালী।—অন্যান্য জেলার ন্যায় এ জেলার শাসন-প্রণালীও সেই একই ভাবে সম্পাদিত হয়। একজন ডেপুটী কমিশনার প্রধান কর্ম্মচারী, তাঁহার অধীনে আরও অনেক ইংরেজ ও দেশীয় রাজকর্ম্মচারী আছে। আকোলায় একটী নরমাল স্কুল আছে, এখানে "বেরার-সমাচার" ও "উর্দ্দু খবর" নামে দুইখানি সম্বাদপত্র প্রকাশিত হয়। আকোলা, খামগাওন ও সিওগাওনে মিউনিসিপালিটী আছে।

আকোলা সহর।—আকোলা জেলার প্রধান সহর জি, আই, পি রেলের একটী ষ্টেশন। ১৮৮১ খৃঃঅব্দে মোট লোকসংখ্যা ১৬৬০৮; পুরুষ ৮৮২৮, স্ত্রীলোক ৭৭৮০; তন্মধ্যে হিন্দু ১১২১৯, মুসলমান ৫০২৮, খৃষ্টান ১৯৯, জৈন ১০৪, পারসি ৪৩, শিখ ১ জন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে সেন্‌সস্ রিপোর্ট অনুসারে মোট লোকসংখ্যা ২১৪৭০; পুরুষ ১১৮১৪, স্ত্রীলোক ৯৭৫৬; তন্মধ্যে হিন্দু ১৪৬৬০, মুসলমান ৬১৫০, খৃষ্টান ১৮৮, জৈন ২৫২, শিখ ৪৯, পারসি ৬৮, অন্যান্য জাতি ১০৩। এক সময়ে আকোলা নিজাম রাজ্যের একটী বিভাগের প্রধান নগর ছিল। এখনও ইহার দুর্গ ও প্রাচীর বিদ্যমান আছে। আকোলায় নিজামের সৈন্য ও মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে একটী যুদ্ধ হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারি গাজি খাঁ ভোনস্লা সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ওয়েলেস্‌লি এই স্থানে এক দিবস শিবির সন্নিবিষ্ট করেন। নিজামের শাসনকালে রাজকর্ম্মচারিদিগের দোষে এ প্রদেশ নিতান্তই হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়; এক্ষণে ইংরেজ হস্তে আসিয়া দিন দিন ইহার উন্নতি হইতেছে। মরণা নদী সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত, পশ্চিম তীরে দেশীয় সহর। পূর্ব্ব তীরে আদালত ও সাহেবদিগের বাসভূমি। এখানে সপ্তাহে দুইটী হাট বসে।

আকায়েব।—বৃটিশ ব্রহ্মের আরাকান জেলার মধ্যস্থিত একটী জেলা। পরিমাণ ফল ৫৫৩৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৩৫৯৮০৬। ইহার উত্তরে চট্টগ্রাম পাহাড়, দক্ষিণে সমুদ্রের নালা খাড়ি, পূর্ব্বে আরাকান য়োম পর্ব্বত, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর।

প্রাকৃতিক ভাব।—সমুদ্র ও আরাকান য়োম পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূমি ও য়োম পর্ব্বতের শাখা প্রশাখাময় পার্ব্বতীয় প্রদেশ লইয়া আকায়েব জেলা। এই জেলার মধ্য দিয়া মায়ু, কুলাদান ও লেমরু নামক তিনটী নদী প্রবাহিত; উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া মায়ু আকায়েব সহরের উত্তর পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। কুলাদন নদী আকায়েব সহরের নিকটেই সমুদ্রে মিলিয়াছে। এই নদীতে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। ইহা "হণ্টার্স বে" নামক উপসাগরে পড়িয়াছে। লেমরু নদীর পূর্ব্ব তীরস্থ সমস্ত প্রদেশ পার্ব্বত্য। একটী গিরিপথ দিয়া এই প্রদেশ হইতে উত্তরাভিমুখে যাওয়া যায়। এখানে অনেক বড় বড় গাছ আছে। অনেক টাকার কাঠ এই জেলা হইতে প্রতিবৎসর রপ্তানি হয়, সাল, সেগুন, শিশু প্রভৃতি অনেক প্রকার গাছ এখানে জন্মে। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণে বাঁশ পাওয়া যায়।

ইতিহাস।—প্রাচীন আরাকান রাজ্যের রাজধানী আকায়েব প্রদেশে ছিল বলিয়া আরাকানের ইতিহাস ও আকায়েবের ইতিহাস একই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে আরাকান ও ভারতবর্ষে যে পূর্ব্বে বিশেষ নিকট সম্বন্ধ ছিল, আরাকানবাসিগণ তাহাই প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছে, তবে এই সকল বিবরণের অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কথিত আছে যে শাক্য সিংহের জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্বে আরাকান রাজ বারানসীর রাজাকে কর প্রদান করিতেন। ইহার বহু বৎসর পরে শিক্কাবাড়ী বারানসীতে রাজত্ব করেন, ইনিই পরে গৌতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় চতুর্থ পুত্র কানমীনকে মণিপুর হইতে চীন দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ প্রদান করেন। কানমীন পূর্ব্বপ্রদেশে অনার্য্য জাতির বসতি স্থাপন করেন এবং আরাকান প্রদেশে আর্য্যজাতি আনাইয়া বাস করান। এই সকল দেখিয়া, অনুমিত হয় যে অতি প্রাচীনকালে এ প্রদেশে আর্য্যগণ আপনাদের ধর্ম্ম-সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

৮০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ আরাকানে আইসে। তাহাদের কয়েকখানি জাহাজ আরাকানের দক্ষিণস্থ রামরী দ্বীপের নিকট জলমগ্ন হওয়ায় সেই সকল জাহাজের নাবিকগণ এই প্রদেশে আসিয়া বসতি করে। নবম শতাব্দীতে আরাকান-রাজ বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করিয়া চট্টগ্রামে একটী বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া যান। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রোমরাজ দক্ষিণ আরাকান আক্রমণ করায় আরাকান-রাজ ম্রোহং নামক স্থানে রাজধানী লইয়া যান। এই স্থানেই বরাবর রাজধানী ছিল, অবশেষে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহা আকায়েব সহরে সংস্থাপিত করেন।

এই ঘটনার পর পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া আরাকানরাজ্যে নানা গোলযোগ চলিতে থাকে। মগ, স্যান প্রভৃতি জাতিগণ ক্রমাগত এই রাজ্য আক্রমণ করে এবং আরাকানবাসিগণও আভ্যন্তরীণ বিগ্রহে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। বুদ্ধগয়ার ব্রাহ্মভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপিতে

দ্বাদশ শতাব্দীর একজন আরাকান রাজের বর্ণনা পাওয়া যায়। ১১৩৩ হইতে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আরাকান রাজ্যে গোণ্য নামক একজন রাজা রাজত্ব করেন, পেগু, পাগান, শ্যাম ও বাঙ্গালার রাজগণ ইঁহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতেন। পুরাতন আরাকানের নিকট মহাতি নামক মন্দির ইনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহামুনি মন্দিরের পরেই এই মন্দির এ প্রদেশে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যগণ ইহাকে দুর্গরূপে পরিণত করিয়া বাস করিতে থাকে। বৃটিশ সৈন্য ইহাদিগকে মন্দির হইতে তাড়াইয়া দিবার সময় এই মন্দির ধ্বংস করিয়া ফেলে।

এ কাল পর্য্যন্ত আরাকান দেশীয় নরাধিপগণের রাজচিহ্নাঙ্কিত যে সমস্ত অতি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ই দ্বাদশ শতাব্দীর। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরাকানাধিপতিগণ বঙ্গদেশের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে স্বস্ব অধিকার-বিস্তারের উদ্যোগ করেন। ঢাকার অন্তর্গত সোণারগাঁও জেলার রাজগণ তাঁহাদিগকে দুইবার কর ও উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। ১৪০৪ খৃঃঅব্দে আরাকানাধিপতির বংশধরগণের মধ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়; তাহাতে ব্রহ্মদেশাধিপতি এক পক্ষের সহায়তা করিবার নিমিত্ত আহুত হয়েন; কিন্তু তিনি কৌশলে সেই রাজ্য হস্তগত করিয়া সমস্ত রাজ্য ১৪৩০ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় শাসনাধীনে রাখেন। এই বৎসরই আরাকানরাজ স্বীয় স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয়েন ও ম্রোহঙে (প্রাচীন আরাকানে) রাজধানী সংস্থাপিত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর অবশিষ্ট সময় আরাকানে শান্তি বিরাজিত ছিল; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ব্রহ্মবাসিগণ স্থলপথে ও পর্ত্তুগিজগণ জলপথে আসিয়া আরাকান আক্রমণ করিল। জলদস্যু পর্ত্তুগিজদিগের আক্রমণ হইতে রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য তাহার (প্রাচীন আরাকান নগরের) চতুর্দ্দিকে ১২ হাত উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর নির্ম্মিত হইল। এই প্রাচীর ১৫৩১ খৃঃঅব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল; পরে ১৫৭১ খৃঃঅব্দে ইহার চতুর্দ্দিকে আবার ঝিল খনন করা হয়। ১৫৬০ ও ১৫৭০ খৃঃঅব্দের মধ্যে আরাকান-বাসিগণ চট্টগ্রাম অধিকার করে এবং তাহাদের রাজপুত্র আসিয়া এখানকার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হয়। এ দেশে অধিকার সংস্থাপিত হইলে আরাকান-রাজ পররাষ্ট্রাপহারী মোগল সম্রাটের শক্তি-সামর্থ্যের অনেক পরিচয় পাইয়া কিছু শঙ্কিত হয়েন। নূতন রাজ্যে মোগলগণ সহসা প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি গোয়া হইতে অনেক জলদস্যু আনাইয়া আপন রাজ্যমধ্যে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু ইহাদিগকে আশ্রয় দিয়া রাখার পরিণাম-ফল অতীব বিষময় হইয়া উঠিল। ইহারা অচিরে রাজ্যমধ্যে নানা উপদ্রব করিতে লাগিল, অবশেষে আরাকান-রাজের শাসন অমান্য করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিল। রাজা তাহাদের এইরূপ বিদ্রোহাচরণে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে রাজ্য হইতে একবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহারা এখান হইতে বিতাড়িত হইয়া গঙ্গার মোহানায় সন্দীপ নামক দ্বীপে আশ্রয় লইল। সেই সময়ে সেবাষ্টিয়ান গোন্‌জেল নামক জনৈক হীনবংশোদ্ভূত পর্ত্তুগিজ তাহাদের অধিনায়ক ছিল। সে কিছুদিন

সৈনিক ছিল, পরে লবণের ব্যবসা করে, পরিশেষে জলদস্যু হইয়া বিশেষ প্রভুত্ব ও প্রতি-পত্তি লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে আরাকান রাজ্যের একজন প্রতিদ্বন্দী রাজকুমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সন্দ্বীপে আসিয়া আশ্রয় লয়েন। গোনৃজেল তাঁহাকে বিশেষ সমা-রোহে অভ্যর্থনা করিল এবং তাঁহার ভগিনীর পাণি গ্রহণ করিতে চাহিল। যুবরাজ তাহার এই প্রস্তাবে সম্মতি না দিলেও নৃশংস দস্যু বল প্রকাশ পূর্ব্বক অভীষ্ট সিদ্ধ করে। এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে হঠাৎ আরাকান-যুবরাজের মৃত্যু হয়। গোনৃজেল বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল, লোকে এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকে। প্রতিদ্বন্দী যুবরাজের মৃত্যু হইলে গোনৃজেল নূতন আরাকানাধিপের সহিত সম্মিলিত হইল এবং কিছুদিন মোগল-দিগের সহিত জলযুদ্ধ করিল। কিন্তু স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতকের কিছুই অকার্য্য নাই; দুরাত্মা পর্ত্তুগীজ দস্যু যে আরাকান-রাজের সহিত মিলিত হইয়াছিল, অবশেষে তাঁহারই কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করিয়া দিল এবং গোয়ার শাসনকর্ত্তার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আরাকান আক্রমণ করিল। অবশেষে গোয়ার পর্ত্তুগিজ শাসনকর্ত্তার সহিত স্বাধীন রাজা রূপে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া আরাকান রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইল। পর্ত্তুগিজ সেনাপতি আরাকান-রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও হত হয়েন, গোঞ্জেলও পরাভূত হয়। এই সময়ে তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; হতভাগ্য গোনৃজেল এইরূপে নিতান্ত নিঃসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়িল। এই অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়; আরকান-রাজ সন্দ্বীপ অধিকার করেন। এই স্থান হইতে তিনি প্রতিবৎসর বাঙ্গালা দেশ লুণ্ঠন করিতেন এবং অসংখ্য নরনারীকে ক্রীতদাসরূপে আনিতেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শা সুজা, আরঙ্গজিব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আরাকান রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, রাজাও প্রথমে তাঁহাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু আরাকানরাজ তৎপরেই শা সুজার ভগ্নীকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। শা সুজা ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহার ভগ্নী বিবাহার্থীকে আত্ম সমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় বিবেচনা করিয়া ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার আর দুইটী ভগ্নী বিষ-পান করিলেন, তৃতীয় ভগ্নী আরকান-রাজকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়েন, কিন্তু তিনিও শীঘ্রই আত্মহত্যা করেন অথবা তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

এই সময়ই আরকান-রাজের ক্ষমতা চরম সীমায় উত্থিত হয়। শা সুজার মৃত্যুতে আরঙ্গজিব সন্তুষ্ট হইলেও বাদসাহ বংশের রাজপুত্রকে আরাকান-রাজ হত্যা করায় তিনি তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ পর্ত্তুগিজদিগের সহিত মিলিত হইয়া চট্টগ্রাম দখল করিলেন এবং আরাকান রাজকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি পর্ত্তুগিজগণকে দস্যু বলিয়া শাস্তি প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর একশত বৎসর ধরিয়া আরাকান রাজ্যে নানা গোলযোগ চলিতে থাকে;—১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজের সৈন্য তিন রাজপুত্রের অধীনে তিনদিক হইতে আরা-

কান রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এ রাজ্য অধিকার করিলেন। আরকানবাসিগণ মগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চট্টগ্রাম ও মেঘনার তীরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। কতক-গুলি আরাকানবাসী আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহারাও মগ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অবশেষে বৃটিশ রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। মগ রাজ এই সকল পলাতককে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট চাহিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহাতে অস্বীকৃত হইলে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তি-শিকারিগণকে আক্রমণ করিলেন, বৃটিশ রাজত্বে লুটপাট আরম্ভ করিলেন এবং বৃটিশ-অধিকৃত সা ভুরি নামক দ্বীপস্থিত ইংরেজদিগকে দূর করিয়া সেই দ্বীপ দখল করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি লর্ড আমর্হাষ্ট মগ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তদনন্তর জেনারেল মরিসনের অধীনে একদল সৈন্য আরাকান প্রদেশে প্রবিষ্ট হইল, সার আরচিবল্ড ক্যাম্বেলের অধীনে আর এক দল ইরাবতী নদী-তীরে চলিল। ২ রা ফেব্রুয়ারি ইংরেজ সৈন্যের প্রথম দল চট্টগ্রাম হইতে পথে উত্তীর্ণ হইল। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ব্রীটিশ সৈন্য আরাকান সহরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এই সৈন্যের সঙ্গে কমেণ্ডার হেস্‌ সাহেব কয়েক খানি যুদ্ধ-পোতও আনিয়াছিলেন। ইংরেজ সেনাপতিগণ দেখিলেন যে আরাকান সহর সুন্দর রূপে রক্ষিত, ব্রহ্মদেশীয় সেনাপতি নগর রক্ষার জন্য অনেক বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও সমস্ত রাজ্যের পার্শ্বে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেবল একটী মাত্র গিরি-পথ দিয়া পগনে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়। এই পথ রক্ষার জন্য কয়েকটী কামান ও ৬৪০০ মগ বন্দুকধারী উপস্থিত ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ এই সহরে ৯০০০ হাজার মগ সৈন্য এই সময়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল। ২৯ মার্চ্চ বৃটিশ সৈন্য এই পথ অধিকার করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু সেনাপতিগণ হত ও আহত হওয়ায় তাহারা সে দিনের জন্য পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। ৩১ মার্চ্চ এই গিরিপথে ইংরেজ সেনা গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। সেই দিন রাত্রি আটটার সময় এক দল ইংরেজ সৈন্য পাহাড়টী দখল করিতে অগ্রসর হইল, এটী প্রায় ৫০০ ফিট উচ্চ এবং বড়ই দুরারোহ। যাহা হউক, ইংরেজ সেনা অতি সহজেই এ সহরটী অধিকার করিতে সমর্থ হইল, পরদিবস প্রাতে একটী কামান এই পাহাড়ের উপর টানিয়া তৎপর দিবস এই কামান হইতে গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইল, এদিকে দুই দিক হইতে ইংরেজ সৈন্য নগরের দিকে অগ্রসর হইল। মগগণ কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর নগর পরিত্যাগ করিল। তখন ইংরেজগণ নগর অধিকার করিলেন, মগগণ বাসরি ও সবনদাও পরিত্যাগ করিয়া পেগু প্রদেশে প্রবেশ করিল, এদিকে সার আরচিবল্ড কাপ্তেন সাহেব তাহাদিগকে তাড়াইয়া একেবারে আরাকান প্রদেশ হইতে দূর করিলেন। যানদাহ নামক স্থানে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হইয়া বৃটিশ সৈন্য আর অগ্রসর হইতে বিরত হইল। এই সন্ধি অনুসারে আরাকান ও তানাসারিম প্রদেশ বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইল।

ব্রহ্মদেশ হইতে ইংরেজ সৈন্য চলিয়া আসিলে আকায়েবে এক দল সৈন্য রক্ষিত হইল এবং আরাকান প্রদেশবাসিগণ লইয়া একটী নূতন সেনাদল গঠিত হইল। ১৮২৭ ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু বিদ্রোহিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই দুইটী ঘটনা ব্যতীত এ প্রদেশে আর কোন গোলযোগই ঘটে নাই।

লোকসংখ্যা।—১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশ যখন বৃটিশ অধিকারে আইসে, তখন ইহা প্রায় লোকশূন্য ছিল। যাহারা পূর্ব্বে চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে চলিয়া গিয়াছিল, বৃটিশ রাজ্যের প্রথম বৎসরেই তাহারা আবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। সেই সঙ্গে ব্রহ্ম রাজের রাজ্য হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া এই প্রদেশে বাস করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে আকায়েব জেলার লোক-সংখ্যা ৯৫০৯৮ ছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ২০১৬৭৭ হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আকায়েব, পেগু ও তানসেরিম বৃটিশ শাসনাধীনে আসিলে এ প্রদেশের লোক-সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আকায়েব জেলার লোক-সংখ্যা ৩০০০০০ লক্ষ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে এ প্রদেশের লোক-সংখ্যা ৩৫১৭০৬ দেখিতে পাওয়া যায়। আরাকানবাসিগণ মগ জাতি হইতে উৎপন্ন, তবে ইহাদের ভাষা ও রীতিনীতি সমস্তই মগদিগের হইতে বিভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে আচার ব্যবহারে ও প্রকৃতিতে ইহারা ভারতীয় জাতির ন্যায়। ইহাদের মধ্যে জানানা-প্রথা আছে এবং এক্ষণে ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহও অতিশয় প্রচলিত।—মুসলমান অধিবাসিগণ পূর্ব্বের ক্রীতদাসগণের সন্তান সন্ততি। ইহারা ধর্ম্ম ব্যতীত আর সকল বিষয়ে আরাকানীদিগের ন্যায়। ইহারা রচনাদিতে মগ ভাষা ব্যবহার করে, তবে কথোপকথনে কতকটা বাঙ্গালা ভাষা কহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ এ প্রদেশে আছে, মগগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনার জন্য মণিপুরী ব্রাহ্মণগণকে এ প্রদেশে আনয়ন করে। পেগডা বা মন্দিরের কার্য্য করিবার জন্য কতকগুলি ডোমকেও এ দেশে আনয়ন করা হয়। মুসলমানগণ এ দেশীয় রমণীগণকে বিবাহ করে, কিন্তু হিন্দুগণ তাহা করে না।

কৃষি।—ধান্যই এ প্রদেশে প্রধান আজীব শস্য। আকায়েব সহর ও বন্দর হইতে প্রতি বৎসর বহুল পরিমাণ চাউল নানা স্থানে রপ্তানি হয়। পূর্ব্বে এ প্রদেশে টাঙ্গিয়া প্রথায় কৃষিকার্য্য অধিক হইত। টাঙ্গিয়া অর্থে জঙ্গল কাটিয়া সেই জঙ্গল পুড়াইয়া তাহারই ছাই সমস্ত ছড়াইয়া দেওয়া এবং তৎপরে তথায় শস্য বপণ করা। এরূপ চাষে এক জমীতে অন্ততঃ দশ বৎসর অন্তর চাষ করিতে হয়। এক্ষণে এ প্রথার পরিবর্ত্তে সাধারণ প্রথায় চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ধান্য ব্যতীত অন্যান্য যে শস্যাদি হয়, তাহার বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক নহে।

উৎপন্ন দ্রব্য।—অতি অল্প পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হয়। এক্ষণে লবণ অতিশয় সস্তা হওয়ায় এ ব্যবসা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে খনিজ পদার্থ কিছুই নাই। প্রায় ৭০০ লোক কুম্ভকারের কাজ করে। পূর্ব্বে পুরাতন আরাকান সহর হইতে বড় বড় নৌকা নানা দ্রব্য-ক্রয়ের জন্য বাঙ্গালা দেশে আসিত এবং অন্যান্য ব্রহ্মদেশীয় বন্দরের সহিত ব্যবসা

বাণিজ্য করিত। আকায়েব বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হওয়ায় দিন দিন ইহার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে।

শাসন-প্রণালী।—এই প্রদেশ-শাসনের জন্য একজন ডেপুটী কমিশনার, একজন আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, আটজন একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, একজন আকুন উন (কলেক্টর), একজন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, একজন সিবিল সার্জ্জন,—একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, একজন কাষ্টম কলেক্টর, একজন মাষ্টার এটেণ্ডাণ্ট, একজন ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অভ স্কুল, একজন টেলিগ্রাফ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও একজন পোষ্ট মাষ্টার। আকায়েব জেলা ১২৬টী বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগের উপর একজন খুগি আছেন। ইনি রাজস্ব আদায় করেন, জমি জারাতের গোল মিটান, এবং অন্যান্য নানা রাজকার্য্য করেন। এই প্রদেশে ৪৫৭ জন পুলিশ কর্ম্মচারী আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে তিনটী গবর্ণমেণ্ট ও ১১৪টী এডেড্ স্কুল ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক আন-এডেড্ স্কুলও ছিল। ঐ বৎসর ১৬০৩১ বালক ও ২৪৯৮ বালিকা লেখা পড়া শিখিতেছিল। এখানে আরাকান "নিউস" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়।

আকায়েব সহর।—ব্রহ্মদেশের আকায়েব জেলার প্রধান নগর ও বন্দর। কুলাদন নদীর মুখে অবস্থিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহাকে একটী মিউনিসিপ্যালিটীতে পরিণত করা হইয়াছে। বৃটিশ অধিকারের প্রারম্ভে আকায়েব মৎস্যজীবিগণের ক্ষুদ্র বাসভূমি ছিল, পুরাতন আকায়েব বড়ই অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজধানী এই গ্রামে সংস্থাপিত করেন। দেখিতে দেখিতে আকায়েব একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছে। ধান্য ও চাউলের জন্যই দিন দিন ইহার উন্নতি হইতেছে, যদি শ্রমজীবির অভাব না হইত, তাহা হইলে আকায়েব আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিত।

লোকসংখ্যা।—১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেনসস্ রিপোর্ট অনুসারে মোট লোকসংখ্যা ৩৭৯৩৮; তন্মধ্যে পুরুষ ২৯২০৮, স্ত্রী ৮৭৩০।

এ সহরে প্রধান অট্টালিকা আদালত, জেল, কাষ্টম্ হাউস, হাসপাতাল, বাজার, দুইটী গির্জ্জা, ডাক বাঙ্গালা ও স্কুল। এতদ্ব্যতীত আকায়েবে ৫টী জলের কল আছে। চাউল ও কেরোসিন তৈল এখানকার প্রধান রপ্তানি; রামরি ও বরোদ্দ দ্বীপে এই তেল উঠে। বিলাত হইতে এ বন্দরে কোন দ্রব্য আইসে না, তবে ভারতবর্ষ ও রেঙ্গুন হইতে বহুতর বিলাতী দ্রব্য আমদানী হয়। ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে প্রথম ৪০ বৎসরের মধ্যে আকায়েব ১৫৫৩৬ লোক সহ একটী নগরে পরিণত হয়। তৎপরে ১৩ বৎসরের মধ্যে ইহার লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যও এই ৫৩ বৎসরে ৭০৭৮০ টাকা হইতে দেড় কোটী টাকা হইয়াছে।

আগড়পাড়া।—২৪ পরগণার একটি বর্দ্ধিষ্ট গণ্ডগ্রাম, এক্ষণে দক্ষিণ বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটী নামে পরিচিত। লোকসংখ্যা ৩০৩১৭ (১৮৮১)। ১৮৯১ খৃঃঅব্দের সেন্‌সস্ রিপোর্ট অনুসারে লোকসংখ্যা মোট ৩৫৬৪৭; পুরুষ ২০৩৭০, স্ত্রীলোক ১৫২৭৭। এখানে

খৃষ্টিয়ান মিশনারিদিগের একটী স্কুল ও অনাথাশ্রম আছে। জলপথে গঙ্গা দিয়া গেলে আগড়পাড়া কলিকাতা হইতে ১০ মাইল।

আগড়তলা।—ইহাকে নূতন হাবেলি বা নূতন সহরও বলে। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী। এইখানে রাজা মধ্যে মধ্যে বাস করেন। কুমিল্লা হইতে আগড়তলা ৩৪ মাইল। একটী প্রশস্ত রাস্তা এই উভয় স্থানের সংযোগ সাধন করিয়াছে। ইহাকে পল্লি বলিলেও চলে; কিন্তু আয়তন ও সম্পদ বিষয়ে দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। লোকসংখ্যা ২১৪৪ (১৮৮১)। এখানে স্থানীয় রাজার একটী প্রাসাদ, স্কুল, হাসপাতাল, জেল ও থানা আছে।

আগড়তলা।—(পুরাতন) পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মধ্যস্থ একটী গ্রাম, বর্ত্তমান রাজধানী হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১১৮৬। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাই ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। পুরাতন রাজপ্রাসাদ ও মৃত রাজা ও রাণীদিগের স্মৃতিচিহ্ন মঠের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রাসাদের নিকট একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে; এই মন্দিরে স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অন্যান্য ধাতু নির্ম্মিত ত্রিপুরা-দেবতার ১৪টী মস্তক আছে। পর্ব্বতবাসিগণ এই মন্দিরকে বিশেষ ভক্তি ও মান্য করে।

আগ্রা —উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটী কমিশনারী বিভাগ,—নিম্নলিখিত জেলা কয়টী ইহার অন্তর্গত, যথা মথুরা, ফরক্কাবাদ, এতা, এটোয়া, মাইনপুরী ও আগ্রা। এই বিভাগের উত্তরে আলিগড় জেলা, পূর্ব্বে গঙ্গা, দক্ষিণে জানাউন ও কাণপুর জেলা, পশ্চিমে ভরতপুর, ঢোলপুর ও গোয়ালিয়র। পরিমাণ-ফল, ১০১৫১ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪৮৩৪০৬৪।

আগ্রা।—উত্তর-পশ্চিমের একটী জেলা,—লোকসংখ্যা ৩৭৪৬৫৬। এ জেলার রাজধানী আগ্রা সহর।

প্রাকৃতিক ভাব।—যমুনার উভয় তীরস্থ প্রদেশ লইয়া আগ্রা বিভাগ গঠিত। প্রায় ঠিক মধ্য দিয়া যমুনা প্রবাহিত হইয়া এই বিভাগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই বিভাগের উত্তরে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূমি,—ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা এবং গঙ্গার শাখা প্রশাখা দ্বারা বিধৌত,—কেবল মধ্যে মধ্যে বালুকাময় ক্ষুদ্র পাহাড় ও স্থানে স্থানে বৃক্ষাদি শূন্য উষর প্রান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যমুনার নিকটস্থ হইলে বহুসংখ্য খাদ দেখিতে পাওয়া যায়,—বর্ষাকালে এই খাদ দিয়া চতুর্দ্দিকস্থ জল ও ময়লাদি দূরে নীত হয়,—এই অঞ্চলের কোন কোন স্থান একবারে বৃক্ষাদি-শূন্য, কোন কোন স্থান বাবলা বৃক্ষে ও ঝোপে পূর্ণ। এইরূপ অনুর্ব্বরা জমির নিম্নে অপ্রশস্ত খাদির বা চর ভূমি। এখানে জল সিঞ্চন না করিলেও যব ও ইক্ষু যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই প্রদেশের ঠিক মধ্য দিয়া উতানগান নদী বহমান,—দক্ষিণ সীমায় চম্বল নদী প্রবাহিত,—ইহার বেগ যমুনা হইতেও প্রখর। এই স্থানের সমতল ভূমি বরাবরই গাঙ্গেয় সমতল ভূমির ন্যায় বিস্তৃত,—

তবে এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া ইহা ক্রমে উচ্চ হইয়াছে। এইখানে বিন্ধ্য পর্ব্বতের বহুসংখ্য দূরবর্ত্তী শাখা (বেলে পাথরের পাহাড়) দৃষ্টিগোচর হয়। যমুনা, চম্বল ও উতানগান নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান খাদে পূর্ণ,—তবে উত্তর-পশ্চিমস্থ পরগণার জমি সমতল,—এই সমতল জমির মধ্য দিয়া আগ্রা খাল প্রবাহিত হইয়া উভয় তীরস্থ ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিতেছে। জেলার ঠিক মধ্যস্থলে যমুনার পশ্চিম তীরে আগ্রা নগর অবস্থিত,—এখানে বিশ্ববিদিত তাজমহল ও আরও বহুতর রমণীয় অট্টালিকা আছে,—ইহার বর্ণনা আগ্রা নগরের বর্ণন-কালে প্রদত্ত হইবে।

ইতিহাস।—আগ্রা নগরের কথা ছাড়িয়া দিলে, আগ্রা জেলার কোনই ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। যমুনার পূর্ব্ব তীরে দিল্লির লোডিবংশীয় নরাধিপগণের একটী প্রাসাদ ছিল,—১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁকে পরাজিত করিয়া বাবর এই প্রাসাদ দখল করেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বাবরের সঙ্গে রাজপুতগণের ফতেপুর শিকড়ির নিকট একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বাবর জয়লাভ করেন। বাবরের পুত্র হুমাউন্‌ও এই পুরাতন আগ্রায় বাস করিতেন,—অবশেষে তিনি ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে দূরীভূত হয়েন। আকবর স্বীয় শাসন-কালের অধিকাংশ সময় এই জেলায় বাস করিয়াছিলেন। নদীর পশ্চিম তীরে আধুনিক আগ্রা—তিনিই সংস্থাপন করেন। ফতেপুর শিকড়িও তাঁহা দ্বারা স্থাপিত হয়। এই নগরের নিকট তিনি ২০ মাইল বিস্তৃত একটি বৃহৎ সরোবর খনন করান,—কিন্তু এক্ষণে তাহার পাড়ের ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আগ্রা হইতে ৫ মাইল দূরে সিকান্দারা নামক সমাধি মন্দির; এই স্থানে আকবরের মৃতদেহ সমাহিত হয়। আকবরের পুত্র জাহাঁগির এই কবর নির্ম্মাণ করেন। ইহার দ্বারে একটী অতি সুন্দর লোহিত প্রস্তরের তোরণ আছে। জাহাঁগির স্বীয় শাসনের শেষাশেষি আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাব ও কাবুলেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শাজাহান্ দিল্লিতে রাজধানী লইয়া যান বটে, কিন্তু আগ্রার গৌরবস্থানীয় তাজমহল প্রভৃতি নির্ম্মাণে অবহেলা করেন নাই। বিদ্রোহী আওরঙ্গজীব দিল্লির সিংহাসন অধিকার করিলে, আগ্রা নগরে সিংহাসনচ্যুত বৃদ্ধ সম্রাটের আবাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৬৬৬ খৃঃঅব্দ হইতে এ জেলা ক্রমেই শ্রীহীন হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে জাঠগণ আসিয়া উপদ্রব করিত, তাহাতেও সহরের অনেক প্রকার অনিষ্ট হয়। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে আগ্রা জেলায় কোনই উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই, তবে ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সুরাজমল ও ওয়াণ্টার রেণ হার্টের (ইহার দেশী নাম সমরু) অধীনস্থ ভরতপুরের জাঠগণ কর্তৃক আগ্রা অধিকৃত হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ সমস্ত দোয়াব প্রদেশ লুণ্ঠন ও অধিকার করে;—কিন্তু পর বৎসরেই নাজফ খাঁ কর্ত্তৃক দূরীকৃত হয়। নানা পরিবর্ত্তনের পর ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেকের রণজয় নিবন্ধন এই প্রদেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। তদবধি সিপাহী-বিদ্রোহের পর এখান হইতে রাজধানী তুলিয়া এলাহাবাদে আনয়ন করা হয়। ১৫ই জুন

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই জেলার তহশীল ও থানা বিদ্রোহিগণ অধিকার করে। ২রা জুলাই নিমচ ও নশীরাবাদস্থ বিদ্রোহী সিপাহীগণ ফতেপুর শিকড়ির নিকট আইসে। সেই সময় হইতে সমস্ত জেলায় অরাজকতা উপস্থিত হয়। ২৯শে জুলাই আগ্রা হইতে একদল সৈন্য যাইয়া ফতেপুর শিকড়ি দখল করে এবং আর একদল সৈন্য যাইয়া এতিমাদপুর ও ফিরোজাবাদ পরগণায় শান্তি সংস্থাপন করে। এই সময়ে আওযার রাজা উত্তরে, ভাদোয়ারের রাজা পূর্ব্বে শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্বিন মাসে দিল্লি ইংরেজের হস্তগত হইলে তথাকার বিদ্রোহিগণ মধ্য-ভারতের বিদ্রোহিগণের সহিত মিলিত হইয়া ৬ই অক্টোবর আগ্রার নিকটবর্ত্তী হয়। চারি দিন পর কর্ণেল গ্রেট হেডের অধীন সৈন্যদল আসিয়া বিদ্রোহীদিগের অজ্ঞাতসারে আগ্রায় প্রবেশ করে। অজ্ঞাতরহস্য বিদ্রোহিগণ আগ্রা নগর আক্রমণ করিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং অল্পদিনের মধ্যেই ফতেপুর শিকড়ি হইতে তাড়িত হয়। ১৮৫১ খৃঃঅব্দের ৪টা ফেব্রুয়ারির পর এ জেলায় আর একজনও বিদ্রোহী রহিল না।

লোকসংখ্যা।—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে আগ্রার লোকসংখ্যা ১০০১৯৬১ ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২০৭৬০০৫ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা ৯৭৪,৬৫৬ ছিল। কাজেই নয় বৎসরে শতকরা ৯·৪২ লোকসংখ্যা কমিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পুরুষ ৫২৬৮০১ ও স্ত্রীলোক ৪৪৭৮৫৫ ছিল।

কৃষি।—দোয়ারের ভূমি সাধারণতঃ উর্ব্বরা; তবে যে সকল স্থানে পার্ব্বত্য খাদ আছে; তথায় জলস্রোতে উপরের মৃত্তিকা ধুইয়া যায় বলিয়া বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। খাদ ও নদীর তীরের মধ্যবর্ত্তী খাদির বা চর জমি খুব উর্ব্বরা; এ সকল জমীতে ফসল বিলক্ষণ হয়। উত্তর পশ্চিমের অন্যান্য স্থানে চাষের অবস্থা যেরূপ,এখানেও সেইরূপ,ফসল দুইটি,খারিফ বা হৈমন্তিক এবং রবি বা বাসন্তিক। খারিফ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপণ করা হয় এবং কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে কর্ত্তন করা হয়। খারিফ ফসলের মধ্যে বজ্‌রা, জোয়ার, তুলা প্রভৃতি এই সময়ে জন্মে। রবি কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে বপণ করা হয় এবং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে কর্ত্তিত হইয়া থাকে। রবি শস্যের মধ্যে যব, গোধুম, মটর, ছোলা প্রভৃতি প্রধান। যেখানে সার পাওয়া যায়, সেখানে জমিতে সার দেওয়া হয়। যে, জমি পতিত রাখিতে সমর্থ হয়, সে চাষ না করিয়া মধ্যে মধ্যে জমি পতিত রাখে। কখন কখনও কৃষাণের অভাবেও জমি পতিত থাকে, তবে একই বৎসরে একই জমীতে খারিফ ও রবি উভয় ফসল বপণ করা হয় না। কখনও ভাদ্র মাসে ধান্য বপণ করিয়া সেই জমিতে পরে রবি ফসল বপণ করা হয়। কৃষকগণ ফসলের সাময়িক পরিবর্ত্তনও করিয়া থাকে,—হৈমন্তিক শস্যের পর বাসন্তিক শস্য উৎপাদন করে—তুলা বজরা ও জোয়ারের পরিবর্ত্তে গোধুম, যব এবং ছোলার চাষ করে। ইক্ষু, তামাক, নীল, পোস্ত এবং শাক সবজীরও চাষ হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মোট আবাদি জমি ৭৩১৭০৪ একার ছিল। তুলার চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু

আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় অন্যান্য ফসলের অল্পতা হয় নাই। কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই ঋণজালে জড়িত, এমন কি জমিদারগণের অবস্থাও ভাল নহে।

দুর্দ্দৈব।—অনাবৃষ্টি হইলে আগ্রা জেলার বিশেষ ক্ষতি হয়। অনাবৃষ্টি বশতঃ ১৭৮৩, ১৮১৩, ১৮১৯ ও ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে আগ্রা নগরে ১১৩০০০ ভিক্ষুককে সাহায্য প্রদান করা হয়। তিন লক্ষ দুর্ভিক্ষপিড়ীত লোক অন্যান্য জেলা হইতে কর্ম্ম ও আহার পাইবার লালসায় এই জেলায় আগমন করে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে আবার অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তবে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ন্যায় এ অন্নকষ্ট তত ভীষণ মুর্ত্তি ধারণ করে নাই। লোকের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আবার একবার অন্নকষ্ট হয়,—এই জেলায় প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হয় নাই বটে, কিন্তু রাজপুতানা হইতে অসংখ্য লোক এই জেলায় আগমন করায় এই জেলায় দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়ে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আর একবার অন্ন-কষ্ট হয়, সুলভ হৈমন্তিক ফসল না জন্মিলেই চাষিগণ অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ বাসন্তিক ফসল উৎপাদন করিতে বাধ্য হয়,—যখন টাকায় ১২।১৩ সের আহারীয় বিক্রয় হইতে থাকে, তখন আর তাহারা ইহা ক্রয় করিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

ব্যবসাবাণিজ্য।—আগ্রা সহর এই জেলার ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। মফস্বলে কয়েকটী নীলকুঠি ও দুইটী তুলার গাঁইট বাঁধিবার কল আছে,—এ জেলার কাপড় সতরঞ্চ অতি উত্তম এবং ভাল ভাল মাটীর দ্রব্যও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সুলতানপুর, কান্দাহারপুর, জারা ও সামনাবাদে গো মেষাদির বৃহৎ হাট বসে। যমুনার দক্ষিণ তীরস্থ বাতেশ্বরে স্নানযাত্রা-উপলক্ষে এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে, এই মেলায় ঘোড়া, উট ও গো মেষাদির বহুল পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় হয়। জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল হইতে অনেক পাথর কাটিয়া বাহির করা হয়,—তথা হইতে এই সকল পাথর, আগ্রায় পরিষ্কৃত ও খোদিত হইয়া পরে যমুনা দিয়া নানাস্থানে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইয়া থাকে। এ জেলার পথঘাট খুব ভাল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের প্রধান লাইন বরাবর দোয়াবের ভিতর দিয়া গিয়াছে,—একটী শাখা-রেল টুণ্ডলা হইতে আগ্রায় গিয়াছে;—এই রেল লাইন রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ে যমুনার উপর স্থিত একটী সেতুর উপর দিয়া গিয়াছে। এই লাইন আগ্রা হইতে ভরতপুর, জয়পুর ও আজমির হইয়া বম্বে গিয়াছে। ষ্টেট রেলওয়ে উতানগান ও চম্বল নদী পার হইয়া ঢোলপুর, গোয়ালিয়র দিয়া গিয়াছে। রাজপুতানা রেলওয়ের আকনারা ষ্টেশন হইতে একটি সংকীর্ণ মাপের রেলপথ আগ্রা ও মথুরা সংযোজিত করিয়াছে। মথুরা, আলিগড়, কাণপুর, এটোয়া, গোয়ালিয়র প্রভৃতি সকল প্রধান প্রধান স্থানে যাইবার জন্য আগ্রা হইতে বেশ ভাল পাকা রাস্তা আছে। আগ্রা খালের এক অংশে নৌকাদি চলে,—যমুনা দিয়াও পূর্ব্বদিকে মালামাল যায়।

শাসন-প্রণালী।—রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজনমত কমে ও বাড়ে, তবে সাধারণতঃ একজন কলেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট, দুইজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন আসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও দুইজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, এতদ্ব্যতীত পুলিশ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও আছেন। এখানে একজন সেশন্‌স্ জজ থাকেন। তাহা ছাড়া ২০ জন দেওয়ানী বিচারক ও ২৫ জন ফৌজদারি বিচারক আছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় মোট রাজস্ব ২২৭৭৮৮০৲ ছিল। তাহা হইতে মোট ৩০৭৭৭০৲ টাকা রাজকার্য্যে ব্যয় হইয়াছিল। মোট পুলিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১২৪৩; এতদ্ব্যতীত ২১১৬চৌকিদারও আছে। এ বিভাগের প্রধান জেল এই জেলায়, এই জেলে ১৮৮১ সালে গড়ে ২০৮১ জন কয়েদি ছিল। এখান হইতে আলিগড়, কাণপুর ভরতপুর, ঢোলপুর, মথুরা প্রভৃতি স্থানে টেলিগ্রাফ লাইন গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সকল রেলওয়ে ষ্টেশনেই টেলিগ্রাফ আফিস আছে। এই জেলায় পোষ্ট আফিসের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আগ্রার গবর্ণমেণ্ট কলেজ, সেণ্টজন কলেজ, সেণ্টপিটার্স কলেজ ভিক্টোরিয়া কলেজ এই কয়টী কলেজ আছে। সেকেন্দ্রায় একটী অনাথ বিদ্যালয় আছে, এখানে লেখাপড়া শিক্ষা ব্যতীত নানারূপ কারুকর্ম্মও শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা উচ্চ শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা করে,—তাহারা সেণ্টজন কলেজে পড়া শুনা করিতে পারে,—এক্ষণে এই বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র নানা স্থানে শিক্ষকতা ও কেরাণীর কার্য্য করিতেছে। অধিকাংশ ছাত্রেই কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করে,—এইখানে শিক্ষিত ছুতার ও কামার রেলওয়েতে অনায়াসে কার্য্য পায়। এতদ্ব্যতীত এখানে শিখিয়া অনেকে কম্পোজিটার, প্রেসম্যান, দপ্তরি, দরজি প্রভৃতির কার্য্য করে। বালিকাদিগকে সূচের কার্য্য ও রন্ধনাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই জেলা সাতটী তহশীল ও সাতটী পরগণায় বিভক্ত। ১৮৮১ সালে এই জেলার ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ ১৭৮৩৯৫০ টাকা ছিল।

জলবায়ু।—আগ্রা জেলার পশ্চিমে অতি নিকটে মরুভূমি থাকায় এ জেলাটি অতিশয় শুষ্ক ও অত্যন্ত উষ্ণ। যদিও শীতকালে শীত ও গ্রীষ্মকালে অতিশয় গরম পড়ে,—তথাপি আগ্রার আবহাওয়া মন্দ নহে। এই জেলায় ছয়টী দাতব্য ঔষধালয় আছে, আগ্রা সহরে একটী কুষ্ঠাশ্রম ও দরিদ্রশালা আছে।

আগ্রা সহর।—আগ্রা জেলার প্রধান সহর। তাজ গঁা ও সা গঞ্জ সহ মোট লোক সংখ্যা ১৬০২০৩। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট অনুসারে লোকসংখ্যা,—মোট ১৬৮৬৬২, তন্মধ্যে পুরুষ ৯০৯২৩, স্ত্রীলোক ৭৭৭৩৯। হিন্দু ১১১,২৯৫, মুসলমান ৪৩৩৬৯, খ্রীষ্টিয়ান ৪০১৫, জৈন ৩২১১, শিখ ৪৮৫, বৌদ্ধ ২৫৪, পার্শী ৩৩, তদ্ব্যতীত অযোধ্যার অন্তর্গত লক্ষ্ণৌ নগরী না ধরিলে, আয়তন ও সমৃদ্ধি বিষয়ে আগ্রা সহরই উত্তর পশ্চিম প্রদেশের দ্বিতীয় নগর। এই সহর যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত; কলিকাতা হইতে রেল পথে ইহার দূরত্ব ৮৪১ মাইল। যমুনার বাঁকের ঠিক

উপরে দুর্গ। যমুনা যেখানে পূর্ব্ববাহিণী হইয়াছে সেই বাঁকের উপর আগ্রা অবস্থিত। বর্ষাকালে দুর্গের এক অংশ পূর্ণহৃদয়া যমুনার ঠিক উপরে অবস্থান করে। ১১ বর্গ মাইল লইয়া পুরাতন নগর প্রাচিরে বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে ইহার অর্দ্ধেক অংশে মাত্র লোকের বসতি আছে, অপরার্দ্ধ প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ, খাদ ও পতিত ভূমিতে পূর্ণ। দুর্গের দক্ষিণে সেনা নিবাস; সেনা নিবাস ও দুর্গের মধ্যে, পূর্ব্বদিকে নদীতীরে একটু মধ্যবর্ত্তী স্থানে সুবিখ্যাত তাজমহল নামক জগদ্বিখ্যাত সমাধিমন্দির। দুর্গের উত্তর পশ্চিমে আদালত এবং সাহেবদিগের বাসভূমি, যমুনাও এই স্থানের মধ্যে দেশীটোলা অবস্থিত। গৃহ সংখ্যার অনুপাতে এখানে যত প্রস্তরনির্ম্মিত বাড়ী আছে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের আর কোন নগরে তত নাই।

ইতিহাস।—আকবর সাহের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে আগ্রায় লোডিবংশীয় নৃপতিগণ বাস করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের রাজধানী যমুনার বাম বা পূর্ব্বপারে অবস্থিত ছিল, বর্ত্তমান সহরের ঠিক সম্মুখে যে ইহার ভিত্তি ছিল, তাহা এখনও পরিলক্ষিত হয়।

১৫২৬ খৃঃ অব্দে বাবর ইব্রাহিম খাঁকে পরাজিত করিয়া এই স্থানের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন, এবং পরবর্ত্তী বৎসরে যখন ফতেপুর শিকড়িতে রাজপুতদিগকে পরাস্ত করিয়া মোগল আধিপত্য দৃঢ়ীকৃত করিলেন, তখন এইখানেই স্থায়ীরূপে বাস করেন। কিন্তু তাঁহার মৃতদেহ কাবুলে নীত হওয়ায় এখানে তাঁহার কোন সমাধি নাই। বাবরের পুত্র হুমায়ুন্ বাঙ্গালায় আফগানগণের অধিনায়ক শের শা কর্ত্তৃক কিয়দ্দিনের জন্য গাঙ্গ প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হয়েন; তিনি পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন এবং তাঁহার রাজধানী দিল্লিতে সংস্থাপিত হয়। হুমায়ুনের পুত্র আকবর রাজধানী আগ্রায় আনয়ন করিয়া যমুনার পশ্চিম তীরে এই নূতন আগ্রা সংস্থাপন করেন। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে তৎকর্ত্তৃক দুর্গ নির্ম্মিত হয়। চারি বৎসর পরে তিনি ফতেপুর শিকড়ির পত্তন করেন। এই নগরকেই রাজধানীতে পরিণত করিবার তাঁহার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু আগ্রানগরী যমুনার তীরে অবস্থিত থাকায় এই স্থানে রাজধানী সংস্থাপন নানা রূপে সুবিধাজনক বলিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। ১৫৯০ খৃঃঅব্দ হইতে ১৬০০খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত আকবর সাহ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভারত বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন; পরে ১৬০১ খৃঃঅব্দে, যুদ্ধ শেষ করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন এবং চারি বৎসর পরে এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রাজত্বকালে দুর্গ মধ্যস্থ প্রাসাদ সকলের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং চিতোরের তোরণ আনিয়া এই নগরে বসান হয়। আকবরের পুত্র জাহাঁগির সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া সিকান্দ্রার আকবরের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তিনি যমুনার বামপারে তাঁহার শ্বশুর এতমাদ্ উদ্দৌলার সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জাহাঁগির মহল নামক দুর্গমধ্যবর্ত্তী প্রাসাদাংশ তাঁহারই সময় নির্ম্মিত হয়। ১৬১৮খৃঃঅব্দে জাহাঁগির আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া যান ও তদবধি আর এই সহরে প্রত্যাগমন করেন নাই। ১৬২৮ খৃঃঅব্দে সাজিহান বাদসাহ হন; এবং ১৬৩২ খৃঃঅব্দ হইতে ১৬৩৭ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত তিনি আগ্রাতে বাস করেন,—

তাঁহারই রাজত্ব-কালে আগ্রায় সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ সকল নির্ম্মিত হয়, তবে সম্ভবতঃ এই সকল অট্টালিকার অনেকগুলিই তাঁহার সিংহাসনাধিবেশনের পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। মতি মসজিদ, জম্মা মসজিদ এবং খাসমহল সমস্তই তাঁহার রাজত্বকালে সম্পূর্ণ হয়। তাঁহার স্ত্রী মম্ তাজমহলের স্মরণার্থে তিনিই তাজমহল নামক জগদ্বিখ্যাত সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করান; এরূপ সুন্দর অট্টালিকা জগতের আর কোথাও নাই। ১৬৫৮ খৃঃঅব্দে তাঁহার পুত্র আরঙ্গজীব বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তিনি সাত বৎসর এরূপ বন্দি-অবস্থায় আগ্রায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কিছুকালের জন্য আগ্রার অবস্থা হীন হয়। আরঙ্গজীবের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করাই ইহার মুখ্য কারণ। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন অবস্থায় এই নগর জাঠগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হয়; ১৭৬৪ খৃঃঅব্দে সুরাজমহল ও সমরুর অধীনস্থ সৈন্যগণ আগ্রা দখল করে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ জাঠদিগকে দূর করিয়া আগ্রা অধিকার করিয়া লয়; কিন্তু চারি বৎসর পরে তাহারা নাজাফ খাঁ কর্ত্তৃক দূরীভূত হয়। সেই সময় হইতে কয়েক বৎসর নাজাফ সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী স্বরূপ রাজোচিত সমারোহে ও আড়ম্বরে আগ্রায় অবস্থান করেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, মহম্মদী বেগ আগ্রায় শাসনকর্ত্তা হয়েন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে শা আলম বাদসা এবং মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত মধুজী সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তিনি অবরুদ্ধ হয়েন। সিন্ধিয়া আগ্রা অধিকার করিয়া ১৭৮৭ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত আপন দখলে রাখেন; তাহার পর তিনি জুনাম কাদের ও ইসমাইল বেগের অধীনস্থ বাদসাহী সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন। ফরাসী সেনানী ডিবইন বাদসাহী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করেন; তদবধি এই দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তেই ছিল, পরে ১৮০৩ খৃঃষ্টাব্দে লর্ড লেক ইহা অধিকার করেন। এই সময় হইতে ইহা ইংরাজ-দিগের সীমান্ত দুর্গ হইল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী আলাহাবাদ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে অপ্রতিহত ভাবে ইংরেজ শাসন চলিতে থাকে। ১১ই মে মিরাটস্থ সৈন্য-গণের বিদ্রোহিতার সম্বাদ আগ্রায় আইসে এবং দেশীয় সৈন্যের বিশ্বস্ততায় সন্দেহ জন্মে। ৩০মে দুই দল সৈন্য দেশীয় পদাতিক কোম্পানীর তহবীল মথুরা হইতে আগ্রায় আনিবার জন্য প্রেরিত হয়। ইহারা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লির অভিমুখে চলিয়া যায়। এই ঘটনার পর দিনই আগ্রাস্থ সৈন্যগণকে নিরস্ত্র করা হয়, এবং তাহারা স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়। ১৫ই জুন গোয়ালিয়ারে বিদ্রোহিগণ উপস্থিত হয় এবং ইহাও বুঝা যায় যে আগ্রাস্থিত গোয়ালিয়ারের সৈন্যগণ বিদ্রোহে যোগ দিবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ ইহা বুঝিয়া ৩রা জুলাই দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার দুই দিবস পরে নিমচ ও নশিরাবাদস্থ বিদ্রোহিগণ আগ্রায় উপস্থিত হয়; এবং সুচেতা নামক স্থানে ইংরাজদিগকে পরাজিত করে। ইংরাজ-দিগকে পরাভূত দেখিয়া বদমাহিসের দল আগ্রা লুণ্ঠন করে এবং স্বদেশী ও বিদেশী যাহাকে

পায় তাহাকেই হত্যা করিতে থাকে। কিন্তু বিদ্রোহী সিপাহীগণ নগর প্রবেশ না করিয়া দিল্লি অভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ায় দুই এক দিনের মধ্যেই আগ্রায় কতক শান্তি সংস্থাপিত হইল। জুন, জুলাই আগষ্ট এই তিন মাস রাজকর্ম্মচারিগণ দুর্গ মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হয়েন,—তবে মধ্যে মধ্যে সৈন্যগণ বাহির হইয়া বিদ্রোহিগণকে আক্রমণ করিত। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর জন কলভিন সাহেবও এই দুর্গে আটক হইয়াছিলেন। এই অশান্তির সময়েই এই দুর্গ মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং এই দুর্গের মধ্যেই তাঁহার সমাধি এখনও বিদ্যমান আছে। সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লি ইংরেজের হস্তগত হইলে বিদ্রোহীরা উক্ত নগর পরিত্যাগ করিয়া এবং মধ্য ভারতবর্ষের বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া ৬ই অক্টোবর তারিখে আগ্রার বিরুদ্ধে অভিযান করে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহাদের অজ্ঞাতসারে কর্ণেল গ্রেটহেডের অধীনস্থ সৈন্যদল আগ্রায় প্রবেশ করিয়াছিল। বিদ্রোহিগণ তাহা না জানিয়া আগ্রা আক্রমণ করে এবং অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া ছত্রভঙ্গে পলায়ন করে। এই ঘটনার পর আগ্রা নিরুপদ্রব হইল এবং শান্তি পুনঃ সংস্থাপন কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে চলিতে লাগিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানেই শাসনকর্ত্তা ও গর্ভমেণ্টের প্রধান রাজকার্য্যালয় সকল রহিল, তৎপরে আলাহাবাদ সামরিক হিসাবে প্রশস্ততর স্থান বলিয়া এইখানে স্থানান্তরিত হইল। এই সময় হইতে আগ্রা একটী জেলামাত্রের প্রধান নগরে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহা আজিও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে সুন্দরতম নগরী। ভারতবর্ষে রেল পথের বিস্তারের সঙ্গে মোগলদিগের এই প্রাচীন রাজধানী দিন দিন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে।

প্রাসাদ।—সমাধিমন্দির আদি আগ্রার সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা গুলির মধ্যে প্রায় সমস্ত সর্ব্বোৎকৃষ্টগুলিই দুর্গের মধ্যে অবস্থিত, নিম্নে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। দুর্গটী বেলেপাথরে গঠিত, ইহার লোহিত প্রাচীর ও পার্শ্ববর্ত্তী মঞ্চাদি দেখিলে স্বতঃই মনোমধ্যে মহান্ বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। এই দুর্গের মধ্যস্থ আকবরের সময়ের প্রাচীন অট্টালিকাগুলির সমস্তই লোহিত বর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। দুর্গের প্রধান দ্বারের সম্মুখে ত্রিপলিয়া নামক একটী প্রাচীরবেষ্টিত চত্বর ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই স্থানে রেলওয়ে ষ্টেশন নির্ম্মিত হইয়াছে। দুর্গের বাহিরে দুর্গদ্বারের সম্মুখে জুম্মা মসজিদ অবস্থিত। এই মসজিদে যাইবার সোপানাবলী খুব প্রশস্ত।

জুম্মা মসজিদ।—ইহার প্রধানাংশ তিনটী চত্বরে বিভক্ত। প্রত্যেক চত্বরের সম্মুখে দ্বার ও তৎসম্মুখেই প্রাঙ্গণ। গোল খিলানযুক্ত দ্বার দিয়া প্রাঙ্গণে অবতরণ করিতে হয়। প্রধান দ্বারের উপর একটি শিলালিপি আছে; ইহাতে লিখিত আছে যে, ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে শাজাহান বাদসা কর্ত্তৃক এই মসজিদ নির্ম্মিত হয়; ইহা সম্পূর্ণ হইতে ৫ বৎসর লাগে। এই মসজিদ শাজাহান বাদসাহের কন্যা জাহানারার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃদ্ধ সম্রাট শাজাহান দুর্বৃত্ত আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে এই জাহানারাই তাঁহার কারাবাসের সঙ্গিনী এবং

শুশ্রূষাকারিণী ছিলেন। এই ধর্ম্মশীলা রাজকন্যার সমাধি দিল্লির বাহিরে মহদাশয় কবি খসরুর সমাধির পার্শ্বে অবস্থিত আছে। এই শূন্য সমাধিমন্দিরটী শ্বেত মারবল প্রস্তরে নির্ম্মিত। সমাধি প্রস্তর-খণ্ডের এক পার্শ্ব দুর্ব্বাদলাচ্ছাদিত। পার্শী ভাষায় নিম্নলিখিত লিপি এই সমাধির উপর খোদিত আছে "আমার সমাধি যেন কোনরূপ বহু মুল্য চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত করা না হয়। সম্রাট শাজাহানের কন্যা চিস্তের সাধুদিগের শিষ্যা; সেই স্বল্পায়ু ও দীনাত্মা জাঁহানারার সমাধির জন্য দুর্ব্বাদল সমুচিত আচ্ছাদন"। জম্মা মসজিদ এই পুণ্যবতী রাজকন্যার স্মরণ চিহ্ন। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফিট ও প্রস্থে ১০০ ফিট।

দুর্গ।—জম্মা মসজিদের সম্মুখেই দুর্গ; এই দুর্গের চারিপার্শ্বে ৭০ফিট উচ্চ প্রাচীর। তাহার পরিধি দেড় মাইল। এই প্রাচীরের বাহিরে প্রস্তর ও তন্নিয়ে বালি ও রাবিস দিয়া গঠিত বলিয়া আধুনিক কামানের সম্মুখে এক মিনিটও তিষ্ঠিতে পারে না। গড়ের চারিদিকে গভীর খাদ আছে। একটী টানা পোল দিয়া গড়ে প্রবেশ করিতে হয়। সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড তোরণ, তৎপরে প্রস্তর-মণ্ডিত পথ। প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী লাল প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ,—এই স্তম্ভ কারুকার্য্যখচিত শ্বেত মারবল প্রস্তরে শোভিত। মধ্যস্থ পথের উপর দুইটী গুম্বজ আছে। এই ধার "দিল্লি গেট" নামে খ্যাত। ইহার পরই একটী অনাবৃত স্থল,—সম্ভবতঃ এটী প্রাঙ্গণ ছিল। এই প্রাঙ্গণের পর রাজপ্রাসাদ; এই প্রধান অট্টালিকাটী দেওয়ানী আম নামে খ্যাত। এইখানে পূর্ব্বে দরবার হইত। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গজীব এই দরবার গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই দরবার গৃহের পার্শ্বেই এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, দরবার গৃহের মধ্যস্থলে বাদসাহ ও সভাসদগণ উপবেশন করিতেন এবং তিন পার্শ্বস্থ দালানে জনসাধারণ দণ্ডায়মান থাকিত। একখানি উচ্চ সিংহাসনে বাদসাহ বসিতেন, তৎপশ্চাতে একটী দ্বার আছে; ঐ দ্বার দিয়া বেগম মহলে যাইবার পথ। দেওয়ানি আমের পশ্চাতে দেওয়ানী খাস ও হারেম। হারেমের তিন অংশে বেগমগণ বাস করিতেন,—চতুর্থাংশে তিনটী মণ্ডপ আছে। দেওয়ানী খাস ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহার ও দেওয়ানী আমের মধ্যস্থ প্রাঙ্গণ মাচ্ছিভবন নামে খ্যাত। সম্ভবতঃ শাজাহান বাদসাহকর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রাঙ্গণের যে অংশ নদীতীরে অবস্থিত, তথায় দুইটী সিংহাসন আছে, একটী শ্বেত মারবল প্রস্তর-নির্ম্মিত, অপরটী কৃষ্ণ শ্লেট প্রস্তরগঠিত। প্রাসাদের প্রধান উপকরণ লাল প্রস্তর, তবে প্রকোষ্ঠ, বারান্দা প্রভৃতি সুন্দররূপে খোদিত শ্বেত মারবল প্রস্তরে গঠিত। দেওয়ানী খাসের পরেই শীস মহল, সহস্র সহস্র দর্পণে এই মহল খচিত; এটী স্নানাগার ছিল। দক্ষিণে লাল প্রস্তর নির্ম্মিত একটী বৃহৎ অট্টালিকা আছে, ইহা জাহাঁগির মহল নামে খ্যাত। জাহাঁগির মহলে হিন্দু প্রণালীর শিল্প নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। জাহাঁগির মহল ও ইহার নিকটস্থ সমমূ ক্রজের গঠন হিন্দু প্রণালীর। দেওয়ানি আমের উত্তরে সুন্দর মতি মসজিদ;—ইহা লোহিত প্রস্তরের অতি উচ্চ ভিত্তির উপর অবস্থিত; ইহার উপরে তিনটী শ্বেত মারবেলের গুম্বজ ও স্বর্ণরঞ্জিত চূড়া আছে। মতি মসজিদ

১৪২ ফিট লম্বা ও ৫৬ ফিট উচ্চ, এই মতি মসজিদও শাহজাহান বাদসাহ কর্ত্তৃক ১৬৩৪ খৃঃঅব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দিল্লির মতি মসজিদ হইতে এই মতি মসজিদ অনেক পরিমাণে বৃহত্তর; এই মতি মসজিদ ব্যতীত আগ্রা দুর্গে অতি ক্ষুদ্র আর একটী মতি মসজিদ আছে, এই মসজিদে বাদসাহগণ উপাসনা করিতেন। এই সুন্দর মসজিদের সমগ্র অংশই অতি সুন্দর শ্বেত মারবলে নির্ম্মিত, ইহার কোথাও কোন প্রকার রঞ্জন বা অলঙ্কার নাই।

তাজমহল।—এই অতুলনীয় অট্টালিকা নদীতীরে অবস্থিত। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় নদীতীর দিয়া যে রাজপথ নির্ম্মিত হয়, সেই পথ দিয়া তাজমহলে যাইতে হয়। শাহজাহান বাদসাহের পত্নী আরজা মন্দবানু বেগম বা মম্ তাজমহলের স্মরণার্থ এই সুন্দর সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে মম্ তাজমহল বেগমের মৃত্যু হয়; সেই বৎসরেই এই মন্দির-নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণ হয়। জয়পুরের শ্বেত প্রস্তর ও ফতেপুর শিকড়ির লোহিত প্রস্তর দ্বারা এই তাজমহল গঠিত। ইহার নির্ম্মাণকৌশল ও কারুকার্য্যের উপযুক্ত বর্ণনা করা যায় না। মারবল নির্ম্মিত উচ্চ ভিত্তির উপর ইহা অবস্থিত। এই ভিত্তির চারিকোণ হইতে চারিটি অতি সুন্দর স্তম্ভ উঠিয়াছে। মধ্যস্থ সমাধি মন্দির পরিমাণে ১৮৬ বর্গ ফিট, তবে এটী ঠিক সমচতুষ্কোণ নহে, একটু বক্রভাবে গঠিত। ইহার উপরে একটী সুন্দর ও বৃহৎ গম্বুজ ও চূড়া। চূড়ার উপরে একটি অর্দ্ধচন্দ্র। নিম্নে চতুঃপার্শ্বে মারবেলের জাল; এই সমাধিমধ্যে মমতাজমহল বেগম ও শাজাহান অনন্ত নিদ্রায় শয়ান। সমাধি মন্দিরের প্রত্যেক কোণেও এইরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গম্বুজ আছে। দুইটী ছিদ্রযুক্ত মারবল পর্দ্দার ভিতর দিয়া সমাধি মন্দিরের মধ্যে আলোক প্রবিষ্ট হয়। ইহাতে বাহিরের অতি প্রখর আলোক মন্দীভূত হয়, অথচ এই আলোক শ্বেত প্রস্তরে প্রতিফলিত হয় বলিয়া আলোকের অপ্রাচুর্য্য হয় না। নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরে ভিতরের কারুকার্য্য সাধিত; ফুল, পাতা,লতা গঠিত করিবার জন্য নানা রঙ্গের মারবল ও মণি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরভাগ যেরূপ নানা মনোহর কারুকার্য্য-খচিত, জগতের আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না, সমস্ত মন্দিরটী একবার দেখিলে জীবনে আর তাহা ভুলিতে পারা যায় না। উপরিস্থ গম্বুজগুলি সুনীল আকাশে মারবলের বিম্বরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে।

তাজে প্রবেশ করিবার দ্বারে একটী অতি সুন্দর তোরণ আছে; এই তোরণের উপরিস্থ গৃহ মধ্য হইতে যমুনা ও তাজ উদ্যান অতি মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই তোরণ হইতে দুই পার্শ্বস্থ বৃক্ষের ছায়ায় সুশীতল পথ দিয়া তাজে যাইতে হয়, এই পথের মধ্যস্থলে একটী সুন্দর জলপূর্ণ পয়ঃ-প্রণালী আছে। মুসলমানদিগের অন্যান্য ইমারত যেরূপ লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাজ সেরূপ নহে। শ্বেত প্রস্তরে আবৃত এই সকল শ্বেত মারবলের উপর আবার জহরতের ফুল লতা পাতার কাজ করা হইয়াছে। প্রাচীরের নিম্ন অংশে পদ্ম প্রভৃতি অঙ্কিত আছে; যদিও এই সকল কারুকার্য্য নিকটে দেখিলে খুব উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়;

কিন্তু দূর হইতে তাজমহল কেবল শ্বেতবর্ণ দেখায়; শ্বেতই তাজমহলের প্রকট বর্ণ; তবে স্থলে স্থলে জহরতের কারুকার্য্য, কৃষ্ণ প্রস্তরের রেখা এবং কোরাণের বচন খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাজমহলে প্রবেশ করিলে স্বতঃই মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি, নির্জ্জনতা ও পবিত্রতার ভাব উদিত হয়। বৃহৎ গম্বুজের নিম্নে বাদসাহ ও বেগমের সমাধির চারিপার্শ্বে অতি অপূর্ব্ব ও অত্যাশ্চর্য্য মারবলের ঝাঁঝরি কাটা পর্দ্দা গঠিত হইয়াছে। এই মারবল নির্ম্মিত ছিদ্রযুক্ত পর্দ্দা বহুল ফুল লতা পাতা দ্বারা খচিত! মারবল কাটিয়া এরূপ স্থাপত্য-চাতুর্য্য যে হইতে পারে, তাহা তাজমহল না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই দুইটী শূন্য সমাধির কোনটীর উপরই কোন খোদিত কার্য্য নাই, তবে শাজাহান বাদসাহের সমাধির উপর একটী কলমদান খোদিত আছে। কিন্তু উভয় সমাধির উপরই জহরত দ্বারা নানা ফুল বিন্যস্ত হইয়াছে। তাজমহলের নির্ম্মাণ-কার্য্য ১৬৩০ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয়। ইহা সম্পূর্ণ হইতে ১৭ বৎসর লাগে, এবং ৩১৭৪৮০২৬৲ টাকা ব্যয় হয়। শাজাহানের যে প্রিয়তমা পত্নী এখানে সমাহিত আছেন তাঁহার নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি নবাব আসিফ খাঁর কন্যা। আসিফ খাঁ লোকললামভূতা বেগম নূরজাহাঁর সহোদর ভ্রাতা পাতসাহা জাহাঁগীরের প্রধান মন্ত্রী এবং খাজা আইস ইতমাদুদ্দৌলার পুত্র ছিলেন।

ইতিমাদুদ্দৌলা নামক আর একটী সমাধি নদীর বাম তীরে অবস্থিত। ইতিমাদুদ্দৌলা জাহাঙ্গীর বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী বা উজির ছিলেন। ইহার বৃহৎ তোরণ সমস্তই লোহিত প্রস্তরে গঠিত ও শ্বেত প্রস্তরের কারুকার্য্যে সুশোভিত।

আধুনিক অট্টালিকার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট কলেজ, জেল ও জজ আদালত উল্লেখযোগ্য। আগ্রার ক্যাথলিক মিশন ও অনাথাশ্রম বিশেষ প্রসিদ্ধ; ইহা আকবর বাদসাহের রাজত্বে পর্ত্তুগিজ মিশনারিগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়; বলা বাহুল্য সে সময়ে ভারতে পর্ত্তুগিজ ভিন্ন অন্য কোন ইয়োরোপীয় জাতির সমাগম ছিল না। গোরস্থানে অনেক প্রাচীন কবর দেখিতে পাওয়া যায়।

লোক-সংখ্যা।—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে আগ্রার লোক-সংখ্যা ১৪৯০০৪ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা মোট ১৬০২০৩ ছিল। আগ্রার অট্টালিকা দৃঢ়তা ও বাসের স্বচ্ছন্দতার জন্য খ্যাত। বড়লোকের বাড়ী তিন চারতালা উচ্চ, উপরের তালা সুন্দর সুন্দর বারান্দায় সজ্জিত। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা মোট ১৬৮৬৬২।

ব্যবসা ও বাণিজ্য।—আগ্রা ভূষি মালের একটী প্রধান হাট; পশ্চিম ও দক্ষিণের ব্যবসায়িগণ এইখান হইতে মাল লইয়া যায়। রহিলখন্দ প্রভৃতি স্থানের চিনি প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য সকল আগ্রায় আনীত হইয়া পরে চারিদিকে প্রেরিত হয়। এখানে জুতা ও সলমার কাজও খুব চলে। চিনি, তামাক, ভূষিমাল, লবণ ও তুলা আগ্রায় আমদানি হয়। কারপেট, সলমার ও সাচ্চার কাজ, ও পাথরের নানা প্রকার দ্রব্য আগ্রা হইতে অন্যত্র রপ্তানি হয়। ইষ্ট-

ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন হইতে একটু দূরে পড়ায় আগ্রার ব্যবসা বাণিজ্য পূর্ব্ব হইতে কমিয়াছে। টুণ্ডলা হইতে যমুনার উপরিস্থ সেতু দিয়া আগ্রা পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলপথ গিয়াছে; পূর্ব্ব হইতে রাজপুতানা-রেল পথ ভরতপুর দিয়া এবং দক্ষিণে ঢোলপুর ও গোয়ালিয়র হইতে রেল আসিয়া আগ্রায় সম্মিলিত হইয়াছে। এই সকল রেল পথের সহিত বোম্বাই প্রদেশের রেলপথ সংযোজিত হইলে আগ্রা পুনরায় যে, উত্তর ভারতবর্ষের বাণিজ্য-কেন্দ্র হইবে, তৎপক্ষে সংশয় অতি অল্প। মথুরা হইতে প্রাচীন বাদসাহী রাস্তা এবং ফতেপুর ও ভরতপুর রাস্তা পশ্চিম হইতে আগ্রায় আসিয়াছে, এ ছাড়া যমুনা দিয়া অনেক বাণিজ্য দ্রব্য নানা স্থানে বাহিত হয়।

মিউনিসিপ্যালিটি।—২৫ জন সভ্য লইয়া আগ্রা মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত; ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১৯৬০৯০৲ টাকা আয় ছিল, তন্মধ্যে ১৯১১৪০৲ ব্যয় হয়।

প্রাচীন আগ্রা।

আগ্রা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন।

এই নগর পূর্ব্বে হিন্দু নরপতিগণের রাজধানী ছিল। ভারতবর্ষীয়গণ ইহাকে অগ্র নগর বলিত। "আগ্রা" অগ্র নগরের অপভ্রংশ মাত্র। আগ্রা নামটী হিন্দুদিগের প্রদত্ত। মোগল সম্রাট আকবর এই সহরের নাম রাখিয়াছিলেন "আকবরা-বাদ" কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে লোকে আগ্রাকে আর "আকবরাবাদ" বলিত না, তজ্জন্য সে নাম লুপ্ত হইয়া এই সহর আগ্রা নামেই প্রসিদ্ধ হয়।

কেহ কেহ বলেন এখানে অনেক আগরওয়ালা জাতির বাস ছিল বলিয়া ইহার আগ্রা নাম হইয়াছে। এই বণিক জাতির আদিম নিবাসস্থল দিল্লির পশ্চিম বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত আগরোহা নামক নগরে, রাজপুতানার কোন কোন অংশে এবং মালব দেশের মধ্যস্থিত আগর নামক নগরে ছিল। কালক্রমে ইহাদের অনেকে আসিয়া আগ্রায় বাস করে। তাহাদের নামেই যদি আগ্রার নামকরণ হইয়া থাকে, তবে আগ্রার তদানীন্তন ভূপতিগণ মথুরা রাজ্যের প্রাচীন অধিপতিগণের অনেককাল পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কারণ আগ্রা বহুকাল হইতে মথুরার হিন্দু নরপতিগণের অধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল; তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটিকে অনেকে ভ্রমপূর্ণ বলেন; কারণ আগ্রা হিন্দুদিগের সময়ে যতই কেন সমৃদ্ধিশালী থাকুক না, মথুরা অপেক্ষা ইহা কখনই অধিকতর প্রাচীন বা ধনজনপূর্ণ বলিয়া বর্ণিত হয় নাই।

কেহ কেহ অনুমান করেন এই নগর অগ্রামেশ নামক জনৈক হিন্দু নরপতির রাজধানী ছিল। কুইন্টিস্ কর্টিয়স নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহাসিক স্বপ্রণীত ইতিহাসে অগ্রামেশ্বর নামে এই নরপতিকে অভিহিত করিয়াছেন।

কাহার কাহার মতে "আগার" শব্দ হইতে আগ্রা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে লবণের কূপকে লোকে "আগার" বলে। আগ্রার প্রায় সর্ব্বত্রই এই "আগার"

দৃষ্ট হয় এবং এখানকার মৃত্তিকা অত্যন্ত লবণময়, তজ্জন্য এই অনুমান কতকটা ঠিক বলিলেও বলা যায়। আবার কেহ কেহ বলেন "শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে যে পুষ্পমিত্র-পুত্র * অগ্নিমিত্রের নাম উল্লেখ আছে, সেই মৌর্য্য বংশীয় বৃহদ্রথ রাজার সেনাপতি পুত্র অগ্নিমিত্র আগ্রা নগরে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে আগরাজা বলিত, তজ্জন্য তাঁহার রাজধানীর নাম আগ্রা হইয়াছে।

এই সমস্ত কথার কোনটি সত্য, তাহা বলা কঠিন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে আগ্রা নগরে একটা স্থান খুঁড়িয়া দুই সহস্র রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। সেই সমস্ত মুদ্রার উপর প্রাচীন দেবনাগর অক্ষরে "শ্রী-গুহিলা" এই কয়েকটী অক্ষর অঙ্কিত ছিল। তাহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন কোন সময় মিবারের ঘেলট বংশীয় নরপতিগণ আগ্রা পর্য্যন্ত শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। দুর্গ হইতে তিন মাইল দূরে যমুনার দক্ষিণ তটে একটী অতীব রমণীয় প্রাসাদ ও প্রমোদ-কুঞ্জের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। হিন্দুস্থানীরা বলে যে এই প্রাসাদ ও উদ্যান মগধাধিপতি রাজা ভোজের ছিল। রাজা ভোজ পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। মুসলমানগণ আগ্রা অঞ্চল অধিকার করার বহুকাল পূর্ব্বেও যে, এই উদ্যান ও প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল, তাহা অনেক শিক্ষিত ও প্রাচীন লোক স্বীকার করিয়াছেন। কারলাইল সাহেব বলেন যে, এই ভোজ মগধাধিপতি ভোজ নহেন, ইনি মিবারের ঘেলট বংশীয় শ্রীগোহাদিত্য অথবা গুহিলার বংশধর ভোজ। তিনি আগ্রা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া এই নগরে প্রমোদকুঞ্জ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। "শ্রীগুহিলা" এই নামাঙ্কিত দুই সহস্র রৌপ্য মুদ্রা তাঁহারই অধিকৃত প্রদেশের মৃত্তিকা-নিম্নে প্রোথিত ছিল। এই সমস্ত কথার আলোচনায় আগ্রা যে বহুদিন হিন্দু নরপতিগণের রাজধানী ছিল, ইহা নিসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হয়।

আগ্রা নগরের মধ্যে এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কনিংহ্যামের আর্কিয়লজিক্যাল সর্ভে নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে কারলাইল সাহেব এই সমস্ত প্রাসাদাদির যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি সমাধি-মন্দির ও প্রাসাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

সম্রাট আকবর সাহের সময়ের ইমারত।

আকবরী মসজিদ।

আগ্রার কিনাড়ী বাজারে এই নামের একটী মসজিদ আছে। সম্রাট আকবর ইহা নির্ম্মাণ করান। সংস্কার-অভাবে ইহার বড়ই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। কিছু দিন হইল আগ্রার মুসলমানগণ মিলিত হইয়া ইহার জীর্ণসংস্কার করাইয়াছে।

---

* বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বীয় স্বামীকে নষ্ট করিয়া শুঙ্গ বংশীয়দিগের মধ্যে প্রথম রাজা হইবেন; তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র।
শ্রীমদ্ভাগবত। ১২।১।৮ম শ্লোক।

হাঁস মহাল।

আগ্রা ও মথুরার মধ্যবর্ত্তী স্থানে যমুনা-তটে এই প্রাসাদটী অবস্থিত ছিল। এই স্থানটী অতীব রমণীয়। হাঁস মহলের দৈর্ঘ্য ৩৮০ ফিট এবং বিস্তার ২০০ ফিট। আগ্রা হইতে সেকেন্দ্রার দিকে ৬ ক্রোশ দূরে এই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

যোধবাইয়ের সমাধিমন্দির।

সম্রাট আকবর যোধপুরের রাজা মালদেবের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই হিন্দু বেগমের গর্ভে ভুবনবিদিত সম্রাট জাহাঁগীরের জন্ম হয়। যোধ বাইয়ের সমাধি-মন্দিরটী আগ্রার দক্ষিণে মালপুর এবং ফতেপুরশিকড়ির মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার নিকটেই "চাঁদমারি"—সাহেবদের বন্দুকের নিশান সহী করিবার প্রশস্ত মাঠ।

এই সমাধি-মন্দিরে তস্কর এবং অন্যান্য দুষ্ট লোক সকল লুকাইয়া থাকিত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট বারুদ দ্বারা ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। এক সময় গবর্ণমেণ্ট এই সমাধি-মন্দিরের ইষ্টক ও অন্যান্য মালমসলা দ্বারা একটি বারাক (সেনানিবাস) নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করেন। কিন্তু গাঁথুনি ভাঙ্গিয়া উঠিতে না পারায় সে সংকল্প পরিত্যক্ত হয়।

সম্রাট আরঙ্গজীবের সময়ের প্রাসাদাদি।

চিনিকা রোজা।

এই নামের সমাধি-মন্দিরটী অতীব সুন্দর; ইহার বহির্ভাগ কাচের ন্যায় চক্‌চকে। এখন এই রোজাটির অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। জীর্ণসংস্কার অভাবে ইহার অনেক অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যমুনার উপর যে নৌসেতু আছে, তাহার উত্তর পূর্ব্ব এক মাইল দূরে এই সুন্দর রোজা অবস্থিত। লোকে বলে আরঙ্গজীবের সময় আফজল খাঁ—উজীর খাঁ সিরাজীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই রোজা নির্ম্মাণ করান।

লাল পাথরের ঘোড়া।

সেকেন্দ্রা যাইবার পথে বাম পার্শ্বে "কাচ্চি কি সরাইর" নিকট একটী বৃহৎ লাল পাথরের ঘোড়া আদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কারলাইল সাহেব বলেন সেকেন্দাব লোডী এই পাথরের ঘোড়া নির্ম্মাণ করান। জনশ্রুতি আছে যে, কোন সময়ে একজন পাতসাহা বা সেনাপতি এইখানে আসিয়া ছাউনি করিয়া থাকেন। তাঁহার একটী অত্যন্ত প্রিয় অশ্ব এইখানে হঠাৎ মরিয়া যায়। পাতসাহা সেই প্রিয় অশ্বের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এইখানে ঐ প্রস্তরময় অশ্ব নির্ম্মাণ করান।

হিন্দু সময়ের সীমা পরিজ্ঞাপক প্রস্তর-খণ্ড।

বীরবলের প্রাসাদ।

সেকেন্দ্রার সন্নিহিত বেনপুর নামক পল্লীগ্রামের নিকট একখণ্ড প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর দেবনাগর অক্ষরের সংবৎ ১৬৫১ ও "শ্রীগণেশায় নমঃ" প্রভৃতি আরও দুই চারিটী কথা খোদিত আছে। এটি হিন্দু রাজাগণের সময়ের সীমা পরিজ্ঞাপক প্রস্তর খণ্ড।

তাজমহল হইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দূরে শ্যামনগর নামক স্থানে সম্রাট আকবরের মন্ত্রী রাজা বীরবলের অতি সুন্দর প্রাসাদ ছিল। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে এই শ্যামনগরে অরঙ্গজীবের সহিত তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর দারার তুমুল সংগ্রাম হয়। এখানে এখনও স্থানে স্থানে বীর-বলের প্রাসাদের বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ও অন্যান্য ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

আগ্রা-খাল।—প্রদেশ মধ্যে জলের সচ্ছলতা করিবার জন্য এই খাল খনন করা হয়; ইহাতে নৌকাদিও চলাচল করে। দিল্লি, মথুরা, আগ্রাজেলা ও ভরতপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া এই খাল প্রবাহিত। যমুনার জল, অকলা নামক স্থান হইতে এই খালে নীত হয়। এই খাল অকলা হইতে যমুনা ও খারি নদীর মধ্যবর্ত্তী উচ্চ সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। আগ্রা হইতে ২০ মাইল দূরে খাল উতানগাঁও নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। মথুরা ও আগ্রার সহিত শাখা খালে সংযুক্ত, ইহাতে নৌকা চলাচল করিতে পারে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই খাল সম্পূর্ণ হয়, তৎপর বৎসর শীতকাল হইতে খালে কার্য্য আরম্ভ হয়। এই খাল মোট ৪৫৩ মাইল লম্বা। ইহার খনন-ব্যয় সুদসহ মোট ৮৪০৩১২০৲ টাকা পড়ে, কিন্তু এক্ষণে ইহাতে লাভ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই খাল হইতে ২৭৪০০০৲ টাকা লাভ হয়।

আগ্রা।—বাঙ্গলার অন্তর্গত খুলনা জেলার একটী গ্রাম,—কপিলমণি হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত; এইখানে অনেক ভগ্নস্তূপ আছে; এস্থানটী সম্ভবতঃ সুন্দরবনের প্রাচীন অধিবাসিগণের একটী সহর ছিল।

আগ্রা বারখেরা।—ভূপাল পলিটিক্যাল এজেন্সির মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। রাজা, সিন্ধিয়ার অধীনে ১২খানি গ্রামের উপর আধিপত্য করেন, ও ঠাকুর নামে অভিহিত হয়েন। ইনি বার্ষিক ৫৮৮০৲ টাকা সিন্ধিয়াকে কর প্রদান করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তৎকালীন ঠাকুর ছত্রশাল বিদ্রোহিগণের সহিত যোগদান করেন, ইহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়, কিন্তু বর্ত্তমান ঠাকুর বলবন্ত সিংহকে পুনরায় রাজ্য প্রদান করা হইয়াছে। রাজ্যের আয় ৭০০০৲ টাকা, লোকসংখ্যা ৪৫০০।

আচিপুর।—২৪ পরগনার একটী গ্রাম বজবজ হইতে অল্প দূরে হুগলী নদীর উপরে স্থিত, এখানে একটী টেলিগ্রাফ অফিস আছে। যত জাহাজ আচিপুরের সম্মুখ দিয়া গমনাগমন করে, তাহাদের নাম তারযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয় এবং প্রত্যহ টেলিগ্রাফ গেজেটে ইহা বহুবার প্রকাশিত হয়।

আজমির মেরোয়ারা।—রাজপুতানার মধ্যে ইংরেজ-অধিকৃত একটী প্রদেশ। পরিমাণ-ফল, ২৭১১ বর্গ মাইল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ৪৬০৭২২ ছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট অনুসারে লোকসংখ্যার মোট ৫৪২৩৫৮; তন্মধ্যে পুরুষ ২৮৮৩২৫, স্ত্রীলোক ২৫৪০৩৩। হিন্দু ৪৩৭৯৮৮; শিখ ১৫১; জৈন ২৬৯৩৯; বৌদ্ধ ০; পার্শী ১৯৮; মুসলমান ৭৬২৬৫। আজমির ও মেরোয়ারা এই দুইটী বিভাগ লইয়া এই প্রদেশ। মেরো-

য়ারার বৃত্তান্ত পরে লিখিত হইবে। এই প্রদেশের চারিদিকেই দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তরে কিষণগড় ও যোধপুর, পশ্চিমে যোধপুর, দক্ষিণে উদয়পুর এবং পূর্ব্বে কিষণগড় ও জয়পুর রাজ্য। এই দুইটী বিভাগ পূর্ব্বে দুইটী জেলা ছিল; ১৮৪২খৃষ্টাব্দে দুইটীকে মিলাইয়া একটী করা হইয়াছিল। এক্ষণে দুইটিকে আবার বিভক্ত করিয়া দুইটী জেলা করা হইয়াছে। এই দুইটী জেলার শাসনভার একজন রাজকর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত। ইহাঁকে কমিশনার বলে, ইনি আজমির সহরে বাস করেন। এই দুইটী আবার একটী চিফ কমিশনারের অধীন,—রাজপুতানায় যিনি লাট সাহেবের এজেণ্ট, তিনিই আজমির-মেরোয়ারার চিফ-কমিশনার। ইহার সদর কাছারি আবু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই প্রদেশের মোট-রাজস্ব ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৯৫৮৪৩০ টাকা ছিল।

প্রাকৃতিক ভাব।—রাজপুতানার বৃহৎ জল মূল প্রদেশ লইয়া আজমির-মেরোয়ারা প্রদেশ গঠিত। এই অত্যুচ্চ প্রদেশে যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহা চম্বাল নদী দিয়া বঙ্গোপসাগরে এবং লুনী নদী দিয়া কচ্ছ উপসাগরে পতিত হইতেছে। ভারতের সমতল প্রদেশের মধ্যে আজমির-মেরোয়ারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে প্রত্যন্ত প্রদেশ ক্রমে ঢালু হইয়া গিয়াছে। আরাবল্লী পর্ব্বতই এই জেলার প্রধান দৃশ্য; দিল্লির নিকট যমুনার তীর হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্ব্বত-শ্রেণী ক্রমে অধিকতর উচ্চ হইয়া অবশেষে আজমির সহরের নিকট অতি উচ্চ হইয়াছে। সহরের নিকটে ২৮৫৫ ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর তারাগড় নামক দুর্গ অবস্থিত। নাগ পাহাড় নামক পাহাড়ও তারাগড় অপেক্ষা কম উচ্চ নহে। আজমির হইতে ক্রমে ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়া অবশেষে ১০ মাইল দূরে এই পর্ব্বত-শ্রেণী সমতল ভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মেরোয়ারার প্রধান নগর বেওয়ারের নিকট আরাবল্লী পর্ব্বত-শ্রেণী আবার উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। তৎপরে এই প্রদেশের সমস্তই পর্ব্বত ও উপত্যকায় পূর্ণ। অবশেষে বিন্ধ্য পর্ব্বতের সহিত আবুর নিকট ইহা মিলিত হইয়া গিয়াছে। মেরোয়ারের দিকে পর্ব্বত-শ্রেণী বড়ই উচ্চ। এই পর্ব্বত-শ্রেণীর পূর্ব্ব ভাগস্থ প্রদেশ প্রায় সম্পূর্ণই অনাবৃত; তরঙ্গাকারে তাহা নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়াছে; নাগ পাহাড়ের পশ্চিমে বিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমি।

অতি উচ্চে অবস্থিত বলিয়া আজমীর-মেরোয়ারা প্রদেশে কোন বড় নদী নাই। এই প্রদেশের প্রধান নদী বানাস আরাবল্লী পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া দেওয়ারি নামক সেনা-নিবেশের নিকট এই জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। বর্ষাকালে এই নদী নৌকা বিনা পার হইতে পারা যায় না—ইহার কোথাও কোন খেওয়াও নাই;—সেইজন্য ভেলা বাঁধিয়া দেওয়ানি হইতে লোক জন নদী পার হইয়া এই জেলায় প্রবিষ্ট হয়। বানাস নদী ব্যতীত খাড়ী, দাই, সাবরমতী ও সরস্বতী নামক চারিটী অতিক্ষুদ্র নদী আছে,—বৃষ্টি হইলে এই সকল নদীতে প্রবল স্রোতে জল প্রধাবিত হইতে থাকে।

বৃহৎ পুষ্করিণীগুলিই এস্থানের প্রধান জলাধার। পাহাড়ের স্রোতস্বতী সমূহের খাড়ির মুখে বাঁধ বাঁধিয়া এই সকল পুষ্করিণীর অঙ্গ পুষ্ট হইয়াছে। আজমিরের বিশাল্য পুষ্করিণী,আনা সাগর,রামসর এবং মেরোয়ারায় দিলবারা,কালিনজার, জোয়াজা এবং বালাদ নামক পুষ্করিণী ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রদেশে আরও ৪৩৫টী এইরূপ পুষ্করিণী আছে। এই স্থানের পূর্ব্বশাসনকর্ত্তা কর্ণেল ডিক্‌সন সাহেবের প্রযত্নেই এই সকল স্থাপিত হয়। ইহাদের জলেই চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশের চাষবাস চলে। মার্চ্চ মাসে এই সকল পুষ্করিণীর জল থাকে না,—তখন এই সকল স্থানে বাসন্তিক শস্য উৎপাদিত হয়। এই সকল ব্যতীত চারিটী স্বাভাবিক ক্ষুদ্র হ্রদ বা পুষ্করিণী আছে, প্রসিদ্ধ পুষ্কর তীর্থ তাহাদের অন্যতম।

আরাবল্লী পর্ব্বত খনিজ পদার্থে পূর্ণ,—তবে এক্ষণে তথায় কোনই খনির কাজ হয় না। তারাগড় পাহাড়ে সীসা, তামা, লৌহ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়; পূর্ব্বে খনি হইতে এই সকল ধাতু বাহির করা হইত। এক সময়ে মহারাষ্ট্র-গণ এই স্থানের সীসার খনি বৎসরে ৫০০০৲ টাকায় ইজারা দিতেন। বৃটিশ অধিকার এই প্রদেশে সংস্থাপিত হইলে অত্রত্য প্রথম সুপারিটেণ্ডেণ্ট উইলভার সাহেব নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে খনি হইতে সীসা বাহির করিতেন। আজমিরের সৈনিক বিভাগ এই সীসা ক্রয় বন্ধ করিলে এই খনির কাজও একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কাঠের অভাব ও স্থানান্তরে সীসা লইয়া যাইবার অসুবিধা বলিয়া এই ধাতুর খনিতে কাজ হয় না,—এই সীসা বিলাতি সীসা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট। এক্ষণে রাজপুতানা রেলওয়ে হওয়ায় পুনর্বায় এই খনিব কাজ হইবার সম্ভাবনা।

জেলার সর্ব্বত্রই অট্টালিকা-নির্ম্মাণের মাল মসলা পাওয়া যায়। অন্যত্র কাঠে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, এখানে পাথরেই তাহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে এ প্রদেশ সম্পূর্ণ বৃক্ষশূন্য হইয়াছিল,—তবে এক্ষণে আবার বৃক্ষ-সংস্থাপনের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বড় বড় হিংস্র জন্তু বাস করিতে পারে এমন জঙ্গল এজেলায় নাই,—তবে নাগ পাহাড় হইতে ডাওয়ার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নেকড়ে বাঘ দেখা যায়, কিন্তু ব্যাঘ্র, তরক্ষু প্রভৃতি খুব কম। এ প্রদেশের ঠাকুরগণ সকলেই বন্য শূকর রক্ষা করেন এবং ইহাদিগকে সময় সময় শিকার করেন। রাজপুতগণ শূকর শিকার বড়ই ভালবাসে। হরিণ ও কৃষ্ণসার দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষী প্রভৃতি অতি অল্প।

ইতিহাস।—১৪৫ খৃষ্টাব্দে চৌহান-রাজ অজ আজমির সহর সংস্থাপন ও এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে যে, অজ-রাজা প্রথমে নাগ পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শনি গ্রহ প্রত্যহ রাত্রে তাঁহার দুর্গ ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে তিনি হতাশ হইয়া তারাগড়ে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হয়েন। এই পাহাড়ের উপর তিনি বিটলিগড় নামে এক দুর্গ এবং নিম্নস্থ ইন্দ্রকোট নামক উপত্যকায় নিজের নামে আজমির সহর সংস্থাপন করেন। অবশেষে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া সহর হইতে ১৮ মাইল

দূরস্থিত একটী গিরি-গুহায় বাস করিতে থাকেন। এখন সেই স্থানে কজপান নামক মন্দির তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মুসলমানদিগের আগমনের সহিত আজ-মিরের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়। ৬৮৫ খৃষ্টাব্দে আজমিরের চৌহান রাজ দোলা রায় অন্যান্য হিন্দু-রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া হিন্দুবিজেতা আরবীয় মুসলমান বীর মহম্মদবেন কাসিমের ভারত-আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন, কিন্তু তিনি এই যুদ্ধে মুসলমান কর্তৃক পরাজিত ও হত হয়েন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা মাণিক রায় সম্ভর সংস্থাপন করেন। এই সময় হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র রাজ-পুত রাজ্যের কোনই ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই বৎসর সুলতান মাহ্‌মুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করিতে যাইবার পথে আজমির হইয়া যায়। সে সহর লুণ্ঠন করিয়া মন্দির সকল নষ্ট করে,—তাহাতে সহরবাসীগণ তারাগড়ে যাইয়া আশ্রয় লয়। সুলতান মাহমুদের অন্তঃকরণ তখন সোমনাথ মন্দিরের জন্য ব্যাকুল, সুতরাং তারাগড় অবরোধ করিবার আর তাহার অবসর হইল না; আজমিরের লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত লইয়া সে সত্বর গুর্জ্জরের অভিমুখে ধাবিত হইল। প্রত্যাগমন-সময়ে আজমিরে আসিবার তাহার ইচ্ছা ছিল,—কিন্তু তাহার পথপ্রদর্শকগণ তাহাকে ভুলাইয়া মরুভূমির মধ্যে আনিয়া ফেলে। সেই সুযোগে আজমিরের রাজপুতগণ তাহার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া উত্ত্যক্ত করিয়া তুলে,—সহস্র সহস্র মুসলমান তৃষ্ণায় মরুভূমি মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। তখন হিন্দু পথ-প্রদর্শকগণ বলিল যে, তাহারা সোমনাথ ধ্বংসের প্রতিহিংসা স্বরূপে এই কাজ করিয়াছে—এক্ষণে মরিতে কাতর নহে। বলা বাহুল্য নৃশংস মাহ্‌মুদ তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে বিশালদেব আজমির সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ইনিই বিশালসাগর খনন করিয়াছিলেন। তিনি দুর্দ্দান্ত তুয়ার জাতিকে পরাজিত করিয়া দিল্লি অধিকার করেন এবং মেরোয়ারের পাহাড়িয়া জাতিকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে দিয়া আজমিরের রাজপথে জল সেচন করাইতেন। বিশাল-দেবের পৌত্র আনা আনা-সাগর স্থাপন করেন। এই আনাসাগরের তীরে শাজিহান বাদসা সুন্দর সুন্দর প্রমোদ-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আনার প্রপৌত্র সোমেশ্বর দিল্লি-অধি-পতি অনঙ্গপালের কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রসিদ্ধ পৃথীরাজ ইঁহার পুত্র;—ইনি চৌহান বংশের শেষ হিন্দু রাজা। ইঁহারাই প্রচণ্ড বীরত্বে ভারতে হিন্দু স্বাধীনতা একবারে দিগ-দাহি তেজে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, শেষে ইঁহারই অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অস্তমিত হইয়াছে। ইনি দিল্লির অধিপতি অনঙ্গ পালের পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হয়েন; এই কারণে পৃথীরাজ দিল্লি ও আজমির উভয় রাজ্যেরই অধিপতি হয়েন। এই সময়ে দিল্লি, কান্যকুব্জ ও উজ্জয়িনীর ন্যায় আজমির ও মুসলমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। প্রথমে সেই দিল্লিরাজ্য মুসলমান কর্তৃক পরাভূত হইলে, তৎপরেই কনোজ ও আজমিরের ও সেই অবস্থা হইল। ১১৯০ খৃষ্টাব্দে পৃথীরাজ মহম্মদ ঘোরি কর্তৃক পরাজিত ও হত হইলেন, দিল্লি রাজ্যও মুসলমান অধিকৃত হইল। ইহার পরেই মুসলমান

রাজ আজমির দখল করিয়া নাগরিকদিগকে হত্যা করিল,—যাহারা বাঁচিল তাহারা কঠোর ক্রীত দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। ইহার পর পৃথ্বীরাজের কোন আত্মীয়কে এই রাজ্য প্রদত্ত হইল,—তিনি অনেক টাকা কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। পর বৎসর সাহাবুদ্দিন কনোজের রাঠোর বংশকে পরাভূত করিলে রাঠোরগণ পিতৃপুরুষগণের সেই প্রাচীন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মাড়োয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহার পর আজমিরের হিন্দু রাজা মাড়োয়ারের রাঠোর ও মীরগণের সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। এই সময়ে কুতবুদ্দিন দিল্লির বাদশাহ হয়েন। তিনি সহসা গ্রীষ্মকালেই সসৈন্যে আসিয়া আজমির আক্রমণ করিলেন। রাজা সপরিবারে কারাগারে রুদ্ধ থাকিলেন; অবশেষে আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া জ্বলন্ত চিতায় সপরিবারে আত্মহত্যা করিলেন। এদিকে কুতবুদ্দিন আজমির জয় করিয়া মাড়োয়ার আক্রমণ করিলেন, বহুদিন যুদ্ধের পর তিনি সমস্ত আরাবল্লী পর্ব্বত নিজ করতলস্থ করিতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর সায়েদহুসেন তারাগড় দুর্গের ভার প্রাপ্ত হন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে কুতবুদ্দিনের মৃত্যু হইলে রাঠোর ও চৌহানগণ মিলিত হইয়া রাত্রে তারাগড় আক্রমণ করে ও মুসলমানগণকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। তারাগড়ে সায়েদ হুসেনের কবর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কবর ও তাঁহার সঙ্গীগণের কবর এবং তাঁহার বিখ্যাত অশ্ব, গঞ্জ সাহিদান নামক স্থানে অবস্থিত। মুসলমানগণের নিকট এটী একটী প্রধান তীর্থ স্থান। তিনশত বৎসর পরে আকবর বাদসাহ তত্রত্য পীরের প্রসাদে পুত্র লাভ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত দিল্লি হইতে পদব্রজে এই সুদূর সমাধি-মন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন।

সামসুদ্দিন আলতামাস পুনরায় আজমির প্রদেশ দখল করেন। তৈমুরের আক্রমণ পর্য্যন্ত এ প্রদেশ মুসলমান-হস্তেই ছিল। মোগলগণ দিল্লি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলে সেই অরাজকতার সময় রাণাকুম্ভ আজমির দখল করিয়া লইলেন। কিন্তু এই ঘটনার পরে অতি শীঘ্রই তিনি হত হইলেন এবং ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে মালোয়ার মুসলমান নবাবগণ ইহা অধিকার করেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আজমীর মালোয়ার নবাবের অধিকৃত ছিল; পরে মালোয়া রাজ্য গুজরাট রাজ্যের সহিত মিলিয়া যায়। এই সময়ে মালোয়ার রাজা মালদেব আজমীর অধিকার করেন। মালদেব তারাগড় দুর্গ অভেদ্য করেন ও নিম্ন হইতে দুর্গে জল তুলিবার জন্য একটী কপিকল প্রস্তুত করেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। আজও ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাঠোরগণের হস্তে এ প্রদেশ ছিল, পরে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবরের ক্ষমতা দুর্জ্জয় হইলে ইহা পুনরায় দিল্লি সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। আকবর বাদসাহ সমস্ত রাজপুতানা সহ আজমিরকে একটী সুবাহারূপে নির্দ্দিষ্ট করেন। ইহা আকবর বাদসাহ হইতে মহম্মদসার রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত ১৯৪ বৎসর দিল্লি সাম্রাজ্যের একটী বিভাগ ছিল। রাজপুত-

দিগকে দমনে রাখিবার জন্য এ প্রদেশে দিল্লি সৈন্য বিরাজ করিত, আজমীরে বাবর বাদসাহের একটী প্রমোদ-উদ্যান ছিল। আজমির সহরের ঠিক বাহিরে আকবর একটী প্রাচীর বেষ্টিত গড় সহ রাজ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। জাহাঙ্গির ও শাজিহান উভয়েই মধ্যে মধ্যে আজমিরে আসিয়া বাস করিতেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের ২৩সে ডিসেম্বর ইংলণ্ডা-ধিপতি প্রথম জেমসের দূত সার টমাস রো সাহেব জাহাঙ্গির বাদসাহের সহিত আজমিরে সাক্ষাৎ করেন। জাহাঙ্গিরের রাজত্ব-কালে আজমির কয়েক বৎসর দিল্লি সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়। সপ্তদশ শতাব্দির পরিব্রাজক টমাস করিয়েট সাহেব জেরুজিলাম হইতে আজমিরে পদব্রজে আইসেন। সার টমাস রো আজমির সহর ও এই স্থানের দিল্লি-রাজদরবারের সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আজমিরে আরঙ্গজিব দারার সৈন্য পরাজিত করেন। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী বার্ণার সাহেব এই সময়ে এই স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মোগল সাম্রাজ্য-পতনের প্রথমাংশেই মাড়োয়ারে অজিত সিংহ দিল্লির শাসন কর্ত্তাকে বধ করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। মহম্মদ সা আজমীর দখল করেন বটে কিন্তু ১০ বৎসর পরে অজিত সিংহের পুত্র অভয় সিংহকে প্রদান করেন। অভয় সিংহের পুত্র রাম সিংহ গৃহ-বিবাদের সময় নিজ সাহায্যের জন্য জয়আপা সিন্ধিয়াসহ মহারাষ্ট্র গণকে আহ্বান করেন। বহু-গোলযোগের পর রামসিংহের পিতৃব্যতনয় বিজয় সিংহ মহারাষ্ট্র দিগকে এই রাজ্য প্রদান করেন এবং নিজে তাহাদিগকে কর দিতে স্বীকৃত হইয়া আজমিরের রাজা হইয়াছিলেন। এইসময় হইতে ৩০বৎসর পর্য্যন্ত এপ্রদেশ মহারাষ্ট্রগণের হস্তেই ছিল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মধুজি সিন্ধিয়া জয়পুর আক্রমণ করিলে রাঠোরগণ মহারাষ্ট্রদিগকে দূরীভূত করিতে উদ্যত হইল,—তাহারা আজমিরও দখল করিয়া লইল। কিন্তু ৩ বৎসর পরে মহারাষ্ট্র গণ ও তাহাদের ফরাসী সেনাপতি ডিবইন পাতাম নামক স্থানে রাঠোরদিগকে পরাস্ত করিয়া আজমির পুনরায় অধিকার করিল। পিণ্ডারি যুদ্ধের পর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুন তারিখে সন্ধির দ্বারা এ প্রদেশ ইংরেজ-হস্তগত হয়। তদবধি ইহা ইংরেজ শাসনাধীন আছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মেরোয়ারা এই প্রদেশের সহিত মিলিত হয়। কর্ণেল ডিকসন সাহেব বহুদিন এই প্রদেশ বিশেষ দক্ষতার সহিত শাসন করেন। তিনি অনেক পুষ্করিণী খনন করেন ও কৃষির উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজাবর্গ বৃটিশ শাসনে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়; তজ্জন্যই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এ প্রদেশে কোন গোলযোগ হয় নাই। ২৮শে মে নাশিরাবাদের দুই দল দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহী হয়, কিন্তু ইংরেজগণের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। বিদ্রোহিগণ দিল্লি চলিয়া যায় এবং অধিবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে বিপ্লব হইতে দূরে ছিল। ১৮৬৮।৬৯ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়।

লোকসংখ্যা।—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশের লোকসংখ্যা ৩১৬,০৩২ ছিল। ১৮৮১ খৃঃ

মোট ৪৬০৭২২ লোক ছিল। কৃষিজাতিগণের সংখ্যা ১৩২৭৩২ ছিল। এ প্রদেশে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১৪৯৬৮ জন রাজপুত ছিল,—ইহারা কৃষিকাজ হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করে ও নিতান্ত বাধ্য না হইলে হল চালন করে না। তবে ইহাদের অনেকেই তালুকদার। ইহারা এখনও শৌর্য্যবীর্য্যপূর্ণ তেজস্বী জাতি,—তবে বড়ই আলস্য পরবশ ও অহিফেন-সেবী। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহাবীর ছিলেন ও বহুদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া ইহারা বড়ই অহঙ্কার করে। ইহারা সকলেই সর্ব্বদা সঙ্গে তরবার রাখে। রাজপুতদিগের মধ্যে নানা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে,—তাহার মধ্যে রাঠোরগণই ধনী ও প্রধান ইহারাই জমিদার রাঠোরগণের পর কাচ্ছওয়াগণ, তৎপরেই চৌহানগণ। বেনিয়া জাতির মধ্যে আগড়ওয়ালা অসোয়াল, ও সারাওগীগণ প্রধান; ইহাদের সংখ্যা ৩৯৬৪১। ইহার মধ্যে ওসোয়ালগণ ব্যবসা বাণিজ্যে অধিক সুদক্ষ বলিয়া খ্যাত। ইহাদের স্ত্রীলোকগণও লিখিতে পড়িতে শিক্ষা করে এবং হিসাব করিতে ইহারা বড়ই পারদর্শী। জাট ও গুজারগণ এই প্রদেশের প্রাচীন কৃষকজাতি,—অন্যান্য স্থানের ন্যায় আজমিরে জাটগণও খুব সবল ও কর্ম্মিষ্ঠ,—ভাল ভাল সকল গ্রামগুলি ইহাদের বাস্ ভূমি,—ইহারা কুয়া প্রভৃতি খনন করিয়া বিশেষ পরিশ্রমে চাষের উন্নতি করে। কিন্তু গুজারগণ বড়ই অলস,—ইহারা কৃষিকাজে তৎপর নহে,—বরং মেষ গো চরাইতেই বিশেষ ভাল বাসে। এই সকল ব্যতীত এই প্রদেশে অনেক নীচ জাতি আছে। ইহাদের অবস্থা ভাল নহে, সকলেই প্রায় ঋণ-জালে জড়িত।

এই সকল জাতি ব্যতীত মের নামক অসভ্য একটী জাতি এই প্রদেশ দেখা যায়। ইহারা নাম মাত্র হিন্দু, ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি কিছুই নাই। মেরোয়ারে এক প্রকার এই জাতির ব্রাহ্মণ আছে, ইহাদের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের কোন সম্বন্ধ নাই ইহারা মদ্য মাংস ভোজন করিয়া থাকে। এই প্রদেশ ইংরেজ হস্তে আসিলে এই দুর্দ্দান্তজাতি লইয়া ইংরাজকর্ম্মচারিগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল।—ইংরেজ অধিকারের পুর্ব্বে ইহারা প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় লুট পাঠ করিয়া বা বন্যপশু প্রভৃতি সংহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে লইয়া একটী সেনা দল সংগঠিত করেন,—ক্রমে ইহারা শান্তশিষ্ট জাতি হইলে এই সেনাদল পুলিশে পরিণত করা হয়,—কিন্তু মেরগণ আপত্তি করায় ইহাদিগকে সেনাদলেই রাখা হইয়াছে।

এই প্রদেশে মোট ৭৩৫টী গ্রাম ও ৪টী সহর আছে।—যথা আজমীর, লোক সংখ্যা ৪৮৭৩৫। বেওয়ার (১৫৮২৯) নশিরাবাদ (২১৩২০) ও কেকরি (৬১১৯)। আজমির এই প্রদেশের রাজধানী;—বেওয়ার মেরোয়ারে প্রধান নগর। নশিরাবাদ সেনানিবাস, কেকরিতে ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। এই প্রদেশের মধ্যে সুবিখ্যাত হিন্দু-তীর্থ পুষ্কর অবস্থিত। মাড়োয়ারি ও হিন্দুস্থানি এই প্রদেশের প্রধান ভাষা।

কৃষি।—রাজ-পুতানার অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় আজমির প্রদেশেও জলের অভাবে কৃষি কাজ বড়ই দুষ্কর এই জন্য জল সংস্থানের জন্য বহুসংখ্যক পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতে হই-

য়াছে। এই প্রদেশের প্রধান ফসল যব, গম, ছোলা ও বজরা। আক ও আফিমের চাষও অল্প পরিমাণে হয়। অধীবাসির অবস্থা ভাল নহে,— সকলেই গীভর ঋণ-জালে জড়িত হইয়াছে।

কোন ও কোন পুষ্করিণীতে মৎস্য আছে, কিন্তু এ প্রদেশের লোক মৎস্য আহার করে না, মৎস্য-হত্যা ইহাদের মতে মহাপাপ বলিয়া গণ্য।

দৈব দুর্ঘটনা।—জলের অভাবে এপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ১৮১৯,১৮২৪,১৮৩৩, ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে বিশেষ অন্নকষ্ট হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইলেও আজমির প্রদেশে কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু ১৮৬৮—৬৯ খৃষ্টাব্দে এপ্রদেশে অতি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এদুর্ভিক্ষে সমস্ত রাজপুতনা প্রায় জনশূন্য হইয়া যায়। ১০৫০০০ লোক ইহাতে অনাহারে কালকবলে পতিত হইয়াছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য।—বোম্বাই ও উত্তর ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের আজমির সহর একটী মধ্যবর্ত্তী স্থান ছিল;—এইজন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বহুপূর্ব্বে এইস্থানে একটী কুঠি স্থাপন করেন। মধ্যে আজমিরে ব্যবসা বাণিজ্য বড়ই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল,—এক্ষণে আবার ইহার ক্রমোন্নতি দেখা যাইতেছে। বেওয়ার ও নশিরাবাদ সহর দুইটী ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছে। চিনিও বিলাতি কাপড়ই প্রধান আমদানি দ্রব্য,—তুলা, ভুষামাল, পোস্ত প্রভৃতি মাড়োয়ারে পালিসহরে রপ্তানি হয়। লবণ ব্যতীত আর কোন দ্রব্যই এপ্রদেশে প্রস্তত হয়না। পূর্ব্বে উষ্ট্র ও বলদ মালামাল বহন করিত,—এক্ষণে রেল হওয়াতে রেলেই মালামাল চালিত হইতেছে। পূর্ব্বে এপ্রদেশে মোটেই রাস্তা ছিলনা। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় গভর্ণমেণ্ট অনেক রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে এপ্রদেশে ২২৬ মাইল পাকারাস্তা ও ৬৩৬৫ মাইল কাঁচারাস্তা আছে। রাজপুতানা রেল আজমির, নসিরাবাদ ও আমোদাবাদ দিয়া আসিয়াছে। রাজপুতানা মালোয়া রেল নসিরাবাদ ও আজমিরকে সম্মিলিত করিয়াছে। এই সকল রেল হওয়ায় আজমিরে অধিকাংশ দ্রব্যই খুব সস্তা হইয়াছে।

শাসন-প্রণালী।—আজমির মেরোয়ারা কমিশনারের অধীনস্থ একটী বিভাগ, ইহার রাজধানী আজমির সহর। কমিশনার শাসন বিচার প্রভৃতি সকলপ্রকার রাজকার্য্যই সম্পাদন করেন। আজমির বিভাগের ভার একজন আসিষ্টাণ্ট কমিশনারের উপর ও মেরোয়ারা বিভাগ আর একজন আসিষ্টাণ্ট কমিশনারের উপর ন্যস্ত আছে।—একজনের সদর কাছারি আজমির সহর, অপরের বেওয়ার সহর। উভয় প্রদেশ একজন চিফ কমিশনারের অধীন, —ইনি রাজপুতানার লাটসাহেবের এজেণ্ট ও এই দুই প্রদেশের ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকর্দ্দমার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জজ। কমিশনারের অধীনে ৪৩ জন কর্ম্মচারী আছেন। ১৮৮১ খৃঃ এই প্রদেশের মোট রাজস্ব ১২১০৬২০ টাকা ছিল ও ৭০৩৯৮০ টাকা ব্যয় হয়। ঐ বৎসর এই প্রদেশে মোট ৫৮২ জন পুলিশ কর্ম্মচারী ছিলেন। এই প্রদেশে লেখা পড়ার চর্চার অবস্থা এখনও বড়ই হীন,—১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মোট ১০৯ স্কুল ছিল। এই সকল স্কুলে

কেবল মাত্র ৫,৪১৭ জন বালক বিদ্যা শিক্ষা করিত। খ্রীষ্টান মিসনরীগণ ৬০টী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আজমীর কলেজে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হয়। ভূত-পূর্ব্ব লাট লর্ড মেও রাজপুতনা পরিদর্শনে আসিয়া রাজপুত রাজাগণের পুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য এই স্থানে মেও কলেজ সংস্থাপন করিয়া যান। সমস্ত রাজপুতগণ এই কলেজ সংস্থাপনের জন্য, অর্থ-সাহায্য করেন, প্রায় ৭ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় হয়। এই টাকার সুদে ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এই কলেজ চলিতেছে,—এখানে কেবল রাজাদিগের পুত্রগণ পাঠাদি করেন। এই প্রদেশে, আজমির, মেওয়ার ও থেক্‌রি এই তিনটী মাত্র মিউনিসিপালিটী আছে।

আবহাওয়া।—এ প্রদেশের আবহাওয়া ভাল। ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারী এই তিনমাস বেশ শীত পড়ে,—গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম হয়,—এখানে বিশেষ কোন রোগ নাই, তবে মধ্যে মধ্যে বিসূচিকা রোগ দেখা দেয়।

আজমির সহর।—আজমির মেড়োয়ারার রাজধানী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার লোক সংখ্যা ৪৮,৭০৫। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে মোট ৬৮,৮৪৩। পুরুষ—৩৭,৯৮৫, স্ত্রীলোক ৩০,৮৫৮।

হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টীয়ান	জৈন	শিখ	অন্যান্য জাতি
৩৭,৮২৬	২৬,৪৩৩	১৪৯৭	২৭৭০	১৫৯	১২৮

ইহা তারাগড় পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত,—উত্তর দিকে আনাসাগর হ্রদ। একটী প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরে সহর বেষ্টিত,—এই প্রাচীরে নগর-প্রবেশ জন্য পাঁচটী দ্বার আছে। সহরটীর রাস্তা প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন,—কয়েকটী সুন্দর অট্টালিকাও আছে। আজমির সহরের ইতিহাস পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই সহরের দর্শনীয় স্থান (১) দর্গা, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই পূজ্য। এটী খোজা সাহেবের সমাধি স্থান,—ইনি সাহাবুদ্দিনের পরেই এই স্থানে আইসেন ও একজন বিখ্যাত ফকির ছিলেন। ইনি অনেক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করেন ও অনেক অধিবাসীকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহার বংশধর এখনও এই সমাধি স্থানের প্রধান মোল্লা। সহরের দক্ষিণ দিকে এই দরগা অবস্থিত; ইহাতে অনেকগুলি অট্টালিকা আছে, তাহার মধ্যে আকবর নির্ম্মিত একটী মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। সাজেহান বাদসাহ নির্ম্মিত মসজিদটী এখনও বেশ আছে। প্রতি বৎসর দরগার উরসমেলা বলিয়া একটী মেলা হয়। এই মেলায় দরগার তীর্থ যাত্রীগণ পোলাও ভোগ প্রদান করে,—এই পোলাও রাঁধিবার জন্য দুইটী অতি বৃহৎ ডেক্‌চি আছে,—বড়টীতে পোলাও রাঁধিতে হইলে হাজার টাকা ও ছোটটীতে প্রায় ৫০০৲ টাকা লাগে। এতদ্ব্যতীত প্রায় ২০০৲ টাকা দরগার কর্ম্মচারিগণকে পারিশ্রমিক হিসাবে দিতে হয়। এই পলান্ন রন্ধন হইলে পরে বিক্রয় হয় ও প্রায় সকল জাতিই অতি আদরের সহিত এই পলান্ন ভোজন করে। ২০।২৫ হাজার লোক এই মেলায় আগমন করে।

(২) তারাগড় পর্ব্বতের নিম্নে আড়াই দিন্‌কা ঝোপ্রা নামক আর একটী মসজিদ আছে। পূর্ব্বে এটী জৈন মন্দির ছিল। কথিত আছে যে কুতবুদ্দিন বা আলতামাস আড়াই দিনে এটীকে মুসলমান মস্‌জিদে পরিণত করেন। এই মস্‌জিদে অতি সুন্দর প্রাচীন কারুকার্য্য আছে, ইহা ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট ইহার পুনঃসংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

(৩) দৌলতবাগ।—জাহাঙ্গীর বাদসাহ আনা সাগর তীরে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন,—এক্ষণে চিফ কমিসনার সাহেব এই বাটীতে বাস করিয়া থাকেন। মারবল-নির্ম্মিত বিশ্রামাগার হ্রদের তীরে নির্ম্মিত আছে,—উদ্যানটী অতি বৃহৎ ও সুন্দর।

(৪) নগরের বাহিরে আকবর বাদসাহের প্রাসাদ। পূর্ব্বে এ বাটীতে অস্ত্রাগার ছিল, এক্ষণে ট্রেজারি ও আদালত হইয়াছে। আনাসাগর হইতে দুইটী নল দ্বারা আজমীর সহরে জল লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঝান্‌রা ও দাঘি নামক দুইটী অকৃত্রিম উৎস আছে, ইহার জল অনেকে পান করেন। আজমিরের কূপ জল পানের উপযুক্ত নহে। সহরে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আফিস, আদালত প্রভৃতি সকলই আছে।"

আজমগড়।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বেনারস বিভাগের একটী জেলা। পরিমান ফল ২১৪৭ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১৬০৬৫৪। ইহার উত্তরে ফয়জাবাদ ও গোরকপুর জেলা, পূর্ব্বে—বালিয়া জেলা, দক্ষিণে গাজিপুর জেলা ও পশ্চিমে জোনপুর ও সুলতান পুর জেলা। আজমগড় সহর এই জেলার প্রধান নগর।

ইতিহাস।—কথিত আছে যে এক সময়ে ভাড় প্রভৃতি জাতি এই জেলার আদিম নিবাসী ছিল। তিনবার এই প্রদেশ বিজীত হয়,—প্রথম রাজপুতগণ আসিয়া ভাড়দিগের হস্ত হইতে এ প্রদেশ কাড়িয়া লয়। তৎপরে ভুঁইহার নামক একজাতি আসিয়া এ দেশ জয় করে। ভুঁইহারগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়,—কিন্তু লোকে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-মিশ্রিত জাতি বলে। এখনও এ প্রদেশে বহুসংখ্যক ভুঁইহার বাস করে। তৎপরে মুসলমানগণ অন্যান্য প্রদেশের সহিত আজমগড় অধিকার করে। ১৪শ শতাব্দির শেষে জোনপুর স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে জোনপুরের সরথি, রাজাগণ আজমগড় দখল করিলেন। পুনরায় এ প্রদেশ মুসলমানগণ অধিকার করেন ও সিকান্দার লোদি সিকান্দারাবাদ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বহু বৎসর পর্য্যন্ত এ প্রদেশ দিল্লির বাদসাহের অধীন ছিল। ১৭শ শতাব্দিতে গৌতম রাজপুতগণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া সমস্ত আজমগড় প্রদেশ দখল করেন। অভিমানচন্দ্র সেন নামক এক ব্যক্তি দিল্লির বাদসাহ আকবরের অধীনে চাকরী করিয়া আজমগড় জেলায় দৌলতাবাদ জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি পরে মুসলমান হয়েন। ইনি ও ইহার বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত আজমগড় প্রদেশ দখল করিয়া বইসেন। জোনপুরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা খানখানান ইহাদের নিকট হইতে বাৎসরিক ৬০০ টাকা কর লইতেন। ১৮শ শতাব্দির প্রারম্ভে আজমগড়ের

রাজা মহাবৎ খাঁ কর দিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইল। তিনি তিলাশ্রী নামক স্থানে মুসলমান সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। তৎপরে তিনি জোনপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, অযোধ্যার সুবাদার সাদাৎ খাঁর সৈন্যের দ্বারা মহাবত খাঁ বিপন্ন হইয়া গোরকপুরে পলায়ন করিলেন ও শীঘ্রই বন্দী হইলেন,—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বংশ লুপ্ত হইল। ইহার পর ইহার বংশীয় তিন জন নামে মাত্র রাজা হয়েন, তাঁহাদের সময়ে তাহাদের হস্ত হইতে সমস্ত প্রদেশ বিচ্যুত হয়। অবশেষে ইহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজিমগড় অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত হইল ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপই ছিল। কোন সময়ে অভিমান চন্দ্র সেনের বংশসম্ভূত নাদির খাঁ বিদ্রাহিতাচরণ করেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজকে এই প্রদেশ প্রদান করা হয়। নাদীর খাঁ এই প্রদেশ পাইবার জন্য ইংরেজদিগের নিকটে প্রার্থনা করেন,—তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না বটে, কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারীগণকে রাজা উপাধি ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। এখনও এই বংশীয়গণ এই পেনসন ভোগ করিতেছেন। ১৮০১ হইতে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত এ প্রদেশে উল্লেখ যোগ্য কোনই ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন আজমগড়ের বিদ্রোহীগণ ইংরেজগণকে হত্যা করে ও তোষাখানা লুট করিয়া ফরজাবাদে চলিয়া যায়। ইংরেজগণ অনেকে গাজিপুরে পালায়ন করেন। পরে গাজিপুর হইতে সৈন্য আসিয়া আজমগড় দখল করে। অন্যান্য ইংরেজগণও আজমগড়ে আইসেন—কিন্তু দানাপুরে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইলে তাঁহারা আবার সকলে গাজিপুরে আইসেন। ৯ই হইতে ২৫শে আগষ্ট পালোয়ারগণ আজমগড় অধিকার করে; ২৬শে গুর্খাগণ আসিয়া তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেয়। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংরেজগণ আবার আজমগড়ে আইসেন। ২০শে পালোয়ারগণ পরাজিত হয় ও আজমগড় ইংরেজ শাসনে আইসে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জঙ্গ বাহাদুর বিদ্রোহীগণকে তাড়াইয়া গোরকপুর হইতে ফয়জাবাদের দিকে লইয়া যান,—তাহারা তখন আবার আজমগড় জেলায় প্রবিষ্ট হয়। বিদ্রোহী কুমার সিংহ লক্ষ্ণৌ হইতে পলায়ন সময়ে আজমগড়ে প্রবিষ্ঠ হয়েন। তাঁহাকে ইংরেজ সৈন্য আট্রোলীয়া নামক স্থানে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হয়। এপ্রেল মাসে কুমার সিংহ আজমগড় সহর আক্রমণ করেন,—কিন্তু পরাজিত হইয়া পশ্চাৎ পদ হন। পলায়ন সময়ে গঙ্গা পার হইতে না পারিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। অক্টবর মাস পর্য্যন্ত এই জেলায় বিদ্রোহীগণ উপদ্রব করিতেছিল,—কিন্তু পরে কর্ণেল কেলি সসৈন্যে গিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দেন।

ভগ্নস্তূপ।—এই জেলায় অসংখ্য দুর্গ ও ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই সকল দুর্গাদি এক সময়ে ভাড় জাতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকলের মধ্যে ঘোসী নামক দুর্গই প্রধান। কথিত আছে যে রাজা ঘোষ ভৌতিক বলে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কৃষি।—এই জেলায় চাসের জমি সমস্তই নদীর চর,—মাটী বড়ই বেলে,—দুই দশ হাত নিম্নেই জল পাওয়া যায়। কূপ খনন করিয়া ইষ্টক দিয়া তাহার পাড় না বাঁধিলে কোন মতেই কূপ থাকে না, মাটী ঝড়িয়া পড়িয়া কূপ নষ্ট হইয়া যায়। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এ জেলায় ও দুইটী ফসল জন্মে, হৈমন্তিক ফসল চাউল, অড়হর প্রভৃতি হয়, বর্ষাকালে যব, গম, ছোলা, মটর ও অন্যান্য নানা প্রকার ফসল জন্মিয়া থাকে। এখানে জলের জন্য কোন খালাদি খনন করা হয় নাই। জমি সম্বন্ধে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য জেলার যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, এখানেও তাহাই আছে।—প্রথম জমিদারি,—পরে পত্তিদারি, তৎপরে অপূর্ণ-পত্তিদারি, এবং ভায়াচারা। ব্যবসাদারের মধ্যে বেনিয়া ও ক্ষত্রিয় মহাজনগণই প্রধান। সমস্ত ব্যবসাই এই সকল ব্যক্তির হস্তগত।

দুর্দ্দৈব।—একশত বৎসরের মধ্যে এ জেলায় কোন দুর্ভিক্ষ হয় নাই। ১৭৮২।৮৩ খৃষ্টাব্দে একবার এ জেলায় দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শীলাবৃষ্টি হইয়া সমস্ত ফসল নষ্ট হয়,—১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কুয়াশায় সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৩৭।৩৮ খৃষ্টাব্দে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ১৮৫৯।৬০, ১৮৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭৭।৭৮ খৃষ্টাব্দেও অনাবৃষ্টি হইয়াছিল।

ব্যবসা বানিজ্য।—আজমগড় হইতে পণ্য দ্রব্য নানা স্থানে লইয়া যাইবার জন্য জল পথ ও স্থলপথ দুইই আছে। জল পথের মধ্যে গগ্‌রা নদীই প্রধান,—গাজিপুর, জোনপুর, গোরকপুর ও কাশী প্রভৃতি সকল স্থানে যাইবার জন্য চারি দিকে পাকা রাস্তা আছে। এই সকল পাকা রাস্তা ব্যতীতও অসংখ্য কাঁচা রাস্তা আছে। চিনি, গুড়, নীল, আফিম, মোটা কাপড়, ও জালানী কাঠ এই জেলার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। রেসম, তামাক, লবণ, লোহার জিনিস, চামড়ার জিনিস, বিলাতি কাপড় প্রভৃতি দ্রব্য আমদানি হয়। পূর্ব্বে আজমগড়ে রিফাইন চিনি বিস্তর প্রস্তুত হইত,—কিন্তু এক্ষণে চিনির কারখানা উঠিয়া গিয়াছে। এই জেলায় নামে ৪ শত নীলকুঠী আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নীলের চাস দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে। এই জেলায় চারিটী বড় বড় মেলা হয়।

শাসন-প্রণালী।—অন্যান্য জেলার ন্যায় এ জেলার শাসন-প্রণালীও ঠিক এক প্রকার। একজন জজ; একজন ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর, এবং তাঁহাদের অধীনে অনেক বিচারক ও ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। পুলিশের উপর একজন পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্টও আছেন। এই জেলার মোট রাজস্য ১৮,৯২,৩৬০৲ টাকা,—মোট ব্যয় ২২,২৩৩ টাকা। এখানে ৪৫৬ জন পুলিশ কর্ম্মচারী আছে। জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৯টী স্কুল আছে।

আটক।—পাঞ্জাবের রাওয়েলপিণ্ডি জেলার মধ্যস্থিত একটী সহর ও দুর্গ। লোক সংখ্যা ১৮৯১ খৃঃ অব্দের গণনানুসারে মোট ৩০৭৩। পুরুষ ১৮১৪ স্ত্রী ১২৫৯ হিন্দু ৭৫১ মুসলমান ২০৫০ খৃষ্টীয়ান ১৩৫ শিখ ১৩৭। যেখানে কাবুল নদী সিন্ধু নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে—ঠিক সেই সঙ্গম স্থলের উপর অতি উচ্চ স্থানে এই দুর্গ অবস্থিত। ইহার নিম্নে দুইটী অতিবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড থাকায় একটী ভয়াবহ ঘুর্ণি গঠিত হইয়াছে। এই দুইটী বৃহৎ

প্রস্তর খণ্ডকে কামানিয়া ও জানানিয়া বলে। আকবরের সময় এই নামের দুই জন ধর্ম্মদ্রোহীকে এই দুর্গ হইতে নদী গর্ভে নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হইতেই ইহাদের এই নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে দুর্গের মধ্যেই সহর ছিল, কিন্তু এখন সহর দুর্গের নিম্নে গঠিত হইয়াছে। আকবর বাদসাহ এইখানে একটী খেওয়া সংস্থাপিত করেন ও ১৫৮৩খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রণজিত সিংহ এই দুর্গ অধিকার করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা শিক হস্তেই রহে, পরে ইংরাজের অধিকৃত হয়। এক্ষণে এখানে বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য সর্ব্বদা বাস করে। এক্ষণে সিন্দু নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়া তাহার উপর দিয়া রেল উত্তর পশ্চিম প্রান্তে গিয়াছে, এই সেতুর নিম্ন দিয়া গাড়ী ও লোক চলাচলের পথ আছে, সহরে আদালত, ডাক্তার খানা, ডাকবাঙ্গালা, সরাই প্রভৃতি সকলই আছে।

আতুর।—মাদ্রাস প্রদেশের সালেম জেলার একটী তালুক ও সহর। পরিমান ফল ৭৬৭ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ১৮৯১ খৃঃ অব্দে মোট ৯২৯৫। পুরুষ ৪৪৫৭। স্ত্রী ৪৮৩৮। হিন্দু ৮১৯১। মুসলমান ৯০৪, খৃষ্টীয়ান ২০০, ইহার চারি দিকেই পর্ব্বত শ্রেনী, এই সকল পাহাড়ে যথেষ্ট পরিমাণে চুম্বক পাথর পাওয়া যায়। পেটার পর্ব্বতস্থিত কারি রমনের মন্দির একটী সুবিখ্যাত তীর্থস্থান। চাউলই প্রধান ফসল, এতদ্ব্যতীত যব প্রভৃতিও জন্মে। তুলাও যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ভানানদীর নিকট যথেষ্ট চন্দন বৃক্ষ আছে। লোক্যাল ফণ্ডের টাকা হইতে ৭টী বালকও ৬টী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিসনারীরা দুইটী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছেন। এই তালুকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ৫টী মেলা হয়।

আতারি—পঞ্জাবের মুলতান জেলার একটী গ্রাম ও ভগ্নস্তপ এক্ষণে এটী একটী সামান্য গ্রাম মাত্র, কিন্তু এখনও একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ এই থানে বিদ্যমান আছে। জেনারেল কনিংহাম বলেন যে আলেকজন্দার ভারত, বিজয়ে আসিয়া যে তৃতীয় নগর অধিকার করেন,—এটী সেই ব্রাহ্মনদিগের নগরের ভগ্নাবশেষ। মধ্যস্থলে ভগ্ন দুর্গ,—এই দুর্গের দুই পার্শে বিস্তৃত ভগ্নস্তপ। এই সকল ভগ্নস্তপে যে রূপ বড় বড় ইষ্টক বাহির হয়, তাহাতে এটীকে একটী অতি প্রাচীন সহর বলিয়া নিশ্চয়ই প্রতীতি হয়। এই সকল ভগ্ন স্তপের কোনই ইতিহাস জানিতে পারা যায় না, এই প্রাচীন সহরের নাম যে কি ছিল তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই।

আতগড়।—উড়িষ্যার একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণ ফল ১৬৮ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৩১০৭৯। ইহার উত্তরে ধেনকানল রাজ্য, পূর্ব্বে কটকজেলা, দক্ষিণে মহানদী ও পশ্চিমে ত্রিগেরিয়া ও ধেনকানল রাজ্য। এ প্রদেশ বড়ই নিম্ন ও প্রায়ই জলপ্লাবনে ডুবিয়া যায়। চাউল ও ইক্ষু এখানে জন্মিয়া থাকে,—পূর্ব্বে আতগড় উড়িষ্যাধিপতির ছিল,—তিনি তাহার মন্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া সম্বন্ধীকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়া এই রাজ্য প্রদান করেন। বর্ত্তমান রাজা জাতিতে কায়স্থ। এই রাজ্যের আর

১৬২০০৲ টাকা। ব্রাটিশ গভর্ণমেণ্টকে ২০০০৲ কর দিতে হয়। রাজা একটী স্কুল সংস্থাপিত করিয়াছেন। আতগড়ে একটী খৃষ্টান কৃষকদিগের বাসভূমি আছে। কটক হইতে সম্বলপুরে যে রাস্তা গিয়াছে,—তাহাই আতগড়ের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

আতরেঞ্জি খেরা।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এটা জেলার মধ্যস্থিত অতি প্রাচীন সহরের ভগ্ন স্তূপ। এটা সহর হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান অসংখ্য প্রস্তর মূর্ত্তি, অট্টালিকা প্রভৃতিতে পূর্ণ। এই স্থান হইতে প্রাচীন মুদ্রাও সময় সময় যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই ভগ্ন স্তূপের উপর একটী শিব মন্দির আছে। জেনারেল কনিংহাম বলেন যে হিয়াং থেসাং পিলোচানা নামে যে নগর দেখিয়াছিলেন তাহারই ভগ্নাবশেষ এই। জনপ্রবাদ যে ইহা বেন রাজার রাজধানী ছিল,—১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরি ইহাকে পরাস্থ করেন এবং তাঁহার দুর্গ ও রাজধানী তোপে উড়াইয়া দেন। এই আখ্যায়িকায় অনেক অসংলগ্ন কথা দৃষ্ট হয় বিশেষতঃ দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে বারুদ আদৌ আবিস্কৃত হয় নাই; তখন মহম্মদ ঘোরীর বারুদ দ্বারা বেন রাজার রাজধানী ও দুর্গ নষ্ট করা কি প্রকারে সম্ভব হয়? এই সমস্ত কারণে পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা অলীক বলিয়া বোধ হয়।

আথিরালা।—মাদ্রাসের কডাপা জেলায় চিবার নদী তীরস্থিত একটী তীর্থস্থান। এই খানে যে পুষ্করিণী আছে তাহাতে স্নান করিলে বিশেষ পুণ্য হয় বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস। শিবরাত্রিতে এখানে বহু সহস্র লোকের সমাগম হয়।

আদম সেতু (আডামস ব্রিজ)—ভারতের দক্ষিন উপকূলস্থ রামেশ্বরম দ্বীপ হইতে, সিংহলের উপকূলস্থ মান্নার দ্বীপ পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিন পূর্ব্বে বিস্তৃত বালুকা ও প্রস্তরের বাঁধ। জোয়ারের সময় এই বাঁদের কোন কোন স্থানের উপর ৩।৪ ফিট জল হয়। রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে রাম ও বানরগণ এই বাঁধ বাধিয়া লঙ্কায় প্রবিষ্ট হয়েন।

আদাবদ।—বম্বে প্রদেশের খান্দেশ জেলার মধ্যবর্ত্তী চোপদা মহকুমার একটী সহর,—পূর্ব্বে এই সহরে একটী মহকুমা ছিল। লোক সংখ্যা ১৮৯১ খৃঃ অব্দের সেনসস্ অনুসারে মোট ৫৯৪১। পুরুষ—৩০৭০, স্ত্রী-২৮৭১।

হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টিয়ান
৪৮১৭	১১২৩	১

পূর্ব্বে মহাকুমার যে সকল অট্টালিকায় আদালত ছিল,—তথায় এক্ষণে একটী স্কুল হইয়াছে। এই স্কুরে লালবাগ নামক একটী ভগ্নাবশেষ উদ্যানের মধ্যে একটী সুন্দর ইদেরা আছে। সহরের উত্তরে ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত একটী মসজিদ আছে। উত্তর পশ্চিমে তিন মাইল দুরে বিখ্যাত উনাব দেব উষ্ণ-উৎস অবস্থিত।

আদাঙ্কি।—মান্দ্রাজের নেলোর জেলার মধ্যস্থিত অঙ্গোল তালুকের একটী সহর। লোক সংখ্যা ১৮৮১ খৃঃঅব্দ ৬৪৮১।১৮৯১ সালের সেনসাসস রিপোর্ট অনুসারে লোক সংখ্যা মোট ৭৪৮০।

গুন্দলা কামা নদী তীরে হাইদ্রাবাদ হইতে নেলোর যাইবার পথে অবস্থিত। এই প্রদেশে যথেষ্ট পরিমানে কলাই জন্মে ও গোপাগন হয় বলিয়া এই সহরে ছোলার কারবার চলে। সিঙ্গারিকোন্ডা মন্দির ও হরিপালাকুড় দুর্গের ভগ্নাবশেষ সহরের নিকটে স্থিত; এই সহরে একজন ডেপুটি তশীলদার আছেন, ডাক ঘর ও ডাক বাঙ্গালা ও আছে।

আদিগাওন।—মধ্য প্রদেশের সিওনি জেলার একটী জমিদারী, পূর্ব্বে হারাই রাজের অধীনে ছিল, জমিদারীতে ৯০ টি গ্রাম ছিল। নাগপুর রাজের জনৈক সিউনি শাসনকর্ত্তার বংশধর ভর্ত্তি গোঁসাইগণ এই প্রদেশের কর্ত্তা ছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শেষ গোঁসাই কাল কবলে পতিত হন তাঁহার বংশে কেহ না থাকায় এক্ষণে ইহা গভর্ণমেণ্টের লইয়াছে, এই প্রদেশ প্রায় পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ, এই সকল পাহাড়ে ও জঙ্গলে গন্ধ জাতি রাস করে। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে চাষ মন্দ হয় না।

আদিগাওন।—আদিগাওন জমিদারীর প্রধান গ্রাম, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এখানকার লোক সংখ্যা ১২০৯ ছিল। পূর্ব্ব জমিদারের নির্ম্মিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ গ্রামের বাহিরে একটি পাহাড়ের উপর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

আনাকাপালি।—মান্দ্রাজের বিজয়নগর জেলা মধ্যস্থিত আনাকাপালি তালুকের একটী সহর সারদানদীর তীরে অবস্থিত; এই নগর সম্প্রতি উন্নতি লাভ করিয়াছে, ১৮৯১ খৃঃ অব্দের লোক সংখ্যা মোট ১৭০১০। পুরুষ ৮৪৮৯, স্ত্রী ৮৫২১ হিন্দু ১৬৭৩৭ মুসলমান ২৫৬ খৃষ্টিয়ান ১৭।১৮৯১ খৃঃ অব্দের লোক সংখ্যা ১৩৩৪১। চারিদিকস্থ প্রদেশ বিজয়াগ্রামের মহারাজার জমিদারি। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয় ও উহা শীঘ্রই দমন করা হয়। তালুকের সদর কাচারি বলিয়া এখানে আদালত জেল প্রভৃতি সকলই আছে।

আনামাঙ্গাই।—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ও কইম্বটুর জেলা মধ্যস্থিত একটী বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণী। পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশের সর্ব্বত্র জঙ্গলে পূর্ণ,—এই জঙ্গলপূর্ণ স্থান সকলই ম্যালেরিয়া ময়। কিন্তু পর্ব্বতের উপরিভাগ বড়ই সুন্দর,—এখানে বহু সুন্দর সুন্দর নদী আছে। ইহার উপরে যে কাট ও পাথর জন্মে তাহা বড় উৎকৃষ্ট। উপরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা ও স্বাস্থ্যকর। অন্যান্য পর্ব্বত নিবাস অপেক্ষা এ স্থান কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। এ স্থানে ইংরেজগণের একটী সুন্দর নিবাস ভূমি হইতে পারে। এই পর্ব্বত শ্রেণী দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—এক উচ্চ শ্রেণী। অপর নিম্ন শ্রেণী,—উচ্চ শ্রেণীর পর্ব্বতগুলি ৬ হইতে ৮ হাজার ফিট উচ্চ,—নিম্ন শ্রেণীর পর্ব্বত গুলি ২০০০ ফিট উচ্চ। এই পর্ব্বতের পশ্চিম প্রান্তে গভর্ণমেণ্টের জঙ্গল,—এই জঙ্গল হইতে সেগুন কাষ্ঠ বহুতর বম্বে সহরে জাহাজ

নির্ম্মাণের জন্য প্রেরিত হয়। জঙ্গল হইতে গাছ হাতিতে টানিয়া আনে। পরে গাড়ীতে পটাঙ্গুর ষ্টেষণে আনা হয়,—তথা হইতে রেলে ইহা নানাস্থানে রপ্তানি হয়। এই পাহাড়ের প্রধান নদী খুন্দালি, তোরাকাদাবু ও কোনালর। এই পর্ব্বতে কয়েকটী অতি উচ্চ শৃঙ্গ আছে,—ইহার মধ্যে আনামুদি ৮৮৫০ ফিট, তাঙ্গাচি ৮১৪৭ ফিট, কথুমানাই ৮১০০ ফিট উচ্চ এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গুলি আছে।

এই সকল পাহাড়ে কেহই বাস করে না। উত্তর ও পশ্চিম ধারে কাদের নামক জাতি বাস করে। কাদের জাতি ভৃত্যের কাজ করে না, ইহারা সত্যবাদী ও নির্ভীক,—অন্যান্য সভ্য জাতির উপর ইহাদের বিশেষ আধিপত্য। ইহাদের আকৃতি খর্ব্ব, অনেকটা কাফ্রি বা অষ্ট্রেলিয়ান দিগের ন্যায়। ইহাদের ধর্ম্ম ভূত পূজা,—ইহারা বহু বিবাহ করে ও ইহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই। এই সকল বন্যজাতির বাসভূমি নির্দ্দিষ্ট নাই,—ইহারা শিকার করিয়া ও বন্য ফল মূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। এ প্রদেশেও কাফির চাস আরম্ভ হইয়াছে,—পশ্চিম দিকে তিনটি কাফির বাগন হইয়াছে।

আনন্দপুর।—পাঞ্জাবের হুসিয়ারপুর জেলায় উনা তশীলের একটি সহর। নয়না-দেবী নামক পর্ব্বত শৃঙ্গের নিম্নে ও শতদ্রু নদীর বাম তীরে অবস্থিত। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে গুরু গোবিন্দ কর্ত্তৃক এই সহর স্থাপিত হয়। এখানে প্রতি বৎসর শিক গণের একটি বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। লোক সংখ্যা ৫৮৭৮। এ সহরে একটি মিউনিসিপালিটি আছে।

আঙ্গুল।—উড়িষ্যার মধ্যস্থিত গভর্ণমেণ্টের একটি জমিদারি,—পূর্ব্বে এটি একটী দেশীয় রাজ্য ছিল,—পরে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট এটী নিজ শাসনাধীন করিয়াছেন। পরিমাণ ফল ৮৮১ বর্গ মাইল,লোক সংখ্যা (১০১৩০৩)। ইহার উত্তরে রাধাকোল ও বামরা রাজ্য,—পূর্ব্বে তালচর ধেনকানল, ও হিন্দোল রাজ্য, দক্ষিণে নরসিংপুর ও দশপল্লা রাজ্য, এবং মহানদী, পশ্চিমে আথমালিক রাজ্য। দক্ষিণ দিক পাহাড়ে পূর্ণ অন্যান্য প্রদেশ সমতল,—সমস্ত দেশই প্রায় জঙ্গলে পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে চাস হয় ও এখানে উৎকৃষ্ট শালকাঠ পাওয়া যায়। এ দেশে সময় সময় অনাবৃষ্টি হয়, তবে বর্ষা কখনই হয় না। রাজা পুনঃপুনঃ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অমান্য করায় এই রাজ্য ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট খাসে লয়েন। এখানে কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়। এক্ষণে দিন দিন আঙ্গুলের উন্নতি হইতেছে।

আনজার।—কাচ রাজ্যের একটী সহর। লোকসংখ্যা ১২৫৮৪। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কাচরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে আনজার প্রদান করেন। কিন্তু ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধি সংস্থাপিত হইয়া আনজার পুনরায় রাজাকে প্রদান করা হয় ও রাজা ইহার পরি-বর্ত্তনে ইং গভর্ণমেণ্টকে ৮৮০০০৲ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়েন। সহরের বাহিরে অজয় পালের মন্দির আছে,—এই মন্দির মধ্য অশ্বপৃষ্ঠে অজয় পালের মূর্ত্তি স্থাপিত।

ইনি নবম শতাব্দিতে আজমির হইতে বিতাড়িত হইয়া এইখানে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বাস করেন। এই মন্দিরের দেবত্তোর আছে ও এখানে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী সর্ব্বদা বাস করে।

আফগানিস্থান—ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম ও পারস্তের পূর্ব্ব এই দুই দেশের মধ্যস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ আফগানিস্থান নামে খ্যাত। এই প্রদেশের অধিবাসির মধ্যে আফগান জাতিই প্রধান।

আফগানিস্থান নাম পুরাতন নহে, গত শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে আমেদ খাঁর রাজত্ব কালে এই নাম প্রচারিত হয়, এমন কি আফগান গণ তাহাদের দেশকে আফগানিস্থান বলে না।

এ দেশ ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে অবস্থিত, তবে ইহার সহিত ভারতের নানা বিষয়ে সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

কর্ণেল হেনরি ইউল সাহেব "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" নামক গ্রন্থে এই প্রদেশ সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—আফগানিস্থান সম্বন্ধে সেই বিবরণ যথাযথ এবং প্রামাণিক বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত, আমাদের সঙ্কলিত এই বিবরণ অনেক পরিমাণে তন্মূলক। পরবর্ত্তী ভ্রমণকারী ও পরিদর্শকদিগের নিকট হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহাও আমাদের এই বৃত্তান্তে স্থান লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন এরিয়া (হিরাট) ড্রাঙ্গিয়ানা (সিস্তান) প্যারোপামিসেডেই (কাবুল)আরাকো-সিয়া (কান্দাহার) গাণ্ডারিতিস্ (পেশোয়ার) এই সকল লইয়াই আধুনিক আফগানিস্থান। পেশোয়ার প্রদেশ এক্ষণে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা যে আফগা-নিস্থানের অংশ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সীমা। আফগানিস্থানের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা সহজ নহে। ইহার সীমা প্রদেশে অনেক জাতি বাস করে, সেই সকল জাতির মধ্যে অনেক গুলিই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কোন কোন জাতি কেবল নাম মাত্র কাবুলের আমিরের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। এই সকল কারণে প্রকৃত পক্ষে আফগানিস্থানের সীমা কোনটী যে ঠিক তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। তবে যতদূর সম্ভব তাহাই আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

উত্তরে:—হিমালয়ের শাখা হিন্দুকুশ বরাবর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত; তৎপরে আরও পশ্চিমে হিন্দুকুশের শাখা কহিবাবা; তৎপরে কতকগুলি পর্ব্বত শাখা বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে; এই সকল পর্ব্বতে ও উপত্যকায় অর্দ্ধ স্বাধীন হাজরা নামক জাতি সকল বাস করে। তাহারা বহুদূর পর্য্যন্ত উত্তরে ও পশ্চিমে ব্যপ্ত; সুতরাং আফগানিস্থানের প্রকৃত উত্তর সীমা যে কোনটী তাহা স্থির নিশ্চিত বলা যায় না।

পূর্ব্বে:—পূর্ব্বে সলিমান পাহাড় ও ইহার শাখা প্রশাখা। পেশোয়ার জেলার উত্তরে কতকাংশে সিন্ধু নদীই আফগানিস্থানের পূর্ব্ব সীমা; তৎপরে আফগান ও দার্দ্দি জাতি দিগের বাসভূমি; এ প্রদেশের বিষয় কিছুই জানা নাই।

দক্ষিণে :—আফগান ও বেলুচী জাতি দিগের বাস ভূমি ; কোনটী যে প্রকৃত আফগান স্থানের সীমা তাহা বলা যায় না। দক্ষিণে বেলুচ জাতি দিগের মরু সদৃশ বেলুচিস্থানই দক্ষিণ সীমা বলা যাইতে পারে।

পশ্চিমে :—কুমালিকী গিয়া হইতে উত্তর পূর্ব্বে হেলমণ্ড নদীর তীরস্থ নাদালি নামক স্থান পর্য্যন্ত আফগানিস্থানের সীমা বিস্তৃত। তৎপরে এই সীমা বরাবর উত্তরে হরিরুদ নদী পর্য্যন্ত গিয়া অবশেষে সফেদকো পর্ব্বতে মিলিত হইয়াছে।

সমস্ত আফগানিস্থানের পরিমাণ ৭৫০ মাইল পূর্ব্বে পশ্চিমে, ও ৪৫০ মাইল উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত ইহার সীমা প্রদেশও যদি আফগানিস্থানের মধ্যে গণনা করা যায় তাহা হইলে উত্তর দক্ষিণে ইহা আরও ৬০০ মাইল বৃদ্ধি হইবে।

সমস্ত প্রদেশেই সমুদ্র হইতে ৪০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত ;—কোন কোন প্রদেশের উচ্চতা ৭০০০ ফিটেরও অধিক।

স্বাভাবিক বিভাগ।—(১) কাবুল নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ। (২) গজনী প্রভৃতি পর্ব্বত-উপত্যকা প্রদেশ। (৩) উত্তর হেলমণ্ড নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ। (৪) নিম্ন হেলমণ্ড নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ। (৫) হেরাট নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ। (৬) উর্দ্ধ উপত্যকার পূর্ব্বাংশ, এ প্রদেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে ; এই সমস্ত নদী পূর্ব্ব দিকে সিন্ধুনদে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে।

কাবুল প্রদেশের উত্তরে বিস্তৃত হিন্দুকুশ পর্ব্বত ;— এই পর্ব্বত সর্ব্বদাই বরফে আবৃত ; আলেকজেণ্ডারের সমসম কালীন ঐতিহাসিকগণ ইহাকেই ককেসাস্ পর্ব্বত নাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল কত উচ্চ তাহা স্থির হয় নাই। তবে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গের পরিমাণ বোধ হয় ২০ হাজার হইতে ২৫ হাজার ফিট। এই হিন্দু-কুশ পর্ব্বতের পর কুসন নামক গিরি পথ ১৫ হাজার ফিট উচ্চ ;—প্রায় ২০টি গিরি পথ এই পর্ব্বতে আছে ;—ইহাদের কোনটীই উচ্চে ১২ হাজার ফিটের কম নহে।

নদী।—আফগানিস্থানের মধ্যে কাবুল নদীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কাবুল সহরের ৩০ মাইল পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত কয়টী করদনদী সম্মিলিত হইয়া এই নদী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। (১) উনাই পর্ব্বত হইতে উত্থিত কাবুল উপনদী ; (২) ঘোরবন্দ ও পাঞ্জশির নামক উপত্যকা হইতে উত্থিত একটী নদী ; ইহার তীরবর্ত্তী প্রদেশ বড়ই উর্ব্বরা ও উদ্যান ও আঙ্গুরের ক্ষেত্রে পূর্ণ। ইহার পূর্ব্ব নাম "বারাণ" ছিল ;—কিন্তু এক্ষণে ইহার কোন নাম নাই। (৩) হিন্দুকুশ হইতে উত্থিত তাগাও নদী।

আরও ৩০ মাইল পূর্ব্বে আলেসাং নদী কাবুল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। আরও ২০ মাইল দূরে জেলালাবাদের নিকটে ইহার সহিত আরও একটী বড় নদী সংমিলিত হইয়াছে। প্রাচীন মানচিত্রে ইহা কামানদী নামে উল্লিখিত। আধুনিক মানচিত্রে কুনার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই নদীর উত্তরাংশ কাসকার ও বৈলাম নামে পরিচিত।

সম্ভবত এইটাই কোয়াসপেস নদী, প্রাচীনগণ এই নদীকেই মালামানটুস বলিতেন। পামির প্রদেশের সীমাস্থিত হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া এই নদী উত্তর পশ্চিম বাহিনী হইয়া কাসকর বা চিত্রল প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কাবুল নদীর সহিত যথায় মিলিত হইয়াছে তথা হইতে ইহার উত্থান স্থান পর্য্যন্ত ইহা তিনশত মাইলের ন্যূন নহে। পেশোয়ারের নিকট লণ্ডাই নামক একটী করদ প্রবাহিণী এই নদীতে মিলিত হইয়াছে।

কাবুল নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ হিন্দুকুশের শাখা পাগমান পাহাড় দ্বারা হেলমণ্ড প্রদেশ হইতে বিভক্ত হইয়াছে। তুর্কিস্থানের পথ এই নদীর তীর দিয়া উনাই গিরি পথের মধ্য হইয়া হেলমণ্ড প্রদেশে কিয়দ্দূর গিয়াছে। তৎপরে কহিবাবা পাহাড়ের উপর দিয়া হাজি-খাক গিরিপথ অতিক্রম করিয়া বামিয়ানে আসিয়াছে।

কাবুল প্রদেশের সর্ব্ব দক্ষিণ সীমা সাফেদকো পর্ব্বত; আফগান গণ ইহাকে স্পিনজার (শ্বেত পর্ব্বত) কহে। এই পর্ব্বত বরাবর বিস্তৃত হইয়া আটকের দক্ষিণে সিন্ধু নদের তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম শিকারাম; ইহা ১৫৬২০ ফিট উচ্চ। এই গিরিশ্রেণীর উত্তরাংশে জেলালাবাদ ও কাবুলের মধ্যবর্ত্তী সেই সকল দুরধিগম্য গিরি পথ অবস্থিত যেখানে ১৮৪১।৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সেনা গণের ভীষণ পরিণাম ঘটিয়াছিল। জেলালাবাদ ও পেশোয়ারের মধ্যে বিখ্যাত খাইবার গিরিপথ। কাবুল নদী সর্ব্বশেষে আটকের নিকট সিন্ধু নদে সম্মিলিত হইয়াছে।

জেলালাবাদের নিকট কাবুল নদী কেবল গ্রীষ্ম কালে পার হইতে পারা যায়। কুনার নদীর সংযোগস্থলের সন্নিকট কাবুল নদী অতিশয় গভীর খেওয়া ভিন্ন পার হইতে পারা যায় না। পেশোয়ারের দক্ষিণে নৌশেরার নিকট এই নদীর উপর একটি নৌসেতু আছে। স্রোত অতিশয় প্রবল বলিয়া এই নদীতে নৌকা গমনাগমনের সুবিধা নাই, তবে জেলালাবাদের দক্ষিণে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত বোঝাই নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। একরূপ চামড়া নির্ম্মিত ভেলাতেও এখানকার লোকে জলপথে যাতায়াত করিয়া থাকে।

জেলালাবাদের উত্তরে গণ্ডামাকের নিকট কাবুল প্রদেশের দুইটী স্বাভাবিক বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রদেশের একস্থান ৫০০০ ফিট উচ্চ ও আবার তন্নিম্নেই একেবারে ২০০০ ফিট নিম্ন। সম্রাট বাবর এই প্রদেশ বর্ণনাকালে বলিয়াছেন, "যেই তুমি নিম্নে অবতীর্ণ হইলে অমনি মনে হয় যেন এক নূতন পৃথিবীতে প্রবেশ করিলে। এখানকার বৃক্ষ অন্যরূপ ফসল অন্যপ্রকার পশুগণ ভিন্ন জাতীয়, অধিবাসীগণের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সকলই ভিন্ন।" প্রকৃতপক্ষে এই স্থানটীকে প্রকৃতি দেবী যেন একটি ভারতবর্ষের দ্বার স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রবলতার সময়ে প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত হইলেও উত্তরাংশের উপত্যকাগুলির আবহাওয়া এবং শস্য ও ফলমূলাদি প্রায় নাতিশীতোষ্ণ ইয়রোপের অতি মনোরম প্রদেশগুলির ন্যায়। কিন্তু নিম্ন প্রদেশ ঠিক ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ

ও ভারতবর্ষীয় বৃক্ষাদিতে পূর্ণ। আফগানিস্থানের অন্যান্য প্রদেশ (খোরাসান প্রভৃতি) এরূপ ফুল ফল, বৃক্ষ লতাদি পূর্ণ নহে; তবে সফেদকো পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্বাংশের কোন কোন স্থান কাবুল প্রদেশের ন্যায় উর্ব্বরা। হিরাট উপত্যকাও এইরূপ সুন্দর ও অত্যন্ত উর্ব্বরা। খোরাসান প্রদেশ স্বভাবতঃ উচ্চ, বৃক্ষশূন্য পাহাড়ে পূর্ণ; উপত্যকা সকল বালুকাময়; বহু দূর পর্য্যন্ত একটীও বৃক্ষলতা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই রূপ ক্রমে পাহাড়শ্রেণী বিস্তৃত হইয়া গিয়া অবশেষে বিস্তৃত মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এমনকি যেখানে চাসবাস হয়; সেখানেও বৃক্ষ নাই; যখন ফসলাদি ক্ষেত্রে না থাকে; তখন সমস্ত খোরাসান প্রদেশ একটি বিস্তৃত মরু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে পশ্চিম আফগানের কোন কোন স্থানে বন্য বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তপ্ত হেলমণ্ড প্রদেশে, বিস্তৃত ঘোর প্রদেশে ও হিরাট নদীর তীরে এই রূপ অল্প পাতা বিশিষ্ট বৃক্ষ জন্মে।

আফগানিস্থানে কাবুল নদীর পরেই হেলমণ্ড নদী প্রধান। কাবুল বা বামিয়ানের মধ্যে কহি-বাবা ও পাগমান পাহাড় হইতে এই নদী উত্থিত হইয়াছে। তৎপরে ইহা হাজরা প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এইরূপ তিন শত মাইল বিস্তৃত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত প্রদেশ ভেদ করিয়া ইহা গিরিস্ক নামক স্থানে আসিয়াছে। হিরাট ও কান্দাহারের পথ এই স্থানে এই নদী পার হইয়া গিয়াছে। হাজরা প্রদেশে এই নদী অনেক পাহাড়ের মধ্য দিয়া আসিয়া পরে গিরিস্ক হইতে সমতল ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। গিরিস্ক হইতে ৪৫ মাইল নিম্নে কালাই বিস্তের নিকট আরঘান্দাব নামক নদী ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে হেলমণ্ড নদীর কলেবর বিপুলতা প্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহার বিস্তৃতি প্রায় ৭।৮ শত হাত ও গভীরতাও প্রায় ১০।১২ ফীট হইবে। তবে বৎসরের সকল সময়ে এত জল থাকে না। নদীর মুখ হইতে এক শত মাইল দূরবর্ত্তী পুলালিক পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে লোক হাঁটিয়া পার হইতে পারে। ইহার বাম তীরে ১৫০ শত মাইল পর্য্যন্ত মরুভূমি,—কোন কোন স্থানে নদী হইতে সওয়া মাইল দূর পর্য্যন্তে এই মরু বিস্তৃত হইয়াছে। নদীর তীরে ফসলাদি যথেষ্ঠ পরিমাণে জন্মে,—তবে সমস্তই উষ্ণ প্রদেশ সুলভ। দেখিলে বোধ হয় এক সময়ে এই প্রদেশে বহু-লোকের বাস ছিল,—এখনও গিরিস্কের নিম্নে ১০০ মাইল পর্য্যন্ত প্রদেশে ফসলাদি যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। তবে ক্রমে ইহারও অবনতি ঘটিতেছে,—কারণ এ প্রদেশ অরাজকতাময় এবং আপদ সঙ্কুল।

হেলমণ্ড নদী প্রায়ই দক্ষিণ পশ্চিম বাহিণী, কিন্তু সিস্থান প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া ইহা উত্তর বাহিনী হইয়াছে। এইরূপ ভাবে। ৭০।৮০ মাইল বহমানা হইয়া অবশেষে ইহা বহু মুখে সিস্তান হ্রদে যাইয়া মিলিয়াছে। এই নদী ৬৫০ মাইল বিস্তৃত, ফেরিয়ার সাহেব বলেন যে গিরিস্কের নিম্নে এই নদীতে সকল সময়ে নৌকা চলাচল করিতে পারে। কিন্তু এখন নৌকার চলাচল দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও বর্ষা

দুই একখানি দেখা যায়, তাহা অতি জঘন্য ও কদাকার। চর্ম্ম নির্ম্মিত ভেলায় এদেশের লোকেরা নদী পারাপার হইয়া থাকে।

হেলমণ্ড নদীর পরই হরিরুদ নদীর নাম উল্লেখ করা যায়। যেখানে কহিবাবা পর্ব্বত হইতে ইহার শাখা দ্বয় কসিয়া ও সফেদকো পাহাড়ে চলিয়াগিয়াছে সেই খান হইতে এই নদী উত্থিত হইয়াছে। নানা করদ প্রবাহিণী ইহার সহিত মিলিত হওয়ায় অবে নামক গ্রামের নিকট এই নদার কলেবর বিলক্ষণ পুষ্টতা লাভ করিয়াছে। এখানে চাস বাসের জন্য জল, খাল কাটিয়া নানা স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। হিরাট উত্তীর্ণ হইয়া আরও অনেক শাখার সহিত হরিরুদ সংযুক্ত হইয়াছে। তৎপরে ইহা পারস্য দেশে প্রবিষ্ট হইয়া দুই বৃহৎ শাখায় দুই দিকে গিয়াছে। একটি সারায়ের নিকটস্থ হইয়া ক্রমে বিস্তৃত ঘাস বনে (Steppes) অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে ইহার জল অতিশয় বৃদ্ধি হয় ও সে সময়ে পারাপার হওয়া বড়ই কঠিন। সর্ব্বশুদ্ধ এই নদী প্রায় ৫০০ মাইল দার্ঘ। এই সকল নদী ব্যতীত নিম্ন লিখিত কয়েকটি নদীও উল্লেখ যোগ্য। আরঘন্দাব, তার্নাক, আরঘেস্থান, দোরি, খাসরুদ ফারারু, কুরম ও গুমাল।

হ্রদ। যে হ্রদের সহিত লোরা নদী যাইয়া মিলিত হইয়াছে তাহার বিষয় কিছুই জানা নাই। সিস্তানের বিস্তৃত হ্রদ বা বিলের অধিকাংশ আফগানিস্থানের অন্তর্গত নহে। সুতরাং ঘিলজাই উপত্যকাস্থ আবিএসতাদা নামক হ্রদই উল্লেখ যোগ্য। গজনী হইতে ৬৫ মাইল দক্ষিণে এবং সমুদ্র হইতে ৭০০০ ফিট উচ্চে এই হ্রদ অবস্থিত, এই হ্রদের চতুস্পার্শ্বে একটি বৃক্ষ বা এমন কি একটি তৃণ বা মনুষ্যাবাস কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ৪৪ মাইল বিস্তৃত ও কোন স্থানই ১২ ফিটের অধিক গভীর নহে। গজনী নদী এই হ্রদে আসিয়া মিসিয়াছে, কিন্তু ইহার জল এতই লবণাক্ত যে গজনী নদী দিয়া যে মৎস্য এই হ্রদে আইসে তাহা অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না।

প্রদেশ ও নগর। আফগানিস্থান নিম্ন লিখিত প্রধান প্রধান বিভাগে বিভক্ত যথা—কাবুল, জেলালাবাদ, গজনী, কান্দাহার ও হিরাট, ঘিলজাই ও হাজরা প্রদেশও কতকাংশে আফগানিস্থানেরই অন্তর্গত বিভাগ।

এই সকল প্রদেশের রাজধানী ব্যতিত অন্য আর কোন স্থানই সহর নামে উল্লিখিত হইবার উপযুক্ত নহে; তবে নিম্নলিখিত কয়টির উল্লেখ করা যায়।

ইসতালিক।—কহি ডিমান প্রদেশের একটি সহর, কাবুলের উত্তর পশ্চিমে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বরে জেনারেল ম্যাকাসকিল চারিকর নামক স্থানের সৈন্যহত্যা ও বারনেস সাহেবের হত্যাকারীগণকে আশ্রয় দেওয়া অপরাধে এই সহরবাসীদিগকে দণ্ড দিবার জন্য এই সহর দখল করিয়া ধ্বংস করেন। প্রকৃতই এই সহরটি বড়ই সুন্দর। পর্ব্বতের অঙ্গে পিরামিডের ন্যায় গৃহ সকল স্তরে স্তরে উঠিয়া গিয়াছে, সর্ব্বোপরি

একটি মস্‌জিদ। নিম্নস্থ উপত্যকাভেদ করিয়া একটি সুন্দর নদী কুল কুল ধ্বনি করিয়া প্রবাহিতা, নদীর দুই পার্শ্বে সুন্দর ফল ফুল পরিপূরিত উদ্যান, কতই যে আঙ্গুরের বাগান তাহার সংখ্যা হয় না। এই সুরম্য উপত্যকার মধ্যে মধ্যে চূড়াযুক্ত প্রাচীরে বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ, তৎপশ্চাতে তুষার মণ্ডিত শ্বেত হিন্দুকুস পর্ব্বত। প্রায় প্রত্যেক অধিবাসীর এক একটি বাগান আছে, ফল উৎপন্ন হইবার-কালে সকলেই সহরের বাড়ী বন্ধ করিয়া বাগানে যাইয়া বাস করে। এই সহরের লোকসংখ্যা সাতটি পল্লিসহ মোট ১৮০০। অধিবাসী-গণ জাতিতে তাজিক, কিন্তু তাজিকদিগের ন্যায় শান্ত নহে। ইহারা দেখিতে সুন্দর ও সবল, সর্ব্বদাই শিকার ও যুদ্ধ করিতে ব্যগ্র। পদাতিক সৈন্যগণের মধ্যে ইহারাই আফগানিস্থানে শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। লুঙ্গি, সুসি প্রভৃতি মোটা কাপড় এই স্থানে প্রস্তুত হইয়া ব্যবসার জন্য তুর্কিস্থানে নীত হয়। প্রায় ৫০ ঘর শিক দোকানদার এই সহরে আছে।

চারিকর। কহিডামনের উত্তর প্রান্ত সীমায় তুর্কিস্থানের পথে ইসতালক হইতে ২০ মাইল। চারিকর কাবুল হইতে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। কলাইবাদ হইতে ঘোরবন্দ নদীর একটি শাখা এই সহরের পার্শ্ব দিয়া বহমান হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই সহরে প্রায় ৩০০০ বাড়ী ও একটি বাজার ছিল,—দোকানদারগণের মধ্যে অধিকাংশই শিক, প্রায় ১৫০ শিক পরিবার এইখানে বাস করে। ঘোরবন্দের খনি হইতে এই স্থানে লৌহ অনেক পরিমাণে আমদানি হয়—তৎপরে এখান হইতে সেই লৌহের দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়ার্থ প্রধানতঃ কাবুলে প্রেরিত হয়। সহরের মধ্যে মৃত্তিকা নির্ম্মিত অনেক গুলি দুর্গ আছে, ইহার মধ্যে কালাইকাজিই প্রধান। তুর্কিস্থানে যে সকল পণ্য দ্রব্য প্রেরিত হয় তাহার উপর মাশুল এই স্থানে আদায় হয়। কহিস্থানের শাসন কর্ত্তা চারিকরে বাস করেন। ইংরেজগণ আফগানিস্থানে প্রবেশ করিলে মেজর ইলড্রেড পটিঞ্জর একদল গুরখা সৈন্য সহ এখানে অবস্থিতি করিতেন। কাপ্তেন কডরিংটন ও হউটন এই সেনা দলের নায়ক ছিলেন। পরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কাবুলবিদ্রোহের সময় ইহারা কাবুল যাইবার চেষ্টা করিলে ইহাদের অধীনস্থ সৈন্যগণ প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল। পটিঞ্জর ও হটন একজন মাত্র সিপাহি সমভিব্যাহারে কাবুলে পঁহুছিতে সক্ষম হয়েন। পরে আরও অনেকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

খিলাতইখিলজাই।—এটি প্রকৃত পক্ষে সহর নহে, সামান্য একটি দুর্গমাত্র। কান্দাহার ও গিজনীর পথে তারনাক নদীর দক্ষিণ তীরে ৫৫৪৩

খিলতিই-খিলজাই।—এটী প্রকৃতপক্ষে সহর নহে, একটী দুর্গমাত্র। কান্দাহারও গজনীর পথে তারনাক নদীর দক্ষিণ তীরে ৫৫৪৩ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধে কাপ্তেন ক্রেগির অধীনস্থ সিপাহিগণ এই দুর্গে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল।

গিরিক।—এটীও একটী দুর্গ, নিকটে একটী পল্লি আছে॥ কান্দাহার ও হিরাটের পথে হেলমণ্ড তীরে অবস্থিত, গ্রীষ্মকালে এই স্থানে হেলমণ্ড নদী পদব্রজে পারাপার হইতে প্যারা।

তরাং এই গড় এই স্থানে অবস্থিত থাকায় এই পথ রক্ষা পক্ষে বিশেষ উপযোগী। খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এই দুর্গ ইংরেজ সৈন্তের অধি- [illegible] সমবন্ত সিংহ নামক একজন দেশীয় সেনাপতির অধীনে

[illegible]

গুরুতর। কিন্তু স্থানটী বড়ই [illegible]

এই সহর বহু প্রাচীন। ফর্‌রা নগর জঙ্গিস খাঁ আক্রমণ করেন ও [illegible] অধিবাসীগণকে আরও উত্তরে একটী সহরে লইয়া যান, তথায় এখনও অনেক ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে। কিন্তু এই সকল ভগ্নস্তূপে দুই হস্ত পরিমান বৃহৎ ইষ্টক ও ঐ সকল ইষ্টকে শরাকার অক্ষর সমস্ত খোদিত দেখিত পাওয়া যায়, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই স্থান জঙ্গিস খাঁর সময় অপেক্ষাও প্রাচীন। এই প্রাচীন সহর সাহ আব্বাস কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হইলে অধিবাসীগণ আধুনিক সহরে আইসে এবং তদবধি নাদির সাহের ভীষণ অবরোধের সময় পর্য্যন্ত ইহার সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াছিল। নাদের সাহের সময় হইতে বহু আক্রমণে ইহা মলীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে, অবশেষে ১৮৩৭ খৃং অব্দে ধ্বংসাবশিষ্ট ৬০০০ হাজার আন্দাজ অধিবাসী কান্দাহারে নীত হয়।

সবজাভার।—ইহা হেরাট হইতে ৯৩ মাইল ও ফাররা হইতে ৭১ মাইল দূরে অবস্থিত। ফার্‌রার ন্যায় ধ্বংস মলীন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গে একটী ক্ষুদ্র বাজার ও একশত বাড়ী ছিল। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে এতই ভগ্নস্তূপ যে দেখিলেই বোধ হয় যে কোন সময় এখানে একটী সুবৃহৎ নগরী অবস্থিত ছিল। অনেকগুলি খালের সাহায্যে হরিরুদ নদী হইতে এখানে জল আনয়ন করা হয়।

জারনি।—হেরাটের পূর্ব্বদিকে বিখ্যাত ঘোর প্রদেশে এই নগর স্থাপিত। ঘোর রাজ্য সম্ভূত রাজবংশ গজনী রাজবংশকে পরাভূত করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত সমস্ত আফগানিস্থান শাসন করিয়াছিলেন। চারিদিকে ভগ্নস্তূপ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, সহরটী একটী ছোট ভগ্নপ্রায় প্রাচীর দ্বারা বেষ্ঠিত। একটী সুন্দর উপত্যকার উপর এই সহর অবস্থিত, পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রধাবিত, চতুর্দ্দিক পর্ব্বত ও বৃক্ষে সুশোভিত, এবং দ্রাক্ষা লতায় অলঙ্কৃত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে লোক সংখ্যা প্রায় ১২০০ ছিল;—অধিকাংশ অধিবাসীই সুরি ও তৈমুনি জাতীয়।

লাস।—এটীও একটী কেল্লা;—একটী উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর অবস্থিত, এই পর্ব্বতের নিম্ন দিয়া ফরেরুদ নদী প্রবাহিতা। এক্ষণে ৭০।৮০টীর অধিক বাড়ী দৃষ্ট হয় না। কিন্তু

বহুসংখ্যক নির্দ্দিষ্ট—আবাসহীন ভ্রমনকারী জাতির বস্ত্রাবাস ইহার নিকটে সর্ব্বদাই পরি-লক্ষিত হয়।

ঘোরিয়ান।—হিরাটের ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত;—ইহা একটী ক্ষুদ্র নগর এবং এখানে আন্দাজ ৪০০ গৃহস্থের বাস। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ কালে ইরানীরা [illegible] একটী কেল্লা নির্ম্মান করিয়াছিল, তাহার ভগ্নাংশ পরিখার বাহিরে এখনও বিদ্যমান [illegible] ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে হেরাটে পারস্য সেনা আসিলে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই সহর [illegible]সীগণকে প্রদত্ত হয়, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পারস্য রাজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইয়ার মহ-[illegible] দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলেন।

[illegible] উৎপন্ন দ্রব্য।—(ধাতু) আফগাণিস্থান ধাতুর জন্য বিখ্যাত, কিন্তু এই সকল ধাতুর [illegible] এখানে কোন দ্রব্যাদি তয়ার হয় না। লাগমান নদী ও তন্নিকটস্থ প্রদেশ হইতে কিয়ং পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। হিন্দু কুশস্থ পাঁজশির উপত্যকায় এক সময়ে বিখ্যাত রৌপ্য খনি ছিল। পেশোয়ারের উত্তর পশ্চিমস্থ বাজুর প্রদেশে উৎকৃষ্ট লৌহ জন্মে ও রপ্তানি হইয়া থাকে। মাষুদ বাজিরি প্রদেশেও লৌহ পাওয়া যায়। উত্তর কুরাম ও গুমালের মধ্যবর্ত্তী ফারমুলি প্রদেশস্থ লৌহই কাবুলে অধিক আমদানি হইয়া থাকে। হিন্দুকুশ পর্ব্বতে ও বামিয়ানের গিরিপথে লৌহচূর্ন বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। কাকর প্রদেশ, সিনোয়া-য়ারি প্রদেশ ও উত্তর বঙ্গাশ প্রদেশে সীসা জন্মে। হিরাটের নিকটও খুব বৃহৎ সীসার খনি আছে, কিন্তু এই খনি হইতে সীসা উঠান হয় না। আন্টিমণি সহ সীসা আরঘানদাবে, গজনী হইতে ২৪ মাইল দূরস্থ বার্দ্দিক পাহাড়ে, কাবুলের উত্তর ঘোরবন্ধ উপত্যাকায়, ও ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত আফ্রিদি প্রদেশে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ সীসাই হাজরা প্রদেশ হইতে আইসে। ঘোরবন্দ উপত্যকায় ফেরিঙ্গাল নামক স্থানে একটী বিস্তৃত ও অতি প্রাচীন সীসার খনি আছে। কান্দাহারের উত্তর ৩০ মাইল দুরস্থ মাকস্থদ নামক স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে আন্টিমণি পাওয়া যায়। কাকর প্রদেশস্থ ঝোব বিভাগ হইতে দস্তা আইসে, কালাইয়ের কার্য্যেই এই দস্তা অধিক ব্যবহৃত হয়। হিরাটের নিকট গন্ধক পাওয়া যায়, তবে হাজরা প্রদেশ ও সিস্তানের প্রান্তস্থিত পিরকিস্রি হইতেই বহুল পরিমাণে আইসে। গজনীর নিকট জারমটে কয়লা জন্মে।

আবহাওয়া।—আফগানিস্থানের ন্যায় উচ্চ ও নিম্ন ভূমি বহুল দেশের আবহাওয়ার মূর্ত্তি যে বহু বৈচিত্র্য সমন্বিত হইবে তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। গজনী নগরের উচ্চতা অত্যন্ত অধিক বলিয়া এখানে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত তীব্র। ডিসেম্বর মাসের অর্দ্ধেক না যাই-তেই হিন্দুকুশের গিরিপথ সকল এতই তুষারাচ্ছন্ন হয় যে পদব্রজ-যাত্রী ব্যতিত আর কিছুরই চলাচল হইতে পারে না। শীতের তীব্র প্রকোপ জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি আরম্ভ হয় এবং মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে তাহার হ্রাস হয় না। হাজরজাত এবং কাবুলে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক, কান্দাহারে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, হিরাটে শীতের প্রকোপ অধিক

সহে এবং জেলালাবাদে শীতের অবস্থা প্রায় ভারতবর্ষের স্তায় মৃদু। আফগানিস্থানের শীত ঋতুর সম্বন্ধে মোটের উপর ইহা অনায়াসে বলা যায় যে সমুদ্র হইতে ৫০০০ ফিট উর্দ্ধে ইহার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক তাহার পর নিম্নতা অনুসারে শীতের মৃদুতা অনুভূত হয়। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের অত্যুচ্চ প্রদেশ এবং অন্যান্য অত্যুচ্চ পর্ব্বত ছাড়া আ[illegible] স্থানের প্রায় সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মের প্রকোপও অতি প্রবল। জেলালাবাদ অঞ্চলে [illegible] প্রকোপ এতই অধিক যে জীব জন্তু অজস্র মরিয়া যায়। হিরাটে গ্রীষ্মের তাপ[illegible] মনতঃ মৃদু এবং এই ঋতুতে এই স্থান ইংরাজ বা তাহাদের স্তায় শীত প্রধান দেশের অধিবাসী দিগের পক্ষে পরম রমনীয়।

ফেরিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন যে বৎসরের মধ্যে নয় মাস আফগানিস্থানে [illegible] প্রকাশ যার পর নাই প্রফুল্ল এবং সেই জন্য এখানে দিবা ভাগ অপেক্ষা নিশা আরও মনোরম। সলিমান পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ষনাধিক্য নাই। শীত কালে খুব অল্প বৃষ্টি হয় এবং গ্রীষ্ম কালে কদাচ হয়।

এই দেশের গ্রীষ্ম ঋতু জুন মাসে আরম্ভ ও সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়। হিম, শিশির এবং বসন্ত ঋতুর স্থিতিকাল (অক্টোবর) কার্ত্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ (মে) মাস পর্য্যন্ত। শীতকালে শ্বাস নালীর পীড়া এবং সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত জ্বর ও উদরাময়ের প্রাদুর্ভাব হয়।

কৃষি। ভূতলের, অসংখ্যবিধ উচ্চতা ও নিম্নতা এবং জল বায়ুর অত্যন্ত বৈচিত্র্য নিবন্ধন আফগানিস্থানে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের এবং নাতি শীতোষ্ণ দেশের সর্ব্ববিধ ফল শস্য জন্মে। ভারতবর্ষের স্তায় এদেশেও বৎসরে দুইটী ফসল হয়। আফগান দিগের একটী ফসলের নাম "বাহারক" ইহা হেমন্তে রোপিত গ্রীষ্মারম্ভে পরিপক হয়। ইহাকে আমরা বাসন্তি শস্য বলিতে পারি; এই ফসলে যব ও গমই অধিক জন্মে। দ্বিতীয় বিধ ফসলের আফগান নাম "পাইজা" বা "তিরমাই" আমাদের দেশের কথায় বলিতে গেলে ইহাকে হৈমন্তিক শস্য বলিতে হয়। ইহা বসন্ত কালে উপ্ত ও হেমন্তে কাটিয়া লওয়া হয়। এই শস্যের মধ্যে ধান্য, তরমুজ, ভূট্টা, তামাক, মুগ, শালগম প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য; অত্যন্ত উচ্চ প্রদেশে একটী মাত্র ফসল হয়। এ দেশের অধিবাসী গণের প্রধান খাদ্য আটা, ধান্য ও যবচূর্ণ। স্বাত প্রদেশেই প্রচুর পরিমাণে ধান্য পাওয়া যায় এবং পেশওয়ারের চাউলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুনার উপত্যকার ধান্যই প্রধান ফসল। পূর্ব্বাঞ্চলের প্রধান উৎপাদ্য বাজরা নানাবিধ বিলাতি ও ভারতীয় শাক সবজির চাসও এখানে করা হইয়া থাকে। আপেল, আঙ্গুর, আখরোট বেদানা প্রচুর পরিমাণে হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে বানিজ্য সম্পর্কে ভারতবর্ষে রপ্তানি হইয়া থাকে। কাবুলের উপত্যকায় নালা কাটিয়া জল চালাইবার প্রণালী প্রচলিত আছে। পশ্চিমস্থ প্রদেশে দেশীয়গণ এক প্রকার জল প্রণালীর ব্যবস্থা করে আমরা তাহাকে ভূগর্ভস্থিত প্রণালী বলিতে পারি।

গৃহপালিত পশু।—ভারতীয় উষ্ট্র অপেক্ষা আফগানিস্থানের উষ্ট্র অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায় কিন্তু ইহা অত্যন্ত বলবান ও দৃঢ়কায়; আফগানগণ অতি যত্নে উটের পালন পোষণ ও রক্ষনাবেক্ষণ করিয়া থাকে। এখানে ব্যাকট্রিয় দেশের দ্বিককুৎ (দুই কুঁজ বিশিষ্ট) উষ্ট্র মধ্যে মধ্যে দেখা যায় বটে কিন্তু এদেশে এজাতীয় উষ্ট্র জন্মে না। এদেশ হইতে অনেক অশ্ব বিক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। ঐ সকল অশ্বের মধ্যে যে গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সে গুলি মেমানা, খোরাসান, টর্কোম্যান এবং অন্যান্য প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে।

এদেশে সচরাচর যে সকল ঘোড়া দেখা যায় তাহাদিগকে "ইয়াবু" বলে। "ইয়াবু" আফগানিস্থানেই জন্মে। এই জাতীয় ঘোড়ার "গর্দ্দান" খুব স্থূল এবং ইহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। আফগানগণ "ইয়াবু" দিগকে সচরাচর ভার বহনের কার্য্যে নিযুক্ত করে আবার কখন কখন তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণও করিয়া থাকে।

"ইয়াবু" অশ্ব বেগগামী নহে সত্য কিন্তু ইহারা "দুল্‌কী" চালে অক্লেশে বহুদূর পর্য্যটন করিতে পারে। এই জাতীয় ঘোড়া একবারেই গরম সহ্য করিতে পারে না। ইহাদের "খাড়াই" প্রায় ১৪ হাত। আমীর দোস্ত মহম্মদ অশ্ব পালন ও রক্ষণ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন তাঁহার রাজত্ব সময়ে আফগানিস্থানে অশ্ব পালনের অত্যন্ত উন্নতি হয়। এদেশে অশ্ব শাবক দিগকে অতি অল্প বয়সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা অথবা বেচিয়া ফেলা হয়।

কান্দাহার এবং সিস্তানের গাভীগণ অত্যন্ত দুগ্ধবতী। ইহাদিগকে ককুদ্ধারী (কুঁজ বিশিষ্ট) বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাদের পৃষ্ঠে চির দিন এই ককুৎ (কুঁজ) থাকে না। দুধের জিনিস আফগান দিগের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। দধিকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া আফগান গণ "ক্রূত" নামক এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহারা এই ক্রূত খাইতে বড় ভাল বাসে।

এদেশে সচরাচর স্থূল-লাঙ্গুল দুই জাতীয় মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয়ের লোম সাদা অন্য জাতীয়ের লোম কাল। এই সকল মেষের সাদা লোম যথেষ্ট পরিমাণে বোম্বাই, পারস্য ও ইয়রোপে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। কতক গুলি নির্দ্দিষ্ট আবাসহীন ভ্রমনশীল আফগান জাতির মেষ পালই প্রধান ধন সম্পত্তি এই মেষের শুষ্ক মাংস তাহাদের প্রধান আমিষ-খাদ্য। শরৎ কালে আফগানগণ বহুল পরিমাণে গো, মেষ ও উষ্ট্র জবাই করে এবং তৎসমুদয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে পরে ঐ সমস্ত মাংস খণ্ডে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে। আফগানিস্থানে কৃষ্ণ ও অন্যান্য নানা মিশ্রিত বর্ণের ছাগল দৃষ্ট হয়। যে ছাগ লোমে শাল প্রস্তুত হয় ইহারা সেই জাতীয় ছাগলই বটে তবে কাল ক্রমে সাঙ্কর্য্য দোষে অনেকই নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। এদেশে নানা জাতীয় কুকুর আছে। কাবুল ও কহিস্থানে এক জাতীয় শিকারী কুকুর দৃষ্ট

হয় তাহারা স্পেনদেশের পয়েণ্টার (Pointer) জাতীয় কুকুরের ন্যায় ঘ্রাণ শক্তির দ্বারা শীকার খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। এই জাতীয় কুকুর অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও হৃষ্ট পুষ্ট। এখানে ডাল কুকুর (Grey hound) আছে বটে কিন্তু ইংলণ্ডের ডালকুকুরের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। "খান্দী "নামক আর এক জাতীয় শিকারি কুকুর আছে ইহাদের সাহায্যে বটের ও টিটির প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষী শিকার করা যায়।

শিল্প দ্রব্য—আফগানিস্থানের শিল্পজাত দ্রব্যাদি অধিক নাই। জেলালাবাদ, কান্দাহার এবং হিরাটে রেসম প্রস্তুত হয়। ইহার অধিকাংশই দেশীয় অধিবাসীগণের পরিচ্ছদাদি নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, রেসমের উৎকৃষ্টাংশ বোম্বাই ও পঞ্জাবে রপ্তানি হয়। হেরাটে যে সকল সুন্দর সুন্দর মসনন্দ (ক্যারপেট) প্রস্তুত হয় তাহা পারস্য দেশজাত মসনন্দ বলিয়া—ভারতে বিক্রীত হইয়া থাকে।

মেষ, ছাগ, ও ব্যাকট্রিয়া দেশীয় উষ্ট্রের লোমে নানাবিধ পশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। পোস্‌তিন" নামক সলোম মেষ চর্ম্ম অতীব পরিচ্ছন্ন, পঞ্জাবে ইহার বহুল আমদানি হয়। ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট সৈন্য দিগের ব্যবহারের জন্য প্রতি বৎসর অনেক "পোসতিন" ক্রয় করেন। এ দেশে এক প্রকার স্বচ্ছ স্ফটিকের মালা প্রস্তুত হয়; মক্কায় এই মালা যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

ব্যবসা বানিজ্য—আফগানিস্থানে নৌকা যাতায়তের উপযোগী নদী অথবা শকটাদি যাতায়তের উপযোগী পথ না থাকায় এদেশের পণ্য দ্রব্য সমস্ত অশ্ব বা উষ্ট্র পৃষ্ঠে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। এখানকার পথ সমস্তই অতীব দুরধিগম্য, এই সকল পথ কোথায় বা গণ্ড শৈল সমাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া কোথায় বা তৃণ লতা বা বৃক্ষ বিটপি শূন্য পর্ব্বত বা মরুস্থলির উপর দিয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালে যদিও ভারত বর্ষের বহুমূল্য পণ্য দ্রব্যের অধিকাংশই সমুদ্র পথে পশ্চিম এসিয়া বা ইয়রোপে নীত হইত তথাপি এমন সময় ছিল যখন সেই সমস্ত অতীব মূল্যবান, দ্রব্যজাত অসংখ্য উষ্ট্র পৃষ্ঠে সুরক্ষিত হইয়া এই সমস্ত দুর্গম পথ দিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত দেশ সমূদয়ে প্রেরিত হইত। নিম্ন লিখিত কয়েকটী পথ দিয়া ব্যবসায়ীগণ সচরাচর পণ্যাদি লইয়া যাতায়াত করে।

(১) পারস্য হইতে মেসেদ দিয়া হিরাটের পথ।

(২) বোখারা হইতে মেমান দিয়া হিরাটের পথ।

৩। বোখারা হইতে কার্ষি, বাল্‌ক এবং খুলুম দিয়া কাবুলের পথ।

৪। পঞ্জাব হইতে পেশোয়ার এবং ভাতরা অথবা আব খানা দিয়া কাবুলে যাইবার গিরি-পথ।

৫। পঞ্জাব হইতে পেশোয়ার ও জামরুদ হইয়া কাবুলে যাইবার গিরিপথ ইহারই নাম খাইবার পাস।

৬। পঞ্জাব হইতে গুমাল বা ঘলারি দিয়া গজনি যাইবার পথ।

৭। সিন্ধু দেশ হইতে কান্দাহার যাইবার গিরিপথ ইহারই নাম বোলান পাস।

	ভারতের রপ্তানি	ভারত হইতে আমদানী	মোট
সিন্ধু দেশের সহিত (১৮৭০.৮১)	৩২৭৩২০,	১৭২১৮২০	২০৪৯১৪০
পঞ্জাবের সহিত (১৮৮০।৮১)	৩২৪০৫১০	৯৮৬০০০০	১৩১০০৬৭০
	৩৫৬৭৯০০	১১৫৮১৮৮	১৫১৪৮৯১১

এসিয়ার প্রাচীন বাণিজ্য প্রথার কিয়দংশ এখনও আফগানিস্থানে দেখা যায়। দেশে একদল বণিক আছে, ইহাদিগকে "পভিণ্ডা" কহে। ইহারা ভারতবর্ষ, খোরাসান বোখারা প্রদেশে বাণিজ্য করে। উষ্ট্র ও অশ্ব পৃষ্ঠে দলে দলে ইহারা বাণিজ্য করিয়া থাকে, সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র ও থাকে। ইহারা আত্মরক্ষা করিতে সর্ব্বদাই তৎপর, ইহারা কৃষিজীবি আবার বণিক এবং আবশ্যক হইলে ইহারাই আবার যোদ্ধা ও হয়, অতি প্রাচীন কালে যেরূপ প্রথায় ব্যবসা বাণিজ্য চলিত, ইহারাও ঠিক সেইরূপ ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। ভয় দেখাইয়া, যুদ্ধ করিয়া, ঘুস দিয়া, যেখানে যেরূপ সেই খানে সেইরূপ করিয়া ইহারা বৎসরের মধ্যে দুইবার বোখারা হইতে সিন্ধু তীরে আইসে। গ্রীষ্মকালে ইহারা গজনীতে ও কিলাতি ঘিলজাই প্রদেশে এবং হেমন্ত কালে সলিমান গিরিপথে আসিয়া বাস করে। সিন্ধু তীরে আসিয়া ইহারা ব্রীটিস কর্ম্মচারিগণের নিকট অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া ভারতে প্রবিষ্ট হয়। ইহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার ও উষ্ট্র পঞ্জাবে রাখিয়া রেলে কলিকাতাভিমুখে অথবা ষ্টিমার বা নৌকায় বোম্বাইয়ে করাচি অভিমুখে পণ্য দ্রব্য লইয়া যাত্রা করে. এমন কি দূর আসাম অথবা রেঙ্গুনে পভিণ্ডাগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সবল ও সুগঠিত কলেবর, তৈলহীন লম্বা চুল, প্রাংশু দেহ ও অপরিচ্ছন্ন বসন দেখিয়া ইহাদিগকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। মার্চ মাসে আবার ইহারা ফিরিয়া আসিয়া পাঞ্জাবে স্ত্রী পরিবার দিগের সহিত সম্মিলিত হয়, ও ঘিলজাই প্রদেশে গমন করে, তৎপরে কাবুল কান্দাহার বোখারা ও হিরাট প্রভৃতি স্থানে দলে দলে বিভক্ত হইয়া বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করে, হেমন্তের শেষে ঘিলজাই প্রদেশে আবার সকলে মিলিত হইয়া দেশে চলিয়া যায়। পারস্য শব্দ "পায়উইণ্ডা" (একগাঁইট মাল।) হইতে সম্ভবতঃ পভিণ্ডা শব্দের উৎপত্তি। লোহানি, রয়াজির, কাকর, ঘিলজাই প্রভৃতি জাতির যখন যে এইরূপ ধরণে ব্যবসা করে, তখনই তাহাকে পভিণ্ডা বলা হয়।

আফগানিস্থানের জাতি।—আফগানিস্থানের অধিবাসীগণকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) আফগান জাতি (২) যাহারা আফগান জাতি নহে। ইহার মধ্যে বলে, চরিত্রে ও সংখ্যায় আফগানগণই প্রধান। ডাক্তার বিলো সাহেবের পুস্তক পাঠ করিলে এই জাতির সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়।

আফগান জাতি প্রায় বারটী বড় বড় শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার মধ্যে বারটী সর্ব্ব প্রধান, যথাঃ—

দুরাণী।—পূর্ব্বে ইহাদের নাম আবদালি ছিল, কিন্তু ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে নাদের সাহের মৃত্যুর পর আমেদ সা দুরি দুরাণী অর্থাৎ (তৎকালের মুক্তা) পুরুষশ্রেষ্ঠ উপাধি গ্রহণ করিয়া এই প্রদেশের অধিপতি হয়েন, তদবধি অধিবাসীগণ দুরানি নামে পরিচিত। হিরাট ও কান্দেহারের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ দুরানী জাতির বাস ভূমি।

ঘিলজাই।—আফগান জাতির মধ্যে ঘিলজাই গণই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও স[illegible] গত শতাব্দিতে ইহারাই আফগানি স্থানের সর্ব্বে সর্ব্বা ছিল ও এক সময়ে ইহারাই ইস্পা[illegible]হানের ও অধিপতি হইয়াছিল। ইহারা কান্দাহারের উত্তরাংশস্থ বিস্তৃত উপত্যকায় বাস করে। কাবুল হইতে জেলালাবাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ঘিলজাই জাতির বাস। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আফগান যুদ্ধে ঘিলজাই গণ বিশেষ শক্রতা প্রদর্শন করিয়া ছিল, আমির দোস্ত মহম্মদ ভিন্ন শ্রেণীর আফগান হইলেও ইহারা সকলেই তাঁহার বিশেষ সাহায্য ও ইংরেজ সেনার বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়া ছিল। প্রাচীন মুসলমান ইতিহাসবেত্তাগণ ঘিলজাই জাতি কেই খিলিজি জাতি বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ইহারা তুর্ক জাতীয়, অনেক সুবিখ্যাত দিল্লির সম্রাট এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। ঘিলজাইগণ দেখিতে অনেকটা তুরস্ক জাতির ন্যায় আর ঘিলজাই ও খিলিজি নামে বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় যে প্রাচীন ইতিবেত্তাগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে।

জুজুফ জাই।—এই জাতি পেশোয়ায়ের উত্তর দিকস্থ পর্ব্বতে ও উপত্যকায় বাস করে। যাহারা পেশোয়ার প্রদেশে আছে তাহারা কেবল ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীন, অন্যান্য সকলেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। আফগান দিগের মধ্য ইহারা বড়ই দুর্দ্দান্ত বলিয়া খ্যাত।

কাকর।—সলিমান ও টবা পর্ব্বতে আফগানিস্থানের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে বেলুচি জাতির আবাস ভূমির নিকটে এই জাতি বাস করে,—ইহারাও প্রায় স্বাধীন। ইহাদের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আর অধিক কিছুই জানিতে পারা যায় নাই।

এতদ্ব্যতীত আরও কতক গুলি শ্রেণী আছে,—ইহার মধ্যে খুগিয়াণিগণ জেলালাবাদ প্রদেশে, মোমান্তজাইগণ পেশোয়ারের উত্তর পূর্ব্বস্থ পর্ব্বতে, (ইহার প্রধান সহর লালপুরা) খাটকগণ কোহাট ও পেশোয়ার প্রদেশে, উতমান খেল গণ পেশোয়ারের উচ্চতর পর্ব্বতে, বাঙ্গসগণ কোহাট, কুরাম ও মিরান জাই উপত্যকায়, আফ্রিদ্‌গণ পেশোয়ারের দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে, ওরাকজাই তিরা উপত্যকা ও কোহাটের উত্তর ও পশ্চিম অংশে এবং সিনওয়ারি জাতি খাইবার পর্ব্বত ও সাফেদকো উপত্যকায় বাস করে।

তাজিক।—যাহারা আফগান জাতি নহে।—ইহার মধ্যে তাজিক গণই প্রধান। ইহারা সমস্ত আফগান প্রদেশে আফগান গণের সহিত মিলিয়া বাস করে। পশ্চিম প্রদেশেই ইহাদের প্রধান বাস। ইহারাই আফগানস্থানের আদিম অধিবাসীগণের বংশ সম্ভূত

বলিয়া খ্যাত; ইহাদের প্রাচীন ইরাণ গণের বংশে জন্ম; ইহাদের ভাষাও অনেকটা পারস্য ভাষার মত। তাজিক গণ সবল ও দৃঢ়গঠিত; দেখিতে সুন্দর, আফগান দিগের ন্যায় আকার প্রকার বেশভূষা রীতিনীতি সকলই কিন্তু ইহারা ভ্রমণকারী নহে; সর্ব্বদা চাস বাস করে, যাহারা চাস বাস করে না তাহারা সহরে থাকিয়া কামার ছুতার প্রভৃতির কার্য্য করে। আফগানগণ এ সব কাজ প্রায়ই করে না। ইহারা আফগান গণের ন্যায় দুর্দ্দান্ত নহে; আফগান দিগের প্রতাপ ও প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া ইহারা সর্ব্বদা শান্ত শিষ্ট ভাবে বসবাস করিয়া থাকে। অনেকে আমিরের সৈন্যদলে সৈন্যের কার্য্যে নিযুক্ত হয়; ইহারা অনেকে পঞ্জাবপ্রদেশে দেশীয় সৈন্যের পল্টনে সৈনিকের কার্য্য করে। তাজিকগণ সকলেই সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমান। কাবুলের অন্তঃপাতি দামিনী-কো অঞ্চলের তাজিক গণ বড়ই দুর্দ্দান্ত ও প্রতিহিংসা পরবশ।

কিজিল বাসি—(লোহিত শির) ইহারা পারস্য দেশের অধুনিক অধিবাসী। আরও বিশদরূপে বলিলে ইহাদিগকে পারস্য ভাবাপন্ন তুরস্কের লোক বলিতে হয়। পারস্য দেশের বর্ত্তমান রাজবংশ এবং তথাকার প্রধান প্রধান অধিবাসীগণ সকলেই কিজিলবাসি শ্রেণি ভুক্ত। নাদের সার সময় হইতে ইহারা পারস্য দেশে বাস করিতেছে। কাবুল সহরে ইহারাই বণিক, ইহারাই চিকিৎসক, ইহারাই লেখক এবং ইহারাই ব্যবসায়ী। প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে প্রায়ই কিজিলবাসিগণ নিযুক্ত হয়। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্যের পল্‌টনে ইহাদের অনেকে কায করে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর; কাবুলের অন্যান্য অধিবাসী অপেক্ষা ইহারাই অধিকতর সুশিক্ষিত সুতরাং তথায় ইহাদেরই সম্মান অপেক্ষাকৃত অধিক। কিজিলিবাসিগণ অশ্বারোহণে বিশেষ সুদক্ষ, বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যতৎপরতার জন্যও ইহারা প্রশংসিত হয়। ইহারা সিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত সুতরাং আফগান গণের চক্ষে ইহারা বিধর্ম্মী। কেবল মাত্র পারসিয়ান ও কিজিল বাসি গণেরই যত্নে ও পরিশ্রমে কাবুল বর্ত্তমান সময়ে এতদূর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে; কিন্তু কিজিল বাসি গণ যতই কেন বড় ও যতই কেন সম্মানিত হউক না কিয়ৎপরিমাণে আফগানের অধীনতা স্বীকার না করিয়া জীবন যাপন করা তাহাদের কাহারই ভাগ্যেই ঘটে না।

হাজরা—আফগানিস্থানের উত্তর পশ্চিম দিকে যে ভূভাগ দুর্গম পর্ব্বতাকীর্ণ এবং হিন্দুকুশাদ্রির পশ্চিম প্রান্তস্থ পর্ব্বত শ্রেণি; (বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ যাহাকে প্যারো-প্যামিশস্‌ এই প্রাচীন নামে অভিহিত করেন) এই সমস্ত প্রদেশ হাজরাগণের আবাস ভূমি। ইহারা এই সকল পর্ব্বত শৃঙ্গের ৫০০০ ফিট হইতে ১০,০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চে বাস করিয়া থাকে। পর্ব্বতের যে অংশে ইহারা বাস করে সে অংশকে হাজারা জাত্‌ বলে। এ প্রদেশ এক প্রকার সম্পূর্ণ স্বাধীন; লোকে বলে কোন আফগানই ইহার মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে না।

মঙ্গোলদিগের মুখশ্রীর সহিত হাজরাগণের মুখশ্রীর অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। প্রথিত

নামা জেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার বংশধর গণের বিপুল বাহিনীর সঙ্গে যে সমস্ত মঙ্গোল জাতি পূর্ব্বদিক হইতে এ অঞ্চলে আগমন করে হাজরাগণ তাহাদেরই বংশ সম্ভূত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অন্যান্য জাতিও আছে। মেজর লিচ সাহেব লিখিয়াছেন খিলজাইগণ হাজরা দিগকে মুঘল বলে। মঙ্গল নামক একটী জাতি এখনও আফগানস্থানে আছে। ইহারা ঘোর পর্ব্বত ও মারঘাব নদীর নিকটস্থ প্রদেশে বাস করে। ইহারা মঙ্গোল ভাষায় কথা কহে। হাজরা জাতির মধ্যে পারস্য ভাষাই প্রচলিত। জেঙ্গিস খাঁর সৈন্য গণ "তুমান" ও "হাজরা" এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। "তুমান" অর্থে দশ হাজার এবং "হাজরা" অর্থে হাজার। বোধ হয় এই শেষোক্ত শব্দ হইতেই এই জাতির নাম "হাজারা" হইয়াছে।

হাজরা গণের আবাস ভূমির যে সকল স্থানে সহজে যাতায়ত করা যায় সেই সকল স্থানের অধিবাসীগণ আমীরকে কর দেয় কিন্তু অন্যান্য দুর্গম প্রদেশে সশস্ত্র সৈন্যগণের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহীত হয় না।

আরঘান্দাব ও হেলমণ্ড নদী দ্বয়ের উত্তর তট ভূমি, হিন্দুকুশাদ্রির যে পার্শ্বদ্বয় পূর্ব্বদিকে প্রায় আন্দারাব নদীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, বামিয়ানের পর্ব্বতময় প্রদেশ, এবং বন্ধ, মুরঘাব ও হরিরুদ নদীর উত্তর ভাগস্থ তাবৎ জলপথ, এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগে হাজরাদিগের বাস্‌ এই সমস্ত প্রদেশের মোট পরিমাণ ফল প্রায় ৩০,০০০ হাজার বর্গ মাইল। হাজরাদিগের গৃহ-নীতি অতীব কুৎসিৎ, তাহারা তজ্জন্য সর্ব্বত্রেই নিন্দিত হইয়া থাকে। ইহারা বারুদ প্রস্তুত করে, বন্দুক চালাইতে জানে। ইহাদের হাতের নিশান্‌ অতিশয় ঠিক।

শীতকালের প্রারম্ভে অনেক হাজরা চাকরীর চেষ্টায় আফগানিস্থানে ও পঞ্জাবে আসে। হাজরা জাতীয় স্ত্রী পুরুষ দাস দাসীর কার্য্য করার জন্য সচরাচর বিক্রীত হয়। লোকে এই জাতীয় দাস দাসী ক্রয় করিতে ভাল বাসে। গজনীর নিকটে যে সকল হাজরা বাস করে কেবল তাহারাই কৃষিজীবি, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে হাজরা গণ দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। হাজরাগণ সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান।

আইমক—হিরাটের পূর্ব্ব ও উত্তরাংশে এবং হাজরা প্রদেশের পশ্চিম ভাগে এই জাতির বাস। হাজরাদিগের সহিত এই জাতির বিশিষ্ট প্রভেদ কি আছে তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাতে এই মাত্র বলা যায় যে আইমকেরা ইরানি বংশ সম্ভূত এবং হাজরাগণ তুরাণি বংশ সম্ভূত।

আইমকেরা সুন্নি সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমান। ইহাদের একাংশ পারস্য রাজের অধীন।

হিন্দকী—আফগানিস্থানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেক হিন্দুর বাস আছে ইহারাই তথায় হিন্দকি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হিন্দকি গণ ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত বলিয়া

পরিচিত। প্রধানতঃ বানিজ্য ব্যবসায়ী বলিয়া অধিকাংশ প্রধান প্রধান গ্রামে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং নগর সকলেও ইহাদের সংখ্যা এবং প্রভাব অল্প নহে। দেশের বানিজ্য এবং আসরাফের (টাকা পয়সার) কার্য্য প্রধানতঃ ইহাদেরই হাতে। যদিও [illegible]রিক্ত কর ভারে প্রপীড়িত এবং অনেক স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত তথাপি ইহারা সমৃদ্ধি [illegible]পন্ন।

আর এক সম্প্রদায়ের হিন্দু আফগানিস্থানে বাস করে, ইহারা জাট নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের জাট ও এখানকার জাটেরা একই বংশসম্ভূত। এই জাতির উৎপত্তি কি প্রকারে হইল তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। ইহারা দেখিতে সুন্দর ও সবল। ইহাদের সংখ্যাও কম নহে কিন্তু ইহারা বড়ই দরিদ্র। জাটগণ ভৃত্য, নাপিত ও বাদ্যকরের কায করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

বেলুচি—ইহারা আফগানিস্থানের দক্ষিণ পূর্ব্বপ্রান্তবাসী কতকগুলি পার্ব্বত্যজাতি। ইহারা ইরানি বংশ সম্ভূত। ইহাদের মধ্যে কাসরাণি, হজদার, খোসাব, লাঘারি, গুরচানি মারি ও বুগতিই প্রধান। ইহারা অত্যন্ত কোপনস্বভাব, দুর্দ্দান্ত ও অসভ্য। এই সকল জাতি নামে মুসলমান প্রকৃত পক্ষে ইহারা মুসলমান ধর্ম্মের কোন নিয়মই প্রতিপালন করে না এবং ঘোরতর কুসংস্কারাচ্ছন্ন। প্রতিহিংসা গ্রহণ করা ইহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। কষ্ট সহিষ্ণুতায় এই জাতি অতুলনীয়। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে অথবা ক্ষুৎপিপাসায় ইহারা কখন কাতর হয় না, এবং উষ্ট্রের ন্যায় অনেকক্ষণ জল পান না করিয়া থাকিতে পারে। আফগান জাতি অপেক্ষা বেলুচিগণ অধিকতর সাহসী ও কার্য্যতৎপর।

কাবুল নদীর উত্তরাংশে যে পর্ব্বতাকীর্ণ জনপদ আছে তথায় নানা জাতীয় লোকের বাস। ইহারা কহিস্থানি লাগমানি ও সাফি প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত। ইহাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন অনেকটা প্রাকৃতিক ভাষার ন্যায়। প্রাচীন কালে কাবুল নদীর উত্তর তীরে যে সমস্ত অসভ্য জাতি বাস করিত ইহারা তাহাদেরই বংশ সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়।

জেলালাবাদের উত্তর হইতে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশকে কাফেরস্থান কহে। এই দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আফগানগণ বলে যে এই প্রদেশে "সিয়া পোষ" নামে কাফেরগণ (কৃষ্ণ বসন ধারী বিধর্ম্মী) বাস করে। ইহারা সম্ভবতঃ আর্য্য জাতির একটী শাখা অথবা এমনও হইতে পারে ইহারা মূল আর্য্যবংশের এক অংশ, বহু যুগ ধরিয়া আপনাদের আদি বাসস্থান বা তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে রহিয়া গিয়াছে। কোন ইয়রোপীয় লোক আজ পর্য্যন্ত ইহাদের কাহাকেও দেখেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের প্রান্তবাসী মুসলমানেরাও ইহাদের কোন সংবাদ দিতে পারে না। শুনা যায় ইহাদের মধ্যে কতক গুলি ইয়রোপীয় রীতি নীতি প্রচলিত আছে। ইহারা টেবল চেয়ার ব্যবহার করে ও কাষ্ঠে চারি পাঁচ তালা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এই সকল কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ সুন্দর

কারুকার্য্য শোভিত। মেজর ট্যানার সাহেব এই দেশ পর্য্যটন করিবার অভিপ্রায়ে ইহার প্রান্ত সীমাস্থ এরেট নামক স্থানে যান, তিনি বলেন এরেটের গৃহ সকলে যে প্রকার কারুকার্য্য আছে তাহা প্রকৃতই বড় সুন্দর। আফগানগণ এ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত বা পরাজিত করিতে পারে নাই, তবে প্রান্ত সীমাস্থ অধিবাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমান হইয়াছে। ইহাদিগকে নিমচা কহে।

জেনারল সার চার্লস ম্যাগ্রোর আফগানিস্থানের লোকসংখ্যা নির্ণয় করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন এই দেশের মোট লোক সংখ্যা ৪,৯০,১০০০ ইহার মধ্যে আড়াই লক্ষ আফগান। এই গণনার মধ্যে আফগান-তুর্কিস্থান, চিত্রল ও স্বাধীন ইস্ফজাই প্রদেশেরও লোকসংখ্যা ধরা হইয়াছে।

আফগান জাতি দেখিতে সুন্দর ও বলিষ্ঠ, অনেক সময় ইহারা দাড়ি রাখে ও মস্তকের ব্রহ্মতালুর কেশ মুণ্ডন করে। দেখিলেই ইহাদিগকে সাহসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও গর্ব্বিত বুলিয়া প্রতীতি জন্মে। ইহারা বড়ই শিকার প্রিয়। আফগান স্ত্রীলোক দিগের সৌন্দর্য্য ইহুদি প্রণালীর। ইহারা কেশ বেণীবদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠ দেশে বিলম্বিত রাখে। স্ত্রীলোকগণ কখনও জনসমাজে বাহির হইতে পারে না।

বাল্যকাল হইতে রক্তপাত দেখিয়া ইহারা মৃত্যুকে ডরায় না, শত্রুকে আক্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, তবে পরাজিত হইলে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে। ইহারা অতিশয় দুর্দ্দান্ত, আইন ও শাসনের একান্ত অবাধ্য। কোন উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায় থাকিলে ইহারা সরলতা ও সামাজিকতা দেখাইয়া থাকে, কিন্তু যে স্থলে সেরূপ কোন আশা নাই সে স্থলে ইহারা হিংস্র পশুবৎ নিষ্ঠুর। মিথ্যা কথা বলিতে, বিশ্বাসঘাতকতা করিতে অহঙ্কার দেখাইতে ইহারা বড়ই তৎপর। প্রতিহিংসা বৃত্তি ইহাদের মধ্যে এতই প্রবল যে ইহারা তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। সার হারবার্ট এডওয়ার্ড লিখিয়াছেন যে ইহাদের অপেক্ষা সুগঠিত শরীর আর কোন জাতিরই নাই, ইহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নীতি বুদ্ধিও আর কাহারও নাই।

শাসন প্রণালী—শাসন সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপার স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ গ্রামস্থ কতক-গুলি লোকে একটী সিদ্ধান্ত করে এবং এই সিদ্ধান্ত একজন প্রতিনিধির দ্বারা সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধি সভায় প্রেরিত হয়। এখানে বিতর্কিত হইবার পর সেই সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক সভায় প্রেরিত হয়। সম্প্রদায় গুলির প্রধান পুরুষরা জাতীয় সভারূপে সমবেত হইয়া ইহার চরম মিমাংসা করে। এই সকল সভা বা সমিতিতে বাগবিতণ্ডা এবং কলহাদি প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে কিন্তু জাতীয় সভার দ্বারা কোন ব্যবস্থা একবার স্থিরীকৃত হইলে জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি তাহা মানিয়া চলিতে বাধ্য, না চলিলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। মালিক অর্থাৎ জাতীয় প্রধান পুরুষেরা এই দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। নগরাদিতে এক জন কাজি এবং কতকগুলি মুফ্তির দ্বারা

মহম্মদীয় আইন অনুসারে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। লিপিবদ্ধ বিধি ছাড়াও কতকগুলি অলিখিত ও বহু প্রাচীন কাল সমাগত সূত্র ও ব্যবহারের দ্বারাও আফগানেরা অনুশাসিত ও পরিচালিত। ইহাকেই "পুক্তনওয়ালি" বলে। এই অলিখিত ব্যবস্থা শাস্ত্রের একটী প্রধান বিধির নাম "নানাওয়াতি" বা প্রবেশবিধি এই বিধি অনুসারে কেহ আসিয়া কোন পাঠানের বহির্দ্বারে প্রবেশ করিয়া এবং তাহার গৃহের নাম করিয়া যাহা কেন প্রার্থনা করুক না, সম্পত্তি এবং প্রাণ নাশ হইলেও পাঠান তাহা দিতে বাধ্য। সেইরূপ, কেহ আসিয়া আতিথ্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে আহার্য্য ও আশ্রয় দিতে পাঠান বাধ্য। প্রত্যেক অনিষ্ট ও অপমানের জন্য এবং জ্ঞাতি সম্পর্কীয় কাহারও প্রাণের জন্য প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে প্রত্যেক পাঠান বাধ্য। সময়ে সুযোগ না পাইলে বহু বৎসর ধরিয়া তাহারা সুযোগ প্রতীক্ষা এবং শত্রুকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করে এবং যখনই তাহাকে আয়ত্তাধীন পায় তখন নিরতিশয় নিষ্ঠুর নির্যাতনের দ্বারা প্রতিহিংসা গ্রহণ করে। এরূপ না করিলে পাঠানকে স্বসমাজে অবজ্ঞাত ও ঘৃণিত হইতে হয়। এক পুরুষে এই প্রতিবিধান কার্য্য সম্পন্ন না হইলে তাহার বংশাবলি পূর্ব্বপুরুষের অপমান বা অনিষ্টের প্রতিশোধ লইতে বাধ্য থাকে। অকারণে নরহত্যা, যুদ্ধে যাইতে অসম্মতি, জাতীয় সভার বিধি উল্লঙ্ঘন, ব্যভিচার, এই সকল অপরাধ পাঠানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দণ্ডনীয়।

আফগানগণ প্রধানতঃ "সুন্নি"—কেবল কতকগুলি জাতি "সিয়া" আছে কিন্তু সম্ভবতঃ তাহারা প্রকৃত পাঠান নহে। ইহাদিগের উপর মোল্লাদিগের প্রভাব অত্যন্ত অধিক এবং বিধর্ম্মী অপেক্ষাও সিয়াদিগের উপর তাহাদের বিদ্বেষ অধিক। এই জন্যই ইহারা পারস্য দেশবাসী দিগের উপর বিশেষ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে অন্য মুসলমানেরা যতটা ঘৃণা করে পাঠানেরা ততটা করে না। তবে যখন ধর্ম্মযুদ্ধে ইহারা উন্মত্ত হয় অন্য মুসলমানের সহিত ইহাদের প্রভেদ দেখা যায় না। এরূপ অশিক্ষিত ও অন্ধ বিশ্বাসী দিগের পক্ষে তাহা হইবারই কথা।

রাজ্য প্রণালী—বর্ত্তমানে যেমন আছে, ইতিপূর্ব্বেও তেমনি সময়ে সময়ে আফগানিস্থান একজন প্রধান শাসকের অধীন হইয়া থাকিয়াছে কিন্তু রাজপরতন্ত্র প্রণালী বলিলে আমরা যাহা বুঝি, ইহা তাহা নহে। এখানকার রাজ্য প্রণালীকে বরং একজন সামরিক নেতার বশবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাপরতন্ত্র মণ্ডলীর সমবায় বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে একজন করিয়া সরদার থাকে, এবং সে আপন প্রবৃত্তি ও ইচ্ছানুসারে তথাকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করে। এই সকল সরদারেরা কলহপ্রবন, দুরাকাঙ্ক্ষা এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন;—কেবল ভেদ নীতির অবলম্বনেই রাজা ইহাদিগকে স্ববশে রাখিতে পারেন। কোথাও একতা নাই, কোথাও স্থায়িত্ব নাই। যুদ্ধ কালেই হউক আর শান্তি কালেই হউক, সৈনিকেরা অকুণ্ঠিত ভাবে নেতা ছাড়িয়া নেতান্তরের অনুবর্ত্তী হয়। আফগান চরিত্রের গূঢ় রহস্য একজন বৃদ্ধ আফগান এলফিনষ্টোন সাহেবের কাছে এই

রূপ ব্যক্ত করিয়াছিল—"আমরা বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া থাকিতে পারি, নিত্য আতঙ্ক লইয়া থাকিতে পারি, সতত শোনিতপাত লইয়া থাকিতে পারি, কেবল প্রভু লইয়া থাকিতে পারি না।"

সৈন্য বিভাগ—পুরাতন আফগান সৈন্যের গঠন প্রণালী এরূপ ছিল যে এক এক জন যোদ্ধা বা সরদারের অধীনে এক গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের কতকগুলি করিয়া সৈনিক থাকিত, এই সকল সর্দ্দারেরা আবশ্যক মত সৈন্য সরবরাহের সর্ত্তে জমীজমা ভোগ করিতেন কিন্তু এই সকল সরদারদিগের উপর বিশ্বস্ত চিত্তে নির্ভর করিবার স্থল ছিল না। যুদ্ধকালে ইহাদিগের স্বপক্ষে যাইবার যত দূর সম্ভব ছিল, শত্রুপক্ষে যোগ দিবারও ততদূর সম্ভব ছিল, অর্থাৎ ইহারা নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে পক্ষাবলম্বন করিত। এই অনিষ্ঠ সম্ভাবনার প্রতিবিধানের জন্য আমির দোস্ত মহম্মদ খাঁ নিয়মিত সৈন্য সংগঠনের ব্যবস্থা করেন।

এক্ষণে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে আফগানিস্থানের নিয়মিত-সৈন্য বেতন পায় না কিন্তু অপরাধের জন্য অতি কঠোর ভাবে দণ্ডিত হয়।

ভাষা ও সাহিত্য—আফগানিস্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা আফগান বংশীয় নহে,তাহাদিগের ভাষা প্রায়সঃ ইরানি (ফারসী)। আফগানদিগের মধ্যেও যাহারা শিক্ষিত তাহারা এই ভাষায় অভিজ্ঞ। কিন্তু আফগানদিগের প্রকৃত ভাষার নাম, "পুস্ত" অথবা "পুক্তু"। ভাষাতত্ববিদেরা বিবেচনা করেন যে এই ভাষা একটী আর্য্য ভাষা। এই ভাষায় সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ, সেখ মালী নামক এক জন ইউসুফজাই জাতীয় সরদার কর্ত্তৃক "স্বাত" প্রদেশ বিজয়। এই ভাষার সাহিত্য কাব্য বহুল। আফগান কবিদিগের মধ্যে আবদর রহমানই সর্ব্বপ্রধান। হেলমণ্ড নদীর পশ্চিমে পুস্ত ভাষা বড় একটা ব্যবহৃত হয় না।

রাজস্ব—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে আমির দোস্ত মহম্মদের আয় ছিল ৪০,০০০০০ চল্লিশ লক্ষ টাকা। সে সময় আফগান-তুর্কিস্থান তাঁহার শাসনাধীনে ছিল বটে কিন্তু হিরাট তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল না। হিরাটের আয় সম্ভবতঃ ৮০০০০০ আটলক্ষ টাকা। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আমির দোস্ত মহম্মদ আফগানিস্থানের আয় অনেক বৃদ্ধি করেন; ঐ বৎসর হইতে তাঁহার আয় ৭১০০০০০ একাত্তর লক্ষ টাকা হয়। ইহার মধ্য হইতে প্রতি বৎসর ৪৩০০০০০ টাকা সৈন্য সংরক্ষণের জন্য ব্যয়িত হইত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের আয় ৭৩৩০০০০ টাকা হইয়াছিল। এক সময় আমির ইয়াকুব খাঁ মেজর বিডলফকে বলিয়াছিলেন যে আফগানিস্থানের মোট রাজস্ব ১৫০০০০০০ এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এই টাকার অনেক অংশ ফসলে আদায় হয় অর্থাৎ অনেক প্রজা নগদ টাকায় রাজকর না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ফসল দিয়া থাকে। ভূমির কর, সহরের শুল্ক, বানিজ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক, আমিরের খাসমহাল, জরিমানা, টাকশাল ও বাজেয়াপ্তি এই গুলি হইতেই আফগানিস্থানের আয় হইয়া থাকে।

ভূমির উৎপন্নের উপর টেক্‌স ধার্য্য আছে। এই টেক্‌স নগদ টাকা ও ফসলে (উভয় প্রকারেই) আদায় করা হয়। মেওয়ার বা অন্যান্য প্রকার বাগানের উপর বিশেষ একটা নিরীখে খাজনা আদায় হইয়া থাকে। যে সকল অধিবাসী পাঠান নহে তাহাদের প্রত্যেককে ৫৲ টাকা করিয়া বাড়ীর টেক্‌স দিতে হয়। পাঠান দিগকে অধিক টেক্‌স দিতে হয় না। হিন্দুগণকে জিজিয়া নামক কর দিতে হয়। প্রত্যেক হিন্দুর নিকট হইতে বৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক (কিছু বেশীরকমের) আদায় করা হইয়া থাকে, ইহাকেই জিজিয়া কর বা পোল টেক্‌স বলে। গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুর উপর কর আছে। প্রকাশ্য হাট বা বাজারে যে সকল পশু বিক্রীত হয় তাহার উপর স্বতন্ত্র টেক্‌স দেওয়ার নিয়ম আছে। আফগানিস্থানের অনেক প্রদেশে সশস্ত্র সৈনিকের সাহায্যে কর সংগ্রহীত হয়। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায় প্রজাদিগকে কেহ খাজনার কথাটিও বলে না, কিন্তু সরকারী তহবীলে যেই টাকার টানাটানি পাড়ে অমনি সশস্ত্র সৈন্যগণ বাকীকর সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত হয়। তখন দেশময় একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। অত্যাচার উৎপীড়নের সীমা থাকে না

কাবুল এবং কান্দাহারে পণ্য দ্রব্যের উপর নাম মাত্র শুল্ক আদায় করা হয়, এক শত টাকার দ্রব্য হইলে আড়াই টাকা মাত্র শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু রাজ কর্ম্মচারীগণ নানা প্রকার উৎপীড়নে অনেক বেশী টাকা আদায় করিয়া লয়।

যে সকল অশ্ব বিক্রয়ার্থ অন্য দেশে প্রেরিত হয় তাহাদের জন্য অনেক টাকা টেক্স দিতে হয়। পণ্য দ্রব্যের ভারবাহী পশুদিগের জন্যও টেক্‌স দিতে হয়। এই টেক্‌সের হার নেহাত কম নহে বোঝাই উট—৬ টাকা বোঝাই গর্দ্দভ ১ এক টাকা।

ইতিহাস—আফগান ইতিবৃত্ত লেখকেরা আপনাদের জাতিকে "বেনি ইজরেল" নামে অভিহিত করে। আরবী ভাষায় "বেণি ইজরেল" শব্দের অর্থ ইজরেলের সন্তান। তাহারা বলে যে, তাহারা শল (তালুত) রাজার বংশ সম্ভূত। এই শল বা তালুত্ রাজার পুত্র জেরিমীয়া এবং ইহার পুত্রের নাম আফগানা, সম্ভবতঃ ইহারই নাম হইতে দেশের নামকরণ হইয়াছে। আফগান কবিতায় এবং ইতিহাসে এই বৃত্তান্ত নানারূপে নানা মূর্ত্তিতে প্রকটিত দেখা যায়।

খৃষ্টাব্দের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে দারায়ুঃ হিস্তাসপিসের সময়ে, দেখা যায় যে আফগানিস্থান নানা প্রাদেশিক নামে একিম্যানীয় সাত্রাপি সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রীক ইতিবৃত্ত লেখক স্ত্রাবো যে প্রদেশকে আরিয়ানা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বর্ত্তমান কাবুল রাজত্ব বোধ হয় তাহাই; তবে দক্ষিণে এবং পশ্চিমে আরিয়ানার সীমা বর্ত্তমান কাবুল রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রসারিত ছিল। স্ত্রাবো বলেন খৃষ্টাব্দের প্রায় ৩১০ বৎসর পূর্ব্বে সিলুকস্ সিন্ধু নদের পশ্চিমে কতকটা প্রদেশ সম্রাট চন্দ্র গুপ্তের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়া যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। এই যৌতুক-প্রদত্ত প্রদেশের মধ্যে

যে কাবুলের কতকাংশ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার প্রায় ৬০ বৎসর পরে ব্যাকট্রিয়া প্রদেশে একটী সৃতন্ত্র এবং স্বাধীন গ্রীক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া আফগানিস্থানেরও কতকাংশ কবলিত করে। ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকেরা ভারতবর্ষে যে সকল সমরাভিযান করিয়াছিল, তাহার মূল ও কেন্দ্রস্থান কাবুলেরই উপত্যকা। ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক রাজাদিগের মুদ্রা এই প্রদেশে অনেক পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে (৬৩০—৪৫) চীন পরিব্রাজক হোয়েনসং কাবুল উপত্যকায় তুর্কি এবং হিন্দু উভয়বিধ রাজ্যই দেখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দিতে কাবুলের শেষ হিন্দু রাজা মুসলমানদের নিকট পরাজিত হয়েন এবং তথায় হিন্দু আধিপত্যের লোপ হয়। মহম্মদ গজনবী এবং মহম্মদ ঘোরি, উভয়েরই রাজ্যের কেন্দ্র এই আফগানিস্থান ছিল এবং ইহারা উভয়েই ভারত বিজয় করিয়াছিল। দ্বাদশ হইতে ষষ্ঠদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত যে সকল পাঠন বংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিল, আফগানিস্থানের সহিত সেই সকল পাঠান বংশেরই অন্নাধিক সম্বন্ধ ছিল।

দিগ্বিজয়ী তৈমুর সমস্ত আফগানিস্থান বিজয় ও অধিকার করিয়াছিলেন এবং এই রাজ্য খৃষ্টীয় ১৫০১ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই বংশীয়দিগের শাসনাধীন ছিল। ইহার কিছু দিনের মধ্যেই সুলতান বাবর ইহা অধিকৃত করেন এবং ১৫২২ খৃঃ অব্দে কান্দাহার প্রদেশও ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া লয়েন। তৎপরবর্ত্তী দুই শতাব্দি ধরিয়া কাবুল দিল্লির মোগল বাদসাহদিগের অধীনে ছিল, হিরাট পারস্য রাজের শাসনাধীন ছিল এবং কান্দাহার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রভুর হস্তগত ও হস্তান্তরিত হইয়াছিল। ১৭০৮ খৃষ্টীয় অব্দে পারস্য রাজকে তাড়াইয়া দিয়া এক জন ঘিলজাই সেনানায়ক কান্দাহারের আধিপত্য আত্মসাৎ করেন। ১৭১৫ খৃঃ অব্দে হিরাটও স্বাধীন হইয়াছিল। ঘিলজাই জাতি পারস্যের ইস্পাহান নগর দখল করিয়া ১৭২০ হইতে ১৭২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পারস্য রাজ্যের আধিপত্য করিয়াছিল। ইহারই পরে নাদির সাহের অভ্যুদয়। ১৭৩৭—৩৮ খৃঃ অব্দে নাদির সাহ সমস্ত আফগান প্রদেশ অধিকার করেন এবং ১৭৪৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা তাহারই অধীনে ছিল এই বৎসরে ঘাতুকের হস্তে তাঁহার অপমৃত্যু হওয়ায় তাঁহার রাজ্যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়ায়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ঘোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল, আহম্মদ সাহ দুরাণি, এই সুযোগে কাবুলে রাজ্য সংস্থাপন করিল এবং আফগান ভূমি হইতে (পারস্য দেশীয় দিগকে) ইরাণি দিগকে বিদুরিত করিয়া দিল। ১৭৭৩ সালে যখন আহম্মদ সাহার মৃত্যু হয় এই সময়ে আফগান রাজ্য উত্তরে তুর্কিস্থান ও অক্ষস্ পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পারস্য রাজ্যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অনারেবল মাউণ্ট ইষ্টুয়ার্ট এলফিনেষ্টোন সাহেবকে দূত রূপে আমির সা সুজার নিকট প্রেরণ করিলেন। আমির পেশোয়ার নগরে ইংরেজ দূতকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করেন।

আফগানদিগের সহিত ইংরেজের এই প্রথম সম্বন্ধ। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লেফটেনাণ্ট আলেক-জেণ্ডার বারনেস বোখারা যাইবার পথে কাবুল হইয়া যান। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পারস্য রাজ হিরাট দখল করায় ও রুসগণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বারনেস সাহেবকে রেসিডেণ্ট রূপে কাবুলে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে দোস্ত মহম্মদ কাবুলের আমির ছিলেন,—ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যাহা চাহেন,—আমির তাহাতে সম্মত না হওয়ায় দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সা সুজাকে (ইনি কাবুল হইতে তাড়িত হইয়া ভারতে বাস করিতে ছিলেন।) আমির করা স্থির হইল। পঞ্জাবাধিপতি রনজিৎ সিংহ এই যুদ্ধে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন, কার্য্যকালে তাঁহার রাজ্য মধ্য দিয়া ইংরেজ সেনাকে যাইতে দিতে অস্বীকৃত হইলেন,—কিন্তু একদল শিক সেনা সাহায্যার্থে দিলেন,—সার ক্লড ওয়েড সাহেব এই শিক সেনা ও একদল ইংরেজসৈন্য সহ খাইবার পাস দিয়া আফগানি স্থানে প্রবেশ করিলেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে উত্তর সিন্ধুদেশে ২১ সহস্র ইংরেজ সেনা সমবেত হইল, সার জন কীন ইহাদের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন। কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা কহানদিন সা পারস্য দেশে পলায়ন করেন, ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেলমাসে সা সুজা কান্দাহারে আমির বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ২১ জুলাই গজনী দখল হইল। দোস্ত মহম্মদ জয়ের আশা না দেখিয়া হিন্দুকুশ উত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিলেন এবং সা সুজা ৭ই আগষ্ট কাবুল নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে ভাবিয়া সার জন কীন ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু ৮০০ ইংরেজ সেনা কাবুল প্রদেশে রহিল, সার উইলিয়ম ম্যাক্‌নাটন দূত ও সার আলেকজাণ্ডার বারনেস রেসিডেণ্ট রূপে কাবুলে রহিলেন।

দুই বৎসর সা সুজা আফগানিস্থানে রাজত্ব করিলেন; দোস্ত মহম্মদ ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে যত্নের সহিত সমাদরে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু গোড়াগুড়িই দেশে অশান্তিও বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত ছিল,—২রা নবেম্বর (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) সহসা কাবুল সহরে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত হইল,—বারনেস সাহেব হত হইলেন, ইংরেজ সেনা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল, বিপদের উপর বিপদ ও লাঞ্ছনার উপর লাঞ্ছনা ঘটিতে আরম্ভ করিল। ২৩ সে ডিসেম্বর বিদ্রোহদলপতি ও দোস্ত মহম্মদের পুত্র আক্মদ খাঁর সহিত কথোপকথন কালে আক্মদ খাঁ স্বহস্তে সার উইলিয়ম ম্যাকনাটন সাহেবকে হত্যা করিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি ইংরেজ সেনা আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিবে,—এই মর্ম্মে সন্ধি পত্র সাক্ষর হইলে ইহারা প্রায় সংখ্যায় সাড়ে চারি হাজার (ইহার মধ্যে ৬৯০ জন ইংরেজ) কাবুল পরিত্যাগ করিল,—কিন্তু নিদারুণ শীত ও দুর্দ্দান্ত আফগান গণের হস্তে কেহই রক্ষা পাইল না,—কেবল ডাক্তার ব্রাইডন সাহেব অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় জেলালাবাদে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গজনীর সেনাগণ

গজনী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কেবল জেনারেল নট কান্দাহার ও জেনারেল সেল জেলালাবাদ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই ভয়াবহ অত্যাচারের দণ্ড দিবার জন্য মহাযুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রেল জেনারেল পলক্ সসৈন্যে জেলালাবাদে উপস্থিত হইলেন, ২১ আগষ্ট তথা হইতে যাত্রা করিয়া ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি কাবুল অধিকার করিলেন,—এদিকে জেনারেল নট গজনী ধ্বংস করিয়া কাবুলে আসিলেন;—কাবুলের বাজার ও দুর্গ ধ্বংস করা হইল। এই সকল কার্য্য শেষ করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরেজ সেনা কাবুল পরিত্যাগ করিল।

বিদ্রোহের প্রারম্ভেই সা সুজা হত হইয়াছিলেন,—দোস্ত মহম্মদকে মুক্তি দেওয়ায় তিনি গিয়া কাবুলের আমির হইলেন,—তাহার পুত্র আকবর খাঁ উজির হইলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে আমির দোস্ত মহম্মদ শিক দিগের সহিত মিলিত হইয়া আটক পর্য্যন্ত আসিলেন, গুজরাটের যুদ্ধে তিনি সের সিংহের সাহায্যার্থ একদল আফগান সেনা প্রেরণ করেন, ইংরেজ সেনা বহু দূর পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদানুসরণ করিয়াছিল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আমির বাল্ক জয় করিলেন, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইলেন,—পেশোয়ারে এই সন্ধি পত্র সাক্ষর হইল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমির কান্দাহার জয় করিলেন, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পারস্য রাজ হিরাট দখল করায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পারস্য উপসাগরে সৈন্য প্রেরণ করিলেন;—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আমির পেশোয়ারে আসিয়া গভর্ণর জেনারেল সর জন লরেন-সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গভর্ণর জেনারেল তাঁহাকে পারস্য রাজের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই উদ্দেশে মেজর লমস্‌ডেন ইংরেজ দূতরূপে কান্দাহারে যাত্রা করিলেন,—তৎপরেই ভয়ানক সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিল,—কিন্তু আমির এ সময়ে ইংরেজ পক্ষে অটল ভাবে ছিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদ হিরাট অধিকার করিলেন,—কিন্তু এই ঘটনার ১৩ দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সের আলি আমির হইলেন,—তাঁহার ভ্রাতাগণের সহিত যে বিবাদ বিসম্বাদে জড়িত ছিলেন তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন,—এক সময়ে তাঁহার অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছিল যে তাঁহার অধীনে বাল্ক ও হিরাট ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের হেমন্ত কালে তিনি পুনরায় কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন ও তাঁহার বিপক্ষগণকে পরাভূত করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে ভারতের লাট মেও সাহেব

আম্বালায় সের আলিকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা সংস্থাপিত হয় এবং তাঁহাকে ১২ লক্ষ টাকার অবশিষ্টাংশও প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত কামান বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রও তাঁহাকে প্রদান করা হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রুস গভর্ণমেণ্ট ও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টে অনেক লেখা লেখির পর স্থির হয় যে রুস গভর্ণমেণ্ট কখন কাবুল গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবেন না। অকসাস নদী ইহার শেষ সীমা বলিয়া ধার্য্য হয়। এই ঘটনার পর ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়টী ঘটনা উল্লেখ যোগ্য,—প্রথম, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমির ব্রীটিশ গভর্ণমেণ্টর নিকট নিজ রাজ্য নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য জামিন ও তাঁহার পুত্র পৌত্রগণই যে তাঁহার সিংহসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইংরজেগণকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গিকারাবদ্ধ করিবার চেষ্টা পান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন আফগানি স্থানে ব্রীটিস রেসিডেণ্ট রাখিবার চেষ্টা পান। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই উদ্দেশে পেশোয়ারে এক সভা হয়,—কিন্তু আমিরের দূতের মৃত্যু হওয়ায় ইহার কোনই মীমাংসা হয় না।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জেনারেল স্তলিতফ রুস দূত রূপে কাবুলে আগমন করিলে আমির তাঁহাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু ইহার কিয়দ্দিন পরে ইংরেজ দূত সার নেভিল চাম্বারলেন কাবুলে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে আমির অস্বীকৃত হয়েন। প্রথমে বুঝাইবার চেষ্টা পরে তাহাকে এক শেষ পত্র লেখা হয়,—তাহারও কোন উত্তর আমির প্রদান না করায় তিনি ব্রীটিস গভর্ণমেণ্টের সহিত শক্রতাচরণ করিতেছেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয় এবং এই জন্য ২১শে নবেম্বর আফগানিস্থান আক্রমণ করা স্থির হয়। তৎপরেই ইংরেজ সৈন্য আমিরের সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া খাইবার প্রভৃতি স্থান অধিকার করিল। ১৩ ডিসেম্বর রুস দূত সহ আমির কাবুল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি আফগান তুরস্কস্থানে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর পুত্র ইয়াকুব খাঁ কাবুল-কারাগারে বন্দি ছিলেন,—পিতা পলায়ন করিলে পুত্র মুক্তি লাভ করেন ও কাবুলবাসী-গণ তাঁহাকেই আমির বলিয়া স্বীকার করে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গণ্ডামুখ নামক স্থানে ইয়াকুব খাঁ স্বইচ্ছায় ইংরেজ শিবিরে আসিয়া ইংরেজের সকল প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ধি সংস্থাপন করেন। এই সন্ধি পত্রের নিম্ন লিখিত তিনটী সর্ত্তই প্রধান,—যথা আফগানিস্থানের সীমা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন,—কাবুলে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট থাকিবে এবং অন্যান্য রাজ্যের সহিত সন্ধি বিগ্রহ কোন কিছু করিতে হইলে তাহা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টেই কাবুলে যাইয়া করিবেন। এই সন্ধি অনুসারে সার লুই কাভাগনারি কাবুলে রেসিডেণ্ট রূপে প্রেরিত হয়েন। তাঁহাকে বিশেষ আদরে অভ্যর্থনা করা হয় কিন্তু ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর কাবুলবাসীগণ সহসা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ইংরেজগণ পরাজিত হয়েন

অতঃপর দুর্ব্বৃত্ত কাবুলীগণ ব্রিটিস রেসিডেন্ট ক্যাভেগনারী এবং তাঁহার শরীর রক্ষক সমস্ত সৈন্যদিগকে হত্যা করে।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাবুলীদিগের এই অন্যায় ও অতি নৃশংস ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারতে তুমুল যুদ্ধের আয়োজন হয়। সার ফ্রেড্রিক রবার্টস (তখন জেনারেল) সেনানায়কের-পদে অভিষিক্ত হইয়া বিপুল বাহিনী সঙ্গে কুরামের পথ দিয়া কাবুলে প্রবিষ্ট হন। তিনি অত্যল্প আয়াসেই কাবুল নগর অধিকার এবং বালাহিসারের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের কতকাংশ তোপে উড়াইয়া দেন। আমীর ইয়াকুব খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া বন্দিভাবে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। পরে বর্ত্তমান আমীর আবদুর রহমন কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

প্রাচীন কীর্ত্তি। কাবুল নদীর উভয় তটেই বৌদ্ধদিগের অনেক প্রাচীন [illegible] বিদ্যমান আছে। (কাবুল শব্দ দ্রষ্টব্য)। (আমীর ও কাবুল শব্দে, আফগানি[illegible] আরও অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে)।

আভা।—ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী। ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত, মিতা[illegible] নামক আর একটী নদী এই সহরের পূর্ব্ব দিয়া আসিয়া ইরাবতী নদীতে মিলিয়াছে। এই সহরের চারিদিকেই নদী। সহরটী দুই ভাগে বিভক্ত,—একটী বাহিরের সহর অপরটী ভিতরের সহর, এই দুই সহরই সুদৃঢ় প্রাচীরে রক্ষিত। এখানে ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী অতি অল্প, বোধহয় ৬।৭টার অধিক নাই। অন্যান্য মগ সহরের ন্যায় আভাতেও অনেক মন্দির আছে, দূর হইতে এই সকল মন্দিরের জন্য সহর বড়ই সুন্দর দেখায়, কিন্তু সহরে প্রবিষ্ট হইলে এ সৌন্দর্য্য আর থাকে না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় মন্দিরটী দুইটী [illegible] গঠিত, একটী প্রাচীন, অপরটী আধুনিক। প্রাচীন মন্দিরে একটী প্রস্তর [illegible] মূর্ত্তি আছে। আভাতে ১১টী বাজার আছে, এই সকল বাজারে সকল প্রকার দ্রব্য (চিন দেশীয় দ্রব্য হইতে বিলাতি দ্রব্য পর্য্যন্ত) পাওয়া যায়। দিন দিন এই সহরের সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতেছে। অমরপুর ও সেগাইন লইয়া আভা প্রাচীন রাজধানী ছিল, কিন্তু এক্ষণে এই সকল স্থানে ভগ্নস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে আভা নগর সংস্থাপিত হয়, তদবধি বরাবর ইহা ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। উল্লিখিত তিনটী সহরের সহিত তিনটী জেলা সম্মিলিত থাকা জানা যায়। যখন আভা ব্রহ্মের রাজধানী ছিল তখন এখানে ৫০,০০০ হাজার লোক বাস করিত। এখন এখানে আট নয় হাজার লোকের বাসও নাই। আভায় যে বুদ্ধদেবের মন্দির আছে তাহার নাম মাওঙ-রত্ন। এই মন্দির মধ্যে ২৪ ফিট অর্থাৎ ১৬ হাত উচ্চ বুদ্ধ মূর্ত্তি ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন। ইহার মস্তকের ব্যাস ৮ ফিট।

আম্বালা সহর।—আম্বালা জেলার সদর কাছারি গাগর নদী হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। সম্ভবমত চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে অম্বরাজ পুত্র কর্ত্তৃক এই সহর স্থাপি-

পিত হয়, কিন্তু ইংরেজ অধিকৃত হইয়াই এই সহর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে যখন এই প্রদেশস্থ রাজ্য সকল ইংরেজ অধিকৃত হয়, তখন সরদার সঞ্জবক্ষ সিংহের বিধবা পত্নী আম্বালার অধীশ্বরী ছিলেন। রণজিৎ ইহাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন, কিন্তু কর্ণেল অক্টরলনি গিয়া ইহাঁকে পুনরায় আম্বালা প্রদান করেন। এই বিধবার মৃত্যু হইলে ...জ গভর্ণমেণ্টের হয় ও এই সময়ে এইখানেই. পলিটিকাল এজেণ্টের বাসভূমি ...৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সহরের কিছু দূরে একটী সেনা নিবাস সংস্থাপিত হয়। ১৮৪৯ ... ইংরেজ শাসনাধীনে আসিলে আম্বালাকে জেলার সদর বলিয়া স্থির করা হয়। ...চারিদিকে প্রাচীর নাই ও ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ একভাগ নূতন, ...রাতন। পুরাতন বিভাগের রাস্তা ঘাট বড়ই অপ্রসস্ত, তবে নূতন সহরের রাস্তা ... দেখিতে সুন্দর। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আমির সের আলিকে অভ্যর্থনা করিবার ...রে এক মহা দরবার হয়।

...রে পূর্ব্বে বড়ই জলকষ্ট ছিল, কিন্তু এক্ষণে মিউনিসিপালিটী এ অভাব দূর ... ক্যানটনমেণ্ট সহর হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানকার গির্জ্জা ... শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। এখানে কয়েকটী হোটেল ও একটী ডাক বাঙ্গলাও ...তন সহর ও সেনা নিবাসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আদালত প্রভৃতি আছে। আম্বালা ...জ্যের পক্ষে বড়ই সুবিধা জনক স্থানে অবস্থিত। সিমলার রেলওয়ে ষ্টেসন বলিয়া ...রও খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এখান হইতে কালকা পর্য্যন্ত একটী রেল হই- ...ই কারণে আম্বালায় অনেকগুলি ইংরেজের দোকান আছে। নানারূপ দ্রব্যের ... বাণিজ্য এখানে খুব চলে। এই সহরের লোক সংখ্যা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ৫০,৬৯৬ ছিল, ... ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৬৭,৪৬৩ হয়।

আমহার্ষ্ট।—ব্রহ্মদেশের তিনাসেরিম বিভাগের একটী জেলা। পরিমাণ ফল ১৫,১৮৯ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৩০১,০৮৬। ইহার উত্তরে সালুইন ও কিয়ান ইক নদী, পূর্ব্বে আঙ্গিয়ান নদী, দক্ষিণে মালই পাহাড়, পশ্চিমে খিবলিম নদী, ও মাটাবান উপসাগর।

প্রাকৃতিক ভাব।—মোলমেনের চতুর্দ্দিকে শস্যস্থি ক্ষেত্র সমস্ত সালুইন ও অন্যান্য নদী-সলিলে সিক্ত হয়। পূর্ব্ব প্রান্তের কতক ভূমি গভীর বনাকীর্ণ, তাহার মধ্যে মধ্যে দাওনা পর্ব্বতের ক্ষুদ্রাংশ সমস্ত দৃষ্ট হয়। দাওনা জেলায় মুলাইৎ পাহাড়ের ৫,৫০০ ফিট উচ্চ একটী শৃঙ্গ আছে, এই শৃঙ্গ হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় বহির্গত হইয়া উত্তর পশ্চিমে প্রায় এক শত ক্রোশ স্থান আবৃত করিয়াছে। কতকগুলি পাহাড় আগ্নেয় গিরির স্বভাবাপন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। গিয়াং নদীর পূর্ব্বে ও মোলমেনের উত্তরে জেৎকাবেঙ নামক চূণা পাথরের এক পাহাড় আছে।

ইতিহাস।—বহু শতাব্দি পর্য্যন্ত আমহার্ষ্ট প্রদেশের ইতিহাসে যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এক দিকে সায়ামীগণ ও অপর দিকে পেগু বাসীগণ

আক্রমণ করিয়া এই প্রদেশ বাসীগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। পরে সায়ামীগণ এদেশ হইতে দূরীকৃত হয় ও পেগু বাসীগণ মগ কর্তৃক পরাজিত হয়। মগরাজ নরপতি সিথু ইহার প্রাচীন রাজধানী মার্টাবান নগর সংস্থাপিত করেন। তিনি এইখানে [illegible] প্যাগোডাও স্থাপিত করেন ও আলিনমাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। [illegible] সিথুর পুত্র সিংহাসনাধিরোহণ করিলে অলিনমা তাঁহার দরবারে আসিতে অস্বীকৃত [illegible] ইহাতে রাজা তালাপ্যাকে তাঁহার স্থানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। আলিনম[illegible] রাজের সহিত মিলিত হইয়া তালাপ্যাকে দূর করিয়া পুনরায় নিজে শাসনকর্তা [illegible] হইলেন। অনেক বৎসর পর্য্যন্ত মগরাজ উত্তরে চীনদিগের উৎপীড়ণে উৎপীড়ি[illegible] এবং দক্ষিণের অধিবাসীগণ তাহাদের শাসন মানিত না। মাতাগু নামক একজ[illegible] সায়াম রাজ কর্তৃক এক সময়ে মার্টাবানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েন। এই ব[illegible] কন্যাকে বাহির করিয়া লইয়া মার্টাবানে আসিয়া আলিনমাকে গুপ্তভাবে হত[illegible] ১২৮১ খৃষ্টাব্দে সায়াম রাজ তাঁহাকে মার্টাবানের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন, তদ[illegible] রাজা ওয়াবিচু নামে খ্যাত হয়েন। ওয়াবিচু মার্টাবানের উত্তর প্রদেশ শীঘ্রই দখ[illegible] বইসেন। এই প্রদেশকে কানপানানি বলিত, রাজা শিকারে অনুপস্থিত থাকা[illegible] রাজা ওয়াবিচু তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠন ও তাঁহার কন্যাকে হরণ করিয়া আইসে[illegible] সময়ে মার্টাবান রাজ পেগু রাজকে সহায় করেন। পরে মার্টাবান রাজ্যের সহি[illegible] টাভয় ও তেনাসেরিম রাজ্য সম্মিলিত হয়। [illegible] ইতিহাস। কারণ পেগুই পরে রাজধানী হয়[illegible] ফ্রেডেরিক নামে একজন ভিনিসবাসী পে[illegible] অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। এই সময় হইতে এই প্রদেশে ক্রমাগত যুদ্ধ [illegible] থাকে, এক অংশ সায়াম রাজ দখল করিয়া লয়েন, অপর অংশ মগ রাজ অনঙ্গপারা অধিকার করেন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় এই প্রদেশের কতকাংশ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে আইসে, পরে ২য় ব্রহ্মযুদ্ধের পর সমস্ত অংশই ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করা হয়।

প্রাচীন চিহ্ন।—এই প্রদেশের বিলু দ্বীপে ৬০টী পোস্তা আছে। মার্টাবানের প্রধান মন্দিরের নাম মেথিয়ান চাল, রাজা ওয়াবিচু নির্ম্মান করেন। খাইকাপান নামক মন্দির ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে আলিনমা নির্ম্মাণ করেন। খাটুন নামক পোস্তাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান। ব্রহ্ম দেশীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে এই মন্দির ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। লোকে বলে যে গৌতম বুদ্ধ এ প্রদেশে আগমন করিলে তাঁহার এই আগমন চিহ্ন স্বরূপে এই মন্দির নির্ম্মিত হয় ও ইহাতে তাঁহার কেশ সংস্থাপিত করা হয়। খাইকাপান মন্দির মোলমেনে সর্ব্বপ্রধান পোস্তা। মোলমেনের নিকট আরও কতকগুলি প্রাচীন পোস্তা আছে। খাটুন ও মার্টাবান উভয় নগরই এক সময়ে প্রাচীন রাজধানী ছিল, কিন্তু এক্ষণে এ দুইটীই ভগ্নাবশেষ মাত্র।

লোক সংখ্যা।—১৮২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমহার্ষ্ট প্রদেশ যুদ্ধ বিগ্রহে পূর্ণ ছিল, এই প্রদেশ যখন ইংরেজ শাসনাধীনে আসিল তখন এখানে প্রায় জনপ্রাণী কেহই ছিল না। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সিবিরাম রাজা নামক একজন বিদ্রোহী মগ সর্দ্দার দশ হাজার লোক লইয়া মোলমেনে বাস করিল। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে ব্রহ্মদেশ হইতে ২০ হাজার লোক আসিয়া বাস করে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই জেলার লোক সংখ্যা [illegible],০০০ ছিল, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ৮৫,০০০ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১২৭,৪৫৫ হয়। পেগু প্রভৃতি প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া এই প্রদেশে বাস করায় লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি [illegible]। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লোক সংখ্যা ৮৩,১৪৬ ছিল, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৩০,৯৫৩ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে [illegible]৭৪৭ হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে ১৯৩,৪৬৮ দেখা যায়, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের [illegible]রি মাসে এই জেলার লোক সংখ্যা ৩০১,০৮৬ হইযাছিল।

এই জেলার অধিকাংশ অধিবাসী তেলাং জাতীয়. পূর্ব্বে সান নামক এক প্রকার [illegible] জাতি এই প্রদেশে আসিয়া বাস করে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের তিলিঙ্গিনার বহুসংখ্যক লোক আসিয়াও এইস্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে এই দুই জাতি এক হইয়া গিয়া তেলাং জাতি হইয়াছে। ইহাদের ভাষা মগ ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থানে ইহারা এক্ষণে আবার মগ জাতিতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু আমহার্ষ্ট প্রদেশে ইহারা এখনও একটী স্বতন্ত্র জাতি হইয়া রহিয়াছে। এ প্রদেশে আসল মগ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। আরাকানিস ও সান জাতির অনেকে আসিয়া এ প্রদেশে বাস করিতেছে। [illegible]দু ও মুসলমানও আছে, মুসলমানগণ অনেকে ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়াছে। [illegible] জেলার প্রধান নগর মোলমেন, আমহার্ষ্ট ও মার্টাবান। মার্টাবান অতি প্রাচীন [illegible]ী, কিন্তু এক্ষণে ইহার আর সে সমৃদ্ধি নাই। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জেনারেল সার [illegible]বও কাম্পেন সাহেব মোলমেনে ইংরেজ সেনানিবাস সংস্থাপন করেন, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এইখানেই এই জেলার সদর কাছারি সংস্থাপিত করা হয়। এ প্রদেশের সহিত তেনাসিরিম প্রদেশ সংযুক্ত হইলে লাট আমহার্ষ্ট সাহেব নিজ নামে আমহার্ষ্ট সহর সংস্থাপন করিয়া এইখানে এ প্রদেশের সদর কাছারি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

কৃষি।—এই জেলার অধিকাংশ জঙ্গলে পূর্ণ ও কতকাংশ বর্ষাকালে একেবারেই জল-প্লাবনে ডুবিয়া যায়, তবে নদীর তীরে চাউল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। সুপারিও খুব জন্মে, তামাক প্রভৃতিও জন্মিয়া থাকে। পার্ব্বত্য অংশে অল্প পরিমাণে তুলাও উৎপন্ন হয়। আকের চাষই এই জেলার প্রধান কৃষি। ১৮৭৫।৭৬ খৃষ্টাব্দে এখানে মোট ১,১৮৯টী আকের আবাদ ছিল। বড় বড় বৃক্ষই জঙ্গলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। জঙ্গল হইতে গাছ কাটা হইলে এই সকল সেগুন প্রভৃতি গাছ নদীর জলে ভাসাইয়া আনা হয়। এই গাছ কাটা ও গাছ আনয়ন ব্যাপার সম্পূর্ণ নূতন। প্রথমে গাছকাটাগণ নিজ নিজ গাছে দাগ দিয়া আইসে, পরে তিন বৎসর পরে এই সকল গাছ কাটা হয়, তৎপরে হাতি দিয়া টানিয়া গাছ নদীর

মধ্যে ফেলিয়া রাখা হয়। বর্ষাকাল যতদিন না আইসে ততদিন এই গাছ এই স্থানেই পড়িয়া থাকে, তৎপরে বর্ষাকাল আসিলে নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলে। কখন কখন গাছকাটাগণ তীরে তীরে নিজ নিজ গাছের সঙ্গে হাতীতে যায়, কখনও বা গাছ আপনি ভাসিয়া যাইতে থাকে। পরে জঙ্গল ছাড়িয়া নদী যেখানে লোকালয়ে আসিয়াছে সেইখানে নদীতে বড় বড় দড়ি রাখা হয়, ঐ দড়ীতে কাট সকল আসিয়া বাধিয়া যায় ও জমিতে থাকে। এইখানে গাছকাটাগণ নিজ নিজ গাছ চিনিয়া লয় ও পরে সেই সকল গাছে ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া সহরে বা বন্দরে চলিয়া যায়। এ প্রদেশে গমনাগমন নৌকাতেই করিতে হয়, সমস্ত জেলায় মোট ৬২ মাইল রাস্তা আছে।

উৎপন্ন দ্রব্য।—খাটনে বহু পরিমাণে চিনি প্রস্তুত [illegible] স্থানে রপ্তানি হয়। এ জেলার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য চাউল ও কাঠ। প্রতি বৎ[illegible] কাঠ [illegible] প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এ জেলায় কয়েকটী [illegible] আছে। তুলা ও চামড়াও কিছু কিছু রপ্তানি হইয়া থাকে, লবণ, [illegible] অন্যান্য নানা প্রকার বিলাতি দ্রব্য এ প্রদেশে আমদানি হয়।

শাসন প্রণালী।—তেনাসেরিম প্রদেশ গৃহীত হইলে এই দেশ এতই রাজ[illegible] বলিয়া বোধ হয় যে গবর্ণমেণ্ট ইহা পরিত্যাগ করিতে এক সময়ে প্রস্তুত হই[illegible] তবে এখানে বড় বড় সেগুন প্রভৃতি গাছ আছে দেখিয়া ইহা রাখা হয় ও পরে [illegible] গাছই এ প্রদেশের ধনের আকর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ১৮৫৫।৫৬ খৃষ্টাব্দে এ[illegible] মোট রাজস্ব ৪৪৯,৬৬০৲ টাকা ছিল। ১৮৬২।৬৩ খৃষ্টাব্দে মোট ৯৩৪,৮৬০৲ ছি[illegible] খৃষ্টাব্দে ১৩৭৭,৩৭০৲ টাকা হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১৬৮৭,৪৯০৲ হয়, ১৮৮১।৮২তে [illegible] টাকা হইয়াছিল। এই জেলা ১১টী বিভাগে বিভক্ত। বিচারের জন্য মোলমেনে একজ[illegible] জজ ও মফস্বলে ১৮ জন বিচারক আছেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মোট পুলিশ কর্ম্মচারি ৭১৯ ছিল। ঐ বৎসর এখানে ৩৬১টী স্কুল ছিল। এ বৎসর ৮,৪৩৮ বালক ও ১,০৯২ বালিকা লেখা পড়া করিতেছিল। এ জেলা হইতে দুইখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। মোলমেনে গবর্ণমেণ্টের একটী হাইস্কুল আছে, এতদ্ব্যতীত মিসনারীদিগের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী স্কুলও আছে। মগ স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা বিষয়ে তত যত্ন করা হয় না, তবে মগ রমণীগণ সামান্য সামান্য ব্যবসা সমস্তই একচেটিয়া করিয়াছে।

আমেদাবাদ।—বম্বের উত্তর বিভাগের গুজরাট প্রদেশস্থ একটী জেলা। পরিমাণ ফল ৩,৮২১ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৮৫৬,৩২৪। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেনসস্ রিপোর্ট অনুসারে মোট—২৭৭,১৯৫। স্ত্রীলোক ১৩৭,৭৬৫, পুরুষ ১৩৯,৪৯০।

হিন্দু	মুসলমান	জৈন	খৃষ্টিয়ান	ইহুদি	পারসি	য়্যানিমিষ্টিয়া	অন্যান্য
১৯১,৮৩৬,	৬০,৫৭৩,	২২,৫৫১,	১,০৯২,	১৬৫,	৭৭৯,	১৬২,	৩৭,

এই জেলার রাজধানী আমেদাবাদ সহর।

আমেদাবাদ জেলার পশ্চিমে ও দক্ষিণে কাটিওয়ার প্রদেশ, উত্তরে বরদা রাজ্যের উত্তরাংশ, পূর্ব্বে বালাসিনর রাজ্য ও কয়রা জেলা। এই জেলার সীমা-রেখা বরাবর অক্ষুন্ন নহে, ইহার পাবানতিজ ও ঘোগা নামক দুইটী মহকুমা দেশীয় রাজ্যদ্বারা সম্পূর্ণই মূল জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন, অথবা এই দুইটী মহকুমা সম্পূর্ণ ই দেশীয় রাজ্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত। এতদ্ব্যতীত এই জেলার মধ্যস্থিত কয়েকটী গ্রাম বরদা ও কাটিয়ার রাজের অধিকৃত। আবার ঐ উভয় রাজ্য মধ্যস্থিত কয়েকটী গ্রামও ব্রৌটিস অধিকার ভুক্ত এবং এই জেলার অন্তর্গত।

প্রাকৃতিক ভাব।—এই জেলার বাহ্যিক ভাব দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে পূর্ব্বে এই [illegible] সমুদ্রের গর্ভে ছিল। কাম্বে উপসাগর ও কচ প্রণালীর মধ্যস্থিত প্রদেশ এখনও জো[illegible] ডুবিয়া যায়। অতি দক্ষিণাংশে ও উত্তর সীমার অব্যবহিত বাহিরে কয়েকটী [illegible] আছে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত প্রদেশটী সমতল হইয়া উত্তর ও পূর্ব্বদিকে [illegible]য়াছে, কোথায়ও ক্ষুদ্র বালুকাস্তূপ ব্যতীত আর উচ্চ পাহাড় পর্য্যন্ত

[illegible] দিয়া সবরামতী নাম্নী নদী প্রবাহিত,—এই নদী উত্তর পূর্ব্বে আফগানী প[illegible]শেষাংশে উত্থিত হইয়া অবশেষে কাম্বে সাগরে মিলিত হইয়াছে। ইহা লম্বে প্রায় ২০০ শত মাইল, কয়েকটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শাখা নদী এই নদীর সহিত আমেদাবাদ সহরের উত্তরে ও দক্ষিণে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। সবরামতী নদীতে নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না, আর এই নদীর জল এতই লোণা যে চাস পর্য্যন্ত ইহার জলে হইতে পারে না। এই জন্য এই জেলায় সর্ব্বত্রই ইন্দেরা দেখিতে পাওয়া যায়। ২৫ ফিট আন্দাজ খনন করিলেই উৎকৃষ্ট জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল কুয়া ব্যতীত পুষ্করিণী ও বৃষ্টির জল বাঁধিয়া রাখিবার জন্য চৌবাচ্ছাও যথেষ্ট বিদ্যমান আছে, কেবল যে সহরে বা সহরের নিকটেই কেবল এইরূপ পুষ্করিণী দেখা যায়, তাহা নহে সহর হইতে বহু দূরে পল্লীগ্রামেও এইরূপ অনেক পুষ্করিণী আছে। যে বৎসর যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি হয়, সে বৎসর জলের কোনই অভাব হয় না, কিন্তু যে বৎসরে এই জেলায় বৃষ্টির অভাব হয়, সে বৎসর জলের বড় কষ্ট হইতে থাকে ও অনেক গরু ছাগল প্রভৃতি মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আমেদাবাদ হইতে ৩৭ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বিরামগ্রাম নামক মহকুমায় নান নামক এক হ্রদ আছে, ইহার পরিমাণ ৪৯ বর্গ মাইল। ইহার জল সকল সময়েই কটু, কিন্তু যতই গ্রীষ্মকাল আসিতে থাকে ততই ইহা লোণা হয়। হ্রদের ধারে বহু ঝোপ ও দাম আছে এই সকল স্থানে অনেক প্রকার জলচর পক্ষী বাস করে। হ্রদের মধ্যে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, গ্রীষ্ম কালে এই সকল স্থানে অধিবাসীগণ গরু চরাইয়া থাকে। আমেদাবাদ জেলার উত্তরাংশে পাবানতিজ সহরের নিকট আরও দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। ইহার মধ্যে বড়টীর পরিমাণ প্রায় ১৬০ একার, এটী ৩০ ফিট গভীর ও ইহার জল পানের উপযুক্ত। ছোটটীর

পরিমাণ ৩১ একার, ইটী বর্ষাকালে ৮ ফিট গভীর থাকে, কিন্তু কোন কোন বৎসর গ্রীষ্ম কালে একেবারেই শুকাইয়া যায়।

বিরামগ্রাম মহকুমার নিকট গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী যে পাথরের কারখানা আছে, এই পাথর ব্যতীত আমেদাবাদ জেলায় আর কোন খনিজ দ্রব্য নাই। এ জেলায় কোন বড় অরণ্যও নাই, তবে সহর ও গ্রামের নিকট গুজরাটের সাপরণ বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। গরু, মহিষ, উষ্ট্র, অশ্ব, গাধা, মেষ, ছাগ প্রভৃতি গৃহ পালিত পশু। গাভী পালন পুণ্যের মধ্যে গণ্য। এই জেলায় গভর্ণমেণ্টের অশ্ব পালন কার্য্য হইয়া থাকে। আরব অশ্ব আনাইয়া তাহারই সাহায্যে দেশীয় অশ্ব জাতির উন্নতির যে চেষ্টা গভর্ণমেণ্ট করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে বলা যায়। উত্তর পূর্ব্বস্থ জঙ্গলে ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীকারের পশু ও পক্ষী শীতকালে যথেষ্ঠ পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, মৎস্যও যথেষ্ঠ আছে।

ইতিহাস।—যদিও আমেদাবাদ জেলায় কোন কোন জমির বন্দোব[illegible] তত্রাচ লোকে বলে যে আনিলবারা রাজাদিগের দ্বারা এই স্থানের জমির চা[illegible] (৭৪৬-১২৯৭ খৃঃ) আনিলবারা রাজাগণ পরাক্রান্ত হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত [illegible] বহু অংশ ভীলদিগের অধীনস্থ ছিল, ভীলগণ ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করে। গঘো ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অংশ খাস মহল, তবে জেলার প্রান্তবর্ত্তী কোন কোন স্থান করদ ভাবে প্রদত্ত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে পেশোয়া ও গাইক-বাড় এইরূপ মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ খাসে রাখিয়া প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ করদ ভাবে বন্দোবস্ত করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই প্রদেশ ব্রীটিশ রাজ্য ভুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত [illegible] বন্দোবস্তই চলিয়া আসিতেছিল। ভাও নগরের রাজা নিকটস্থ প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করায় তাহারা ব্রীটিশ গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রজাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ করা হইল ও গাইকবার ও পেশোয়া উভয়ই ইহাতে সম্মত হইলেন। সার ডি সুইজা [illegible]ই প্রদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কিনা দেখিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। তিনি রিপোর্ট করিলেন [illegible]ব পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল গ্রহণ না করিলে এ প্রদেশ লইয়া কোনই ফল নাই। গাইকবার এ সকল স্থান ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিলেন; ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সৈন্য রাখিবার ব্যয় জন্য ডলকাত প্রদত্ত হইল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আরও অধিক সৈন্য রাখিবার ব্যয় স্বরূপে গাইকবার ও পেশোয়া আমেদাবাদ সহরও ছাড়িয়া দিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ প্রদেশ বরদার রেসিডেণ্টের অধীন ছিল, তৎপরে ইহা খর্রবার কলেক্টরের অধীন হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি অন্যান্য প্রদেশও ব্রীটিশ হস্তগত হওয়ায় আমেদাবাদকে একটী জেলা করা হয়।

লোক সংখ্যা।—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে লোক সংখ্যা ৬৫০,২২৩ ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ৮২৯,৬০৭ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৮৫৬,৩২৫ হয়। আমেদাবাদ জেলায় অনেক পার্শীর বাস। হিন্দুদিগের মধ্যে বেনিয়ারাই ধনী ও ব্যবসাদার। অন্যান্য স্থানে হিন্দু বেনিয়াগণ যেমন

ধনী ও ব্যবসায়ী, এখানে তাহা নহে, জৈন বেনিয়াগণই এ প্রদেশে ধনী ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ নিপুণ। ধনী স্বদেশেই টাকা খাটাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অর্থে মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ ব্যবসা করেন। যাহাদের অর্থ নাই, তাহারা সুদে টাকা কর্জ্জ লইয়া কাপড়, চিনি, ভূষিমাল প্রভৃতির ব্যবসা করে। যাহারা খুব গরিব, তাহারা ছোট মুদির দোকান করে, অথবা গ্রামে গ্রামে ফেরি করিয়া নানা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। কেহ কেহ গবর্ণমেণ্ট আফিসে কেরাণীর কার্য্যও আজ কাল করিতেছে।

যদিও আমেদাবাদ বম্বে প্রদেশের প্রধান জেলা, তত্রাচ এ জেলায় অধিকাংশ অধিবাসী চাস বাস করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হিন্দুদিগের মধ্যে কুম্বি, রাজপুত ও কোলিগণ কৃষি কাজ করে, এতদ্ব্যতীত চোরা নামক মুসলমান ও সাধারণ মুসলমানগণের অনেকেও চাস বাস করিয়া থাকে। কুম্বিদিগের সংখ্যা অতি অধিক, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মোট ১০৯,৬৯০ জন কুম্বি আমেদাবাদ জেলায় ছিল, ইহার মধ্যে অনেক তাঁতির কাজ বা অন্যান্য কাজও করে, কেহ কেহ গভর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে সক্ষম হইয়াছে, কেহ কেহ ব্যবসায়েও যথেষ্ঠ ধন লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাপাচার খুব কম, গুরুতর অপরাধ ইহারা প্রায়ই করে না। কৃষক জাতির মধ্যে ইহারা অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত। কন্যার বিবাহে এই জাতির অতিশয় অধিক ব্যয় পড়ে, এই জন্য কন্যা হত্যাও অতিশয় এ প্রদেশে প্রচলিত ছিল। এক্ষণে আইন দ্বারা ইহা বন্ধ করা হইয়াছে। কন্যার বিবাহে অতিশয় ব্যয় পড়ে বলিয়া এই জাতির মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী রীতি প্রচলিত আছে একটী এই যে, প্রথমে কন্যার এক গোছা ফুলের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। ঐ ফুল ফেলিয়া দিলেই সেই কন্যা বিধবা বলিয়া গণ্য হয় ও তৎপরে "নাত্রা" প্রথায় তাহার অতি অল্প ব্যয়ে বিবাহ হইতে পারে। কোন কোন সময়ে একটী বিবাহিত পুরুষের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়, বিবাহের পরই তিনি বিবাহ বাতিল করিয়া দেন, তখন সেই কন্যার নাত্রা প্রথায় অল্প ব্যয়ে পুনরায় বিবাহ হয়।

রাজপুতগণের আকারে ও স্বভাবে এখনও পূর্ব্ব সৈনিক ভাব কতক লক্ষিত হয়। ইহারা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, গারাসিয়া বা জমিদার অপর চাসী। বেশভূষায় ও আহার ব্যবহারে কুম্বি হইতে রাজপুতকে প্রভেদ করিতে পারা যায় না, তবে কুম্বিদিগের ন্যায় ইহারা কৃষি কার্য্যে দক্ষ নহে। গারাসিয়াগণ জমির উপস্বত্বে জীবিকা নির্ব্বাহ করে ও আফিম খাইয়া আলস্যে সময়াতিপাত করিয়া থাকে। গারাসিয়াগণ স্ত্রীলোকদিগকে অন্দর মহল হইতে বাহির হইতে দেয় না, কিন্তু চাসীদিগের স্ত্রীলোকগণ মাঠে গিয়াও চাস করে।

কোলীগণ ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ চাসে দক্ষ, মধ্যবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ প্রায় কুম্বিদিগের ন্যায় চাসে দক্ষ, কিন্তু প্রান্তসীমাবাসীগণ চাসে অতি অজ্ঞ, বন্য জাতি অপেক্ষা সুনিপুণ নহে। কখনও কখন ইহাদের মধ্যে দাঙ্গা হয় বটে, কিন্তু এক্ষণে ইহারা বড়ই

শান্তশিষ্ট হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের দুর্দ্দান্ত ভাব ও এখনকার এরূপ শান্তভাব দেখিলে স্বভাবতই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

এই প্রদেশের ভাষা গুজরাটী, তবে সহরে প্রায় সকলেই হিন্দুস্থানি বুঝিতে পারে। এই জেলার নিম্নলিখিত সহর কয়টী উল্লেখ যোগ্য ঃ—(১) আমেদাবাদ, লোক সংখ্যা সহরে ১২৪,৭৬৭, সেনা নিবাসে ২,৮৫৪। (২) ধলকা, লোক সংখ্যা ১৭,৭১৬। (৩) বিরামগাম, লোক-সংখ্যা ১৮,৯৯০। (৪) ধলেরা, লোক সংখ্যা ১০,৩০১। (৫) ধানধুকা, লোক সংখ্যা ১০,০৪৪। (৬) ঘোলা, লোক সংখ্যা ৭০,৬৩। (৭) পরানতিজ, লোক সংখ্যা ৮,৩৫৩। (৮) মোবাসা, লোক সংখ্যা ৭,০৩১। (১০) সানাদ, লোক সংখ্যা ৬,৯৮৪।

শিল্প।—আমেদাবাদ নানা প্রকার দ্রব্য নির্ম্মান বিষয়ে বম্বে প্রদেশে একটি প্রধান স্থান। সমুদ্রের ধারে লবণ প্রস্তুত ব্যতীত আর সমস্তই প্রায় আমেদাবাদ সহরে হয়। আমেদাবাদ হইতে উত্তর পশ্চিমে ৫৬ মাইল দূরে মারাগোয়া নামক স্থানে লবণ প্রস্তুত হয় ও তথা হইতে সমস্ত গুজরাট প্রদেশে ইহা বিক্রিত হইয়া থাকে। লবণের কারখানার মধ্য পর্য্যন্ত একটি রেল গিয়াছে, লবণ রাখিবার জন্য মারাগোয়ায় একটি বৃহৎ গুদাম বা গোলা নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লবণের জন্য ব্রোচ, সুরাট ও আমেদাবাদেও গোলা আছে। সমুদ্রের জল হইতে এই লবণ প্রস্তুত হয় না, ১৮ হইতে ৩০ ফিট মাটি খনন করিলে একরূপ লোণা মাটি নির্গত হয়, ইহাতে সমুদ্রের জল অপেক্ষা ৬ গুণ অধিক লবণ আছে, এই মাটি হইতেই লবণ প্রস্তুত করা হয়। লবণের কারখানার নিকট যথেষ্ঠ পরিমাণ সোরাও প্রস্তুত হয়। লবণ ব্যতীত রেশম, সোনা রূপার দ্রব্য, তামা ও পিত্তলের দ্রব্য, কুম্ভকার নির্ম্মিত দ্রব্য, কাষ্ঠের দ্রব্য, কাপড়, জুতা, কখন সাবান ও কাগজ প্রস্তুত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদে ৪টি ষ্টিম চালিত কাপড়ের কল ছিল।

রেশম ও তুলার বস্ত্রাদি এখানে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় বলিয়া, গুজরাটের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা আমেদাবাদেই জাতি বা ব্যবসায়ী দল বা সমিতি আছে। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুতকারীগণ এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিতে গঠিত। প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তা এই সমিতির সভ্য, প্রত্যেক সভ্যেরই ভোট দিবার ক্ষমতা আছে ও যে বিষয়ে অধিকাংশ সভ্যে ভোট বা মত দেয়, সেই বিষয়ই করা হয়। একই কার্য্যের যেখানে ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন শাখার এক একটি সমিতি আছে, যেমন, কুম্ভকার বৃত্তির মধ্যে ইষ্টক নির্ম্মাতাগণ, টাইল নির্ম্মাতাগণ, হাড়ি নির্ম্মাতাগণ, ইহাদের সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন এক একটি সমিতি আছে। প্রতিদ্বন্দিতাকে বৃদ্ধি হইতে না দেওয়া ও অন্যান্য কারিগরগণের সহিত কোন বিষয়ে মতভেদ বা কলহ ঘটিলে এই সকল সমিতি তাহা মিটাইয়া দেয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বস্ত্র নির্ম্মাতাগণ স্থির করিলেন যে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত তাঁতিয়াগণকে যে হারে পারিশ্রমিক দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা আর দিবেন না; তদপেক্ষা অল্প দিবেন। ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই কলহ চলিতে থাকে, এই ৬ সপ্তাহ তাঁতিয়াগণ নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকে। অবশেষে

বিবাদ নিষ্পত্তি হয়। উভয় পক্ষ যে সকল করার ধার্য্য করেন তাহা ষ্টাম্প কাগজে লেখা পড়া করা হয়। প্রতিদ্বন্দিতার লাঘব করিবার জন্য সমিতি কয়েক দিন ছুটি বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন, ছুটীতে কেহ কাজ করিলে তাহার জরিমানা হয়। এ বন্দোবস্ত প্রায় সমস্ত সমিতিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদের ইষ্টক নির্ম্মাতা দিগের মধ্যে অনেকে কাজ পায় না, অথচ অনেকে নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা অধিক সময় কাজ করিয়া অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিত। সমিতি, সকলে যাহাতে কাজ পায়, এই জন্য অতিরিক্ত কাজ করা বন্দ করিয়া দেন ও যে এরূপ অতিরিক্ত কাজ করিতে থাকে, তাহার জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা না দিলে অপরাধীকে একঘরে করা হয় অথবা সে যাহাতে আর কোথায়ও কোন কাজ না পায় তাহারই বন্দোবস্ত করা হয়। এই সকল জরিমানার টাকা ব্যতীত সমিতির আরও আয় আছে, যে প্রথম কোন কাজ আরম্ভ করে তাহাকে সমিতিকে কিছু টাকা দিতে হয়। কিন্তু কুম্ভকার, সূত্রধার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবিগণের কোন কিছু দিতে হয় না; পিতার পর পুত্র ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাহাকেও কিছু দিতে হয় না। অন্যান্য কাজে সকলকেই সমিতিকে অর্থ প্রদান করিতে হয়, কাজের তারতম্য বুঝিয়া ৫০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সমিতির ফি আছে। জরিমানা ও এইরূপ ফিতে যে টাকা আদায় হয়, তাহা বারোয়ারি, ভোজ ও দানে ব্যয়িত হয়। আমেদাবাদের এইরূপ সমিতির কার্য্যে সদাব্রত চলে, এখানে প্রত্যহ বহু সংখ্যক দরিদ্র আহার পায়।

কৃষি।—এ প্রদেশের মাটী প্রধানতঃ দুই প্রকার, শ্বেত ও কালো। জেলায় অনেকাংশে একই গ্রামে এই দুই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়, তবে কালো মাটী প্রধানতঃ জেলার পশ্চিম অংশে ও সাদা মাটী পূর্ব্বাংশে দেখিতে পাওয়া যায়। জল ও সার সহযোগে সাদা মাটী বড়ই উর্ব্বরা হয়। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার মাটী এ প্রদেশে আছে, তবে ইহা যথেষ্ঠ পরিমাণে কোথাও নাই। সাবারমতী নদীর এক প্রকার পলী জমি এ জেলায় এই জমিই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা এবং কিছু মাটী খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায় বলিয়া এই জমিতে চাসের সময় জলের কোনই অভাব হয় না। জেলার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে বেলগ্রামের ন্যায় এক প্রকার লাল প্রস্তরময় মাটীও দেখিতে পাওয়া যায়।

গুজরাটের অন্যান্য জেলার সহিত তুলনায় এ জেলায় বহু সংখ্যক তালুকদার আছে। ইহারা জেলার ৩৮৭টী গ্রামের অধিকারী। এই সকল তালুকদারের জমিদারী গুজরাট ও কাটিওয়ারের প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশে স্থিত। কিন্তু এই সকল তালুকদারী গুজরাট অপেক্ষা কাটিওয়ারেরই অংশ বলিতে পারা যায়। এই সকল জমিদারীর সত্বাধিকারী দেশের ঠাকুর-গণ। তালুকদারী গ্রাম সকল হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির আছে; হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই কয়েকটী প্রধান জাতি হইতে সমুদ্ভুত। কাটিওয়ারের জুনাগড় রাজবংশ হইতে চুড়াসমাগণের উৎপত্তি; পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ভাগে আমেদাবাদের মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক জুনাগড়ের রাজবংশ দূরীকৃত হয়। সোলাঙ্কি জাতি হইতে উথালাগণ উৎপন্ন,

১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আনিলবারা রাজ্য আলাউদ্দিন কর্তৃক ধ্বংসীভূত হইলে এই জাতি আনিলবারা হইতে পলায়ণ করে। গোহেল জাতি মারোয়ার হইতে বহু পূর্ব্বে এ প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে। ওয়েঘেলার ন্যায় ঝালা জাতি পূর্ব্বে মাকবারা নামে অভিহিত হইত। সোলাঙ্কি ও মাকবারা জাতি হইতে থাকারা জাতি উৎপন্ন। যে সকল মুসলমান পরিবার এ প্রদেশে আছে, তাহাদের অধিকাংশই আমেদাবাদের প্রাচীন মুসলমান ওমরাওগণের বংশধর। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি জমিদারি এখনও মুসলমান বা মহারাষ্ট্র রাজাদিগের প্রিয়-পাত্রগণের বংশধরের হস্তে আছে। এই সকল মুসলমানগণ প্রায়ই রাজপুত পামির জাতি, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত। কেহ কেহ বা মহারাষ্ট্র রাজার অধীনস্থ মুসলমান রাজ কর্ম্মচারীদিগের বংশধর। এই সকল মুসলমানকে খাসবস্তি কহে, খাস অর্থে সহর, অর্থাৎ সহরবাসী। এই সকল ছাড়া আরও খাসবস্তি আছে, ইহারা বলে যে ইহারা খোরাসান হইতে আসিয়াছেন ও ওঝালা রাজগণের নিকট গ্রাম উপহার পাইয়াছিলেন।

এই সকল তালুকদার গভর্ণমেণ্টকে নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিয়া থাকেন, এই খাজনা কখন বৃদ্ধি হয় না। ক্রমে এই সকল জমিদারী এত ভাগ হইয়া গিয়াছে যে এক গ্রামেই অনেক অংশীদার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা সকলে গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতে বাধ্য। ইহাদের মধ্যে একজন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন ও তিনিই ভিন্ন ভিন্ন অংশীদারের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া থাকেন। ১৮৫৬।৫৭ খৃষ্টাব্দে এ জেলা প্রথমে বন্দোবস্ত হয়, ৩০ বৎসর পরে ১৮৮৬।৮৭তে আবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই সকল জমিদারের অধীনে প্রজা আছে, ইহারাই চাস করে ও জমিদারের নিকট হইতে ফসলের এক অংশ পারিশ্রমিক বলিয়া পায়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে অনেক তালুকদার ঋণজালে জড়িত হওয়ায় গভর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের জন্য নূতন বন্দোবস্ত করিতে হয়। ৪৬৯টী গ্রাম গভর্ণমেণ্ট নিজ কর্তৃত্বাধীনে লইয়া আইসেন ও প্রকৃত কত ভূমি আছে ও কতই বা আয় দেখিবার জন্য জরিপ আরম্ভ করেন। তৎপরে তালুকদারদিগের ঋণের অনুসন্ধান করা হয় ও মোট ১৩৬০,৪০০৲ টাকা দেনদারগণকে প্রদত্ত হয়। এই টাকার ১২৮৯,৬০০৲ টাকা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জমিদারগণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয়েন, গভর্ণমেণ্ট যে মোট ৫৫০,০০০৲ টাকা ধার দেন, তাহার কেবলমাত্র ১৩৬,৪৭০৲ মাত্র এখনও তালুকদারদিগের পুনঃ প্রদান করিতে বাকি আছে।

দৈব দুর্ঘটনা।—গত সার্দ্ধ দুই শতাব্দির মধ্যে ১৪ বৎসর দুর্ঘটনার জন্য খ্যাত। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, ১৬৫০ ও ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি ও অন্নকষ্ট হইয়াছিল। ১৭১৮ ও ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে অন্নকষ্ট ও ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহামারি হয়। ১৭১১ ও ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সাবারমতী নদীতে ভয়ানক জলপ্লাবন হয়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে অতিশয় বৃষ্টি হইয়া আমেদাবাদ সহরের বিশেষ হানি করে। ১৭৯০।৯১ খৃষ্টাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮১২।১৩ খৃষ্টাব্দে পঙ্গপালে বিশেষ ক্ষতি করে, ১৮১৯।২০ ও ১৮২৪।২৫ অনাবৃষ্টি হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আবার অনাবৃষ্টি হয় ও পঙ্গপালে বিশেষ ক্ষতি করে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় অনাবৃষ্টি

হইয়াছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়া বিশেষ হানি করে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জলপ্লাবনে আমেদাবাদ সহর ও নিকটস্থ প্রদেশ প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। দুইটি লৌহ নির্ম্মিত সেতু ও সহরের অধিকাংশ একেবারে ভাসিয়া যায়, এতদ্ব্যতীত ১০১টী গ্রাম বিলুপ্ত হয়। দুর্ভিক্ষের সময় মথুরা প্রভৃতির লোক এদেশে আসায় কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

পথ ঘাট, ব্যবসা বাণিজ্য।—রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে মধ্য ভারত ও মালোয়ারের পণ্য দ্রব্য সমস্ত আমেদাবাদের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া গমনাগমন করিত। গরুর গাড়ী, উষ্ট্র ও বলদের স্কন্ধেই মালামাল যাইত। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এ প্রদেশে একটিও নির্ম্মিত রাস্তা ছিল না ও বৃষ্টির সময় গরুর গাড়ী একেবারেই চলাচল করিতে পারিত না। এক্ষণে রেল, রাস্তা ও সমুদ্র এই তিনপথে পণ্য দ্রব্যাদি গতায়াত করে। জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গ্রামাদি গরুর গাড়ীতেই মালামাল যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৪৫ মাইল পাকা রাস্তা ও ৩০৯ মাইল কাঁচা রাস্তা ছিল, এই কাঁচা রাস্তায় বর্ষা ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গাড়ী গতায়াত করিতে পারে। বম্বে বরদা রেলওয়ে এই জেলায় ৯২ মাইল আছে, রাজপুতনা রেলওয়ে ১৫ মাইলও ভাওনগরে গণ্ডাল রেলওয়ের ২০ মাইল আছে। এই জেলার ব[illegible]র ধলেরা ও গগো, এক সময়ে এই দুটি বড় সহর ছিল, এক্ষণে এ স্থানের ব্যবসা বাণিজ্য কমিয়াছে। চিনি, কাপড়, কড়িকাট, ধাতু, ভুষামাল, নারিকেল, গুড় প্রভৃতি আমদানি হয়, তুলা, ভুষামাল প্রভৃতি রপ্তানি হয়। আমেদাবাদের ব্যবসার মূলধন আমেদাবাদেরই, বম্বে হইতে দূর বলিয়া এখানকার সওদাগরগণের ভাব সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র, ইহারা বড়ই রক্ষণশীল ও পরিমিতব্যয়ী।

শাসন প্রণালী।—আমেদাবাদ ৭টী তালুক বা মহকুমায় বিভক্ত, যথা দাস্করই, সামান্দ, বিরামগাম, ধলকা, ধানুধুকা, পরান্তিজ, মোবাসা ও গগো। ইহার মধ্যে ছয়টী মহকুমায় সিভিলিয়ান আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও একটীতে স্বয়ং কলেক্টর থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। জেলার ট্রেজারির ভার একজন ডেপুটী কালেক্টরের হস্তে ন্যস্ত আছে। জেলার সমস্ত রাজকার্য্য, মিউনিসিপালিটী প্রভৃতির সকল প্রকার কার্য্য ইহারা কালেক্টরের অধীনে থাকিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক মহকুমার রাজস্ব আদায় করিবার ভার এক এক জন মামলাতদারের উপর ন্যস্ত আছে, এই সকল মামলাতদারের ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাও আছে। দেওয়ানি মোকর্দ্দমার জন্য সাতটী আদালত আছে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সমস্ত জেলায় ১,২০০ পুলিশ কর্ম্মচারী ছিলেন, ইহাদের জন্য মোট ২১১,৯১০৲ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদ জেলে প্রত্যহ ৪৭৯ জন কয়েদী ছিল, ইহার মধ্যে ৪৫ জন স্ত্রীলোক। জেলায় ১৯টী ডাকঘর ও ১২টী টেলিগ্রাফ আফিস আছে।

আবহাওয়া।—সমুদ্রের তীরবর্ত্তী পূর্ব্বাংশ ব্যতীত জেলার অন্যান্য অংশে শীত গ্রীষ্মের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে অতিশয় শীত পড়ে, ফেব্রুয়ারি

ও জুনের মধ্যেও ভয়ানক গরম হয়। বৃষ্টি বর্ষাকালে অধিক হয় না বলিয়া বর্ষাকালও বড় গরম। অক্টোবর মাসে পীড়ার বড় আধিক্য হয়।

আমেদাবাদ সহর।—গুজরাটের সমস্ত সহরের মধ্যে আমেদাবাদ সর্ব্ব প্রধান ও ইহার সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য সমস্ত বম্বে প্রদেশের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সাবারমতী নদীর বাম তীরে এই সহর অবস্থিত। নগরের প্রাচীর উত্তর পূর্ব্বে বিস্তৃত ও অনধিক দুই বর্গ মাইল লইয়া বেষ্টিত। ১৫ হইতে ২০ ফিট এই প্রাচীর উচ্চ, ইহাতে ১৪টী গেট আছে ও ১০০ হাত অন্তর একটী করিয়া গুমটী ও কামান রাখার স্থান আছে। নদী ১,০০০ হাত হইতে ১২ শত হাত বিস্তৃত, তবে কোন কোন সময় ব্যতীত অন্য সকল সময়ে নদীর জল ২০০ হাতের অধিক বিস্তৃত থাকে না। নদী, সহর প্রাচীরের অতি ধার দিয়া প্রবাহিত এবং সহর, নদী হইতে অধিক উচ্চ নয় বলিয়া এই সহর সময় সময় জলপ্লাবনে ডুবিয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সহরের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া ৩,৮৮৭ গৃহ ও ৫৮২,০৮০৲ টাকার হানি করে। সহরের বাহিরের সকল স্থান বৃক্ষাদিতে পূর্ণ, মাঠ সকল উর্ব্বরা ও বেড়া দিয়া ঘেরা। মধ্যে মধ্যে হিন্দুকালীন অট্টালিকাদি ও মুসলমান কালীন মসজিদ ও কবরের ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আসোবাল সহরের চারিদিকে যে প্রাচীর ছিল ও যাহা ভগ্নাবশেষ হইয়া যায়, গুজরাটের মুসলমান রাজবংশের দ্বিতীয় নবাব আমেদসা, তাহারই উপর ১৪১৩।১৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত মুসলমান নবাব মহম্মদ সা ইহার পুনঃসংস্কার করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ২৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আবার ইহার সংস্কার করিয়াছেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত গুজরাট সহ আমেদাবাদ আকবর বাদসাহের অধিকৃত হয়।

ষোড়ষ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে পশ্চিম ভারতের মধ্যে আমেদাবাদ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর নগরী ছিল। ফেরেস্তা বলেন যে এই সহরে ৩৬০টী বিভাগ ছিল, প্রত্যেক বিভাগ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও মহারাষ্ট্রগণের অভ্যুত্থান কালেই আমেদাবাদের নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দির প্রারম্ভে দিল্লির বাদসাহের ক্ষমতা গুজরাট প্রদেশে নাম-মাত্র ছিল। মুসলমান ও মহারাষ্ট্র দলপতিগণ আমেদাবাদ লইয়া বিবাদ বিশম্বাদ করিয়াছিলেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে দামাজি গাইকবার ও মসিন খাঁ উভয়ে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও উভয়ের স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য উভয়ে একত্রিত হয়েন ও আমেদাবাদ দখল করেন, তাঁহারা উভয়ে আমেদা-বাদ শাসন করিতেছিলেন ও উভয়ে ইহার রাজস্ব ভাগ করিয়া লইতেন। দামাজি পেশোয়া কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইলে মসিন খাঁর প্রতিনিধি দামাজির প্রতিনিধির হস্ত হইতে আমেদা-বাদের শাসন ভার নিজ হস্তে লইলেন, তবে তাঁহাকে রাজস্বের অংশ প্রদান করিতেন। দামাজি কারামুক্ত হইয়া রঘুজিরাওয়ের সহিত সম্মিলিত হইলেন, রঘুজিরাও গুজরাটে পেশোয়ার আধিপত্য সংস্থাপন করিতেছিলেন। ইহার পর যে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিল তাহাতে মহারাষ্ট্রগণের সম্মিলিত সেনা আমেদাবাদ দখল করিয়া লইল। ১৭৫৬।৫৭ খৃষ্টাব্দে মসিন

খাঁ আবার আমেদাবাদ গ্রহণ করেন, অবশেষে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ ইহা পুনরায় দখল করিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জেনারেল গডডার্ড সাহেব সসৈন্যে আমেদাবাদ আক্রমণ করেন। কিন্তু ইংরেজগণ ইহা নিজ দখলে না রাখিয়া মহারাষ্ট্রগণকে প্রদান করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া ইংরাজ কর্তৃক পরাজিত হইলে আমেদাবাদ ইংরেজ অধিকৃত হয়।

কথিত আছে যে যখন এই নগরি ইহার সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল, তখন ইহার লোক সংখ্যা নয় লক্ষ ছিল। ইহার কয়েক জন বণিক ক্রোড়পতি ছিলেন। শেষাশেষি আমেদাবাদ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং যখন ইহা ইংরেজদিগের হস্তে আইসে, তখন ইহা প্রায় লোকশূন্য ও ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইহার লোক সংখ্যা ৯৭,০৪৮ ছিল, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১১৬,৮৭৩ ছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১২৪,৭৬৭ ছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেন্‌সস রিপোর্ট অনুসারে লোক সংখ্যা মোট ১৪৪,৪৫১। পুরুষ ৭৪,১৩১, স্ত্রীলোক ৭১,৩২১।

হিন্দু	মুসলমান	জৈন	খৃষ্টিয়ান	ইহুদি	পারসি	অন্যান্য
১০০,০২৮,	৩০,২৫৩,	১২,৭০০,	৬১৩,	১০২,	৭১৮,	৩৭,

হিন্দুগণই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, তৎপরেই সারাবাক বা জৈনগণ, ইহারাই ধনী বণিক, ব্যবসায়ী ও মহাজন। কুম্বিজাতি হইতে তাঁতি প্রভৃতিগণের উৎপত্তি, মুসলমানগণের অনেকে তাঁতি, কৃষিজীবি হয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধনী ও ইহাঁরা রেশম প্রভৃতির ব্যবসা করেন।

গুজরাট সারাবাক বা জৈনদিগের প্রধান স্থান ও এখানে ইহাদের ১২০টী মন্দির আছে। যদিও আমেদাবাদ সহরে বা নিকটে জৈনদিগের বিশেষ কোন তীর্থ নাই, তথাচ বৎসরে এই খানে ২৪টী মেলা হয়। তিন বৎসর অন্তর হিন্দুগণ খালিপায় একবার সহর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

আমেদাবাদের বাড়ীগুলির একটু বিশেষতঃ আছে; অধিকাংশ বাড়ী এক এক চকে নির্ম্মিত হয়। কোন কোন চকে ৬।৭টী বাড়ী থাকে, কোন কোন চক এতই বড় যে সেই চকে প্রায় ১০ সহস্র লোকের বসতি। বড় চকগুলির মধ্য দিয়া একটী বড় রাস্তা গিয়াছে, ঐ রাস্তার দুই পাশে দুইটী দ্বার, তৎপরে সেই রাস্তা হইতে আবার অনেক গলি গিয়াছে, প্রত্যেক গলিতে আবার ৫।৭টী চক। প্রত্যেক চকের পথের দুই পাশে ভিন্ন ভিন্ন দ্বার আছে।

আমেদাবাদ এক সময়ে সাচ্চার কাপড়, সুন্দর রেশম ও কার্পাস বস্ত্রাদি, স্বর্ণ, রৌপ্য, ইসপাত, ঝিনুকের দ্রব্যাদি ও অতি উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্য নির্ম্মাণ ও ব্যবসায়ের জন্য খ্যাত ছিল। একটী দেশীয় প্রবাদ আছে,—যে আমেদাবাদের সমৃদ্ধি তিনটী সুতায় ঝুলে, যথা স্বর্ণ, রেশম ও কার্পাস। যদিও আমেদাবাদে এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় অধিক পরিমাণে এই সকল দ্রব্য হয় না, তত্রাচ বহুসংখ্যক লোক এখনও এই সকল কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। রেশম ও সাচ্চার দ্রব্যাদির কার্য্য সমস্তই সহরে হয়। রেশম চিন,

বোখারা ও বাঙ্গালা দেশ হইতে বম্বে হইয়া এখানে আমদানি হয়। বৎসরে প্রায় লক্ষ সের ও পনের লক্ষ টাকার রেশম আমেদাবাদে আমদানি হয়। চিনের রেশমই অধিক কাটে, বাঙ্গালা ও বোখারার রেশমের প্রায় সামান্য অবস্থা। এই খান হইতে রেশম বস্ত্রাদি বম্বে, কাটিবাড়, রাজপুতানা, মধ্যভারত, নাগপুর, হাইদ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য জড়িত সাঙ্কার গোটা দ্বারা রেশম ও কিংখাপের কাপড় প্রস্তুত করিয়া বহুসংখ্যক লোকের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয়। অনেকে দেশীয় তাঁতে তুলার কাপড় বুনিয়া থাকে;—এতদ্ব্যতীত আমেদাবাদে চারটী কাপড়ের কল সংস্থাপিত হইয়াছে, এই কলে প্রায় দুই সহস্র লোক খাটে। আবলুস কাটে অতি সুন্দর সুন্দর দ্রব্য এই স্থানে প্রস্তুত হয়, এই জাতীয় কারু-কার্য্যের শ্রেষ্ঠ নমুনা এই খানে দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিম ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা আমেদাবাদে মাটির দ্রব্য ভাল হয়। সহরের প্রাচীরের নিকট হইতে মাটি লইয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। কুম্ভকার মাটির দ্রব্য রং করিবার জন্য লাল মাটি বা রামচি, সাদা মাটি বা খারি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। প্যালিস কোনরূপ ব্যবহৃত হয় না, তবে দ্রব্যাদি চকচকে করিবার জন্য বাঁশের চেঁচড়া বা কড়ি বা নুড়ি ব্যবহৃত হয়। কুম্ভকারগণ প্রায় সকলেই হিন্দু, তবে কতকগুলি মুসলমানও আছে। জুতা ও চামড়ার কাজ করিয়াও বহুসংখ্যক লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কাগজ প্রস্তুতের জন্য আমেদাবাদ সহর বহুকাল হইতে বিখ্যাত। গুজরাট, কাটিবাড়, কচ ও বম্বে প্রদেশে এই কাগজ রপ্তানি হয়। সিন্দিয়া ও হুলকারের রাজ্যেও কিছু কিছু যায়। বিলাতি কাগজের আমদানি হওয়া পর্য্যন্ত, আমেদাবাদের কাগজের কারবার হীন হইতেছে। এক্ষণে দেশীয় রাজ্যে ও দেশীয় সওদাগরগণের দোকানে এই কাগজ ব্যবহৃত হয়। গবর্ণমেণ্টের আদালতে দেশীয় ভাষায় খাতা পত্র আমেদাবাদের কাগজেই রক্ষিত হয়। ছিন্ন পাটের দ্রব্য হইতেই প্রধানতঃ এই কাগজ নির্ম্মিত হয়, এই কাগজ ছয় প্রকার আছে। এক পয়সা দুই পয়সা করিয়া এক এক তা বিক্রয়ে হয়। অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় কাগজের ব্যবসায়ও আমেদাবাদে সমিতি আছে। মুসলমানগণই প্রস্তুত করে ও তাহাদের সমিতির নাম কাগজিনি জামাত।

সহরের মিউনিসিপালিটীর মধ্যে সাড়ে ২৭ মাইল গাড়ী যাইবার উপযুক্ত পথ আছে। সহরের প্রধান রাস্তা উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত। ৪০ ফিট বিস্তৃত ও ফুটপাথযুক্ত ওলিফাণ্ট রোড পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। সহরের যে অংশে অতিশয় লোকের বাস সে অংশ দিয়া এই রাস্তা যায় নাই। তবে এক্ষণে এই রাস্তার দুই ধারেই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। রাস্তাসকলে জল দেওয়া হয় ও কেরোসিন ল্যাম্প আছে। আমেদাবাদে ৩৪টী জাতি গৃহ ও ১৪টী বাজার আছে। সহরের মধ্যস্থ বাজারগুলি ব্যতীত ভুষি মালের হাট খোলা জায়গায় বইসে। সহরে দুইটী পুস্তকালয় ও পাঠশালা আছে। প্রধানটী হেমাবাই ইনিষ্টিউট নামক অট্টালিকায় স্থিত, ইহার নিম্নতলে পাঠালয়, উপর তলায় বক্তৃতা হয়।

নগরের উত্তর দিকে সেনা নিবাস অবস্থিত। সহর হইতে ইহা প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূর, এই সাড়ে তিন মাইল পথ বড়ই সুন্দর, ইহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষ শ্রেণী, সকালে বৈকালে বহুসংখ্যক লোক এই পথে বেড়াইতে যান। এই সেনা নিবাস বম্বে প্রদেশের উত্তরাংশের সৈন্যগণের অধিনিবেশ স্থান ও একজন মেজর জেনারেল এখানকার সেনা নায়ক।

এখানকার কুয়ার জল লোণা ও পানীয়ের উপযুক্ত নহে। ধনীগণ স্ব স্ব গৃহে চৌবাচ্ছায় বৃষ্টির জল ধারণ করিয়া তাহাই পান করেন। অপরাপর লোকে নদী হইতে জল আনয়ন করে অথবা মিউনিসিপালিটী যে জল নদী হইতে পাম্প করিয়া আনিয়াছেন তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

১৮৮১।৮২ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটীর আয় ২৮৪,৪৯০৲ টাকা ছিল, ব্যয় ৪৪৪,৯৮০৲ আদালত প্রভৃতি ব্যতীত আমেদাবাদে দুইটী গির্জ্জা, একটী অস্ত্রাগার, একটী হাঁসপাতাল, একটী পাগলাগারদ, একটী কুষ্ঠাশ্রম, দুইটী ডাক্তারখানা, ১৮টী স্কুল, ইহার মধ্যে ৪টী বালিকা বিদ্যালয়। এই ১৮টী ছাড়া প্রায় ১০০ দেশীয় বিদ্যালয় আছে। একটী পিনূজারাপোলও এখানে আছে।

নিম্নলিখিত অট্টালিকা দর্শন যোগ্য, যথা মসজিদ, (১) আমেদ সা। (২) হাইবাত খাঁ (৩) সায়েদ আলাম (৪) সানিক আলাম (৫) রাণি ইসনী (৬) সিতি সায়েদ (৭) কুতাব সা (৮) সায়েদ ওসমানি (৯) মিরা সা কিবটি (১০) সিদি বাসির (১১) মহাফেজ খাঁ (১২) আকাত বিবি (১৩) দস্তর খাঁ (১৪) মহাম্মদ স্বস (১৫) বালী (১৬) জুমা।

কবর।—(১) আমেদ সা (২) আমেদ সার গোমী (৩) দারিয়া খাঁ (৪) আসাম খাঁ (৫) মির আবু (৬) সা উজির উদ্দিন।

নানাবিধ।—আসারবা নামক স্থানে ভবাণীর কুয়া। তিন দরজা। সহরের দক্ষিণে দেড় মাইল দূরস্থ কাঙ্কেরিয়া পুষ্করিণী। দাদা হারির কুয়া। সাহিবাস। আজিম খাঁর প্রাসাদ। (এটী এক্ষণে জেল) ডচ দিগের কবর। স্বামী নারায়ণ ও শান্তিদাসের মন্দির।

আমেদনগর।—বম্বে প্রদেশের মধ্য বিভাগের একটী জেলা। ইহার উত্তর পশ্চিমে ও উত্তরে নাসিক জেলা, উত্তর পূর্ব্বে গোদাবরী নদী আমেদ নগরকে নিজাম রাজ্য হইতে প্রভেদ করিয়াছে। দক্ষিণ পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সোলাপুর ও পুনা জেলা। কিন্তু দক্ষিণ পশ্চিমে ভীমা নদী ও তাহার শাখা ঘোঁরা নদী, পুনা জেলাকে আমেদ নগর হইতে প্রভেদ করিয়াছে। জেলার পূর্ব্বাংশে আমেদ নগর সহরের ১০ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত নিজাম রাজ্য বিস্তৃত, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন রাজ্য এই জেলার মধ্যে নাই।

প্রাকৃতিক ভাব।—এই জেলার ভৌগলিক দৃশ্য সাদাদ্রি পর্ব্বত শ্রেণী ও ইহার শাখা প্রশাখা। এই জেলার পশ্চিম সীমা প্রান্তে এই পর্ব্বত শ্রেণী অবস্থিত। এই পর্ব্বতের তিনটী শাখা, এই জেলার মধ্য পর্য্যন্ত আসিয়াছে, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া মুলা ও প্রাবারা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। মুলা নদীর দক্ষিণ তীর হইতে পাহাড় ও অধিত্যকা

জেলার দক্ষিণ সীমাস্থ ঘোর নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্ব সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থান (এই খানে সহ্যাদ্রি পর্ব্বত) ব্যতীত জেলার অন্যত্র স্থান সমতল। এই জেলার সর্ব্ব উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত, সর্ব্ব উচ্চ শৃঙ্গ কুলশবাই ৫ সহস্র ফিট উচ্চ, এতদ্ব্যতীত কিলা পট্ট ও হরিশ্চন্দ্র গড়ও দুইটী উচ্চ শৃঙ্গ। আমেদনগর সহর হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে পারনার পর্ব্বত ৩,২৪০ ফিট উচ্চ ও পার্শ্ববর্ত্তী অধিত্যকা হইতে ৫০০ ফিট উচ্চ।

এই জেলার প্রধান নদী গোদাবরী। দক্ষিণাংশে মুলা ও প্রবারা নদী প্রবাহিত, ইহারা দুইটী একত্রিত হইয়া ১২ মাইল গিয়া অবশেষে গোদাবরী নদীতে সম্মিলিত হইয়াছে। যেখানে প্রবারা গোদাবরীতে মিলিত হইয়াছে, তথা হইতে ২৫ মাইল দূরে ঘোর নদী গোদাবরীতে মিলিয়াছে। কেরা ও সিনা নদী জেলার দক্ষিণাংশে প্রবাহিত, এই দুইটীই ভীমা নদীর শাখা। এতদ্ব্যতীত এই জেলায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে, প্রায় ১২ মাসই এই সকল ক্ষুদ্র নদীতে জল থাকে। যে সকল গ্রাম উচ্চ অধিত্যকায় বিরাজিত, তদ্ব্যতীত অন্যত্র কুয়া ও নদীর জল সহজ প্রাপ্য।

এ জেলায় কোন খনি বা খনিজ পদার্থ নাই। যদিও এ জেলায় কোন গভীর জঙ্গল নাই, তথাচ পর্ব্বত ও জঙ্গলি প্রদেশ গভর্ণমেণ্টের ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ভুক্ত। গৃহপালিত পশুর মধ্যে বলদগণ বড়ই ক্ষুদ্রকায় ও দুর্ব্বল, দুইজোড়া বলদ না হইলে একখানি লাঙ্গল চালাইতে পারা যায় না। যে সকল অশ্ব ভীমা নদীর তীরে জন্মে তাহারা ছোট হইলেও বিশেষ বলিষ্ট, এই সকল অশ্ব লইয়াই বিখ্যাত মহারাষ্ট্র অশ্বারোহীগণ গঠিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টও এই জাতীয় অশ্বের উন্নতি সাধনের বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রাম্য অশ্বগণও সবল ও সাধারণ কাজ কর্ম্মের উপযোগী। পর্ব্বতে ও জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্য মহিষ প্রভৃতি আছে, নিম্ন প্রদেশে নেকৃড়ে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। নদীতে মৎস্যও খুব, তবে ভাল নহে।

লোক সংখ্যা।—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির লোক সংখ্যা ৭৭৩,৯৩৮ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৭৫১,২২৮ ছিল। অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মহারাষ্ট্র, ইহারাই কৃষক ও শ্রমজীবি এবং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ। কাহার, সাঙ্গ, ধাঙ্গড় প্রভৃতি হীন জাতি ব্যতীত ওদারি, কাইকাদি প্রভৃতি বেদিয়া জাতিও আছে। পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে ভীল ব্যতীত ঠাকুর ওরানিস প্রভৃতি জাতিও আছে। এই সকল জাতি পশ্চিম অংশস্থিত অতি গভীর জঙ্গল প্রদেশেই বাস করে। এই সকল জাতি এখনও দুর্দ্দান্তভাব ভাল বাসে ও সেই জন্য ইহাদিগকে বিশেষ নজরে রাখিতে হয়। কয়েক জন বোরা বণিক ব্যতীত মুসলমানগণ সকলেই হীনাবস্থা। ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক মাড়োয়ারী এই জেলায় আসিয়া বাস করিয়াছে। এই সকল মাড়োয়ারী ইন্দোর ও খান্দেশের পথে আইসে ও টাকা ধার দেওয়া, কাপড় বিক্রয় প্রভৃতি কারবার করে।

এই জেলার প্রধান নগর নিম্নলিখিত কয়টী যথা;—(১) আমেদনগর, লোক সংখ্যা

৩২,৯০৩ (২) সঙ্গমনর, লোক সংখ্যা ৮,৭৯৬ (৩) পাথারডি, লোক সংখ্যা ৬,৭৩৪ (৪) খারদা, লোক সংখ্যা ৫,৫৬২ (৫) শ্রিগোণ্ডা, লোক সংখ্যা ৫,২৭৮ (৬) ভিঙ্গার, লোক সংখ্যা ৫,১০৬ (৭) সোনাই, লোক সংখ্যা ৫,৪৮৩।

এক একটী গ্রামে এই কয় জাতি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা মণ্ডল বা পেটেল; হিসাবী বা খুনখারনি, পুরোহিত বা জেসী ও ভাট, কুম্ভকার, নাপিত, ছুতার, কামার, চামার, দরজি, ধোপা, মেথর, চৌকিদার ও মোল্লা এবং গুরু। পুষ্করিণী খনন অথবা মন্দির নির্ম্মাণ কালে সমস্ত গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া এই কার্য্য সাধন করে। ধনীগণ অর্থ দেন, দরিদ্রগণ নিজে খাটিয়া থাকে। চামার, ধাঙ্গড় প্রভৃতি জাতিকে গ্রামের পুষ্করিণী হইতে জল লইতে দেওয়া হয় না। এখনও গ্রামের মণ্ডলের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, তিনিও গ্রামের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য, সামাজিক বিষয়ে তিনিই প্রধান, তিনিও তাঁহার বাটীতে কোন বিবাহ প্রভৃতি হইলে সমস্ত গ্রামবাসীকে ভোজন করাইয়া থাকেন। গ্রাম্য পঞ্চায়তের দ্বারা জাতিরও সময় সময় আর্থিক গোলযোগও মিটিয়া থাকে। মুসলমান মোল্লা মসজিদে নমাজ করেন ও গ্রাম্য সমস্ত ছাগ ও মেষ বধ করেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে হিন্দুগণও মোল্লা কর্তৃক হত ছাগ ও মহিষ ব্যতীত আহার করে না।

কৃষি। এই জেলার ভূমির উর্ব্বরতা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, উত্তরাংশের জমি যত উর্ব্বরা, দক্ষিণাংশের তত নহে। উত্তরাংশের এক বিঘা জমিতে যত ফসল হয়, দক্ষিণাংশের দুই বিঘাতে তাহা হয় না। কৃষকেরা বাগানের জমিতে সার ব্যবহার করে কিন্তু মাঠের জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন উপায়ই গ্রহণ করে না। যদিও এ জেলার অধিকাংশ জমি উর্ব্বরা ও এ জেলায় জলের অভাব নাই, তথাপি এ প্রদেশে অনাবৃষ্টি বশতঃ বিশেষ হানি হয়। ইহা নিবারণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট তিনটী খাল খনন করিয়াছেন। এ প্রদেশের জমি বম্বে প্রদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় গবর্ণমেণ্ট ৩০ বৎসরের ইজারায় বিলি করিয়া থাকেন।

আমেদনগর জেলায় জলপ্লাবন বা অনাবৃষ্টি হয় না। তবে কখন কখন যবে তাম্বিরা নামক রোগ জন্মে। এ রোগ জন্মিলে যব তাঁবার মত রং হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। যদিও কখনও কখনও অনাবৃষ্টি হয়, তথাচ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসা পর্য্যন্ত এ জেলায় কখনও অন্ন কষ্ট হয় নাই। তবে মহারাষ্ট্র ও পিণ্ডারিদিগের উৎপাতকালে এ প্রদেশে কখন কখন দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

ব্যবসা বাণিজ্য। উত্তর ভারত হইতে সমুদ্রপথে যে সকল দ্রব্যাদি রপ্তানি হইত, তাহা এই জেলার মধ্য দিয়া লুমান নামক ব্যবসায়ীগণ লইয়া যাইত, এক্ষণে জি, আই, পি, রেল লাইন হইয়া এই সকল দ্রব্য অন্য পথে যায়। ভুট্টা ও চানা এই জেলার সর্ব্বাংশ হইতেই বম্বে ও পুনায় রপ্তানি হয়। বিলাতি জিনিস, টিন, ধাতু, লবণ, রেশম প্রভৃতি এই জেলায় আমদানি হয়। এখানে প্রধানতঃ সাড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত পাগড়ী

ও তাঁমা ও পিত্তলের দ্রব্যও প্রস্তুত হয়। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে আমেদনগর সংস্থাপিত হইলে ভাঙ্গারিয়া জাতিরও কোন ধনী ব্যক্তি এই জেলায় কাপড় বুনা প্রচলিত করেন। এক্ষণে এই কার্য্য বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে, বম্বের কলের সুতার খুব কম দামই ইহার প্রধান কারণ। কেবল আমেদাবাদ সহরেই ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ২১৩টী তাঁত ছিল, এক্ষণে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সেই স্থানে ২০০০ তাঁত হইয়াছে। আমেদাবাদের সাড়ী মহারাষ্ট্র দেশে বিখ্যাত, নিজাম রাজ্য ও চতুপার্শ্বস্থ সমস্ত প্রদেশের বণিকগণ এখানে আসিয়া এই সকল সাড়ী ক্রয় করিয়া লইয়া যান। তাঁতিগণের মধ্যে অনেকেই উত্তমর্ণদিগের হস্তে ঋণজালে জড়িত; ইহারা সুতা দেয় ও কাপড় প্রস্তুত হইলেই লয়, তাঁতিদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ এক হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত দেয়। এক এক জন তাঁতি মাসে ৫।৬ টাকা উপার্জ্জন করে। ইহারা সকলেই মদ খায়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এই কাজ কেবল তাঁতি জাতি অর্থাৎ সালি বা কষ্টি জাতি করিত, এক্ষণে ব্রাহ্মণ, কুনবি প্রভৃতি জাতিও করিতেছে। পূর্ব্বে আমেদ-নগরে কাগজ ও কারপেট প্রস্তুত হইত, এক্ষণে বিলাতি কাগজের আমদানিতে এখানকার কাগজের কারবার উঠিয়া গিয়াছে, আমেদনগরের কারপেটের আর তত আদর নাই, কাজেই এ কারবারও উঠিয়া গিয়াছে।

আমেদনগরে কয়েকটী ধনীর কুঠী আছে, এতদ্ব্যতীত এই জেলার কোথায়ও আর টাকার কারবার হয় না। মাড়োয়ারি বেনিয়াগণ টাকা ধার দেওয়া ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছে, ইহারা প্রায় সকলেই জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। মহারাষ্ট্র সেনাগণের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এই দেশে আইসে, কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সংস্থাপনের সহিতই ইহারা বহুসংখ্যায় এদেশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশ হইতে যৎসামান্য অর্থ লইয়া আসিয়া ইহারা ব্যবসা আরম্ভ করে ও সঙ্গে সঙ্গে টাকা ধার দিতেও থাকে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহারা বেশ ধন সঞ্চয় করিতে পারে।

এপ্রদেশের কৃষকগণ সকলেই বিশেষরূপে ঋণজালে জড়িত, কাজেই ইহাদের অবস্থাও অতি শোচনীয়, গভর্ণমেণ্ট ইহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

এই জেলার মধ্য দিয়া ১২২॥ মাইল বম্বে ও মানমাদ রেল জি, আই, পি, রেলের সহিত উভয় দিকে মিলিত হইয়াছে। আমেদনগর সহর ইহার একটী ষ্টেসন। এতদ্ব্যতীত ৩৭০ মাইল পথ এই জেলায় আছে, ইহার অধিকাংশই পাকা।

শাসন প্রণালী।—আমেদনগর জেলা ৯টী মহকুমা বা তালুকে বিভক্ত; যথা,— আমেদনগর, পায়নার, সানগামনার, কোপারগাওন, শ্রিগোণ্ডা, আকোলা, জামখেদ, কালজাট, নিউসা, সিওগায়ন, রাহুরি। একজন কলেক্টর ও তিন জন আসিষ্টাণ্ট কলেক্টরের হস্তে এই জেলার শাসনভার ন্যস্ত। জেলা আদালত ব্যতীত আরও ৯টী আদালত আছে। ৩০ জন ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, ইহার মধ্যে ৫ জন ইংরেজ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় মোট ৬২৬ জন পুলিশ কর্ম্মচারী ছিল, ইহাদের জন্য মোট ১২০,৮৫০৲ টাকা বৎসরে ব্যয় হইত। আমেদনগর জেলে প্রত্যহ গড়ে ২০৪ জন কয়েদি থাকে, ইহাদের জন্য ১৩,১৬০৲ টাকা ব্যয় পড়ে।

এই জেলায় ৫৪টী ডাকঘর ও একটি গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস আছে। এখানে একটী সেনা নিবাসও আছে। এই জেলার নিম্নলিখিত চারটী সহরে মিউনিসিপালিটী আছে, যথা,—আমেদনগর, সানগামনাব, ভিঙ্গার, পানতাম্বা। ১৮৮১।৮২ খৃষ্টাব্দে এই জেলার মোট রাজস্ব ১৭৬৬,১২০৲ টাকা ছিল।

আমেদনগরের ডাক্তারখানা ব্যতীত সানগামনার, নিউসা ও সিওগায়নে এক একটী ডাক্তারখানা আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২৫৭টী গভর্ণমেণ্ট স্কুল ছিল, ইহার মধ্যে ১৯টী বালিকা বিদ্যালয়। এই বৎসর ১৩,৬৭৫ বালক লেখা পড়া শিখিতেছিল। আমেদনগরে দুইটী পাঠাগার ও তিনখানি সম্বাদ পত্র আছে।

আব হাওয়া।—জুনের প্রারম্ভ হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত বর্ষাকাল। এ দেশের প্রধান রোগ বসন্ত ও জ্বর।

আমেদনগর সহর।—বম্বে প্রদেশের আমেদনগর জেলার প্রধান নগর। পরিমাণ ফল তিন বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৩৭,৪৯২। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেনসস রিপোর্ট অনুসারে ক্যাণ্টনমেণ্ট ও সহর উভয়ের লোক সংখ্যা ৪১,৬৮৯। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে আমেদ-নগর তৃতীয় ও সমস্ত বম্বে প্রদেশের মধ্যে সপ্তদশ সহর। ইহা সিনা নদীর মুখ হইতে ১২ মাইল দূরে এই নদীর বাম তীরে অবস্থিত। সহরটী সাদাসিদে দেখিতে, ইহার চারি দিকে ১২ ফিট উচ্চ একটী মৃত্তিকা প্রাচীর আছে। ইহার দ্বার প্রভৃতি এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কথিত যে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে নবাব হুসেন নিজাম সা এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। এই সহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান পাহাড়ে বেষ্টিত।

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ নিজাম সা এই নগরী নির্ম্মাণ করেন। ইনি বামনি রাজ্যের একজন সৈনিক পুরুষ ছিলেন; পরে বামনি রাজ্য নষ্ট হইলে ইনি স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়া নিজ নামে এই নগরী স্থাপন করেন। ভিঙ্গার নামক একটি প্রাচীন সহরের উপর এই নূতন নগর সংস্থাপিত হয়। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ নিজাম সার মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র বারহাম নিজাম সা সিংহাসনাধিরোহন করিলেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে বারহাম নিজাম সার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র হুসেন নিজাম সা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের রাজা কর্ত্তৃক ইনি পরাজিত হয়েন, এই যুদ্ধে ইনি বহু-সংখ্যক হস্তি ও ৬৬০টী কামান হারান। বিজাপুরের যে বৃহৎ কামান এখনও আছে, ইহা ইহারই মধ্যে একটী। এই কামানটী পৃথিবীর মধ্যে একটী অতি বৃহৎ পিত্তল নির্ম্মিত কামান। পরে হুসেন নিজাম সা গোলকোণ্ডা, বিজাপুর ও বিহারের রাজার সহিত মিলিত হইয়া বিজয়নগরের রাজারামকে পরাজিত করিয়া বেলগম জেলার মধ্যস্থ টালিকোট

নামক স্থানে হত্যা করেন। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর পুত্র মিরান হুসেন নিজাম সা ইহাঁকে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করেন। মিরান কেবল মাত্র ১০ মাস রাজত্ব করেন, পরে ইহাঁকেই হত্যা করা হয়। মিরানের পর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইসমাইল নিজাম সা দুই বৎসর রাজত্ব করেন, পরে তাঁহার পিতা দ্বিতীয় বারহাম নিজাম সা নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম নিজাম সা চারি মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া বিজাপুর অধিপতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হত হয়েন। ইহাঁদের একজন আত্মীয় আহ্মদ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে রাজবংশীয় নহে প্রমাণ হওয়ায় শীঘ্রই রাজধানী হইতে দূরীকৃত হইলেন। তৎপরে ইব্রাহিম নিজাম সার শিশু পুত্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, চাঁদ বিবিই এই শিশুর রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করিলেন। চাঁদ বিবি আলি আদিন সা বিজাপুরের রাজার বিধবা পত্নী ও আমেদনগরের সুরতেজো নিজাম সার ভগিনী। ইনি মহা সাহসী বীর রমণী ছিলেন; আকবরের পুত্র মুরাদ আমেদনগর আক্রমণ করিলে ইনি স্বয়ং অশ্বারোহণে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে আকবরের অন্য পুত্র দানিয়াল মির্জ্জা বহু সৈন্যসহ আমেদনগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেদনগরে নাম মাত্র রাজাগণ রাজত্ব করিতে থাকে, অবশেষে সাজিহান বাদসা এই রাজবংশের হস্ত হইতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে আমেদনগর গ্রহণ করিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লি হইতে নিযুক্ত আমেদনগরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা পেশোয়াকে এই নগর প্রদান করেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া ইহা দৌলতরাও সিন্দিয়াকে প্রদান করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ওয়েলেসলি ইহা দুই দিন আক্রমণের পর দখল করেন, কিন্তু ইহা পেশোয়াকেই প্রদত্ত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পুনার সন্ধি অনুসারে ইংরেজ সেনা এই দুর্গে বাস করে। পেশোয়ার পতনের পর আমেদনগর একটী জেলার সদর হইয়াছে।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই সহরের লোক সংখ্যা ১৭,০০০ ছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ২৬,০১২ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার লোক সংখ্যা ৩২,৯০৩ হয়, আমেদনগর সেনা নিবাসের লোক সংখ্যা ৪,৫৮৯ ছিল।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবসা করেন, তবে অধিকাংশই চাকরী ও অন্যান্য লেখাপড়ার কাজ করিয়া থাকেন। অধিবাসীর মধ্যে শুদ্রের সংখ্যা অধিক ও ইহারাই সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম করে। মুসলমানগণ আলস্য পরবশ ও সামান্য কাজ করিয়া থাকে। মাড়োয়ারিগণই ধনী, ইহারা ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া করিয়াছে। সহরের একটী রাস্তায় কেবল ভূষামাল বিক্রয় হয়, অপর আর একটী রাস্তায় কেবলই কাপড় বিক্রয় হইয়া থাকে।

সহরের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে দুর্গ, ইহা গোলাকার প্রস্তরে নির্ম্মিত, চারিদিকে একটী গভীর গড় আছে। পূর্ব্বে এই স্থানে একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গ ছিল, কিন্তু পরে ১৫৫৯

খৃষ্টাব্দে মালিক আহ্মদ পৌত্র হুসেন নিজাম সা উপস্থিত দুর্গটী নির্ম্মাণ করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দুই দিন গোলা বৃষ্টির পর দুর্গ ব্রিটিস হস্তে আইসে, সেই যুদ্ধে এই দুর্গ প্রাচীরে যে গোলাঘাত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহরে মুসলমান নির্ম্মিত অনেক অট্টালিকা আছে, অনেক মসজিদ পরিবর্ত্তিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট আফিস করা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দিতে নির্ম্মিত একটী মসজিদে কলেক্টরের আফিস হইয়েছে, এক্ষণে যে অট্টালিকায় জজ আদালত, পূর্ব্বে সেটী একজন মুসলমান ওমরাওয়ের প্রাসাদ ছিল। এক্ষণে যে গৃহে জেল ও ডাক্তারখানা, পূর্ব্বে তাহাও মসজিদ ছিল। সহর হইতে পূর্ব্বে ছয় মাইল দূরে ৭.৮০০ ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর একটী অসম্পূর্ণ কবর ছিল, এক্ষণে সেইটীকে নির্ম্মিত করিয়া তথায় সেনাগণের একটী স্বাস্থ্য নিবাস করা হইয়াছে। সহরের নিকটই একটী মারবেল ট্যাবলেট আছে, যে সকল সেনানী ও সৈনিক এই দুর্গ জয় কালে হত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ইহাতে খোদিত আছে। আমেদনগরে একটী আরমেনিয়াদিগের গির্জ্জা, একটী পার্শ্ব আগেয়ারি, ২.৩টী মন্দির, একটী হাই স্কুল ও ৭টী দেশীয় ভাষার স্কুল আছে। মিউনিসিপালিটী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ স্থাপিত হয় ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৫৬,১০০৲ টাকা ইহার আয় ছিল। মিউনিসিপালিটী হওয়া পর্য্যন্ত সহরের রাস্তা সকল প্রসস্ত করা হইয়াছে, ড্রেনের বন্দোবস্ত হইয়াছে, ও জলের বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। সহরের কুয়ার জল পান করিতে পারা যায় না।

আরাকান—পার্ব্বত্য প্রদেশ। ইহার দক্ষিণে আকায়েব জেলা। পশ্চিমে চট্টগ্রাম। উত্তরে ও পশ্চিমে পাহাড় ও জঙ্গল, এই প্রদেশ সমস্তই পর্ব্বতে পূর্ণ, এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। এই খান হইতে কুলাদান নদী বাহির হইয়াছে, মি, পি, লেম্র প্রভৃতি আরও অনেক নদী এই খানে প্রবাহিত। এই বিস্তৃত জঙ্গলে হস্তি, গণ্ডার, হরিণ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর প্রভৃতি বহু প্রকার বন্য জন্তু আছে। গ্রাম্য পশুর মধ্যে মহিষ, গো, ছাগ, শূকর ও কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গলে বহু প্রকার বড় বড় বৃক্ষ জন্মে।

ইতিহাস।—এই সকল পর্ব্বতে ও জঙ্গলে ভিন্ন ভিন্ন বন্য জাতি বাস করে, ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী প্রধান, যথা (১) বেকিং (২) সাণ্ডু (৩) আনু (৪) টীন (৫) চ (৬) ম্র। এই সকল পাহাড়িয়া জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচলিত। ইহারা ইহাদের ঠাকুর দেবতার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার বলি প্রদান করে। ফসল জন্মিবার পরে ও বীজ বপনের সময় ইহাদের দুইটী বৃহৎ উৎসব হয়। এই সময় মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি জন্য মদ ও ভাত প্রদান করা হয়। ইহাদের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে এক প্রকার আইন প্রচলিত আছে। খুন করিলে দুইটী ক্রীতদাস ও ৬০০ টাকার দ্রব্যাদি জরিমানা হয়। অন্যান্য অপরাধের দণ্ডও কেবল জরিমানায় হইয়া থাকে। কোন গ্রাম লুণ্ঠন করিতে গিয়া খুন করিলে যদি ধরা পড়ে তবে অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা হইয়া থাকে।

এই সকল জাতির গৃহ বংশ নির্ম্মিত ও ভূমি হইতে ৫।৬ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই সকল জাতির মধ্যে সতীত্ব নাই, বিবাহ বিচ্যুতিও অতি সহজ। বর কনেকে কতকগুলি দ্রব্য উপহার দিলেই বিবাহ হইল। বিবাহ বিচ্যুত হইলে কন্যাকে এই সকল প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। বিষয়াদি কেবল পুত্র পায়, কন্যা পায় না। স্ত্রীলোকগণ ঋণের জন্যও দায়ী নহে। চাসবাসের তত উন্নতি নাই। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পাহাড়িয়াগণ সেই জমিতে চাস করে। লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রের অতিশয় অভাব। এখানে চাউল অল্প পরিমাণ জন্মে, তবে এ প্রদেশের তুলা বাঙ্গালার তুলা হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত। স্ত্রীলোকগণ জঙ্গল পরিষ্কার করা ব্যতীত আর সকল প্রকার চাসের কাজ করিয়া থাকে।

এখানে কাপড় ও ঝাঁকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। কোন কোন পাহাড়িয়া জাতি কম্বল প্রস্তুত করিয়া থাকে, এই সকল কম্বল দেখিতে তুরস্ক তুয়ালের ন্যায়। লেম্র নদীর তীরে বড় বড় মাটীর পাত্র নির্ম্মিত হয়, এই সকল মৃত্তিকা পাত্রের চারিদিকে বেতের কাজ করা হয়। সর্ব্বত্রই অল্প পরিমাণ ব্যবসা বাণিজ্য চলে। ইহারা ব্রীটিশ রাজ্য হইতে লবণ ক্রয় করিয়া থাকে।

এপ্রদেশের প্রত্যেক পরিবারের নিকট হইতে ১৲ টাকা কর আদায় করা হয়। প্রত্যেক গাছের জন্যও ১৲ টাকা লওয়া হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশের মোট রাজস্ব ৬,৮৩০৲ টাকা হয়। কিন্তু ব্যয় ৫২,৭২০৲ টাকা পড়ে। এই প্রদেশ শাসন জন্য একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আর একজন আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। ইহাদের অধীনে একদল বন্দুকধারী পুলিশ আছে। এই পুলিশ সৈন্য এপ্রদেশের আদ্য স্থানে স্থাপিত আছে, মধ্যে মধ্যে সৈন্যগণ সমস্ত প্রদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া পাহারা দেয়। যাহাতে পাহাড়িয়াগণ কোন মতে লুট পাট করিতে না পারে, এই পুলিস সৈন্যের তাহাই কার্য্য।

এদেশের আব হাওয়া ভাল নহে। জ্বর অতিশয় প্রবল। এপ্রেল, মে ও জুন এই তিন মাসে জ্বর অতিশয় হইতে থাকে। অধিবাসীগণ সাধারণতঃ সুস্থ, তবে চর্ম্মরোগ ইহাদের অতিশয় হয়। ইংরেজগণের এপ্রদেশে থাকা বড়ই ক্লেশকর, এখানে কোনরূপ মাংস পাওয়া যায় না।

আরাকান যোম।—বঙ্গদেশ ও আরাকান প্রদেশের মধ্যস্থিত পর্ব্বত শ্রেণী। নাগাদেশ ও মণিপুর হইতে আরম্ভ হইয়া আরাকানের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া ইহা অবশেষে সমুদ্র মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মণিপুরের নিকটই এই পর্ব্বতশ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, মধ্য নিম্ন হইয়া পরে আরাকান প্রদেশে ইহা পুনরায় অতিশয় উচ্চ হইয়াছে। এখানে এই পর্ব্বত ৭,১০০ ফিট উচ্চ। এই খানে এই পর্ব্বত হইতে অসংখ্য শাখা প্রশাখা নির্গত হইয়া চারিদিক জঙ্গলে ও পাহাড়ে পূর্ণ করিয়াছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই পর্ব্বতে একটী শৈত নিবাস স্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু এই স্থান শীত প্রধান হইলেও ইহা এত ভিজা ও বৃষ্টিময় যে ইংরেজগণ এই স্থান সকলে কোনই

উপকার পান না, এতদ্ব্যতীত এখানে জলের বিশেষ অভাব। তাহাই এ চেষ্টা পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

আরকট—মান্দ্রাজের উত্তর আরকট জেলার একটী সহর। আরকট রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে পালার নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। আরকট তালুকের সদর কাছারি, পূর্ব্বে কর্ণাটিকের নবাবগণের রাজধানী ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহার আর সে সমৃদ্ধি নাই। লোক সংখ্যা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেনসস অনুসারে—মোট ১০,৯২৮।

হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	অন্য জাতি
৯,০৭৭,	১,৭৫৭,	৯২,	২,

কিছু কিছু চাউল রপ্তানি ব্যতীত, এখানে অন্য কোনই ব্যবসা বাণিজ্য নাই। চুড়ী ব্যতিত এখানে আর কোন দ্রব্যও প্রস্তুত হয় না। ভারত ইতিহাসে আরকট একটী প্রধান স্থান;—১৭১২ খৃষ্টাব্দে মহীশুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য দিল্লির সেনাপতি আরকটে তাঁহার সেনানিবাস সংস্থাপন করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে হজি ভোনশ্লা এপ্রদেশ আক্রমণ করেন, তৎপরে ইহার তিনজন মুসলমান নবাব একে একে নিহত হন, ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য আরকট দুর্গে বাস করে। আরকটে ইংরেজগণ যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করেন, তেমন বীরত্ব ভারত ইতিহাসে তাঁহাদের আর দেখা যায় না। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে আগষ্ট ক্লাইব ২০০ ইংরেজ ও তিনশত দেশীয় সৈন্য লইয়া আরকট দখল করিতে অগ্রসর হয়েন। ৫ দিন পরে তাহারা আরকটের নিকট আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন, এই দিন এপ্রদেশে এক ভয়াবহ ঝটিকা হয়। ঝটিকা কালে ইংরেজগণের শান্ত ও বীরত্ব-ভাব দেখিয়া আরকটস্থ মুসলমানগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিল, পরদিন ক্লাইব অবাধে আরকট দখল করিলেন। কিন্তু কর্ণাটিকের নবাব চাঁদ সাহেবের নিকট এ সম্বাদ উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার পুত্র রাজা সাহেবকে সসৈন্যে আরকট অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন। আরকটের যুদ্ধের বিষয় ও ইংরেজ বীরত্বের বর্ণনা ইতিহাসে উল্লেখিত হইয়াছে। দশসহস্র সৈন্যসহ রাজা সাহেব ক্লাইবকে পরাভূত করিতে না পারিয়া অবশেষে আরকট পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আরকট ফরাসীগণকে প্রদান করা হয়। পরবৎসর দুইবার ইহা পুনরায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা বিফল হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কুট সাহেব এই নগর সাত দিবসের যুদ্ধের পর গ্রহণ করেন। তৎপরে ইংরেজ বন্ধু নবাব মহম্মদ আলির অধিকারে ইহা বিশ বৎসর রহে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইহা হাইদর আলিকে প্রদান করা হয়, ইনি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রদেশ অধিকার করিয়া রহেন। হায়দার আলির মৃত্যু হইলে টিপু সুলতান তাহার সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি আরকটের দুর্গ নষ্ট করিয়া দিয়া এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটিক প্রদেশ ইংরেজ অধিকারে আসিলে আরকটও ইংরেজ অধিকার ভুক্ত হয়। এই সহরে এখনও অনেক

কবর ও মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ সহর রাণিপৎ আরকট হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

আরকট উত্তর।—মান্দ্রাজ প্রদেশের একটী জেলা; পরিমাণ ফল ৭,২৫৬ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১৮১৭,৮১৪। ইহার উত্তরে কডাপা ও নিলোর জেলা, দক্ষিণে সালেম ও দক্ষিণ আরকট জেলা, পূর্ব্বে চিঙ্গিলিপট জেলা ও পশ্চিমে মহিসুর রাজ্য।

প্রাকৃতিক ভাব।—উত্তর ও পশ্চিমাংশ পর্ব্বতে পূর্ণ ও সুন্দর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অংশ সমতল ভূমি। পূর্ব্ব ঘাট পর্ব্বত ও ইহার শাখা প্রশাখায় এই জেলা পূর্ণ। এই সকল স্থানে লৌহ ও তাম্র যথেষ্ঠ পরিমাণে পাওয়া যায়। মহিসুর প্রদেশে স্বর্ণও পাওয়া গিয়াছে, সম্ভবমত এ জেলায়ও স্বর্ণ পাওয়া যাইতে পারে। এ জেলায় কয়লা নাই, তবে চুণ ও গৃহ নির্ম্মানোপযোগী অনেক পাথর পাওয়া যায়। এই প্রদেশের প্রধান নদী পালার। উহার চিয়ার ও পোয়ানি নামক দুইটী শাখা এই জেলায় আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি নদী আছে, কিন্তু এই সকল নদীতে বৎসরের মধ্যে অনেক সময়ই জল থাকে না, তবে বালি খনন করিয়া জল বাহির করিয়া চাস করা হয়। এই প্রদেশে বিস্তৃত জঙ্গল আছে, গভর্ণমেণ্টের এখনও এই সকল জঙ্গল হইতে বিশেষ আয় হয় নাই। এখানে বৃক্ষের মধ্যে রক্তচন্দনই প্রধান। মৎস্য এদেশের লোকের আহারীয় হইলেও বিশেষ পরিমাণে প্রাপ্তব্য নহে। বন্য জন্তু সকল প্রকারই পাওয়া যায়।

ইতিহাস।—প্রাচীন দ্রাবিড় ও আধুনিক কর্ণাটিক রাজ্য লইয়া উত্তর আরকট জেলা। এ প্রদেশের অতি প্রাচীন ইতিহাস কিছুই অবগত হওয়া যায় না, করম্বক নামক একজাতি প্রথম আসিয়া এই প্রদেশে বাস করে। পূর্ব্বে ইহাদের কোন রাজা ছিল না, তবে ইহাদের মধ্যে গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইলে ইহারা কামাণ্ডু করম্ব প্রভু নামক এক ব্যক্তিকে রাজা করে। পালব রাজবংশের ইনিই প্রথম;—৭ম শতাব্দিতে পালব বংশ মহা প্রতাপান্বিত হয়, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই কঙ্গ ও চোল রাজগণ ইহাঁদের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দিতে চোলগণ করম্ব জাতিকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। চোলদিগের অধীনে কনজিভিরাম এই রাজ্যের রাজধানী হয়। কিন্তু বিজয়নগর ও তেলিঙ্গিনা রাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া চোলরাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। সপ্তদশ শতাব্দিতে বিজয়নগর রাজ্যও নষ্ট হইয়া যায়, তৎপরে মহারাষ্ট্রগণের প্রতাপ এই প্রদেশে বৃদ্ধি পায়। শিবজীর অধীনে মহারাষ্ট্রগণ দক্ষিণ ভারতে মহা প্রতাপান্বিত হয়। শিবজীর বৈমাত্র ভ্রাতা ভিকাজী তাহার মৃত্যুতে এই প্রদেশের কতকাংশ লাভ করেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শিবজী তাহার হস্ত হইতে এই প্রদেশ কাড়িয়া লইবার জন্য কর্ণাটিক প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়েন। এই প্রদেশের ভিলোর, আরনি প্রভৃতি দখল করিয়া শিবজী নিজ অধিকার এই রাজ্যে বিস্তার করিলেন। এই সময়ে শিবজী এ প্রদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তরে যুদ্ধ করিতে যান, তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা শান্তজীকে এ প্রদেশের ভার প্রদান করা হয়, কিন্তু

ভিকাজী এ প্রদেশ শীঘ্রই শাস্তজীর হস্তচ্যুত করিয়া লইলেন, পরে রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব শিবজীকে প্রদান করিবেন স্বীকার করায় শিবজী ভিকাজীকেই এই রাজ্য প্রদান করেন। এই সময়ে আরঙ্গজিব এ প্রদেশে নিজ অধিকার সুদৃঢ় করিবার জন্য তাঁহার সেনাপতি জুলফকর খাঁকে প্রেরণ করিলেন। তিনি এই প্রদেশের জিঞ্জি নামক স্থান অধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিলেন; ও দাউদ খাঁকে আরকটের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। পরে সাদাতউল্লা খাঁ কর্ণাটিকের নবাব উপাধি ধারণ করিয়া ১৭১২ খৃষ্টাব্দে আরকটে তাহার রাজধানী সংস্থাপন করে। অন্যান্য সমস্ত আবশ্যকীয় বিবরণ আরকট সহরের বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।

লোক সংখ্যা।—১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশের লোক সংখ্যা ২০১৫,২৭৮ ছিল;—১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে ১৮১৭,৮১৪ দেখা যায়। অধিবাসীগণ অধিকাংশই পল্লিগ্রামে বাস করে, ও কৃষিকাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। রেল হইয়া কৃষিজীবিগণের অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছে।

দুর্দ্দৈব।—জলপ্লাবন এ প্রদেশে কখনই হয় না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২রা মে এক ঝটিকা হইয়া জলপ্লাবন হয় ও অনেক লোক এ জলপ্লাবনে প্রাণত্যাগ করে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়া ছিল, গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা না করিলে এ প্রদেশ জনশূন্য হইত। রেল হইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের কতক সুবিধা হইয়াছে, তবে এ প্রদেশে খাল খনন করিয়া কৃষির সুবিধা করিবার কোনই উপায় নাই।

ব্যবসা বাণিজ্য।—চাউল ও গুড়ই এই জেলার প্রাধান রপ্তানি দ্রব্য। আমদানি হইতে রপ্তানি অধিক হয়। কাপড় বুননই এ প্রদেশের প্রধান কার্য্য তবে বালাজাপেটে সুন্দর কারপেট, বন্দিবাসে লাল মাদুর, ত্রিপাতিতে কাষ্ঠের ও পিত্তলের দ্রব্য, পুঙ্গানুরে লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য, গুড়িয়াত্তমে মৃত্তিকার দ্রব্য এবং কালা হস্তিতে স্ফাটিকের কার্য্য অতি সুন্দর হয়। এ জেলার রাস্তাঘাট সুন্দর, জেলার মধ্যে ১৭০ মাইল রেল আছে এতদ্ব্যতীত ১১৫২ মাইল রাস্তাও আছে। ত্রিপাতিতে প্রতি বৎসর একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

শাসন প্রণালী।—এই জেলার মধ্যে ৯টি গভর্ণমেণ্টের তালুক, ৪টী বড় জমিদারি ও একটী জায়গির আছে। মোট রাজস্ব ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৩৩৭,১৪৩৲ ছিল। এই জেলায় ৩৭টী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ও ১১টী দেওয়ানি আদালত আছে। এখানে ৭২২টী স্কুল আছে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৩৪,৯৯৪ বালক ও ১,৪৫১ বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিল।

আবহাওয়া।—এই জেলার অনেক অংশে ম্যালেরিয়া জ্বর আছে। কুষ্ঠ খুব প্রবল, ফেব্রুয়ারি হইতে মে পর্য্যন্ত ভয়াবহ বসন্তরোগ দেখা দেয়। বিসূচিকাও সময় সময় অতি প্রবল ভাবে দেখা দিয়া থাকে।

দক্ষিণ আরকট।—মান্দ্রাজ প্রদেশের একটী জেলা, পরিমাণ ফল ৪,৮৭৩, লোক সংখ্যা ১৮১৪,৭৩৮। ইহার উত্তরে চিঙ্গিলপট ও উত্তর আরকট জেলা, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর,

দক্ষিণে ত্রিচিনাপল্লি ও তানজোর ও পূর্ব্বে সালেম জেলা এই জেলায় ৮টী তালুক আছে ও ইহার সীমানার মধ্যে ফরাসীদিগের পণ্ডিচারি সহর অবস্থিত।

প্রাকৃতিক ভাব।—পশ্চিম প্রান্তে কালরিয়ান পর্ব্বত ও দক্ষিণে জবাধী পাহাড় থাকা সত্বেও এপ্রদেশ সম্পূর্ণই সমতল। ঐ দুই পর্ব্বত হইতে কয়েকটী শাখা এ প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতেও ইহার ভূমির সমতলতার কোনই হানি হয় নাই। এ জেলার প্রধান নদী কলেরুন ভিলোর ও পারাবানার। এই সকল নদীর সর্ব্বাংশে নৌকায় গতায়াত করিতে পারা যায় না। এই কয়টী ব্যতীত আর গুটিকতক ছোট ছোট নদী আছে। এ জেলায়ও বিস্তৃত জঙ্গল আছে, এই জঙ্গলে বহু সংখ্যক গাভী প্রতি বৎসর চরাইয়া আনা হয়। উত্তর আরকটেও যে সকল বন্য পশু আছে, এ জেলায়ও তাহাই আছে। পক্ষীর মধ্যে ময়ূর, ঘুঘু প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। নানা জাতীয় মৎস্যও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ইতিহাস।—১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে জিঞ্জির শাসন কর্ত্তা ইংরেজদিগকে তাঁহার রাজ্যে কুঠি নির্ম্মাণ করিতে আহ্বান করেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে কডালোরে একটী কুঠি সংস্থাপন করা হয়। এই কুঠি লাভ জনক না হওয়ায় কয়েক মাস পরে পণ্ডিচারি হইতে ১০ মাইল দূরে এক কুঠি সংস্থাপিত করা হয়। চার বৎসর পরে মহারাষ্ট্রগণের নিকট হইতে ইংরেজগণ কয়েকটী গ্রাম লাভ করেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই অধিকার বা জমিদারি আরও বিস্তৃত করা হয়। এই স্থানে ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড স্থাপন করা হয়। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড ফরাসীগণ অধিকার করে। কিন্তু এই ঘটনার দুই বৎসর পরে সার আয়ার কুট পণ্ডিচারি দখল করিয়া ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডের দিকে অগ্রসর হওয়ায়, ফরাসীগণ এই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যায়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও টিপু সুলতান আবার ইহা অধিকার করেন, ও তিন বৎসর এই স্থান ইহাদের অধিকারেই রহে। অবশেষে এই দুর্গ পুনরায় ইংরেজগণের হয় ও পণ্ডিচারি ফরাসীগণকে প্রদান করা হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী প্রদেশ আবার ইংরেজগণ দখল করেন ও কডালোরের রেসিডেন্টের উপর ইহার শাসন ভার অর্পিত হয়। তৎপরে ইহা একটী স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করা হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচারি সহর ফরাসীগণকে প্রদান করা হয়। তৎপরে এই জেলার গঠন সম্বন্ধে সময় সময় অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

লোক সংখ্যা।—১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই জেলার লোক সংখ্যা ১৭৫৫,৮১৭ ছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারিতে ১৮১৪,৭৩৮ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেন্‌সাস্‌ রিপোর্টে মোট লোক সংখ্যা ১৩১,৯৩৭ লিখিত আছে। এই জেলার ভাষা তামিল, সেটীগণই ধনী ও ব্যবসা বানিজ্য করেন। ব্রাহ্মণগণ জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষকদিগের অবস্থা ভাল নহে, সকলেই প্রায় ঋণ জালে জড়িত।

কৃষি।—চাউলই এপ্রদেশের প্রধান ফসল। নীল, আক এবং তুলার চাষও আছে। কৃষি সম্বন্ধে অন্যান্য সকল বিষয় উত্তর আরকটের সহিত এ জেলার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

দুর্দ্দৈব।—জলপ্লাবন ও অনাবৃষ্টি এ প্রদেশে সর্ব্বদাই হয়। ১৮৫৩, ১৮৫৮, ১৮৭১, ১৮৭৪ ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় জলপ্লাবন হইয়াছিল। এক শত বৎসরের মধ্যে এই জেলায় প্রায় দশবার অন্নকষ্ট হইয়াছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, এই দুর্ভিক্ষে এপ্রদেশের যে অবস্থা হইয়াছে তাহার এখনও কোনই উন্নতি হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রজা রক্ষার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছিলেন ও এই উদ্দেশ্যে মোট ১০৩২১০০৲ টাকা ব্যয় করেন। এখানে ঝড়ও মধ্যে মধ্যে হয়। এই সকল ঝড়ে বিশেষ প্রাণ হানিও হইয়াছে। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের ঝড়ে কয়েকখানি জাহাজ ডুবিয়া যায়। ইহার মধ্যে ৭৫০ শত লোক সহ একখানি যুদ্ধ পোত ডুবিয়া যায়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ হইয়াছিল। এই ঝটিকার আট বৎসব পরে আর এক ভয়াবহ ঝড়ে পণ্ডিচারি বন্দরের সমস্ত জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয। তিন খানি যুদ্ধ পোত ডুবিয়া যায ও আরও তিন খানি জাহাজ ১,১৫০ জন ইংরেজ সহ জলমগ্ন হয়।

ব্যবসা বাণিজ্য।—এই জেলায় নীল, চিনি, লবণ, মাতুর, হাঁড়ি, তেল, কাপড় প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ভুষিমাল, তেল, মদ প্রভৃতিও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে একটী কাপড়ের কারখানা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই কারখানা এক্ষণে অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছে। এই জেলার নানা স্থানে বড় বড় মেলা হয়, এই সকল মেলায় নানা প্রকার ও অনেক টাকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে। একটী ষ্টিমের চিনির কল ইরুভেলিপাটে সংস্থাপিত হইয়াছে। লৌহ স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। তবে লৌহের একটী বৃহৎ কারখানা কোন একটী কোম্পানী খুলিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সুবিধা না হওয়ায় তাঁহারা ইহা বন্ধ করিয়াছেন। এই জেলায় বহুসংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক মন্দির আছে।

আরাকান।—ব্রিটিশ বর্ম্মার উত্তরাংশের বিভাগ, এই বিভাগে চারিটী জেলা আছে। পরিমাণ ফল ১৪,৫২৬ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৫৮৭,৫১৮। আকায়েব জেলার ইতিহাস বর্ণনা কালে আরাকান সম্বন্ধীয় সকল কথাই আমরা বলিয়াছি। একজন কমিসনার এই প্রদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার মোট রাজস্ব ৩০০২,২৩০৲ টাকা।

আরাকান পার্ব্বত্য প্রদেশ।—আরাকান বিভাগের একটী জেলা। পরিমাণ ফল ৪ হইতে ৫ হাজার বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১৪,৪৯৯।

আরনি।—উত্তর আরকটের মধ্যস্থিত আরনি জাইগিরের একটী সহর। লোক সংখ্যা ৪,৮১২। চিয়ার নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এইখানে একটী বৃহৎ

সেনা নিবাস ছিল, এক্ষণে ইহা একটী সামান্য সহর মাত্র। এইখানে একটী দুর্গ ছিল, এক্ষণে এটী ভগ্নাবশেষ মাত্র। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব এটী দখল করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সার আয়ার কুট লালি ও হাইদার আলিকে এইখানে পরাস্থ করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এইখানে ইংরেজ সৈন্য সমস্ত সমবেত হয়।

আরা।—বাঙ্গালার সাহাবাদ জেলার সদব কাছারি। লোক সংখ্যা ৪২,৯৯৮। মিউটিনির সময় আরা ইতিহাসে খ্যাত। ১২ জন ইংরেজ ও ৫০ জন শিখ আট দিবস পর্য্যন্ত অতিশয় বীরত্বের সহিত বিদ্রোহীগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। কুমার সিংহ এই সকল বিদ্রোহীগণের নেতা ছিলেন। মেজর ভিন্‌সেণ্ট আয়ার ইংরেজ সৈন্য লইয়া আরার ইংরেজগণকে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পথি মধ্যে অসংখ্য বিদ্রোহীগণ মেজর আয়ারকে ক্রমান্বয়ে আক্রমণ করিতেছিল, কিন্তু তিনি অসীম সাহসে অতি যৎসামান্য ইংরেজ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু সহস্র সহস্র বিদ্রোহীগণ চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছিল। অবশেষে ইংরেজ সৈন্য মহা পরাক্রমে (বেয়নেট) সঙ্গিন সহ অগ্রসর হইলে তাহারা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল, তখন মেজর আয়ার নির্ব্বিবাদে দানাপুর হইতে আরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আরাগায়ুম।—বেহারের মধ্যস্থিত আকোনা জেলার একটী সহর। লোক সংখ্যা ৪,৬২৫। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর এইখানে সার আবথার ওয়েলেসলি ভোনশ্লাকে পরাস্থ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে আরগম যুদ্ধের স্মরণ চিহ্নের স্বরূপ মেডেল এই যুদ্ধের জীবিত বীরগণকে প্রদান করা হয়।

আরাঙ্গাবাদ।—নিজাম রাজ্যের একটী সহর। কাউম নদীর তীরে অবস্থিত, লোক সংখ্যা ২০,৫০০। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত মালিক আম্বর এই নগর সংস্থাপন করেন। মালিক আম্বর এই নগরের নাম কারকি রাখেন, ইহার চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। এই সহরে এখনও অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, আরঙ্গজিব এইখানে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু এক্ষণে এটী সম্পূর্ণই ধ্বংসাবশেষ হইয়াছে। আরঙ্গজিব তাঁহার একটী বেগমের জন্য একটী সুন্দর কবরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এটী অনেকটা তাজমহলের ধরণে নির্ম্মিত হয়। এক সময়ে আরাঙ্গাবাদ একটি বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখনও সহরের চতুর্থাংশ ভগ্নস্তূপে পূর্ণ। সহর হইতে দুই ক্রোশ দূরে হারসূল নামক স্থানে অনেক ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। আরঙ্গজিব পথিকদিগের জন্য এই-খানে একটী পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সহরের পশ্চিমে প্রায়পঞ্চাশটী আরমানিদিগের কবর দেখা যায়; সহর হইতে ১৪ মাইল দূরে রোজা নামক স্থানে মালিক আম্বরের সমাধি আছে। সেনা নিবাস অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আরাঙ্গাবাদের গিরি মন্দিরও বিখ্যাত। বরজিস সাহেব তাঁহার পুস্তকে ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছেন। শিবাচল পর্ব্বতের বর্ণনা দ্রষ্টব্য। তাহাতে আরঙ্গবাদের গিরিমন্দিরের সমস্ত বর্ণনা দেওয়া গেল।

আরাবলী পর্ব্বত।—রাজপুতনার মধ্যস্থিত বিস্তৃত পর্ব্বত শ্রেণী। ইহা উচ্চে হাজার ফিট হইতে ৩ হাজার ফিট, প্রস্থে ৬ মাইল হইতে ৬০ মাইল। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অক্ষ পর্ব্বত, ৫,৬৫০ ফিট উচ্চ। উত্তরে লুনি ও সাখী নদী উত্থিত হইয়া কাচ উপসাগরে পতিত হইয়াছে। দক্ষিণ দিকের কতকগুলি নদী কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে, কতকগুলি মিলিত হইয়া চাম্বাল নদী হইয়াছে, চাম্বাল অবশেষে যমুনাতে যাইয়া মিলিয়াছে। আরাবলী পর্ব্বতের অধিকাংশে কোনই চাসবাস হয় না, এমন কি অনেক স্থানে জঙ্গল পর্য্যন্ত নাই। পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা গুলিও বালুকাময় মরু, ইহাদের মধ্যে কোন কোন স্থানে চাসবাস হয়। পর্ব্বতের উপর মার নামক বন্যজাতি বাস করে। ইহার শাখা প্রশাখা চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

আরোয়াল।—গয়া জেলার একটী প্রধান হাট। ইহা শোন নদীর তীরে অবস্থিত; এখানে দুইটী বড় বড় চিনির কারখানা আছে। বর্ত্তমান শতাব্দির প্রারম্ভে এই স্থানে কাগজি মহল নামে একটী পাড়ায় বিস্তৃত কাগজ নির্ম্মাণের কারখানা ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহার কোনই চিহ্ণ নাই।

আসারুর।—ইহার নাম খাঙ্গার আসারুর, এই জেলার লোকে এই স্থানকে মিযান আলি কহে। পঞ্জাবের গুজরানবালা জেলার একটী গ্রাম। এইস্থানে একটী প্রাচীন সহরের ভগ্নস্তূপ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টের পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দিতে এই সহর সম্ভবত বিদ্যমান ছিল। জেনারেল কনিংহাম বলেন যে হোয়েন থিসাং যে সিকোয়া বা টাকি সহর দেখিয়াছিলেন, সেই সহর এইখানে অবস্থিত ছিল। এক সময়ে এই সহর সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী ছিল; প্রাচীন অট্টালিকা, দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়, প্রতি বৎসরই এইখানে অসংখ্য অতি প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে একজন ফকির এই ভগ্নস্তূপের উপর একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

আলমনগর।—অযোধ্যার হারদই জেলা মধ্যস্থিত সাহাবাদ তসীলের একটী পরগণা। ইহার উত্তরে খেরি জেলা, পূর্ব্বে পিহানি, দক্ষিণে উত্তর সারা, এবং পশ্চিমে সাহাবাদ পরগণা। এই প্রদেশে তাথিরিয়াগণের হস্তে ছিল, পরে গৌর ক্ষত্রিয়গণ কণোজ হইতে ইহাদিগকে দূর করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করে। ইহার পর নীকুম্ভগণ এই প্রদেশ দখল করে, আকবর বাদসাহের সময় নবাব সদর জাহান ইহা অধিকার করেন। বহুকাল এ প্রদেশ ইহার বংশধরগণের হস্তে থাকে, অবশেষে নবাব আসফ উদ্দৌলা ইহা পুনরায় নীকুম্ভ ও গৌরগণকে প্রদান করেন। এপ্রদেশ প্রায় সমস্তই ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

আলডিমো।—অযোধ্যার সুলতানপুর জেলার একটী পরগণা। পূর্ব্বে এই পরগণা ভরগণের অধিকারে ছিল; কথিত যে একজন আলডি নামক ভর রাজা গোমতী নদীর বাম তীরে একটী দুর্গ ও নগর সংস্থাপন করেন, তাহা হইতেই এই পরগণার

নাম আলডিমো হইয়াছে। কতকগুলি ভগ্নাবশেষ দুর্গ ও সহর এক্ষণে এপ্রদেশে ভরগণের স্মরণ চিহ্নস্বরূপে রহিয়াছে। ভরগণের অধিকার কালেই অনেক হিন্দু এপ্রদেশে বাস করে, তাহার মধ্যে রাজকুমার জাতি শেষে আসিয়া এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে, বলিতে গেলে এক্ষণে এ পরগণা রাজকুমারগণের জমিদারি। এই পরগণার গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব মোট ২০২,১৮০৲ টাকা, লোক সংখ্যা ১৫৮,৪৪৬।

আলগুয়াডা।—পেগুর নিকটস্থ বঙ্গোপসাগর স্থিত জলমগ্ন পাহাড়। এই পাহাড় প্রায় ১। মাইল বিস্তৃত ও জল হইতে উচ্চ নহে। জাহাজের পক্ষে এই স্থান বড়ই বিপদজনক ও মগগণ ইহাকে নাগারিট কিরাক কহে। আলগুয়াডা নাম পটু গিজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। এক্ষণে এই পাহাড়ের উপর একটী আলোকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা ১৪৪ ফিট উচ্চ, এবং ইহার উপর একটী উজ্জ্বল আলোকসহ লণ্টন প্রতি এক মিনিটে এক একবার ঘুরে। এই আলো কুড়ি মাইল দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, মেজর জেনারেল ফ্রেজর সাহেবের তত্ত্বাবধানে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

আলাহাবাদ।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেঃ গবর্ণরের শাসনাধীন একটী জেলা। পরিমাণ ফল ২৮,৩৩১ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে অযোধ্যার অন্তর্গত প্রতাপগড় জেলা, পূর্ব্বে জৌনপুর ও মির্জ্জাপুর, পশ্চিমে বান্দা এবং ফতেপুর এবং দক্ষিণে রেওয়া রাজ্য। পূর্ব্ব পশ্চিমে এ জেলার দৈর্ঘ্য ৭৪ মাইল, উত্তরে দক্ষিণে প্রস্থ ৬৪ মাইল। আলাহাবাদ সহরই এই জেলার সদর। লোক সংখ্যা ১৪৭৪,১০৬।

(প্রয়াগ শব্দ দ্রষ্টব্য।)—আলাহাবাদের অন্যান্য তাবৎ বিবরণ প্রয়াগ বর্ণনাস্থলে বিস্তৃত রূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

আলিবাগ।—বম্বে প্রদেশের কোলাবা জেলার প্রধান সহর এবং আলিবাগ মহকুমার সদর কাছারি। এই বন্দর বম্বে হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কোন ধনী মুসলমান এই স্থানে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর বাগান নির্ম্মান করিয়া ইহার নাম আলিবাগ প্রদান করেন। উপকূল হইতে কিয়দ্দূরে সমুদ্র মধ্যে একটী পাহাড়ের উপর কোলাবা. দুর্গ। মহারাষ্ট্র জলদস্যু অঙ্গেরিয়া এই দুর্গে এক সময়ে বাস করিত। এই সহর হইতে দেড় মাইল দূরে একটী হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া এই সহরে জল আনয়ন করা হইয়াছে। এখানে আদালত, জেল, প্রভৃতি সকলই আছে, এইখানে অসংখ্য নারিকেল জন্মে ও আলিবাগের বাগানে যেরূপ আম জন্মে, তেমন আম আর বম্বে প্রদেশের কোথায় ও হয় না।

আলিগড়।—উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যার একটী জেলা। পরিমাণ ফল ১,৯৫৫ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১০২১,১৮৭। মিরাট বিভাগের দক্ষিণাংশ লইয়া এই জেলা, ইহার উত্তরে বুলন্দার সহর জেলা, পূর্ব্বে এটা, দক্ষিণে মথুরা, পশ্চিমে মথুরা জেলা ও যমুনা।

প্রাকৃতিক ভাব।—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব নামক সমতল প্রদেশ লইয়া আলিগড় জেলা। এই দুই নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় এ প্রদেশ বড়ই

উর্ব্বরা। এক্ষণে এখানে চাসের এমনই উন্নতি হইয়াছে যে লোকে এখানকার সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। কয়েকটী আম্র বাগান ব্যতীত এপ্রদেশে আর গাছই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট এপ্রদেশে বৃক্ষাদি রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। গাছের জমির কর অল্প নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, ইহাতে লোকে দিন দিন গাছ পালা রক্ষা করিবার যত্ন করিবে, ইহাই সম্ভব। অশ্বত্থ, বাবলা, মৌয়া প্রভৃতি গাছ এদেশে জন্মে।

গঙ্গা ও যমুনার তীরের জমিতে খুব ঘাস জন্মে, এই সকল স্থানে গাভি প্রভৃতি চরান হয়। গঙ্গায় প্রায়ই বড় বড় চড়া পড়ে, এই সকল চড়ার জমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং এই সকল স্থানে নানারূপ ফসল উৎপন্ন হয়। গঙ্গা ও যমুনা ব্যতীত এপ্রদেশে কালি নদী উত্তর পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণে প্রবাহিত। ইহার উপর দুইটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। নিম নদী উত্তর পূর্ব্ব হইতে আসিয়া অবশেষে কালি নদীতে মিলিয়াছে। ইহার উপরও দুইটী সেতু আছে। এতদ্ব্যতীত কারণ নদী, ঈশান, সেনাগর ও রিন্দ নদী আছে, এই সকল নদীতে শীত ও গ্রীষ্মকালে জল থাকে না। এই সকল নদী ছাড়া গঙ্গা খাল ও এই জেলাব মধ্য দিযা গিযা অবশেষে গঙ্গায় মিশিয়াছে। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে এই জেলা উত্তব পশ্চিমাঞ্চলেব মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা ও সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বোধ হয়।

ইতিহাস।—যাহা কিছু এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহার সমস্তই প্রাচীন কয়েল নগব সম্বন্ধীয়। আলিগড সহর ও দুর্গ এই নগরের বাহিবে অবস্থিত। কথিত আছে যে চন্দ্রবংশেব কোশরব নামক এক ব্যক্তি এই কয়েলনগর সংস্থাপন কবেন, এই স্থানে বলরাম কোন দানবকে বধ করিয়া সমস্ত প্রদেশ দখল করিয়া লয়েন। মুসলমান-দিগের আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে এ প্রদেশ দর রাজপুতগণের অধিকারে ছিল। দ্বাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত বারণের রাজা এই জেলার অধীশ্বর ছিলেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কুতববুদ্দিন দিল্লি হইতে কয়েল যাত্রা করেন ও যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তাহাদিগের সকল-কেই হত্যা করিয়াছিলেন। তদবধি এই নগর মুসলমান শাসন কর্ত্তা কর্ত্তৃক শাসিত হয়, দেশীয় রাজগণের হস্তেও ক্ষমতা ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে এই সহর তৈমুরের আক্রমণে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মোগলগণ দিল্লি অধিকার করিলে সুলতান বাবর কাচক আলি নামক এক ব্যক্তিকে কয়েলের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। অনেক মসজিদ ও স্তম্ভ এখনও মোগল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে। আরঙ্গজিবের মৃত্যুর পর এই প্রদেশ তৎকালীন ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া উঠে। প্রথম মহারাষ্ট্রগণ এপ্রদেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করে, তৎপরে ঝাটগণ আইসে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সুরজমল নামক একজন ঝাট দলপতি কয়েল দখল করিয়া ইহাকে এক সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে আফগানগণ ঝাটদিগকে এপ্রদেশ হইতে দূরীকৃত করে; ইহার পর বিশ বৎসর এই স্থান ভিন্ন ভিন্ন দলের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কেহই এপ্রদেশ দখল করিয়া নিজ

আয়ত্তে রাখিতে সমর্থ হয়েন না, অবশেষে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সিন্দিয়া এই জেলা অধিকার করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা মহারাষ্ট্রগণের অধিকারে থাকে, ইহাদের সময় এই দুর্গ বিশেষ সুদৃঢ় করা হয় এবং এই খানেই সিন্দিয়ার ফরাসী সেনাপতি ডি বইণ মহারাষ্ট্র সৈন্যগণকে ইয়রোপীয় প্রথায় যুদ্ধ করিতে শিক্ষা দেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হোলকার, সিন্দিয়া ও নাগপুর মিলিত হইয়া ইংরেজ, নিজাম ও পেশোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই সময়ে আলিগড় সিন্দিয়ার ফরাসী সেনাপতি পেরণের শাসনাধীনে ছিল। পেরণই এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রগণের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, কিন্তু মহারাষ্ট্র দলপতিগণ তাঁহাকে সমুচিত সাহায্য না করিয়া উভয় দলের কোন্ দল যুদ্ধে জিতিবেন, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড লেকের অধীনে একদল ইংরেজ সৈন্য আলিগড়ের নিকটস্থ হইল। পেরণ অগ্রসর হইয়া ইংরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধের প্রারম্ভেই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন ও শীঘ্রই লর্ড লেকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। আলিগড় দুর্গ তখনও একজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া ইংরেজগণ দেখিলেন যে দুর্গ সম্পূর্ণ ফরাসী কৌশলে সুদৃঢ় করা হইয়াছে ও মহারাষ্ট্রগণ সতেজে ইহা রক্ষা করিতেছে। বিশেষ চেষ্টা ও অতিশয় যুদ্ধের পর এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ইংরেজগণ দখল করিলেন ও ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দোয়াব প্রদেশ ইংরেজ করতলস্থ হইল। ইংরেজ হস্তে এই প্রদেশ আসিবা মাত্র ইহার শাসন প্রণালী স্থিরিকৃত করা হয়; কিন্তু এই সময়ে হুলকারের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় হুলকারের চর আসিয়া এই প্রদেশের জমিদারগণকে উত্তেজিত করিতে থাকে। শীঘ্রই এখানে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হয় এবং শীঘ্রই এ বিদ্রোহ দমন করাও হয়। পর বৎসরে আর একটী বিদ্রোহ হয়, ইহাতে কামোনা নামক দুর্গ হইতে বিদ্রোহী দলপতিগণকে দূর করিলে তবে এই বিদ্রোহ নিবারিত হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে আবার এ প্রদেশে বিদ্রোহ হয়, এই সময়ে জমিদারদিগের সমস্ত দুর্গ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় হইতে সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এ প্রদেশে কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে মিরাটের সিপাহী বিদ্রোহের সম্বাদ কয়েলে উপস্থিত হয়। এই সম্বাদ আসিবা মাত্র আলিগড়ের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয়, সঙ্গে সঙ্গে অধিবাসীগণ ও বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করে। ইংরেজগণ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। ২রা জুলাই পর্য্যন্ত মাদ্রাকের কুটী ইংরেজগণ বিদ্রোহীগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন, পরে এই স্থান ইংরেজগণ পরিত্যাগ করিলে সমস্ত আলিগড় প্রদেশ বিদ্রোহীগণের হস্তে আইসে। কয়েল সহরে যাহাতে লুটপাট না হয় তাহার জন্য কয়েকজনের একটী সভা হয়, কিন্তু মুসলমানগণ তাঁহাদের আজ্ঞা অমান্য করেন ও নাসিমউল্লা নামক এক ব্যক্তি নগরের শাসনভার গ্রহণ করেন। ইহার অত্যাচারে হিন্দুগণ ইংরেজ পক্ষ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল। এ দিকে ঝাট ও রাজপুতে মহা কলহ বাধিল, ২৪শে আগষ্ট একদল ইংরেজ সৈন্য গিয়া

অতি সহজে কয়েল অধিকার করিল, বিদ্রোহীগণ নগর পত্যিাগ করিযা পলায়ন করিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষে সমস্ত দোয়াব প্রদেশ হইতেই বিদ্রোহীগণকে দূরীকৃত করা হয়, তদবধি এ প্রদেশে আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

লোক সংখ্যা।—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশেব লোক সংখ্যা ১১৩৬,৫৬৫ ছিল, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১০৭৩,২৫৬ হয। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আদম স্তুমারিতে লোক সংখ্যা ১০২১,১৫৭ দেখা যায়।

কৃষি।—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আলিগড জেলায় কৃষির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, অর্থাৎ এ জেলায় পতিত জমি আর একবাবেই নাই, এমন কি গোচারণ মাঠেবও ক্রমে বিশেষ অভাব হইয়া পড়িতেছে। এই জেলার ভূমিতে বৎসবে দুইবাব, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনবার ফসল উৎপন্ন হয়। প্রধান ফসল, যব, গম, জোয়াব ও বাজবা।

দৈব দুর্ঘটনা।—আলিগড় জেলায় জলের অভাব নাই বলিযা এ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গঙ্গার খাল খনন হইবাব পূর্ব্বে অনেক সময়ে এ জেলায় দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের অনাবৃষ্টিতেই ভযানক দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬৮।৬৯ খৃষ্টাব্দেব মন্বন্তরের সমযও এ প্রদেশে বিশেষ অন্ন কষ্ট হয, তবে গঙ্গার খাল এই সময় হওয়ায় চারিদিক হইতে এই খাল সাহায্যে শস্যাদি আমদানি রপ্তানি হওয়ায় প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হইতে পারে নাই।

ব্যবসা ও বাণিজ্য।—ভূষিমাল, তুলা ও নীলই এ প্রদেশেব প্রধান রপ্তানি। হাতরাস, কয়েল, কাটবলী প্রভৃতি স্থান প্রধান শস্যের হাট। কযেক বৎসবেব মধ্যে তুলার চাষ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে এক্ষণে এ জেলায় ইহাই প্রধান চাষের দ্রব্য হইয়াছে। এ জেলায় নীলের চাষও বেশ হয়, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এখানে মোট ১৭১টী নীলকুঠি ছিল। গত ১৫ বৎসরে দেশীয়গণ অতিশয় নীলেব চাষ আরম্ভ করিয়াছে। চিনি, চাউল, তামাক, বিলাতি সর্ব্ব-প্রকার দ্রব্য এই জেলায় আমদানি হয়। হাতরাসই ব্যবসায়ের প্রধান স্থান, কয়েল সহরেও ব্যবসা অতিশয় চলে। সহরকয়টী ছাড়া এই জেলায় মোট ১৮০টী বাজার আছে। এতদ্ব্যতীত মহরমের সময় ও ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু পর্ব্বে মেলাও হইয়া থাকে।

আলিগড় জেলার পথ ঘাট উত্তম, প্রতি বৎসরই নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল উত্তর দক্ষিণে এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে, এবং সোমনা, আলিগড়, পালি ও হাতরাস রেল নামক চারটী ষ্টেশন এই জেলায় আছে। আউড ও রহিলখণ্ড রেলও আলিগড় হইতে বাহির হইয়া এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। হাতরাস রোড ষ্টেশন হইতে একটী লাইন মথুরা পর্য্যন্ত এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে, সর্ব্বশুদ্ধ ২২৯ মাইল ভাল পাকা রাস্তা এই জেলায় আছে, এ ছাড়া ৯০ মাইল ২য় শ্রেণীর ও ১৮২ মাইল তৃতীয় শ্রেণীর রাস্তাও আছে।

এই জেলায় আলিগড় ইনিষ্টিউট ও সায়েণ্টফিক সোসাইটী নামে একটী সভা আছে।

নবাব সার সায়েদ আম্মদ খাঁ এই সভা সংস্থাপিত করেন। ভাল ভাল পুস্তক দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা ও মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারই এই সভার উদ্দেশ্য। ইহার একটী লাইব্রেরী আছে, এই লাইব্রেরীতে ২,০০০ পুস্তকের অধিক আছে। আলিগড় ইনিষ্টিউট গেজেট নামে একখানি ইংরাজি ও উর্দ্দু সম্বাদ পত্রও এই সভা হইতে প্রকাশিত হয়। এ সকল ব্যতীত সভা একটী কলেজ স্থাপন করিয়াছে। আলিগড়ে ভারতবন্ধু ও ধর্ম্ম-সমাজ পত্র নামক দুই খানি সম্বাদ পত্র আছে। দুইটী ছাপাখানা এই খানে আছে।

শাসন প্রণালী।—অন্যান্য জেলার ন্যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মোট রাজস্ব ২৫০৬,০৬০৲টাকা ছিল, মোট ব্যয় ৩৭৭,৮১০৲ টাকা পড়ে। লেখা পড়া শিক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৮,৮০৪ বালক ও ১৪৪টী বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিল। এই জেলা ৬টী তশীল ও ১৪টী পরগণায় বিভক্ত। এই জেলার মধ্যে ৫টী সহরে মিউনিসিপালিটী আছে।

আব হাওয়া।—এ প্রদেশে প্রধানতঃ তিনটী ঋতু। জুন হইতে অক্টোবর বর্ষাকাল, অক্টোবর হইতে এপ্রেল শীতকাল, এপ্রেল হইতে জুন গ্রীষ্মকাল। এদেশে ম্যালেরিয়া জ্বর আছে, সময় সময় কলেরাও হয়।

আলিগড় সহর।—আলিগড় জেলার প্রধান নগর। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোক সংখ্যা ৬১,৭০০ ছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লোক সংখা ৬১,৪৮৫। কয়েল নামক বৃহৎ দেশীয় সহরের সহিত সম্মিলিত হইয়া আলিগড় সহর ও দুর্গ সংস্থাপিত। কয়েল একটী অতি সুন্দর সহর, ইহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী অতি উচ্চ স্থান, এটীতে পূর্ব্বে একটী দর জাতির দুর্গ ছিল, এক্ষণে এই উচ্চ স্থানে সাবিত খাঁর মসজিদ অবস্থিত। দুর্গটী ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক অধিকার করেন। এ সহরের ইতিহাস আমরা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। এই সহরে ডাক বিভাগের একটী কারখানা আছে, এই কারখানায় প্রায় ৭০০ শত লোক কাজ করে, এখানে ব্যাগ প্রভৃতি ডাক বিভাগের নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য তুলা, তুলার গাঁইটবন্দি করিবার জন্য এখানে কয়েকটী কল আছে।

আলিপুর।—বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার সদর কাছারি। এই মহকুমার পরিমাণ ফল ৪২০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৩৮৪,৯৭২। কলিকাতার দক্ষিণে আলিপুর অবস্থিত, এখানে বাঙ্গালার ছোট লাটের বাস ভবন বেলভিডিয়ার নামক প্রাসাদ। আলিপুরে কয়েকদল দেশীয় সিপাহী সর্ব্বদা থাকে। ছোট লাট প্রাসাদের পার্শ্বেই জুলজিকাল (পশুশালা) বাগান। আলিপুরে একটী অতি বৃহৎ জেল আছে।

আলিপুরা।—বুন্দেলখণ্ডের একটী দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তরে ও পূর্ব্বে হামিরপুর জেলা, দক্ষিণে গারুলি ও পশ্চিমে ঝান্সি। পরিমাণ ফল ৭০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১৪,৮৯১। রাজার বাৎসরিক আয় ৩০,০০০৲ টাকা। হিন্দুপাত নামক পান্নার রাজা এই প্রদেশ অচল সিংহকে প্রদান করেন। আলি বাহাদুর অচল সিংহের পুত্র প্রতাপ সিংহকে এই রাজ্যে রাখিয়া দেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এদেশ অধিকার করিলে প্রতাপ সিংহ

ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সনদ পান। প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পৌত্র হিন্দুপাত রাজ্য পান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ছত্রপত্ রাজা হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লির দরবারে ইহাঁকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করা হয়। রাজা জাতিতে পুরীহর রাজপুত, ইহার ১৮০ জন সৈন্য ও দুইটী কামান আছে।

আলিরাজপুর।—মধ্যভারতের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে অবস্থিত একটী দেশীয় রাজ্য। পরিমাণ ফল ৮৩৬ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৫৬,৮২৭। সমস্ত প্রদেশ পর্ব্বতে ও জঙ্গলে পূর্ণ। প্রধান ফসল বজরা ও মক্কা। কবে কে এই রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাহা বলা যায় না। এই প্রদেশ পর্ব্বতের ভিতর থাকায় এ দেশে মহারাষ্ট্রগণ আসায়ও ইহার বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। ইংরেজগণ এই প্রদেশ দখল করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাণা প্রতাপসিংহ এ দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মুসাফির নামক একজন কর্ম্মচারী নানা ব্যক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে রাজ্য শাসন করিতে ছিলেন। রাণা প্রতাপসিংহের পর তাঁহার পুত্র যশবন্ত সিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্য তাঁহার দুই পুত্রকে প্রদান করিয়া যান। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার এই উইল রদ করিয়া তাঁহার পুত্র গঙ্গাদেবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি রাজ্য শাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম হওয়ায় তাহার রাজ্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নিজ তত্ত্বাবধানে লইলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাদেবের মৃত্যু হইল, তাহার মৃত্যু হইলে তাহার ভ্রাতা রাণা রূপদেবজী সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়; তখন তাহার পিতৃব্য তনয় বাজি সিংহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বাজিসিংহ নাবালক থাকায় ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট রাজ্য শাসনের জন্য একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। রাজার উপাধি মহারাণা ও ইহাঁর সম্মানার্থে ৯টী তোপ হয়। রাজার দুইটী কামান, ৯ জন অশ্বারোহী ও ১৫০ জন পুলিশ কর্ম্মচারী আছে।

আলিওয়াল।—পঞ্জাবের মধ্যস্থিত লুধিয়ানা জেলার একটী গ্রাম। প্রথম শিক যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বালজোর সিংহ এইখান হইতে নদী পার হইয়া লুধিয়ানা আক্রমণের উদ্যম করেন। ২৮শে তারিখে সার হারি স্মিথ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন, শিকগণ ৬৭টী কামান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আলিওয়ালের যুদ্ধে সতদ্রু নদীর পূর্ব্ব তীরস্থ সমস্ত প্রদেশ ইংরেজ হস্তে আইসে।

আলেপি।—মান্দ্রাজ প্রদেশের ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রধান বন্দর ও দ্বিতীয় সহর। লোক সংখ্যা ৩০,০০০। ইহার একদিকে সমুদ্র, তৎপরে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র, তৎপরেই একটী বৃহৎ হ্রদ। এই বন্দরে ব্যবসা বাণিজ্য খুব চলে, সকল প্রকারের জাহাজ এইখানে আইসে। কাফি, মসলা, নারিকেল, মৎস্য প্রভৃতি রপ্তানি হয়। সকল প্রকার বিলাতি দ্রব্য ও শস্যাদি আমদানি হইয়া থাকে। এখানে ৮৫ ফিট উচ্চ একটী আলোকস্তম্ভ আছে, ইহার আলো ১৮ মাইল দূর হইতে দেখা যায়।

বন্দরের পশ্চাতস্থ হ্রদে সমুদ্র হইতে একটী খাল খনন করা হইয়াছে। সহরের ঠিক মধ্য দিয়া এই খাল গিয়াছে, সহরের মধ্যে এই খালের উপর নয়টী সেতু আছে। অট্টালিকার মধ্যে রাজ প্রাসাদ ও আদালত প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে একদল ইংরেজ সৈন্য এই পথে যায় এবং নায়ার জাতি বিশ্বাস ঘাতকতার সহিত ইহাদিগকে হত্যা করে।

আলমোরা।—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কমাউন জেলার প্রধান নগর। লোক সংখ্যা ৭,৩৯০। এই সহর দেশীয় রাজাগণের একটী সুদৃঢ় দুর্গ ছিল, ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রোহিলাগণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে মুসলমান সৈন্য কমাউনে প্রবেশ করে ও আলমোরা দখল করিয়া লুণ্ঠন করে। কিন্তু এ প্রদেশ নিতান্ত দরিদ্র ও এখানে আব হাওয়া বড়ই মন্দ বলিয়া ইহারা এদেশ ত্যাগ করিয়া আইসে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের গুরখা যুদ্ধেও আলমোরা একটী প্রধান স্থান ছিল। ২৬শে এপ্রেল কর্ণেল নিকোলস্ সাহেব অতিশয় যুদ্ধের পর গুরখাদিগকে এইস্থান হইতে বিতাড়িত করেন। এই যুদ্ধের পর আলমোরা ও কমাউন ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়।

আলোয়ার।—রাজপুতনার মধ্যস্থিত একটী দেশীয় রাজ্য। উত্তরে গুরগাওন জেলা, এবং নাভা রাজ্যের বাবল পরগণা ও জয়পুর রাজ্যের কোট কাসিম পরগণা। পূর্ব্বে ভরতপুর রাজ্য ও গুরগাও প্রদেশ। উত্তরে ও দক্ষিণে জয়পুর রাজ্য। পরিমাণ ফল ৩,০২৪ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৬৮২,৯২৬। মিউয়স নামক জাতিই এই রাজ্যের প্রধান অধিবাসী, রাজপুতের রাজ্য হইলেও এখানে রাজপুতের সংখ্যা অতি অল্প। এই রাজ্যের চারিদিক পাহাড়ে পূর্ণ, এই সকল পাহাড় ১৬শ ফিট উচ্চ। এই রাজ্যে সাবীই প্রধান নদী, এতদ্ব্যতীত সুপাবেল, চুহার ও লিন্দুয়া নামক তিনটী ক্ষুদ্র নদী আছে। শ্লেট, মারবল, লৌহ, তাম্র, শিশা প্রভৃতি এদেশে প্রচুর জন্মে। ছোট বড় নানারূপ বন্য জন্তুও সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে আলোয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এই সকল রাজা জয়পুর ও ভরতপুরের রাজাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতেন। প্রতাপ সিংহ নামক একজন রাজপুত এই আধুনিক আলোয়ার রাজবংশের প্রথম পুরুষ। জয়পুরের রাজা নাবালক থাকায় ইনি আলোয়ার প্রদেশ দখল করিয়া বইসেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ইনি ভরতপুর হইতে আলোয়ার কাড়িয়া লয়েন। ইহার মৃত্যুর পর ইহাঁর পৌষ্যপুত্র বলবন্ত সিংহ রাজা হয়েন। মহারাষ্ট্র যুদ্ধে বলবন্ত সিংহ ইংরেজ সহিত মিলিত হয়েন। লাসোয়ারি যুদ্ধের পর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ইহাকে এই প্রদেশের উত্তরাংশ প্রদান করেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে আলোয়ার রাজ সন্ধিসূত্রে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহিত আবদ্ধ হয়েন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আলোয়ার রাজ জয়পুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার সহিত আবার সন্ধি হয় ও ইহাতে তাহাকে এরূপ ষড়যন্ত্র করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করা হয়। কিন্তু ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বকতিয়ার সিংহ জয়পুর রাজ্যের দুইটী দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন।

তাঁহাকে দমন করিবার জন্য একদল ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হয়, তাঁহার রাজধানীর নিকট ইংরেজ সৈন্য আসিলে তিনি দুইটী দুর্গ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়েন। বকতিয়ার সিংহের মৃত্যুর পর তাহার পৌষ্যপুত্র বেণী সিংহ রাজা হয়েন, কিন্তু রাজার বলবন্ত সিংহ নামক এক জারজ পুত্র ছিল। ইনি সিংহাসন দাবি করায় উভয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট মধ্যে থাকিয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দেন,—কিন্তু বলবন্ত সিংহকে বেণী সিংহ হত্যা করিবার উদ্যম করায় আবার আলোয়ার প্রদেশে একদল ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হয়। বলবন্ত সিংহকে আলোয়ারের উত্তর প্রদেশ প্রদান করা হয়, কিন্তু তিনি পুত্রহীন কাল কবলে পতিত হওয়ায় তাহার রাজত্ব অবশেষে আলোয়ার রাজ্যভুক্ত হয়। বেণী সিংহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শিবধন সিংহ সিংহাসনাধিরোহণ করেন, তখন তাঁহার তিনবৎসর মাত্র বয়স। মুসলমান মন্ত্রীগণ প্রবল হওয়ায় রাজপুত ঠাকুরগণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলেন, এই জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আলোয়ারে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। শিবধন সিংহ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া নিজ হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে রাজকার্য্যে বড়ই গোলযোগ ঘটিল ও রাজ্যে অরাজকতা জন্মিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ব্রীটিশ গভর্ণমেণ্ট রাজ্য শাসনের জন্য এক সভা গঠিত করিলেন ও এই সভার সভাপতি একজন ইংরেজকে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবধন সিংহের মৃত্যু হইল, ইনি কোন পুত্র বা পৌষ্যপুত্র রাখিয়া না যাওয়ায় রাজবংশ মধ্য হইতে একজন রাজা স্থির করা আবশ্যক হইল। এইরূপে রাণা বংশের ঠাকুর মঙ্গল সিংহ রাজা স্থিরিকৃত হইলেন। আলোয়ারের রাজার উপাধি মহারাও রাজা ও ইঁহার সন্মানার্থে ১৫টী তোপ পড়ে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজ্য মধ্যে রেল সংস্থাপনার্থে জমি বিনামুল্যে দিতে স্বীকৃত হয়েন। রাজপুতনা রেলের দিল্লি শাখা আলোয়ার রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে। কয়েকটী বড় বড় মেলা আলোয়ার রাজ্যে প্রতি বৎসর হয়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের আয় ২৩২৪,৩১০৲ টাকা ছিল, ব্যয় ২০১৩,২৯০৲ টাকা পড়ে।

রাজ্যশাসনের জন্য কয়েকজন সভ্য লইয়া একটী সভা আছে, রাজা এই সভার সভাপতি। অনেকগুলি স্কুল রাজ্যমধ্যে আছে, আলোয়ার, তিজারা ও রাজগড়ে এক একটী ডাক্তারখানা আছে। রাজার নিম্নলিখিত সৈন্য আছে, ১,৮০০ অশ্বারোহি, ৪,৭৫০ পদাতিক, ২০০ কামান ও ৬৯ গোলন্দাজ।

আলোয়ার।—আলোয়ার রাজ্যের রাজধানী। দুই প্রকারে এই সহরের নাম হইয়াছে, এইরূপ কথিত। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে ইহার নাম আলপুর বা বলবান সহর ছিল, তাহা হইতে ক্রমে আলোয়ার হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন আচবল পর্ব্বত নিকটে থাকায় তাহা হইতেই আলোয়ার হইয়াছে। নগরের চারিদিকে প্রাচীর ও খাদ আছে, রাস্তাগুলি প্রসস্ত ও সুন্দর। নিম্নলিখিত অট্টালিকা উল্লেখ যোগ্য,—যথা (১) রাজপ্রাসাদ (২) মহারাজা বকতিয়ার সিংহের মন্দির (৩) জগন্নাথের মন্দির (৪) আদালত সকল। প্রায় ১,০০০ ফিট উচ্চে আলোয়ার দুর্গ, দুর্গ মধ্যেও অনেক ভাল ভাল অট্টালিকা আছে।

কথিত যে নিকুম্ভ রাজপুতগণ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু পরে খানজাদা, মোগল, পাঠান, ঝাট ও নারুকগণ এই দুর্গ অধিকার করেন। সহরে ৫টী বড় বড় জৈন মন্দিরও আছে। নগর হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে ৯ মাইল দূরে সিমিরা হ্রদ। এই স্থান হইতে সহরে জল আনীত হয়। এ স্থানটী অতি রমণীয়। হ্রদে অসংখ্য মৎস্য আছে; ও নিকটে নানা প্রকার শীকারের জন্তু মিলে। নগর হইতে এক মাইল দূরে রাণী বিশাখ প্রাসাদ ও উদ্যান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য এ স্থান বিখ্যাত। নগরের বাহিরে দেড় মাইল দূরে রেসিডেন্সি, তিজারা রাস্তার উপর একটী জেল ও একটী সুন্দর পুষ্করিণী, সহরের বাহিরে, এইগুলি দর্শনীয় স্থান। সহরের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই বেশ ভাল ভাল পাকা রাস্তা আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লোক সংখ্যা ৪৯,৮৬৭ ছিল।

আসাই।—নিজাম রাজ্যের একটী গ্রাম ও যুদ্ধক্ষেত্র। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ২৩সে সেপ্টেম্বর সার আরথার দেখিলেন, সিন্ধিয়া ও রঘুজী ভোন্সলার সৈন্যগণ জুয়া ও কৈলনা নদীর সঙ্গম স্থলে আসাই গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। মহারাষ্ট্র সৈন্যে ১৬ হাজার পদাতিক, ইহার মধ্যে ১০,৫০০ ইয়োরোপীয় সেনাপতির অধীনে শিক্ষিত ও পরিচালিত; ২০ বিশ সহস্র অশ্বারোহী, অসংখ্য কামান, এই সকল কামানের মধ্যে ১০০টী কামান ফরাসী গোলন্দাজগণ পরিচালিত করিতেছিল। মোট ৫০ হাজার মহারাষ্ট্র সৈন্য আসাই প্রান্তরে সমবেত হইয়াছিল। জেনারেল ওয়েলেসলির অধীনে কেবলমাত্র মোট ৪,৫০০ সৈন্য ছিল, কর্ণেল ষ্টিভেনসনের সৈন্য তাঁহার সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই। জেনারেল ওয়েলেসলি যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়া নদী পার হইয়া মহারাষ্ট্রগণকে আক্রমণ করিলেন। ১৪ মাইল হাটিয়া আসিয়া তাহার সৈন্যগণ ঠিক দুই প্রহরের সময় তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করিল। মহারাষ্ট্র কামানের প্রকোপে জেনারেল ওয়েলেসলি বাধ্য হইয়া নিজ কামান সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন, কিন্তু তাহার সৈন্যগণের বেয়নেট আক্রমণে মহারাষ্ট্রগণ ভঙ্গ দিল, কিন্তু যাহারা মৃত প্রায় ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, তাহারা সহসা উঠিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে ইংরেজ সৈন্যের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। জেনারেল ওয়েলেসলি তাহার সৈন্য ফিরাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া হত ও আহত করিয়া কামান কাড়িয়া লইলেন। তখন মহারাষ্ট্রগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সিন্ধিয়া ও ভোন্সলা উভয়েই প্রথমে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু মহারাষ্ট্র গোলন্দাজগণ শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল। আসাই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রগণ বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, সিন্ধিয়ার প্রধান মন্ত্রী এই যুদ্ধে নিহত হয়েন। এই যুদ্ধের পরেই আরগাওনের যুদ্ধ হইল ও পরে দেবগাওনে এক সন্ধি হইয়া গেল। আসাই যুদ্ধে ১২ হাজার মহারাষ্ট্র হত হয়, ইংরেজ সৈন্যের প্রায় তৃতিয়াংশ, মোট ১,৬৫৭ জন নিহত হয়। এখনও আসাই গ্রামবাসীগণের অনেকে যুদ্ধের অনেক বন্দুক ও গুলি গোলা প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কুড়াইয়া পায়। এখনও এই যুদ্ধক্ষেত্রে বৃষ্টির পর অনেক নর-কঙ্কাল বাহির হয়

আসির গড়।—মধ্য ভারতের নিমার জেলার একটী সুদৃঢ় দুর্গ। জি, আই, পি, রেলের চাঁদনি ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা সাতপুরা পর্ব্বতের একটী শাখার উপর মূল হইতে ৪৫০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখনও এই দূর্গে সৈন্যগণ বাস করে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার লোক সংখ্যা ২,৪৩৭ ছিল। এই দুর্গ অতি সুদৃঢ় ভাবে নির্ম্মিত, ইহার তিন দিকে যে দুই একটী পথ দিয়া উপরে উঠিবার উপায় আছে, তাহা এতই দুরারোহ ও তাহা এত সহজে রক্ষা করিতে পারা যায় যে শত্রু সৈন্য কোনরূপেই সে পথে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। অন্যদিকে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান ও সিংহদরজা গঠিত আছে, ইহাও এমন ভাবে গঠিত যে শত্রু সৈন্য সহজে দুর্গে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহা এমনই সুকৌশলে নির্ম্মিত যে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য এই দুর্গ রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এখানে জলও খুব সহজে প্রাপ্য, কিন্তু ইহার নিম্নে এতই খাদ ও গহ্বর আছে যে শত্রু সৈন্য অনায়াসে লুক্কাইত ভাবে থাকিয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে পারে। ফেরিস্তা পাঠে অবগত হইতে পারা যায় যে আসা আহির নামক এক ব্যক্তি ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। খান্দেশের ফারুখী রাজগণ এই দুর্গ ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রহেন। অবশেষে ইহাদের হস্ত হইতে আকবর বাদসাহ এই দুর্গ কাড়িয়া লয়েন। এই সময় হইতে বরাবরই এই দুর্গ মুসলমানদিগের হস্তে ছিল, পরে মহারাষ্ট্রগণ ইহা অধিকার করিয়া লয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আসাই যুদ্ধের অব্যবহিত পবে ইংরেজ সৈন্য অতি সহজে এই দুর্গ দৌলতরাও সিন্দিয়ার নিকট হইতে অধিকার করেন। পরে এই দুর্গ আবার মহারাষ্ট্রগণকে প্রদান করা হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্য ২১ দিন আক্রমণের পর এই দুর্গ পুনরায় অধিকার করেন। তদবধি এই দুর্গ ইংরেজ হস্তেই আছে। এখানে সর্ব্বদাই একদল ইংরেজ সৈন্য থাকে। ঔরঙ্গজিবের সময়ের কয়েকটী বৃহৎ কামান এই দুর্গে আছে।

আহম।—ইহা একটী জাতিব নাম, এই জাতি আসাম উপত্যকায় বাস করে ও মগগণের আসাম আক্রমণের পূর্ব্বে এই জাতিই আসামের রাজ জাতি ছিল। ইহারা সান জাতি হইতে উৎপন্ন। বৃহৎ সান জাতি পূর্ব্বে ত্রিপুরা হইতে শ্যাম ও য়ুনান পর্য্যন্ত বিস্তৃত পং নামক রাজ্যে বাস করিত। ইরাবতী নদীর তীরে ইহাদের রাজধানী ছিল, এক্ষণে এই স্থানের নাম মগেরা মগং রাখিয়াছে। এথনলজি অব বেঙ্গল প্রণেতা কর্ণেল ডাল্টন এবং আসাম ইতিহাস প্রণেতা রবিন্‌সন সাহেব সানদিগের আসাম আগমন সম্বন্ধে বলেন, "৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পং রাজ্যের অধিপতি সুখাম্পার রাজত্বকালে তাহার ভ্রাতা ও সেনাপতি সামলম্পা কাচার, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি জয় করিয়া আসাম উপত্যকায় প্রবিষ্ট হইয়া নানা যুদ্ধের পর সাদিয়া হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত দখল করেন।" রবিন্‌সন সাহেব বলেন, সামলম্পা দেশে প্রত্যাগমন কালে শুনিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, এই সম্বাদ পাইয়া তিনি আর দেশে প্রত্যাগমন না করিয়া আসামেই বাস করিতে লাগিলেন। সামলম্পা হইতেই আহম রাজ বংশের উৎপত্তি। কিন্তু আসাম আদম

সুমারির রির্পোটে এ সম্বন্ধে অন্যরূপ লিখিত আছে,—ইহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত সময় অপেক্ষা প্রায় ৫ শতাব্দি পরে আহম বংশের উৎপত্তি হওয়ার কথা বিবৃত হইয়াছে। রির্পোটে প্রকাশ, "১২২৮ খৃষ্টাব্দে পং রাজ্যের সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, চুকুপা সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইয়া অল্পমাত্র সৈন্য সামন্ত লইয়া আসামে আইসেন। চুকুপাই প্রথমে অহম বা অতুলনীয় উপাধি গ্রহণ করেন ও তাঁহার নব অধিকৃত দেশের নামও আহম প্রদান করেন। এই আহম হইতে পরে দেশের নাম আসামে পরিণত হইয়াছে। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে আহম রাজ চতুমলা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে হিন্দু পুরাণে আহম বংশ স্বর্গরাজ ইন্দ্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া আখ্যাত হয়। চতুমলা হিন্দু নাম জয়ধ্বজ সিংহ গ্রহণ করেন, তদবধি আহম রাজগণ হিন্দু নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছিলেন"।

১২২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় সার্দ্ধশত বৎসর আহম রাজগণ দিহিং নদীর তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। ১৩৭৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীপুর ও শিব সাগরস্থ চুটীয়া রাজাগণের সহিত আহম রাজের বিবাদ হয়, ১২৪ বৎসর ধরিয়া উভয় বংশে যুদ্ধ ও বিবাদ চলিতে থাকে, অবশেষে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে চুটিয়া রাজ পরাভূত হয়েন ও আহম রাজ শিব সাগর জেলার গোরগাওন নামক স্থানে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি আহম রাজ লক্ষ্মীপুর জেলার সদিয়া হইতে নওগাং জেলার কালিয়াবর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র রাজ্য করিতে থাকেন। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে কোচ রাজ আহম রাজ্যের শিব সাগর প্রদেশ লুণ্ঠন ও রাজধানী অধিকার করিয়া লয়েন, কিন্তু কোচ রাজ এ রাজ্য নিজ অধিকার ভুক্ত রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। পরে কাচারীদিগের সহিত আহমদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়, ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কাচারী ও আহমগণে বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই আহমগণ গৌহাটী পর্য্যন্ত স্বরাজ্য বিস্তৃত করে। ৫০ বৎসর পরে আরঙ্গজিবের সেনাপতি মিরজুমলা আসাম আক্রমণ করেন। মিরজুমলা আহম রাজধানী অধিকার ও কর আদায় করিয়া পরে পশ্চাৎপদ হইয়া গোয়ালপাড়ার দিকে যাইতে বাধ্য হন, এই সময়ে আহম রাজ গোয়ালপাড়া হইতে সদিয়া ও দক্ষিণস্থ পাহাড় হইতে ভূটানের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত আসাম উপত্যকা নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। আহম রাজ রুদ্র সিংহের রাজত্ব কালেই এই বংশের ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে রুদ্র সিংহ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। পরবর্ত্তী শতাব্দিতে আহম বংশের গৃহ বিবাদে ও আভ্যন্তরিক শত্রুদিগের আক্রমণে ক্রমেই হীন অবস্থা হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে মোমারিয়া নামক ধর্ম্মোন্মত্তগণ বিদ্রোহী হওয়ায় রাজধানী গোরগাও হইতে শিব সাগর জেলার মধ্যবর্ত্তী রংপুরে লইয়া যাওয়া হয়। গৃহ বিবাদে রাজধানী ক্রমে আরও পূর্ব্বে লইয়া যাওয়া হয়, অবশেষে কামরূপ জেলার অন্তর্গত গৌহাটীতে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে আহম বংশের জনৈক রাজা দ্বারা মগগণ আসামে আহূত হয়। ক্রমে তাহারা সমস্ত আসাম অধিকার করিয়া অতি ভয়াবহ অত্যাচার সহ আসাম

রাজ্য শাসন করিতেছিল, অবশেষে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহারা ইংরেজ কর্ত্তৃক আসাম হইতে দূরীকৃত হয়। সান জাতিদিগের যেরূপ শাসন প্রণালী, আহম রাজগণ আসামেও ঠিক সেইরূপ শাসন প্রণালী প্রচলিত করেন। এই প্রথায় করের পরিবর্ত্তে সেবা করার নিয়ম, অর্থাৎ প্রজা কর না দিয়া রাজার কোন না কোন কার্য্য করিয়া দেয়। অন্যান্য বিষয়ে আহমগণ সম্পূর্ণই হিন্দু ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়ে, এক্ষণে কেবল তাহাদের মুখের আকারে তাহাদিগকে হিন্দুদিগের সহিত প্রভেদ করিতে পারা যায়। সেন্‌সাস রিপোর্টে চাসদাং নামক এক জাতীয় আহমের উল্লেখ করা হইয়াছে। শিব সাগর জেলায় কেবল ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। চাসদাং অর্থে পাহারাওয়ালা বা জল্লাদ। ইহারা রাজ প্রাসাদের নিকট থাকিত ও রাত্রে বংশ নির্ম্মিত উচ্চ প্রাসাদের নিম্ন প্রদেশে নিদ্রা যাইত। ইহাদের মধ্যে এখনও কতকগুলি ইহাদের প্রাচীণ রীতি প্রচলিত আছে; ইহারা মদ্যপান করে, মুরগী ও শূকরের মাংস খায় এবং মৃত দেহের গোর দেয়। কিন্তু চুতাপা যে দেবতা সান দেশ হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন (ও কথিত যে তাহারই কল্যাণে তাঁহার সর্ব্বত্র জয় হয়) লোকে সে সং দেবতাকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কেবল কতকগুলি বাইলং বা জ্যোতিষী এবং দেওদা বা পুরোহিত এই দেবতাকে স্মরণ রাখিয়াছেন। ইহাদের নিকট আহমদিগের প্রাচীণ ভাষার কোন কোন গ্রন্থ আছে।

আসাম।—বঙ্গদেশের পূর্ব্বোত্তর ভাগে আসাম প্রদেশ অবস্থিত। ইহা ভারত সাম্রাজ্যের একটী সীমান্ত প্রদেশ। ব্রহ্মপুত্র এবং সুর্ম্মা বিধৌত সমতল প্রদেশ ইহার অন্তর্গত। এই প্রদেশের আয়তন অন্যূন ৪৬,৩৪১ বর্গ মাইল। পর্ব্বতময় লখীমপুর অঞ্চল ধরিলে আসামের আয়তন আরও বেশী হয়। আসামেব লোক সংখ্যা অন্যূন পঞ্চাশ লক্ষ। প্রদেশীয় রাজকার্য্যের কেন্দ্রস্থল সিলং নগর। প্রদেশীয় প্রধান রাজপুরুষেরও (চিফ কমিশনার) নিয়মিত অবস্থিতি এই নগরে। এই নগরটী খাশিয়া পাহাড়ে সংস্থিত।

এই রূপ কথিত হইয়া থাকে যে, এক কালে আহম নামে একটী জাতি এই প্রদেশে প্রবলতম শক্তিদ্বারা বিরাজ করিয়াছিল, আসাম নামটী এই "আহম" শব্দ হইতে উৎপন্ন।

আসামের উত্তর সীমা—হিমালয় পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগ; এই প্রদেশে এই সকল জাতির বাস—ভুটিয়া, আকা, ডোফলা, মিরী, আবর এবং মিশমী। পূর্ব্বদিকে কতকগুলি অবিজ্ঞাত পার্ব্বত্য অঞ্চল; ইহা কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্যের সীমান্ত রেখা ছিল এক্ষণে ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। ইহার উত্তর পূর্ব্বে মিশমী পর্ব্বত শ্রেণী; পূর্ব্বদিকে মণিপুর রাজ্য এবং নাগা জাতির অধ্যুসিত পর্ব্বত শ্রেণী। দক্ষিণে ত্রিপুরা রাজ্য এবং কুকী জাতির অন্তর্গত লুসাই সম্প্রদায়ের অধ্যুসিত পার্ব্বত্য প্রদেশ; পশ্চিমে বঙ্গদেশের অন্তর্গত ময়মনসিং, রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং কুচবেহার রাজ্য।

ভাষা এবং ইতিহাস ধরিয়া বিচার করিলে আসাম বাসীদিগকে হিন্দু জাতি হইতে স্বতন্ত্র বলিতে হয়। তবে অধুনাতন সময়ে আসামীরা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে বটে।

বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীণতম যে সকল কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে, তাহাতে এইরূপ বুঝায় যে পূর্ব্বে এখানে হিন্দু রাজত্ব ছিল এবং কামরূপ সেই রাজত্বের প্রধান নগর ছিল। এখনও কামরূপই এই প্রদেশের একটী প্রধান সহর। কথিত আছে, এক্ষণকার রঙ্গপুর জেলাও এক সময়ে এই হিন্দু রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে মহাভারতে উল্লিখিত ভগদত্ত রাজা এই প্রদেশরই অধিপতি ছিলেন। তাঁহার বংশাবলির সম্বন্ধে অনেক কথা যোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে, পরে বাহুল্যরূপে তাহা বর্ণিত হইবে। গৌহাটীতে এখনও যে সকল ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে এবং ব্রহ্মপুত্র বিধৌত উপত্যকায় রাজপ্রাসাদ এবং মন্দিরাদির যে সকল ধ্বংস চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই রাজ বংশের বিপুল ক্ষমতার উৎকৃষ্টতম পরিচয়। জনশ্রুতি এই যে, মুসলমানদিগের দ্বারা এই রাজ বংশের উচ্ছেদ ঘটে। পঞ্চদশ শতাব্দিতে মুসলমানেরা রঙ্গপুর প্রথম অধিকার করে, তৎপরে বহুবার তাহারা আসামে অভিযান করিয়াছিল। এই কারণে এই প্রদেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই অরাজকতার সময়ে কোচ জাতি ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। কুচবেহারের বর্ত্তমান মহারাজা এই বংশ হইতে উৎপন্ন।

দাবঙ, বিজনি এবং সিদলির রাজারাও এই বংশধর। আসামের অধুনাতন ইতিহাসে দুই বিপরীত শক্তির প্রতাপ এবং আক্রমণ দেখা যায়। প্রথম, আহম জাতি সম্ভবতঃ শ্যাম দেশ হইতে আসিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দিতে এই প্রদেশ অধিকার করে। ইহারা সম্ভবতঃ ব্রহ্ম সীমান্তবাসী স্যান্ জাতীয় লোক। এপ্রদেশ অধিকার করিলেও এই প্রদেশের সভ্যতার উপর ইহাদের প্রভাব তেমন দৃষ্ট হয় না। এই আহম জাতিকে বীরজাতি বলিয়াই অনুমিত হয়। কেন না, মোগলদিগের সহিত সম্মুখ সমরেও ইহারা কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহারা যে রাজ্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষেয় অন্যান্য প্রদেশ প্রচলিত রাজ্যতন্ত্র হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। এই রাজত্ব যতটা ব্যক্তিগত ততটা ভূমিগত ছিল না। সাধারণতঃ দেশের ভূমি রাজা নিজের বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আহম রাজারা ভূমির উপর সেরূপ দাবী রাখিতেন না। তাঁহারা অধিকার করিতেন ব্যক্তির উপর অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহে কিম্বা রাজার অন্য কোনরূপ প্রয়োজন মত রাজ্যের উপযুক্ত সকল লোককেই রাজপ্রয়োজনার্থ আবশ্যকীয় কর্ম্ম করিতে হইত।

পুরুষের বয়স ১৬ বৎসর হইলেই তাহাকে পাইক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইত, এক হাজার পাইকের উপর একজন সরদার থাকিত, তাহার নাম হাজারী; রাজ্যান্তর্গত সমস্ত লব্ধ-বয়ঃ পুরুষ এইরূপে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইত এবং যুদ্ধকালে সহজে সমর প্রবিষ্ট হইতে পারিত। এই পাইকদিগের কার্য্য কেবল সমর-ব্যাপার নিহিত ছিল না রাজকীয় অন্যান্য কার্য্যও ইহাদিগকে করিতে হইত। এই পাইকদিগের মধ্যে আত্মকার্য্য নিবন্ধন যদি কেহ রাজকার্য্য সম্পাদনে অপারগ বা অনিচ্ছুক হইত, তাহাকে তজ্জন্য অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কিছু রাজকর দিবার ব্যবস্থা ছিল। পাইকেরা রাজকার্য্য করিত বলিয়া কিছু কিছু নিষ্কর ভূমি

পাইত কিন্তু ভদ্রাসন এবং বাস্তু ভূমির জন্য তাহাদিগকে রাজকর দিতে হইত।

এই পাইক সৈন্য থাকাতেই আহম রাজারা এককালে এমন প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। এখনও আসাম প্রদেশে যে সকল জলাশয় ও সেতু দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই এই পাইকদিগের কীর্ত্তি। পূর্ব্ব রাজাদিগের অধীনে বাধ্য হইয়া খাটিতে হইত বলিয়া আসামের প্রজারা খাটুনি মাত্রকেই অত্যন্ত হেয় বলিয়া বিবেচনা করে। এমন কি, এক্ষণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও অতি উচ্চ হারে মজুরি দিয়াও আসামে মজুর পায় না।

এইরূপ বিশ্রুতি যে, আহমেরা ১২২৮ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ প্রথম আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ তাহারা উত্তর ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছিল। এই বংশের প্রথম যে রাজা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন তাঁহার নাম "চুহুম্পা" তিনি ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা "চুচেঙ্কা" শিব সাগরে অনেকগুলি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজত্ব কালে ১৬১১ হইতে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে। ইহাঁর সময়েই এবং ইহাঁরই চেষ্টায় হিন্দুধর্ম্ম আসাম প্রদেশের রাজানুমোদিত ও রাজ্যের প্রচলিত ধর্ম্মরূপে পরিগৃহিত হয়। ইহাঁরই পরবর্ত্তী নৃপতি, রাজা চ্যুতমলা বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে জয়ধ্বজ সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। দিল্লির বাদসাহ আওরঙ্গজীবের সেনাপতি মীর জুমলা যখন এই প্রদেশ আক্রমণ করেন তখন ইনিই এই প্রদেশের রাজা ছিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা যতটাই আত্মগৌরব খ্যাপন করুক না কেন, ইহা একরূপ নিশ্চয় যে, মোগলেরা আসামে আহম, রাজাদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিল এবং তাহাদের আসাম আক্রমণ বিফল হইয়াছিল। এই সূত্রেই আসামের হিন্দু রাজত্ব গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এই বংশের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও রাজকার্য্য নিপুণ রাজার নাম রুদ্র সিংহ। কথিত আছে ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

পরবর্ত্তী অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দিতে অন্তর্ব্বিবাদে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে আহম রাজত্ব ক্রমে শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। ইংরেজদিগের সহিত এই রাজত্বের প্রথম পরিচয় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে গৌরিনাথ সিংহ আসামের রাজা। দারাঙ্গের কোচ রাজা মোয়ামারিয়া নামক একটী উশৃঙ্খল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজা গৌরিনাথকে অধিকারচ্যুত করে। ইংরেজের পক্ষ হইতে কাপ্তেন ওয়েলস একদল সিপাহী লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে গমন করে এবং তাহাকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্টিত করিয়া ফিরিয়া আসে। কাপ্তেন ওয়েলসের প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই প্রদেশে ভয়ঙ্কর অরাজকতা উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিকারার্থ মগেরা (ব্রহ্মবাসীরা) আহূত হইয়াছিল এবং এই প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই অতি কঠোর শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করে। এমন কি, মগদিগের দৌরাত্ম্যে এবং অন্তর্ব্বিবাদে অনেক স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদিগের সহিত মগদিগের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধের অবসানে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশ ইংরেজের রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময়ে নিম্ন আসাম ইংরেজ রাজত্ব ভুক্ত হইয়াছিল

বটে, কিন্তু আসামের উত্তর ভাগ স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করিয়া আহম বংশীয় পুরন্দর সিংহকে ইহার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ইনি সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কুশাসন হইতেছে বলিয়া আসামের এই অংশকেও স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া লয়েন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লির বাদসাহের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন দেওয়ানি সনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন শ্রীহট্ট এবং গোয়ালপাড়া সেই সনন্দের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের অপুত্রক মৃত্যু হওয়ায় এই প্রদেশও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। গারো পাহাড়ও চিরদিন গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ১৮৭৩ সালেও এই প্রদেশের স্বাধীন জাতিদিগকে অবনমিত করিবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সমরাভিযানের প্রয়োজন হইয়াছিল। কতকটা রণজয় সূত্রে, এবং কতকটা সন্ধিসূত্রে খাশিয়া পাহাড়ের অধিবাসী জাতিরা ইংরেজের অধীন হইয়াছে। এখনও সেই প্রদেশের সরদারেরা অর্দ্ধ স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখনও তাহাদিগকে কোন প্রকার টেক্স দিতে হয় না। ১৮৩৫ সালে জয়ন্তিয়া পাহাড় ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। ইহার অব্যবহিত কারণ এইরূপ কথিত যে একজন ইংরেজের প্রজাকে নরবলী দেওয়া হইয়াছিল এবং রাজা তাহাতে সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজ্য প্রদানের পরিবর্ত্তে মাসিক পাঁচ শত টাকা ইংরেজেরা তাঁহার মাসহারা বরাদ্দ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নূতন কর সংস্থাপনের জন্য এই অঞ্চলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; এবং এই বিদ্রোহ প্রশমনের জন্য বহু আয়াস প্রয়োজন হইয়াছিল।

সর্ব্বপ্রথমে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নাগা পর্ব্বতে শ্যামাগুটিং নামক স্থানে এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী রাখা হয়; তথাচ চির-স্বাধীনতা-প্রিয় আঙ্গামী নাগারা মধ্যে মধ্যে ইংরেজ রাজত্বে প্রবেশ করিয়া লুট পাঠ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে যখন মণিপুরের উত্তর সীমান্ত নির্দ্দেশ করা হয়, সেই সময় হইতেই এই প্রদেশ ইংরেজ রাজত্ব ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই প্রদেশের প্রধান ঐতিহাসিক কথা, উত্তর কাছাড়ে আঙ্গামী নাগাদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ। এইরূপ আক্রমণকারীদিগের দমনের জন্যই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর কাছাড় মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। আঙ্গামী প্রদেশে শান্তি স্থাপন ধীরে ধীরে এবং বহু আয়াসে সংসাধিত হইয়াছে। অবশেষে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কহিমায় শাসন কেন্দ্র সংস্থাপিত করায় এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হইয়াছে। চিফ কমিসনার বাহাদুরের লিখিত বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এক্ষণে নাগারা ইংরেজের প্রভুত্ব এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

নৈসর্গিক প্রকৃতির হিসাবে আসাম প্রদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়;—ব্রহ্মপুত্র প্রদেশ, শূর্ম্মা প্রদেশ এবং মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ।

আসামের মাটিতে কর্দ্দম ও সাদা বালুকা মিশ্রিত আছে। এই প্রদেশের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে যে মিশিমি পাহাড় শ্রেণী আছে ঐ সমস্ত পাহাড় চুণা পাথরে পূর্ণ। নাগা পাহাড়ে কেবল বেলে পাথর আছে। খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়েও বেলে পাথরের আধিক্য। গারো পাহাড়ে অভ্র পাওয়া যায়।

আসাম প্রদেশে পাথুরে কয়লা, লৌহ এবং চুণা পাথর প্রভৃতি অনেক খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এপ্রদেশে যে পাথুরে কয়লা পাওয়া যায়, একথা ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সকলে জানিতে পারে এবং ইউরোপীয় কারবারীগণ কয়েকবার এই সকল কয়লা ভূগর্ভ হইতে বাহির করিবার জন্য উদ্যম করে। লখীমপুর, শিব সাগর জেলা এবং নাগা প্রদেশে যে সকল কয়লার খনি বাহির হয় ম্যালেট সাহেব ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তৎসমুদয় পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দেন। খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়েও কয়েকটী ছোট ছোট কয়লার খনি বাহির হয়। এই সমস্ত কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু এই সকল কয়লা স্থানান্তরিত করাই অতীব কঠিন ব্যাপার। সম্প্রতি আসাম রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোম্পানি সংস্থাপিত হওয়ায় সে অসুবিধা বিদূরিত হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে প্রথমে রেলের রাস্তা হয়, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গাড়ি চলে। মাকুম নামক স্থানের কয়লার খনির নিকট প্রচুর পরিমাণে ক্যারোসিন তৈল পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে সমস্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশগুলিতেই লৌহ পাওয়া যায়।

জয়ন্তিয়া ও খাসিয়া পাহাড় চুণা পাথরের অফুরান্ত ভাণ্ডার। স্মরণাতীত কাল হইতে "সিলেটের চুণ" এই নামে এই চুণ প্রসিদ্ধ এবং ইহার দ্বারা বাঙ্গালা প্রদেশের ইমারতের কার্য্যাদি কতদিন হইতে যে সম্পাদিত হইতেছে তাহা বলা যায় না।

১৮৭৬।৭৭ খৃষ্টাব্দে সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার ও ১৮৮০।৮১ খৃষ্টাব্দে এগার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকার চুণ বিক্রীত হয়। এপ্রদেশের কোন কোন স্রোতস্বতীতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। আসামের জঙ্গল হইতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ ধনাগম হয়। কামরূপের দক্ষিণ ভাগে ও দ্বারের পূর্ব্বাংশে যে সুবিশাল অরণ্য আছে, তাহাতে অসংখ্য বড় বড় শাল, শিশু প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। অদ্যাপি গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত সুবিস্তৃত জঙ্গলের সুরক্ষণের সুবন্দবস্ত করিতে সক্ষম হন নাই। ১৮৮০।৮১ খৃষ্টাব্দে আসাম হইতে সাত লক্ষ সাতাইশ হাজার পনর টাকার নানা জাতীয় কাঠ এবং দুই লক্ষ ছয়চল্লিশ হাজার ছাপান্ন টাকার রবার বাঙ্গালা দেশে রপ্তানি হয়।

এখানে হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, চিতাব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ, মিথান অথবা গায়াল (পার্ব্বতীয় জাতিগণ এই জাতীয় গরু প্রতিপালন করে) প্রভৃতি নানাবিধ বন্য জন্তু পাওয়া যায়। গো মহিষ ও ছাগাদি এতদ্দেশের গৃহ পালিত পশু। এ অঞ্চলের মহিষের বড় প্রশংসা। গৃহ পালিত মহিষগণ সময় সময় বন্য মহিষদিগের সহিত সহবাস করার জন্যই এখানকার মহিষ এত উত্তম হয়।

মণিপুর ও ভুটান হইতে টাটু ঘোড়ার আমদানি হয়। হাতী ধরার একতার গবর্ণমেণ্টের হাতে। গবর্ণমেণ্ট যে সকল লোককে ইজারা দেন, তাঁহারাই খেদাতে হাতী ধরিতে সক্ষম। আসাম প্রদেশের পাহাড়ের নামদানীই হাতী ধরিবার প্রধান স্থান। ছয় কিম্বা সাড়ে সাত ফুট হাতী গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে খরিদ করিয়া লইতে সক্ষম। মূল্য ছয় শত টাকার অধিক দিবেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট তদ্রূপ কোন হাতী ইজারদারের নিকট হইতে খরিদ না করেন তবে প্রত্যেক হাতীর উপর গবর্ণমেণ্টকে ১০০৲ এক শত টাকা হিসাবে রাজকর দিতে হয়।

আসাম প্রদেশে নানা জাতীয় লোকের বাস। বিশুদ্ধ আসামী বলিয়া কোন জাতি নাই। আদিম অসভ্য জাতিগণ বাঙ্গালা বা অন্যান্য দেশের স্ত্রী অথবা পুরুষদিগের সহিত বিবাহ সূত্রে সম্মিলিত হওয়ায় নানা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

নিম্নলিখিত পার্ব্বত্য জাতিগণ অদ্যাপিও আপন আপন জাতিয়তা বিশুদ্ধ রাখিয়াছে।

জাতির নাম—	নাগা,	খাসিয়া,	গারো,	মিকীর
সংখ্যা—	১০৪,৬৫০,	১০৪,৮৩০,	১১২,১০৪,	৭৭,৭৬৫,

বোদো বংশীয় কাছাড়িগণও অদ্যাপিও আদিম অসভ্য অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম ভাগে এই জাতির বাস। কাছাড়ে ইহাদের রাজা বাস করেন। অতি অল্প দিন হইল ইনি এই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাছারিদের সংখ্যা প্রায় ২৮১,৬১১।

লালুঙ নামক এক জাতীয় লোক এই অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। ইহারা কাছারীদেরই মত। জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের উত্তর সীমায় এই জাতি বাস করিয়া থাকে।

গারো পাহাড়ের পাদ দেশে রাভা ও হাজঙ জাতির বাস। মেচেরা গোয়ালপাড়ায় থাকে, আহম ও ছুটিয়ারা আসামের পূর্ব্ব রাজবংশ সম্ভূত। কালক্রমে ইহারা কৃষিজীবি হইয়া পড়িয়াছে।

ইহা ছাড়া মিকীর, মিড়ী, ডফলা, খামটী, আবর, মাধাই, কুকী ও মণিপুরী প্রভৃতি আরও অনেক অনার্য্য জাতি এপ্রদেশে আছে। ভারত-দর্পণ চতুর্থ ভাগে তাহাদের প্রত্যেকের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারে লিখিত আছে, আসামে মোট চুয়ান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আট শত তেত্রিশ জন লোকের বাস। ইহার মধ্যে উনত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার বাহাত্তর জন অধিবাসী হিন্দু।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নানা স্থানে ব্রাহ্মণদের বাস। ইহাঁরা এ অঞ্চলের অতি প্রাচীণ অধিবাসী। আহম বংশীয় রাজগণের পূর্ব্বে যে সমস্ত হিন্দু নরপতি আসামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদেরই রাজত্ব কালে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া এখানে বাস করে। নিম্ন আসাম

প্রদেশেও ক্রমান্বয়ে অনেক দিন ধরিয়া ব্রাহ্মণগণ গিয়া বাস করিতে থাকে। কমঠপুরের রাজাগণ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দিতে বেহার হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দির প্রারম্ভে কোচ নরপতি বিশ্ব সিংহ আসামে এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ সংস্থাপন করেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ অদ্যাপি কামরূপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। উত্তর আসামের অনেক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে সমাগত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে।

আসামের ব্রাহ্মণগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক। উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব। যে সকল আহম নৃপতি হিন্দু-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, গোবিন্দ ঠাকুর নামক বিগ্রহ তাঁহাদের উপাস্য দেবতা ছিল। দক্ষিণ অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক। শিবই তাঁহাদের উপাস্য দেবতা। ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষগণ নবদ্বীপ হইতে আসামে গিয়া বাস করেন। সপ্তদশ শতাব্দির শেষ ভাগে আহম রাজ রুদ্র সিংহ ইহাঁদের কয়েক জনকে নবদ্বীপ হইতে লইয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে যিনি পরম ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান তিনিই রাজ গুরু হন। তাঁহার সহযাত্রীগণ রাজ সরকার হইতে অনেক ভূসম্পত্তি ও দেবমন্দিরাদির সেবাইতি প্রাপ্ত হন। তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ অভিষ্ঠদেবতার নিকট পশু বলী দিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ ও আসবাদি পান করিয়া থাকেন কিন্তু আসামের কৃষিজীবিগণ গোঁড়া বৈষ্ণব, তাহাদের চক্ষে তান্ত্রিকদিগের এই সকল আচার ব্যবহার অত্যন্ত হেয় ও জঘন্য।

গণক নামক আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। ইহারা নিকৃষ্ট জাতীয়া রমণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে। ঠিকুজি, কোষ্ঠি প্রস্তুত, শুভাশুভ দিন গণনা এবং গ্রহাচার্য্যের অন্যান্য কার্য্য করিয়া ইহাঁরা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। বাঙ্গলা দেশে গ্রহাচার্য্যদিগের যেরূপ সম্মান আসামে তাঁহাদের সম্মান তদপেক্ষা অনেক অধিক।

ভূইয়া অথবা বার ভূইয়া নামক এক শ্রেণীর লোক আসামে বাস করে। বোধ হয় বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাহারা ভূঁইহার বা জমীদার বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে ইহারাও সেই বংশ সম্ভূত। আসাম দেশীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে কমঠপুরে পাল রাজগণের আধিপত্য বিলুপ্ত হইলে যে পরাক্রান্ত নরপতি ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত হন, একজন পশ্চিম দেশীয় রাজা তাঁহারই নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বীয় রাজ্যের দ্বাদশ জন প্রধান লোককে প্রতিভূ স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন। ইহাঁদের মধ্যে ছয় জন ব্রাহ্মণ ও ছয় জন কায়স্থ ছিলেন। চণ্ডিবর নামক একজন অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ইহাঁদের অধিনেতা ছিলেন। এই চণ্ডিবরই আসামের সুবিখ্যাত মহাপুরুষ শঙ্কর দেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। কমঠপুরের রাজা এই ভূইয়াদিগকে স্বদেশে আনিয়া আপন রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে তাঁহাদিগের অধিবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। বর্ত্তমান নৌগঙ ও দরঙ জেলাতেই পূর্ব্বে ভূইয়াগণ বাস করিতেন। ইহাঁরাই বার ভূঁইয়া বলিয়া খ্যাত। ইহাঁদের প্রবল বিক্রমে চতুর্দ্দিকস্থ কোচ জাতীয়েরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্থ থাকিত।

কলিতা।—বাঙ্গলা দেশে যেরূপ কায়স্থ, আসামে কলিতা-নামক তদ্রূপ একটি জাতি বাস করে। আসাম ভিন্ন অন্য কোন দেশে এই জাতির বাস নাই। ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকাস্থিত শূদ্রদিগের মধ্যে কলিতারাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে চায়। এইরূপ কিংবদন্তী আছে, পরশুরামের ভয়ে ভীত কতকগুলি ক্ষত্রিয়, ত্রিস্রোতা নদী পার হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে পলায়ন করে। তাহারা আপনাদের প্রকৃত জাতি গোপন করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা কলিতা অথবা লুপ্ত-কুল বলিয়া পরিগণিত হয়। এতদ্বিষয়ে আর একটি জনশ্রুতি আছে। কায়স্থগণ, হল-চালনা করিয়াছিল বলিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়া কলিতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, কোচ-রাজবংশের অভ্যুদয় ও উন্নতির সময়ে ইহারা রঙ্গপুর হইতে আসামে আগমন করে; কিন্তু ইহাও অসম্ভব নয় যে, ইহারও বহু পূর্ব্বে তাহাদের সমাগম সংঘটিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, কলিতারা রঙ্‌পুরের কোচ-বংশীয় নৃপতিদিগের ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন। পরে ইঁহারা আহম্‌দিগেরও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ ইঁহাদিগকে অধিকার-চ্যুত করিয়া ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের স্থানে বৃত হইয়াছেন। কলিতাদিগের উচ্চাধিকারের এইরূপ কিংবদন্তী। কিন্তু আসামবাসীদিগের লিখিত ইতিহাসে ইহা সমর্থিত হয় না। কেন না, দেখা যায়, আসামের উপত্যকার প্রাচীনতম অধিবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যমান ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। ব্রাহ্মণদের দ্বারাই আহম্‌-নৃপতিগণ, হিন্দুধর্ম্মে প্রথম দীক্ষিত হইয়াছিলেন—কলিতাগণ দ্বারা নয়। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী কালে কেবল ব্রাহ্মণদিগকেই আসামের রাজগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। বর্ত্তমান কলিতা গোসাঞিদিগকে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কলিতা-ধর্ম্ম-যাজক-সম্প্রদায়ের বংশধর বা ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। ইহা একরূপ স্থিরতর, পঞ্চদশ শতাব্দীতে * শঙ্করদেব-প্রবর্ত্তিত একটি ধর্ম্ম-বিপ্লব হইতে ইহাদের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা। শঙ্কর-দেবের প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্ম-বিপ্লব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মাত্র বলিয়া অনুমিত হয়। কলিতারা এক্ষণে প্রায়শঃ কৃষি-জীবী। তবে এক্ষণে তাহারা ব্যবসায়ী ও মসীজীবীর শ্রেণীতেও দৃষ্ট হয়। এই কলিতাদিগের মধ্যে যাহারা সমাজে কতকটা উন্নত পদবী অধিকার করে, তাহারা আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। কেবল তাহাই নয়। তাহারা কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত হইবারই দাবী করে। এ সম্বন্ধে তাহাদের দাবী এই যে, হলচালনা এবং কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করায়, তাহারা আপনাদের জাতির মূল কার্য্য পুনর্লাভ করিয়াছে। ইহাদিগের সামাজিক উন্নতির পথে পশ্চিম-প্রদেশীয় কায়স্থদিগের ন্যায় উপবীত-ধারণই চরম সংস্কার—ইহা কলিতারা মনে করে। আসামের কায়স্থদিগের সহিত তাহাদের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিতে তাহারা অধিকারী। বাঙ্গলার কায়স্থ-জাতি যে, এ অধিকার স্বীকার করিবেন, ইহা সম্ভবপর নয়।

* এই কাল-নির্ণয়, নির্বিরোধ নয়। "জন্মভূমি" পত্রিকায় শঙ্করাচার্য্যের কাল-নিরূপণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অন্ততঃ আজি পর্য্যন্তও তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন নাই। আবহমান কাল কলিতারা, আর্য্য-বংশ-সম্ভূত প্রকৃত হিন্দু বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি, যে সময়ে আসাম হইতে বাঙ্গলা দেশে ক্রীতদাস আসিত, তখনও কোচের ক্রীতদাস অপেক্ষা কলিতা ক্রীত-দাসের মূল্য দ্বিগুণ ছিল।

ব্রহ্মপুত্র নদের পার্শ্ববর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং সুর্ম্মার উপত্যকায় কৈবর্ত্ত বা কেওট বলিয়া একটি জাতির অধিবাস। ইহারা বংশানুক্রমে মৎস্যজীবী। বাঙ্গালায় কৈবর্ত্তদিগের সামাজিক অবস্থা হীন হইলেও, আসামের কৈবর্ত্তেরা, শূদ্র-জাতি সকলের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গদেশের ন্যায় আসামেও হেলে কৈবর্ত্ত ও জেলে কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে প্রভেদ বিদ্যমান। অর্থাৎ, জালিয়াদিগের অপেক্ষা হেলিয়ারা অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ডোম বলিয়া একটী জাতিও আসামে আছে। ইহারা প্রায়ই মৎস্যজীবী, কিন্তু আসামে ইহারা নীচজাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেও, বাঙ্গলার ডোমেরা যেমন ঘৃণার্হ এবং অস্পৃশ্য, আসামের ডোমগণ সেরূপ নয়। আসামে কোন হেয় কাজও তাহাদিগের করণীয় নয়। বরং আসামের ডোমেরা হিন্দুর হিসাবে খানিকটা উচ্চ অঙ্গের অনুষ্ঠেয় পবিত্রতা রক্ষা করে। এই উপলক্ষে ইহা নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আসামের ডোম-জাতীয় কোন কুলি, কখনও কুক্কুট (মুরগী) বহন করিতে স্বীকৃত হয় না। তাহাদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছে, যাহারা আহার-কালে স্বতন্ত্র বস্ত্র পরিধান করে। অথবা আর্দ্র-বস্ত্র-পরিহিত হইয়া আহার করে।

কাটানি এবং যুগী বলিয়া দুইটি জাতি, আসামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আদম-সুমারীর বিবরণী হইতে অনুমতি হয়, যুগীরা হিন্দু জাতির অন্তর্গত বিবেচিত হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তাহারা কোন অধঃকৃত অনার্য্য জাতির বংশধর। যুগীদিগের মধ্যে যাহারা কুলাগত আচার রক্ষা করিয়াছে, তাহারা কোন ভেদাভেদ না করিয়া সর্ব্বপ্রকার মাংসই আহার করে। তাহাদের ধর্ম্মযাজক ও গুরু নাই। তাহারা মৃত আত্মীয় ব্যক্তিদিগের কবর দিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু জাতির মধ্যে পরিগণিত হইবার জন্য স্বজাতি-নাম ত্যাগ করিয়া কাটাই নাম গ্রহণ করিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, তাহারা সূতা কাটে ও সূতা প্রস্তুত করে। আহম-নৃপতিগণ ইহাদিগকে পলুর চাসের অধিকার দেন। আজি পর্য্যন্ত তাহারা তাহাই করিয়া আসিতেছে। তবে, রেশম-চাসের অবনতি হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে কতক কতক লোক, কৃষি-কার্য্য অবলম্বন করিয়াছে।

এই প্রদেশে চণ্ডাল বলিয়া একটি জাতির অধিবাস আছে। সচরাচর হীরা জাতির তুল্য বলিয়া ইহারা বিবেচিত হয়। অন্ততঃ বিগত আদম-সুমারীর বিবরণীতে এইরূপই বিবৃত হইয়াছে। আসামের সমস্ত উপত্যকায় চণ্ডাল এবং হীরা এক জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে আহার বা বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সুতরাং ইহাই একরূপ নিশ্চিত যে, ইহারা এক জাতীয় হইতে পারে না।

আসামে আর একটি জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে বোরিয়া বলে। আসামের ভাষায় "বোরি" শব্দের অর্থ—বিধবা। সুতরাং অনেকের মত এই যে, ব্রাহ্মণ-বিধবার গর্ভে অন্য কোন জাতির ঔরসে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহারাই এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আসাম প্রদেশে "শালয়েস্" বলিয়া একটি জাতির বাস। ইহারা প্রায়ই কৃষিজীবী। এই প্রদেশে হাড়ি বলিয়া যে জাতি আছে, তাহাদিগকে সচরাচর স্বর্ণকারের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেখা গিয়া থাকে। এই শ্রেণীতে কৃষিজীবীও রহিয়াছে। এই শ্রেণীর মধ্যে যাহারা নীচ বলিয়া পরিগণিত, তাহারা আজিও মুরগী ও শূকর খায়; কিন্তু যাহারা আপনাদিগকে কিছু উচ্চ-শ্রেণীস্থ বলিয়া পরিচিত করে, তাহারা হিন্দুদিগের রীতি-নীতি অবলম্বন করিযাছে। আসামেব সমাজের এই দুই শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে পরস্পর বিবাহ ও আহারাদি চলে না।

আসাম দেশে নাপিত বলিয়াও একটি জাতি আছে। তাহারা আসামের উপত্যকায় বাস করে ও কলিতা বলিয়াই আপনাদের পরিচয় দেয়। নাট এখানকার একটি জাতি। তাহারা প্রায় নৃত্য-ব্যবসায়ী।

মুসলমান।—আসামে মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সূর্ম্মা-উপত্যকায় মুসলমানের সংখ্যা, হিন্দু অধিবাসীর সমানই হইবে। আসামে মুসলমানগণকে সাধারণতঃ গোরীয়া বলে। বোধ হয়, বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন রাজধানী গৌড় হইতে মুসলমান আক্রমণকারিগণ, আসামে প্রথম প্রবেশ করিযা ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করে বলিয়া, তাহাদের এই নাম হইয়াছে। শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ, সিলেট অধিকার করে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব * পাতসার প্রধান সেনাপতি মীরজুমলা, বহু সেনা সমভিব্যাহারে গিয়া আসাম আক্রমণ করেন। তিনি আহমৃ-রাজাদিগের রাজধানী গড়গাঁও পর্য্যন্ত অগ্রসর হন ও আহমৃ-রাজের নিকট কর চাহেন। আসামবাসীগণ, সমর-কুশল মুসলমান সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসক্ত হয় সত্য, কিন্তু তাহাদের দেশের জল-বায়ু-মৃত্তিকা, অতি দূষিত ও তথাকার যাতায়াতের পথাদির অত্যন্ত অভাব। এই দুই হেতু বশতঃ শত্রু-সৈন্য, শীঘ্রই আসাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ, দ্বিতীয় বার এই দেশ আক্রমণ করে। এবার তাহারা আসামবাসী আহমৃদের দ্বারা যুদ্ধে পরাভূত ও মানাস নদীর পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রদেশে বিতাড়িত হয়। দশ বৎসর পরে আহমৃ-রাজ্যে অন্তর্ব্বিবাদ উপস্থিত হইলে, গৌহাটী, মুসলমানগণের অধিকৃত হয়। কিন্তু ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা চির-দিনের জন্য এখান হইতে দূরীভূত হইয়া যায়। এই সময় হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তটে

* এ শব্দের এইরূপই বানান। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-সম্পাদিত "পুরোহিত ও অনুশীলন" ১৩০২ সাল, শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত "ঐতিহাসিক পরিভাষা" ১৫৯ হইতে ১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গোয়ালপাড়া ও উত্তর তটে রাঙামাটি ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই ইস্‌লামের অধিকার বিদ্যমান ছিল না।

নিম্ন-বঙ্গের মুসলমান কৃষকদিগের ন্যায় আসামের মুসলমান কৃষকেরাও ইস্‌লাম-ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত ও শিক্ষাদি সম্বন্ধে যার পর নাই অনভিজ্ঞ। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ, মুহম্মদের সম্বন্ধে কখন কোন কথাও কর্ণগোচর করে নাই। যাহারা কথঞ্চিৎ শিক্ষিত, কেবল তাহারাই মহম্মদকে ডাঙর পীর অর্থাৎ মহাপুরুষ বলিয়া জানে। তদ্ভিন্ন অশিক্ষিত মুসলমানেরা, তাঁহাকে (হিন্দুর যেমন রাম অথবা লক্ষ্মণ, তাহাদেরও মহম্মদ তদ্রূপ), ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকে। আসামের মুসলমানদের আচারানুষ্ঠান অনেকটা এখানকার হিন্দুদের মত। এদেশে মুসলমানদের মধ্যে অনেক গোসাঞি (ইষ্টদেব) আছে। প্রত্যেক মুসলমানই একটি একটি গোসাঞির শিষ্য।

মারিয়া নামক আর একটি জাতি, আসামের উপত্যকায় বাস করে। ইহারা এক প্রকার পতিত মুসলমান। ইহাদের সংখ্যা অল্প। অতি প্রাচীন কালে গৌড়ের পাত্‌সা, আসাম-আক্রমণর্থে যে সমস্ত সৈন্য প্রেরণ করেন, মারিয়ারা সেই সৈন্যদিগের বংশধর। আসাম দেশের ঐতিহাসিকগণ বলেন, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর, আসাম-আক্রমণের জন্য অনেক সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই বিপুল সৈন্য, যুদ্ধ করিতে করিতে, ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তটে কালিয়াবর পর্য্যন্ত সমাগত হয়। পরে আসামিগণ, নূতন সৈন্য-বলে বলীয়ান্ হইয়া গৌড়েশ্বরের বিপুল সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। যে সমস্ত সৈন্য নিহত না হয়, তাহারা বন্দী হইয়াছিল। এই সকল বন্দীকৃত-সৈন্যেরা, প্রথম প্রথম ভূমি-চাস, পরে জঙ্গল-কাটা, তদনন্তর আসাম-রাজের হস্তি-বৃন্দের ঘাস-কাটার কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কালক্রমে, ইহারা কাঁসারির কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। কাঁসারির কাজ শিখিয়া অবধি এখনও ইহারা সেই কাজই করিতেছে। ইহারা অনেক সময়ে ধনবৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে উপার্জ্জিত অর্থ, কৃষি-কার্য্যেও খাটাইয়া থাকে। কালক্রমে ইহারা আসামবাসীদিগের ন্যায় মদ্যপান ও শূকর-মাংস-ভক্ষণ করিতে শেখে। অনেক পরিমাণে ইহারা মুসলমান-ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এক্ষণে আসাম দেশের অভ্যুদয় ও উন্নতির সময় সমুপস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে বিশুদ্ধ মুসলমান ধর্ম্মের বিশেষ সংস্কার ও উন্নতি হইতেছে। অনেক মারিয়া, এখন প্রকৃত ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আসামে খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মদিগেরও বাস আছে। চার চাস প্রচলিত হওয়ার নিমিত্ত অনেক খৃষ্টানধর্ম্মী কোল ও সাঁওতাল কুলী, এখানে আনীত হইয়াছে। গোয়ালপাড়া, সাঁওতালদিগের একটি উপনিবেশ-স্থল। ওয়েলস্-মিশন, আমেরিকার মিশন প্রভৃতি অনেক মিশনের প্রযত্নে খৃষ্টানের সংখ্যা এখানে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আসাম-অঞ্চলে যে কয়েকটি বড় বড় নগর আছে, নিম্নে তাহাদের নাম ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জন-সংখ্যা উল্লিখিত হইল।

নগরের নাম	মোট জন-সংখ্যা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	জৈন	অন্যান্য জাতি
(১) সিলেট	১৪০২৭	৬৮৮৮	৭০২০	৭৪	৩৬	৯
(২) গৌহাটি (জেলা কামরূপ)	১০৮১৭	৭৭৭৩	২৪০৫	৯৯	২৩	৫১৭
(৩) ডিব্রুগড় (জেলা লখীমপুর)	৯৮৭৬	৭১০১	২৩৯৫	৯০	৪৭	২৪২
(৪) বরপেটা (জেলা কামরূপ)	৯৩৪২	৯১৯১	১০২	০	১৪	৩৫
(৫) শিলচর ও ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট (জেলা কাছাড়)	৭৫২৩	৫১৪৪	২২২৪	৮৪	৫	৬৫
(৬) শিলঙ, মায় ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট (জেলা খাসিয়া-হিল)	৬৭২০	৩০৯৫	৫৬৬	৫৪০	০	২৫১২
(৭) গোয়ালপাড়া (জেলা গোয়ালপাড়া)	৫৪৪০	৩৪৮১	১১৭২	১১	১১৪	১২১
(৮) শিবসাগর (জেলা শিবসাগর)	৫২৪৯	৩৫৮৭	১৪৫৩	১১১	৩	১২১

যে কয় প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসামের অধিবাসিগণ, জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তন্মধ্যে শিল্প, বাণিজ্য, দাস্য, কৃষি, ব্যবসা এই পাঁচটিই প্রধান। এ দেশে মজুর পাওয়া বড়ই কঠিন। কাছাড়ী জাতি ভিন্ন আসামের অন্যান্য অধিবাসীরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত অলস ও কার্য্য-বিমুখ। যাহাদের কিছুমাত্র সংস্থান আছে, তাহারা কখনই কোন প্রকার কার্য্য করিতে চায় না। আসামীরা মজুরি করে না। তাহারা কর্ম্মঠ নয় বলিয়াই, নিম্ন-বঙ্গ হইতে এখানে প্রতিবৎসর বহু কুলী আনীত হয়। এ দেশের অধিবাসিগণ, প্রায় সকলেই বেশ ধনবান্ ও সুখী; বিশেষতঃ সুর্ম্মা-উপত্যকায় যাহাদের বাস, তাহাদের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা

উৎকৃষ্ট। ইহাদের দেশে জমীতে প্রচুর ফসল জন্মে। ইহাদিগকে অতি অল্প রাজকর দিতে হয়। এদেশের চাকুরেদের অপেক্ষা চাসা ও মজুরেরা অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে। গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণি ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণির চাকুরেরা, প্রায় সকলেই ঋণ-জালে জড়িত। তাহারা যাহা কিছু বেতন পায়, তাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনেরই খরচ চলা ভার। অথচ এখানকার কুলী ও মজুরেরা, মাসে ১২৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা উপার্জ্জন করে। কৃষকেরা অত্যুচ্চ মূল্যে আপন আপন ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। আসামে উচ্চ বেতন দিলেও, খানসামা বা ভাণ্ডারী পাওয়া দুর্ঘট।

কৃষি।—ধান্যই এ দেশের প্রধান শস্য। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় প্রতিবৎসর তিন বার তিন প্রকার ধান্য উৎপন্ন হয়।

(১) শালি অর্থাৎ আমন।

(২) আহু অর্থাৎ আশু।

(৩) বোরো।

শ্রীহট্ট প্রদেশের হারড় অর্থাৎ নদী-নালার পার্শ্বস্থ বা নিকটবর্ত্তী নিম্ন ভূমি সকলে প্রচুর পরিমাণে আমন ও বোরো ধান জন্মে। সুর্ম্মা-উপত্যকাতেও এই ত্রিবিধ ধান্যের চাস হইয়া থাকে। আসামের যে সমস্ত শুষ্ক ও বালুকাময় ভূমি, বর্ষাগমে জলমগ্ন হয়, তাহাতে শর্ষপ উপ্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শর্ষপ উৎপন্ন হয়। এ-দেশে কলাই, ইক্ষু, ভুট্টা, সুপারি, পান ও তামাক তত অধিক পরিমাণে জন্মে না। শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলে পাটের চাস হয় এবং পর্ব্বতীয় প্রদেশ-সমুদয়ে তুলার আবাদ হইয়া থাকে। এ দেশের আদিম অসভ্য অধিবাসিগণ, এক অভিনব প্রণালীতে ফল-শস্যাদির আবাদ করিয়া থাকে। এই প্রণালী জম্ নামে খ্যাত। তাহারা প্রথমতঃ কোন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত করিয়া 'দা' দিয়া স্থানে স্থানে গর্ত্ত করে। পরে ঐ সমস্ত গর্ত্তে ধান্য, শর্ষপ, তুলা প্রভৃতি সকল প্রকার ফল-শস্যাদির বীজ যথেচ্ছ বপন করিয়া যায়। পরিপক্ক হইলে পর্য্যায়-ক্রমে ঐ সমস্ত ফসল কাটিয়া লয় ও দুই এক বৎসর পরে স্থানান্তরে গিয়া ঐ প্রণালীতে আবার চাস-আবাদ করে। এই প্রণালীতে, ফসল অধিক হয় না সত্য; কিন্ত জঙ্গল-পরিষ্কারের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনুকূল। আজ-কাল গোয়ালপাড়া, কামরূপ কিংবা দারঙের কাছাড়ী অধিবাসিগণ, আর এই প্রণালীতে চাস-আবাদ করে না। খাসিয়া বা মধ্য-নাগা পাহাড়ের সর্ব্বত্র এই প্রণালীর আবাদ প্রচলিত নাই। উত্তর কাছাড় ভিন্ন অন্যান্য প্রত্যেক পার্ব্বত্য জেলার নিম্ন উপত্যকায় কতকগুলি ছাদের মত ঢালু ধান্য-ক্ষেত্র আছে। এই সকল ভূমিতে নানারূপ ফসলের চাস আবাদ হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের নিম্ন ভূমিতে (নামদানীতে) প্রচুর পরিমাণে গোল আলু, আনারস, কমলা লেবু ও তেজপাতের আবাদ আছে। এই সমস্ত ফল-মূল, কলিকাতার বাজারে বিক্রীত হয়।

আসামের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। এই সকল ভূমিতে কখন সার বা জল-সেচনের

আবশ্যক হয় না। বর্ষাগমে নদ-নদী সকল কূলপ্লাবী আকার ধারণ করিয়া স্ব স্ব তটভূমি জল-ময় করে। তাহাতে সমস্ত ভূভাগ, এক প্রকার পলি-মাটীতে সমাচ্ছাদিত হয়। এই পলি-মাটীই সারের কার্য্য করে। আসামের লোক-সংখ্যা তত অধিক নয়। এখানে অনেক পতিত ভূমি দৃষ্ট হয়। ভূমির রাজস্বও এখানে অধিক নয়। কৃষকদিগের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট যে উপায়ে রাজকর আদায় করিয়া লন, তাহাতে কর দিতে কখনই কাহারও কোন কষ্ট হয় না। গবর্ণমেণ্টই কৃষকের নিকট হইতে খাজনা আদায় করেন। কোন জমীদার বা অন্য মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামীর ব্যবধান না থাকায়, প্রজার উপর কোন অত্যাচার বা উৎপীড়ন হইতে পায় না। এখানকার চা-বাগানে খাটিবার জন্য লোক কম পাওয়া যায়। এজন্য চা-বাগানের মজুরির মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক। এইরূপ অনেক সুবিধা আছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করিলে অন্যায় হয় না যে, আসামের কৃষিজীবীরা অবস্থাপন্ন বটে। আসাম প্রদেশের অধিবাসীদিগের যাহা যাহা প্রধান খাদ্য, আসামেই সে সকল উৎপন্ন হয়; সুতরাং অপরে না লইয়া গেলে, স্বদেশোৎপন্ন খাদ্যেই ইহারা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। যাহারা লইয়া যায়, তাহারা বলে—আসামীরা অলস; তাই ইহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে না। আপন আপন পরিবার-প্রতিপালন করিবার জন্য যে পরিমিত শস্য আবশ্যক, তাহার অধিক শস্যোৎপাদনে তাহারা যত্ন করে না। চা-বাগানে যাহারা খাটিয়া খায়, তাহাদের জন্য চাউল এবং অন্যবিধ শস্যও বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। কিন্তু শ্রীহট্টে এরূপ করিতে হয় না। ইহার কারণ আছে। শ্রীহট্ট, বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়, এ প্রদেশেও রাজাই ভূম্যধিকারী। গোয়ালপাড়ার ন্যায় শ্রীহট্টেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইয়াছে। তবে শ্রীহট্টের জমী-বন্দোবস্তের সহিত বাঙ্গলা দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভেদ এই, এখানকার বন্দোবস্ত রায়তোয়ারি—অর্থাৎ কৃষিজীবীদিগের সঙ্গে উহা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ। বঙ্গদেশে রাজার বন্দোবস্ত, জমিদারের সহিত; এ প্রদেশে তাহা নয়—কৃষিজীবীদিগের সহিত। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা-প্রদেশে মৌজাদারী জমী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ, গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য খাজনা, মৌজাদার দিয়া থাকেন এবং প্রজাদের নিকট হইতে মৌজাদার তাহা আদায় করেন। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে "চৌধুরী" পদ্ধতি ছিল, ইহা তাহারই পরিণাম-স্বরূপ। এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করিয়াই, বাঙ্গালা দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিষ্পন্ন হইয়াছিল। উভয়ের কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, এই স্থলে যাহাদিগকে চৌধুরী বলিত,—ইংরেজের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাঁহারা জমীদার নামে অভিহিত হইয়াছেন। আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই জমী-বন্দোবস্ত-সম্বন্ধে মৌজাদারী পদ্ধতি প্রচলিত। এই পদ্ধতি-অনুসারে জমীর বার্ষিক বন্দোবস্তই হইয়া থাকে এবং জেলার প্রধান রাজপুরুষ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। এই প্রদেশের যে যে অংশে লোকালয় আছে, তাহার আয়তন, সাতাইশ হাজার ছয় শত ছেষট্টি বর্গ মাইল।

তন্মধ্যে কেবল প্রায় সাত হাজার বর্গ মাইলে আবাদ হইয়া থাকে। ঐ আবাদী জমীর রাজস্ব, গবর্ণমেণ্ট পাইয়া থাকেন।

যে সকল দৈব ঘটনার উপর জন-সাধারণের জীবনোপায় নির্ভর করে, তাহা এই প্রদেশে প্রায় ঘটে না। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই প্রদেশে এক বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাও কোন দৈব কারণে ঘটে নাই। মগদিগের আক্রমণ এবং অরাজকতাই তাহার কারণ। অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, জলপ্লাবন—এ সকলও যে না হয়, এমন নয়; কিন্তু এ সকল সর্ব্বদা সংঘটিত হয় না। এই সকল কারণ সত্ত্বেও কখনও এই প্রদেশকে বিশেষরূপে বিপন্ন হইতে হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের নিকটবর্ত্তী বলিয়া এখানে নিয়মিত খাদ্যের অভাব প্রায়ই হয় না।

এই প্রদেশে "চা"-চাসেরই প্রাধান্য; কিন্তু তাহা ইয়ুরোপীয়দিগের হস্তগত। দেশের লোকের তাহাতে কোন লাভালাভ নাই। আসামে "চা"-চাসই উত্তম হয়। এই চাসের প্রবর্ত্তয়িতা রবার্ট ব্রুস। তিনি যখন প্রথম এই প্রদেশে ব্যবসায়ের অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন, তখন তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন, "চা"আবাদের পক্ষে ইহা বড় উপযুক্ত স্থান। সে অনেক দিনের কথা—তখন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ। তখন এই প্রদেশ, ব্রহ্ম-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার কিছু দিন পরেই ইংরেজের সহিত ব্রহ্মরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উক্ত ব্রুস সাহেবের ভ্রাতা, রণতরীর কিয়দংশের ভার প্রাপ্ত হইয়া এই অঞ্চলে গমন করেন। তিনিই "চা"র অনেকগুলি গাছ এবং বীজ লইয়া যান। ইহা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। শেষে কতকগুলি নমুনা-মাত্র, কলিকাতাস্থিত বোটানিকেল্ গার্ডনের (উদ্ভিদ্-উদ্যানের) তাৎকালিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের (পরিদর্শকের) নিকট প্রেরিত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক কর্ত্তৃক কাপ্তেন জেন্‌কিন্স প্রেরিত হন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারল বেণ্টিঙ্ক, এই বিষয়ের সারোদ্ধার জন্য একটী কমিটী স্থাপিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে চীন-রাজ্যেই ভাল "চা" হইত; সেই জন্য গবর্ণর জেনেরল লর্ড বেণ্টিঙ্ক, এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে এবং নূতন চারা ও বীজের জন্য চীন-রাজকে পত্র লেখেন। সেই সময়ে চীন-রাজ বীজ পাঠাইয়াছিলেন। তৎপরেই দেখা গেল, আসামে যেরূপ "চা" উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু তখন একটা কথা উপস্থিত হইল,—আসামে "চা"-চাস হইতে পারে, কিন্তু চাস করিবে কে? তজ্জন্য চীন হইতে লোক আনিবার আবশ্যক হইল। ইহার পরে লর্ড অকল্যাণ্ড, গবর্ণর জেনারল হইলেন। তিনিই চীন-দেশ হইতে "চা"-চাসের জন্য কতকগুলি পারদর্শী লোক আনাইলেন। ভারতবর্ষে "চা"-চাসের নিমিত্ত এখনও চীন হইতে কিছু কিছু বীজ আনীত হইয়া থাকে। এ সকল বীজ, প্রায় কাছাড় এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে চীনের যে প্রতিপত্তি ও পসার ছিল, এক্ষণে তাহা নাই। আসামের "চা"র যে সৌরভ, চীনের "চা"র তাহা নাই। আসামে

"চা"-চাসের পরীক্ষা-ভার, প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিজে লইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লখীমপুরে প্রথম "চা"-বাগান খোলা হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ১২ বাক্স আসামী "চা" বিলাতে পাঠান হয়। দালালেরা এই "চা" পরীক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে। কিন্তু আসামে "চা"-র চাস, চিরকাল নিজে চালাইবার অভিপ্রায়, গবর্ণমেণ্টের কখনই ছিল না। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আসামে চা-আবাদ করিবার জন্য কতকগুলি কোম্পানির ইচ্ছা হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টে চার আবাদ, আসাম-টী-কোম্পানির হস্তে সমর্পিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে দারঙ্ এবং কামরূপেও চা-বাগান হইয়াছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দেখা যায়, কাছাড় প্রদেশে "চা" গাছ স্বচ্ছন্দে উৎপন্ন হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে "চা"-বাগানের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া এক হাজার আটান্ন পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

চা-বাগানে খাটিবার জন্য আসামে আবশ্যক মত মজুর পাওয়া যায় না। সেই সূত্রে বাঙ্গলা হইতে "কুলী" লইয়া যাইবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। কাছাড়ীদিগকে বাদ দিয়া বলা যাইতে পারে, আসামের অধিবাসীরা সচরাচর এরূপ অবস্থাপন্ন বা আলস্যপরায়ণ যে, উচ্চ হারে বেতন দিয়াও, নিয়মিত পরিশ্রমের জন্য তাহাদিগকে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ আহম্-বংশের রাজত্ব-কাল হইতে এই প্রদেশে এরূপ একটা সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে যে, অপরের জন্য পরিশ্রম করা হীনতা-সূচক। আসামের চার আবাদে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই লক্ষ কুলি খাটিয়া থাকে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় লোক, এক লক্ষ আশী হাজারেরও উপর।

চা-চাসের জন্য পর্ব্বত-মূলস্থ গভীর আরণ্য প্রদেশের ভূমি অতি উৎকৃষ্ট। কেন না, এইরূপ স্থানের জল-বায়ু-মৃত্তিকার তাপাধিক্য এবং শৈত্যাধিক্য—উভয়ই পাওয়া যায়। আসামের প্রত্যেক জেলাতেই এইরূপ ক্ষেত্র অতি সুলভ। তবে কাছাড়, লখীমপুর, শিবসাগর এবং দারঙ এই চারি জেলাতেই অধিকাংশ চা-বাগান রহিয়াছে।

হস্ত-নির্ম্মিত শিল্পের মধ্যে এখানকার মোটা রেসমের কাপড়ই, উল্লেখ-যোগ্য। এই কাপড় দুই প্রকার। এক এড়ি, দ্বিতীয় মুগা। এই প্রদেশের যুগীরা, তুঁতের চাসও করিয়া থাকে। তাহা হইতে এক প্রকার রেসমও প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত সুতার কাপড়, পিত্তলের বাসন, মৃণ্ময় দ্রব্য, হস্তি-দন্তের অলঙ্কার এবং নিত্য-ব্যবহার্য্য অন্যান্য দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে এই প্রকারের দ্রব্য আমদানি হওয়ায়, আসামের এবংবিধ শিল্প অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীহট্টে এবং সূর্ম্মা-উপত্যকায় কতকগুলি জিনিস জন্মিয়া থাকে; সেরূপ অন্যত্র পাওয়া যায় না। যথা—শীতল পাটী, শাঁখা, হস্তিদন্তের পাটী, হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত পাখা এবং লৌহের কারুকার্য্যের দ্রব্যাদি। এতদ্ব্যতীত নৌকা-নির্ম্মাণ, চুণ পোড়ান এবং ভিন্ন প্রকারের চিনিও এই প্রদেশের শ্রম-লব্ধ দ্রব্যের বিষয়ীভূত। খাসিয়া এবং জয়ন্তীয়া পাহাড় হইতে যে সকল শিল্প-দ্রব্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বাঁশ এবং বেত্রের নির্ম্মিত দ্রব্য, সূতা এবং রেসমের কাপড়, লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার এবং কতকগুলি বাদ্য-যন্ত্রই প্রধান।

আসামের বহির্ব্বাণিজ্য প্রায় জলপথেই হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুত্র এবং সূর্ম্মা উভয় নদীই বাষ্পীয়-যান-যাতায়াতের উপযোগী। চায় রপ্তানি এবং সূতা, চাউল, চিনি ও সুরার আমদানি, বাষ্পীয় যানেই হইয়া থাকে। অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি, এদেশীয় নৌকা-যোগেই হয়। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় তত্রত্য বাণিজ্য, প্রায়শঃ মাড়োয়ারি বা জৈন সওদাগরদের দ্বারাই পরিচালিত। খাসিয়া পাহাড় হইতে যে সকল মূল্যবান্ দ্রব্যাদি রপ্তানি হয়, তাহার লভ্যাংশ, তৎপ্রদেশবাসীরাই পাইয়া থাকে। কিন্তু সূর্ম্মা-উপত্যকায়, ঢাকা এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের মুসলমানেরাই প্রধান ব্যবসায়ী। প্রতি বৎসর শীতকালে এই প্রদেশের সীমান্ত অংশে অনেকগুলি মেলা হয়। তাহাতে পার্ব্বত্য-জাতিদিগের সহিত আদান-প্রদানের সৌকর্য্য সংসাধিত হয়। লখীমপুরের সদীয়া নামক স্থানে এক-মাস-স্থায়ী একটী মেলা হইয়া থাকে। ডফলা ও আবর প্রদেশ হইতে পাহাড়ীরা, লখীমপুরের ব্যবসায়ী-দিগের সহিত সমস্ত শীত-কাল ধরিয়া বাণিজ্য-বিনিময় করিয়া থাকে। সীমান্তের বহির্দ্দেশে ভুটান, তোয়াঙ্, ডফলা, আরব, নাগা-পর্ব্বত, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, লুসাই পাহাড় এবং মণিপুরের সহিতও বাণিজ্য হইয়া থাকে। আমদানি-দ্রব্যের মধ্যে বাঁশ, কাঠ, ঘোড়া, স্বর্ণ এবং হস্তি-দন্তই প্রধান। রপ্তানি-সম্বন্ধে চাউল, সূতা, রেসমের কাপড়, পিত্তল ও তামার জিনিস, আফিঙ্ এবং লবণই প্রধান।

আসাম প্রদেশের প্রধান রাজপুরুষ এক জন চীফ্ কমিশনর্। ইনি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন। ইঁহার অধীনে আসাম প্রদেশে এক জন কমিশনার এবং মণিপুর রাজ্যের জন্য এক জন রাজনৈতিক প্রতিনিধি (পোলিটিক্যাল্ এজেণ্ট) আছেন। ইঁহাদের অধীনে ১১ এগার জন ডেপুটি কমিশনার আছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একটী জেলার ভার অর্পিত। শাসন-বিভাগ, বিচার-বিভাগ এবং রাজস্ব-সংগ্রহ, ইঁহাদিগেরই হস্তে ন্যস্ত।

পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণালী, আসামে অতি অল্প কালই প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রদেশের স্কুলের সংখ্যা তের শতের অধিক নয়। এই সকল বিদ্যালয়ের খরচের জন্য এতৎ-স্থানীয় লোকের চাঁদা দ্বারা যে টাকা লব্ধ হয়, তদতিরিক্ত আবশ্যকীয় অর্থ, গবর্ণমেণ্ট দিয়া থাকেন। সাধারণ বিদ্যালয় ব্যতীত সূত্রধর ও কর্ম্মকারাদির কার্য্যশিক্ষার জন্য জোড়হাটে একটী স্কুল আছে। শিবসাগরে জরীপ (সরভেইঙ) শিক্ষারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। যে সকল বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য নাই, অর্থাৎ যেগুলি কেবল এদেশীয় লোকের অর্থে পরিচালিত হইয়া থাকে, সেখানে ধর্ম্মোপদেশও প্রদত্ত হয়। এই প্রণালীর বিদ্যালয়, শ্রীহট্টে দুই শত সাতাশী। শিবসাগরে এগারটী মাত্র আছে। এই প্রদেশের নিরক্ষর পুরুষের সংখ্যা শত-করা পঁচানব্বুই জন এবং এইরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা, শত-করা নিরানব্বই জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্র ছাড়া আর সাতটী মুদ্রাযন্ত্র এই প্রদেশে ছিল। শ্রীহট্টে এক খানি সংবাদ-পত্র এবং শিবসাগরে এক খানি সাময়িক পত্র আছে। আজ কাল ইহার সংখ্যা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইতেছে।

আসামের জল-বায়ু-মৃত্তিকার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে জলীয় ভাগই কিছু অধিক। এখানে বর্ষাকাল, প্রায় মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রথম ভাগেই আরম্ভ হয় এবং কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত থাকে। চিরাপুঞ্জিতে যেরূপ বৃষ্টি হয়, এরূপ বৃষ্টি, পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। ভূমিকম্প এ প্রদেশে কিছু অধিক। কহিমার নিকটে শীত-কালে বরফও পড়িয়া থাকে।

ইংরেজদিগের বন্দোবস্তে কতকটা উন্নতি হইয়া থাকিলেও, আসামের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নয়। পর্ব্বতের পাদদেশে এবং ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, বড় ভয়ানক। বৃক্ষাদি-শূন্য সমতল প্রদেশ, বেশ স্বাস্থ্যকর। ইহাও দেখা গিয়াছে, চাস-বাসের বিস্তার হইলেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া যায়। সবিরাম জ্বর, উদরের পীড়া, ওলাউঠা, বসন্ত এবং চর্ম্মরোগ, এই প্রদেশের প্রধান ব্যাধি। তেজপুরে একটী পাগলা-গারদ আছে।

আসাম প্রদেশ, পুরাণাদিতে "প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌" নামে অভিহিত। কালিকা-পুরাণ অষ্টত্রিংশ অধ্যায় হইতে নিম্নে যে কয়েকটী শ্লোকার্থ উদ্ধৃত হইল, তৎ-পাঠেই ইহা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে।

"ভগবান্ (নরকাসুরকে) বলিলেন, পুত্র! করতোয়া-নামে গঙ্গা, সর্ব্বদা পূর্ব্বদিগ্-ভাগে বহিতেছেন। যে স্থানে ললিত-কান্তা দেবী আছেন, সেই স্থান পর্য্যন্ত তোমার ভবন হইবে। এই স্থানে দেবী মহামায়া, জগৎ-প্রসবিনী যোগনিদ্রা, কামাখ্যারূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মপুত্র, (লৌহিত্য) নামক নদও রহিয়াছে। এই পুণ্য ভূমিতে দশদিক্-পালগণও, স্বকীয় স্বকীয় স্থানে আছেন।"—১১৪-১১৬ শ্লোক।

"করতোয়া সদা গঙ্গা পূর্ব্বভাগাবধি প্রিয়া।
যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবদ্দেশঃ পুরং তব॥
ক্ষেত্রদেবী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ।
কামাখ্যা রূপমাদায় সদা তিষ্ঠতি শোভনা॥
ক্ষেত্রাস্তি নদ-রাজোঽয়ং লৌহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
ক্ষেত্রৈব দশদিক্পালাঃ স্বে স্বে পীঠে ব্যবস্থিতাঃ॥
ক্ষেত্র স্বয়ং মহাদেবো ব্রহ্মা চাহঞ্চ সর্ব্বদা।
চন্দ্রসূর্য্যশ্চ সততং বসতোঽত্রৈব পুত্রক॥
সর্ব্বে ক্রীড়ার্থমায়াতা রহস্যং দেশমুত্তমং।
ক্ষেত্রশ্রীঃ সর্ব্বতো ভদ্রা ভোগ্যমত্র তথা বহু॥
ক্ষেত্রমধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী-সমা॥
ক্ষেত্রত্বং বসত ভদ্র তে হ্যভিষিক্তো ময়া স্বয়ং।
কৃতদারঃ মহামাত্যৈ রাজা ভূত্বা মহাবল॥"

"এই স্থানে স্বয়ং মহাদেব, ব্রহ্মা ও আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি এবং চন্দ্র-সূর্য্যও নিরন্তর বাস করিতেছেন। এটী অত্যন্ত রহস্য স্থান। এজন্য সমস্ত দেবতাই ক্রীড়ার নিমিত্ত এস্থলে আগমন করেন। এস্থলে সর্ব্বতোভদ্রা নামে লক্ষ্মী আছেন এবং এটী অত্যন্ত গোপনীয় ও ভোগের স্থান। এই পুরীতে ব্রহ্মা, পূর্ব্বে একটী নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই-জন্য ইন্দ্রপুরী-সদৃশ এই পুরীর "প্রাগ্‌জ্যোতিষ্" নাম হইল। ভদ্র নরক! তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া রাজা হইয়া অমাত্যের সহিত কুশলে বাস কর। আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিলাম।"—১২০ শ্লোক। (কামরূপ ও কামাখ্যা শব্দ দেখুন।)

যোগিনী-তন্ত্রের দ্বাদশ পটলে আসাম-প্রদেশ-সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

"নরকাসুর-নামা তু বিষ্ণু-বীর্য্য-সমুদ্ভবঃ।
পৃথিবী-গর্ভ-সম্ভূতো দানবানামধীশ্বরঃ॥
তস্মৈ বিষ্ণুর্দ্দদৌ রাজ্যং কামরূপং মহাফলং।
পৃথিবী-বচনাৎ সোঽপি দানবো যুদ্ধ-দুর্দ্ধরঃ॥
কিরাতৈর্ঘটিতং জিত্বা রণে কাম-নৃপোঽভবৎ।
পুনশ্চ ভগবান্ তস্মৈ নিবাসায় দদৌ মুদা॥
প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরং খ্যাতং কামাখ্যা-যোনি-মণ্ডলং।
জিত্বাভিষেচনং রাজা বিষ্ণুশক্তিং দদাবপি॥
ততস্তু দর্শয়ামাস মনোভব-গুহাং হরিঃ।
সুস্নাতং নারকং তদ্বদ্বিধেয়ামাস বৈ তদা॥

তাৎপর্য্য—পৃথিবীর গর্ভে বিষ্ণুর ঔরসে দানবরাজ নরকের জন্ম হয়। বিষ্ণু, তাঁহাকে মহাফলপ্রদ কামরূপ রাজ্য দান করেন। সেই রণদুর্ম্মদ দানব, পৃথিবীর আজ্ঞায় যুদ্ধে কিরাত-রাজ্য জয় করিয়া তাহার অধীশ্বর হইলেন। ভগবান্ পুনরায় নরকের বাসের জন্য প্রাগ্‌জ্যোতিষ্ নামক বিখ্যাত পুর দান করিলেন। বিষ্ণু, তাঁহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, দেবীর গুহা দেখিলেন ও সুস্নাত নরককে তদ্রূপ আজ্ঞা করিলেন।

ভূগোলের প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

☞ এই অংশের ১৪৯ পৃষ্ঠার টীকায় যে শঙ্করাচার্য্যের উল্লেখ আছে, তিনি আসামের শঙ্করদেব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

১৫২ পৃষ্ঠায় "ডাউর পীর" পরিবর্ত্তে 'ডাওর পীর' হইবে।

ই

(১) ইকোনা।—অযোধ্যা প্রদেশে বহরাইচ জেলার একটী পরগণা। ইহার উত্তরে ভিঙ্গা পরগণা, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে গোণ্ডা জেলা এবং পশ্চিমে বহরাইচ ও ভিঙ্গা তসিল-দ্বয়। এরূপ প্রবাদ, ফিরোজসাহ তোগলক পাতসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই পরগণাটী, লুণ্ঠনকারী এক দল শূত্রধর-বংশীয়ের অধীন ছিল; পরে ঐ পাতসাহের রাজত্বকালে প্রায় ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে বারিষার সা নামক একজন জনবার রাজপুত উহাদিগকে পরাস্ত করেন এবং এই প্রদেশের বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই বিখ্যাত ইকোনা-রাজ-বংশের উৎপত্তি। ইহার বংশধরগণ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত এই প্রদেশে আধিপত্য করেন; কিন্তু তাৎকালিক অধিপতির বিদ্রোহাচরণ-বশতঃ রাজ্যটী সরকারী অধিকার-ভুক্ত হইল এবং উহার কতক অংশ কপূর্রতলার মহারাজকে এবং কতক অংশ বলরামপুরের রাজাকে প্রদত্ত হইল। শেষোক্ত রাজদ্বয়ও ইকোনা-রাজবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

প্রতাপসিংহ নামক জনৈক এই বংশীয় বীর, ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত পরগণায় গাঙ্গোয়াল রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত এই রাজ্য অধিকার করিতেছেন।

এই পরগণার উত্তর দেশে রাপ্তি ও সিংহিয়া নদীদ্বয় এবং দক্ষিণে কোহানী-নাম্নী নদী প্রবাহিতা। ভূমি সাধারণতঃ উর্ব্বরা। পরিমাণ-ফল ১২৯৷৷০ বর্গ ক্রোশ। গবর্ণমেণ্ট-রাজস্ব বার্ষিক ১৩০০৭০৲ টাকা। এই পরগণাস্থ ২১৩ খানি গ্রামের মধ্যে অন্যূন ২০৬ খানি গ্রাম, তালুকদারী-রূপে গৃহীত এবং কপূর্রতলা, বলরামপুর ও গাঙ্গোয়াল রাজাদিগের রাজ্য-ভুক্ত। অধিবাসীর সংখ্যা ৮৯৬২৬। ব্রাহ্মণের ভাগই অধিক। ইকোনা সহর হইতে দুইটী পথ এই পরগণার মধ্য দিয়া ধাবিত হইয়াছে। এখানে ৪ চারিটী স্কুল আছে। এই পরগণায় অনেকগুলি সুন্দর বৌদ্ধ-ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কনিংহাম্ সাহেব, এই স্থানস্থিত তাণ্ডোয়া গ্রামকেই ফাহিয়ান্ ও হিয়েনস্যাঙের কথিত টুয়েই বলিয়া স্থির করেন।

পূর্ব্বোক্ত চীন-দেশীয় পরিব্রাজকদ্বয়ের মতে উক্ত টুয়েই নগরেই কাশ্যপ বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ স্থানেই সমাধিগ্রস্তও হন। এই গ্রামে শাক্য বুদ্ধের মাতার প্রতিমূর্ত্তি এখনও সীতা নামে পূজিত হইয়া থাকে।

(২) ইকোনা।—(একোনা)—অযোধ্যা প্রদেশস্থ বহরাইচ জেলার অন্তর্গত ইকোনা পরগণার নগর। নগরটী বহরাইচ নগরের ১১ ক্রোশ পূর্ব্বে বলরামপুর যাইবার পথে অবস্থিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত এই নগর ইকোনা-রাজাদিগের বাসস্থান ছিল। কিন্তু উক্ত সময়ে তৎকালিক রাজার বিশ্বাসঘাতকতা-বশতঃ তদীয় রাজ্য, সরকারী হইয়া যায়। অধিবাসীর সংখ্যা ২২১৬। এখানে হিন্দুদিগের দুইটী মন্দির ও মুসলমানদের তিনটী মস্জিদ আছে। একটী পুলিস-থানা, একটী ডিস্পেনসারী এবং কপূর্রতলার মহারাজের একটী স্কুলও এখানে আছে।

ইক্কেরী।— মহীসুর-রাজ্যের অন্তর্গত সিমোগা-জেলাস্থ একটী গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা ১৬৪। এই গ্রামটী ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কিলাদি বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। উক্ত রাজগণ, সন্নিহিত প্রদেশগুলির উপর আধিপত্য করিতেন। তৎপরে উঁহারা বেদনর-নামক স্থানে রাজধানী করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এই বেদনর, হায়দর আলি কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং কিলাদি রাজার রাজ্য, মহীসুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই রাজ-বংশ প্রধানতঃ ইক্কেরী নামেই কথিত হইত। ইঁহাদের টাঁকশাল বন্ধ হইলেও, ইঁহাদের কৃত মুদ্রা সকল 'ইক্কেরী প্যাগোডা' নামে বিজ্ঞাত হইত। ইক্কেরী নগর তিনটী ঐককেন্দ্রিক বিস্তৃত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীরের মধ্যে সুবর্ণ ও নানাবিধ চিত্র-ভূষিত প্রাসাদ ও দুর্গ অবস্থিত ছিল। অঘোরেশ্বরের একটী প্রস্তরময় মন্দির এবং তৎসম্মুখে প্রণত তিনটী বীরের মূর্ত্তিই, এখনকার ধ্বংসাবশেষ।

(১) ইগাত-পুরী।—বোম্বে প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নাসিক-জেলার অধীন মহকুমা। এই মহকুমায় ১টী সহর ও ১২৭টী গ্রাম আছে; পরিমাণ ১৮৮ বর্গ ক্রোশ; অধিবাসীর সংখ্যা ৬৮৭৪৯। শতকরা ৩ জন হিসাবে মুসলমান; অবশিষ্ট হিন্দু। দুই এক জন খৃষ্টানও দেখা যায়। এই তালুকের পশ্চিমোত্তর ও দক্ষিণাংশ, পাহাড়ময় ও অনুর্ব্বর; কিন্তু তথাকার জলবায়ু শীতল ও স্বাস্থ্যকর। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভূমি সকলেব জরিপ এবং ৩০ বৎসরের জন্য রাজস্ব স্থিরীকৃত হয়। রাজস্ব আদায় (১৭৮১ খৃষ্টাব্দে) ৯৪০৬০৲ টাকা। এই মহকুমাতে দুইটী ফৌজদারী আদালত এবং একটী পুলিশ-থানা আছে।

(২) ইগাত-পুরী।—বোম্বে প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নাসিক জেলার অধীন ইগাত-পুরী মহকুমার সদর সহর। (অক্ষান্তর ১৯° ৪০′ উত্তর, দ্রাঘিমান্তর ৭৩° ৩৫′ পূর্ব্ব) অধিবাসীর সংখ্যা ৬৩০৬। তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগ মুসলমানের চারিগুণেরও অধিক। লোক সংখ্যা ১৮৯১ খৃঃ ৭৫৪৪। এখানকার মিউনিসিপালটীর বার্ষিক আদায় (১৮৮২। ১৮৮৩ (খৃষ্টাব্দে) ৩০০০৲ টাকা। ইগাতপুরী সহরটী নাসিকের ১৭৷৷০ সাড়ে সতের ক্রোশ দক্ষিণে এবং বোম্বে হইতে ৪৭৷৷০ সাড়ে সাতচল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্সুলার-রেলওয়ের একটী ষ্টেশন এবং একটী পোষ্ট-আফিস আছে। এই নগরটি সমুদ্রতল হইতে প্রায় ১৩০০ হস্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত। এই জন্য চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ইয়ুরোপীয়গণ স্বাস্থ্যোন্নতির কারণে এই স্থানে সমাগত হন। এই স্থানে খৃষ্টীয় গির্জ্জা ও ৩ তিনটী স্কুল আছে। এই সহরের নিকটবর্ত্তী পিম্পি-নামক স্থানে সদরুদ্দিন নামক জনৈক বিখ্যাত মুসলমান সাধুর সমাধি-গৃহের সত্তা রহিয়াছে।

(১) ইগ্লাস্।—পশ্চিমোত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলাস্থ একটী তসিল। ইহার মধ্যে হাসনগড় ও লোরাই পরগণাদ্বয় অবস্থিত। ইহার ভূমি উর্ব্বরা। পরিমাণ-ফল ১০৬৷৷০ এক শত সাড়ে ছয় ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ১১১৩৮৯। তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগ মুসলমানের ১৬৷১৭ গুণ অধিক। এই তসিলে ২১৬টী গ্রাম। গবর্ণমেণ্ট-রাজস্ব মোট ৩১৬৪৬০৲ টাকা। সমস্ত জমীই প্রায় আবাদ হইয়া থাকে। কিন্তু পশুচারণাদির জন্য পতিতও

কিছু থাকে। কূপই এখানে জল-প্রাপ্তির প্রধান উপায়। সমতল ক্ষেত্রে ১৪ চৌদ্দ হইতে ২০ কুড়ি হস্তের মধ্যেই জল পাওয়া যায়। গম, ধান্য, বাজ্‌রা, যব ইত্যাদিই প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। কৃষকেরা পরিশ্রমী এবং অধিকাংশই জাট-বংশীয়। এই তসিলে একটী ফৌজদারী আদালত ও দুইটী পুলিশ-থানা আছে।

(২) ইগ্লাস্‌।—পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় আলিগড় জেলার অন্তবর্ত্তী ইগ্লাস নামক তহসিলের সদর সহর। আলিগড় নগর হইতে ৯ নয় ক্রোশ দূরে মথুরার পথে অবস্থিত। এখানে একটী পুলিশ-থানা ও পোষ্ট-আফিস্‌ আছে। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ১৪২৮। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় জাটেরা, এই নগর আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

ইচাউলি।—অযোধ্যা-প্রদেশের বড়বাঁকি-জেলার একটী নগর। বড়বাঁকি সহর হইতে ১২॥০ সাড়ে বার ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর, অক্ষান্তর ২৬° ৫৮′ উত্তর, ও দ্রাঘিমান্তর ৮১° ৩৭′ পূর্ব্বে; অবস্থিত। ৯৯০—১০৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদের সেনাপতিগণ, ভার দুর্গকে ভূমিসাৎ করেন এবং করাচীব ভূম্যধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া একটী নূতন নগর স্থাপিত করেন; কিন্তু ইহার প্রাচীন নামটী বিলুপ্ত করেন নাই। উক্ত সময়ের জায়গিরদার-গণের বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত এখানে বাস করিতেছেন। আসফ উদ্দৌলা এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার দেওয়ান মহারাজ টিকাইট রায়-প্রতিষ্ঠিত একটী সুন্দর জলাশয় এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৪৭৫১। হিন্দুর ভাগ মুসলমান অপেক্ষা কিছু অধিক হইবে।

ইচাক।—বাঙ্গলা দেশস্থ হাজারিবাগ জেলার একটী নগর। এখানে মিউনিসিপালটী আছে। হাজারিবাগ সহর হইতে ৩॥ বা ৪ সাড়ে তিন বা চারি ক্রোশ দূরে (অক্ষান্তর ২৪° ৫′ ২৪″ উত্তর ও দ্রাঘিমান্তর ৮৫° ২৮′ ১৩″ পূর্ব্বে) অবস্থিত। স্থানটী বড় মনোরম; এখানে একটী দুর্গ আছে। এই দুর্গটী, কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রামগড়ের রাজাদিগের পারিবারিক অধিবাস স্থান-রূপে দীর্ঘ-কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৭৩৪৬। তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগ, মুসলমান অপেক্ষা ৮।৯ আট নয় গুণ অধিক।

ইচাকাডা।—বাঙ্গলা দেশস্থ যশোহর জেলার অন্তবর্ত্তী গ্রাম; মাগুরার দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে নবাবদিগের রাজত্বকালে এখানে একটী ক্ষুদ্র সেনা-নিবাস ছিল। এখন এখানে একটী বাজার আছে। সেই বাজারে গুড়, আলু ও আনারসের ব্যবসা বহুল পরিমাণে চলিয়া থাকে।

(১) ইচাপুর।—বাঙ্গলা দেশে চব্বিশ পরগণা জেলাস্থিত একটী নগর; কলিকাতা হইতে প্রায় ৮ আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে ঈষ্টারেন্‌ বেঙ্গল রেলওয়ের একটী ষ্টেশন এবং গবর্ণমেণ্টের একটী বৃহৎ বারুদ-খানা রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যপ্রাপ্ত একটী এদেশীয় স্কুলও এখানে আছে।

(২) ইচাপুর।—(অর্থাৎ বাঞ্ছিত নগর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্বর্ত্তী গাঞ্জাম জেলার একটী নগর; বার্হামপুরের ৮ আট ক্রোশ পশ্চিম দক্ষিণে (অক্ষান্তর ১৯° ৬' ৪০" উত্তর; দ্রাঘিমান্তর ৮৪° ৪৪' ১০" পূর্ব্বে) অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৫৫২৮, ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৫৯১১, তন্মধ্যে শতকরা ৩ জন মুসলমান ও অবশিষ্ট হিন্দু। এই নগরে সব্-মাজিষ্ট্রেটের কোর্ট, পুলিশ-থানা ও পোষ্ট-আফিষ্ আছে। পূর্ব্বে এই নগরটীই ইচাপুর জেলার সদর ছিল। এই স্থানে এক জন মুসলমান নায়েব থাকিতেন; কিন্তু ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে জেলাটী গাঞ্জামের সহিত সংযুক্ত হয়। ইচাপুরের ৩ তিন ক্রোশ পশ্চিম-দক্ষিণে বিখ্যাত বোদাগিরি পাহাড় শ্রেণী।

ইচামতী।—বাঙ্গলা দেশস্থ পাবনা জেলায় প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। পাবনা সহরের প্রায় ৩।০ সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে দোগাচী গ্রামের নিকট এই নদীটী পদ্মা হইতে বহির্গত হইতেছে। তৎপরে পাবনা সহর উত্তীর্ণ হইয়া নদীটী বক্রভাবে কিছু দূর গিয়া হরসাগর নদীতে পড়িতেছে। বর্ষাকালে ইচামতী নদীর বিস্তার অধিক। তখন ইহা অতি মনোরম দেখায়; কিন্তু বৎসরের মধ্যে ৮ আট মাস ব্যাপিয়া নদী শুষ্ক ও বালুকাময় থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য ১৬ ষোল ক্রোশ।

ইঞ্চাল করাঞ্জি।—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাপুর ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রীয় পলিটিকাল এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে কোলাপুরের অধীন একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। পরিমাণ ১০০॥ এক শত আধ বর্গ ক্রোশ। লোক-সংখ্যা ৫৫৮৪৮। রাজস্ব ২১৪৬৬০৲ টাকা। এই প্রদেশে স্থানে স্থানে লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধান্য, ইক্ষু, তামাক, তুলা ইত্যাদিই কৃষিজাত দ্রব্য। এই রাজ্যে ১৩ তেরটী স্কুল আছে। এখানে মোটা রকমের পশম ও কার্পাস-বস্ত্র অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান রাজা উচ্চ-শ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশীয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহার ভূতপূর্ব্ব রাজা, গোবিন্দ রাও কেশবের অপুত্রক মৃত্যু হওয়ায় ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে নারায়ণ রাও গোবিন্দ পোষ্য পুত্র হইয়াছেন। তিনিই ইহার বর্ত্তমান রাজা। তাঁহার নাবালক অবস্থায় কোলাপুর-রাজ, রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। কোলাপুর-রাজ, এই রাজ্য হইতে বার্ষিক ২০০০৲ দুই হাজার টাকা কর গ্রহণ করেন। রাজার পোষ্য পুত্র গ্রহণের ক্ষমতা নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রই উত্তরাধিকারী হন।

ইঞ্চাল করাঞ্জি।—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীস্থ মহারাষ্ট্র-প্রদেশীয় ইঞ্চাল করাঞ্জি নামক রাজ্যের রাজধানী। অধিবাসীর সংখ্যা ৯১০৭। তন্মধ্যে শতকরা ৪২ হিন্দু, অবশিষ্ট মুসলমান ও অপরাপর বর্ণের লোক।

ইক্তিয়ারপুর।—(অর্থাৎ জাহানাবাদ)—অযোধ্যা-প্রদেশে রায়বেরেলি-জেলাস্থ একটী নগর। ইহা রায়বেরিলি নগরের অতি নিকটেই অবস্থিত। এই নগরটী নবাব জাহান খাঁ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা রায় বেরেলীর মিউনিসিপালটীর অন্তর্ভুক্ত। এখানে রায়-মহল নামক একটী প্রাসাদ এবং অপর ৩ তিনটী সুন্দর অট্টালিকা আছে। গয়্হা নামক

এক প্রকার এতৎ-স্থানীয় সামান্য দেশীয় বস্ত্র এবং বরা নামক এক প্রকার মিষ্টান্নের জন্য নগরটী কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধ।

ইটকুড়ি।—বাঙ্গালা দেশে হাজারিবাগ জেলার কয়লার খনি। মোহনী নদীর তীর-ভূমিতে অবস্থিত। দৈর্ঘ্য ৭॥ সাড়ে সাত ক্রোশ, বিস্তৃতি পৌনে এক ক্রোশ হইবে। এখানকার কয়লা উৎকৃষ্ট জাতীয় নয়। তবে সাধারণতঃ স্থূল কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অত্রত্য কয়লাময় স্থানও অধিক বিস্তৃত নয়। তবে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সহিত পাকা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত থাকায় দূরে পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা আছে। স্থূল গণনায় বোধ হয় ৪॥ কোটী হইতে ৬ কোটী মণ কয়লা পাওয়া যাইতে পারে।

ইটাবা।—পশ্চিমোত্তর-প্রদেশে সাগর জেলার অধীন খুরাই-তসিলস্থ এক এষ্টেট্। সাগর নগর হইতে ২৪ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। গ্রাম-সংখ্যা ৪৪, পরিমাণ-ফল ৩৮॥ বর্গ ক্রোশ। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাষ্ট্রীয়গণ, ইংরেজদিগকে সাগর জেলা প্রদান করেন, তৎকালে মলহব গড় ও কাঞ্জিয়ার পরিবর্ত্তে ৪৬ খানি গ্রাম-সহিত এই সম্পত্তি, রাম ভাউ নামক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতকে জীবন-সত্ত্ব রূপে প্রদত্ত হয়। ইহার তাৎকালিক রাজস্ব ৮৯৬০৲ টাকা। বর্ত্তমান ব্যবস্থানুসারে তালুকদার ১৬ খানি গ্রামে সম্পূর্ণ অধিকার পাইয়াছেন; কিন্তু অবশিষ্ট ২৮ খানি গ্রামে তাঁহার কেবল জমিদারী স্বত্ব। এই সম্পত্তির সর্ব্ব প্রধান গ্রামটীতে (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৫৪০ খানি গৃহ ও ২১৭৭ জন অধিবাসী ছিল।

ইটামুকালা।—(অর্থাৎ খর্জ্জুর স্থান)—মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নেলোর অঙ্গোল তালুকের একটী নগর। (অক্ষান্তর ১৫° ২২′ ৩০″ উত্তর ও দ্রাঘিমান্তর ৮০° ৯′ ১১″ পূর্ব্ব)। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৩০২৮। ইহা সমুদ্র-তীরবর্ত্তী একটী বাণিজ্য-স্থান। জেলার শুল্ক-আদায়ের দ্বিতীয় কেন্দ্র স্থল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ৭০০৲ টাকা, আমদানি দ্রব্যের মূল্য ২০৬০৲ টাকা। অত্রস্থ সামুদ্রিক শুল্কের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের জাহাজ-সংক্রান্ত পত্রাদি দিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং প্রধান আড্ডা কোটাপাণ্টামে আবেদন-বশতঃ বিলম্ব করিবার আবশ্যক হয় না। জাহাজের অবস্থিতি-স্থানও নিরাপদ্।

ইটার্সি।—পশ্চিমোত্তর প্রদেশে হোসাঙ্গাবাদ জেলার একটী নগর। এই স্থান, গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্সুলার রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হইতে কিছুকাল হইল ভূপাল ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। অধিবাসীর সংখ্যা ২১৩৮। তন্মধ্যে হিন্দু ১৮২০, মুসলমান ১৪৭, অসভ্য জাতি ১৬৩, জৈন ৮।

ইণ্ডস্।—আর্য্যাবর্ত্তের একটী সুবৃহৎ নদী। হিন্দুরা ইহাকে সিন্ধু নদ বলিয়া থাকেন। ইহার উৎপত্তি-স্থান এখনও স্থির রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, নদী, কৈলাস পর্ব্বতের উত্তর-ভাগস্থ কোন স্থান হইতে উৎপন্ন। হিন্দুরা বলেন, এই নদ, এক সিংহের মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে। কৈলাস পর্ব্বতের দক্ষিণে

শতদ্রু নদী উৎপন্ন হইয়া ৫০০ পাঁচ শত ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া তৎপরে সিন্ধুতে পড়িতেছে। শতদ্রু, সিন্ধুর এক উপনদী। সিন্ধু নদ অক্ষান্তর ৩২° উত্তর ও দ্রাঘিমান্তর ৮১° পূর্ব্বে বহির্গত হইয়া পঞ্জাব দেশের মধ্য দিয়া সিন্ধু দেশে প্রবেশ করিতেছে ও তৎপরে আরব সাগরে পড়িতেছে। সিন্ধু নদের দৈর্ঘ্য ৯০০ নয় শত ক্রোশেরও অধিক হইবে এই নদ, ১৮৬৩৫০ বর্গ ক্রোশ-পরিমিত ভূমি-ভাগের জল, প্রবাহিত করে। এই নদ-তীরস্থ ব্রিটিস্ রাজ্যের নগরগুলির মধ্যে করাচি, কোট্রি, হায়দ্রাবাদ, সেহোয়ান, সাখর, রোহ্রি, মিথাঙ্কোট, দেরাগাজি খাঁ, দেরাইস্মাইল খাঁ, কালাবাগ ও আটক—এইগুলি সর্ব্বপ্রধান।

ইণ্ডসের প্রথম ভাগ, ব্রিটিস্ রাজ্যের বহির্ভূত। তিব্বত দেশে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে মানস সরোবরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে বহির্গত হইয়া সিংহ কাবাব নামে প্রায় ৮০ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে প্রবাহিত হইয়াছে। পরে স্বার নদীর সহিত মিলিত হইয়া কাশ্মীর দেশে প্রবেশ করিয়া, "লে" নগর পর্য্যন্ত গিয়া তথায় জান্সকার নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। যে স্থান হইতে ইণ্ডস্ নদী বহির্গত হইতেছে, তথাকার উচ্চতা সমুদ্র তল হইতে ১০৬৬৬ হাত। কাশ্মীর দেশে এবং "লে" নগরেও ইহার উচ্চতা যথাক্রমে ৯৩৩২ হাত এবং ৭৫১৮ হাত। এই নদী, অধিত্যকা এবং গিরি পথের মধ্য দিয়া মহাবেগে প্রধাবিত। নিম্ন এবং সমতল ভাগেও ইহার বেগ সামান্য নয়। গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে নদীতে অতি অল্প জল থাকে এবং শোনা যায়, পদচারণে পার হওয়া যায়। কিন্তু দিবাভাগে পর্ব্বতীয় ঊর্দ্ধ ভূমিতে তুষার-ক্ষরণ-বশতঃ নদীর বেগ ও জল, এরূপ অধিক হয় যে, কাহার সাধ্য তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করে! ইহা "লে" নগরের আরও কিছু দূর পশ্চিমোত্তরে গিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার কিছু পরে গিল্‌গিট নদী ইহার সহিত মিলিত হইতেছে। তৎপরে পশ্চিম-দক্ষিণ মুখে কোহিস্থানের মধ্য দিয়া দারবেণ্ডের নিকট পঞ্জাবে প্রবেশ করিতেছে।

উৎপত্তি-স্থান হইতে ৪০৬ ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া ইহা যে স্থানে পঞ্জাবে প্রবিষ্ট হইতেছে, তথায় ইহার বিস্তার, বর্ষাকালে প্রায় ২০০ হস্ত; কিন্তু গভীরতা সেরূপ অধিক নয়। নৌকা বা পান্সি করিয়া তখন ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। শীতকালে অনেক স্থানে পদচারণে গমনাগমন করা যায়; কিন্তু অতর্কিত ভাবে মহাবেগে মধ্যে মধ্যে স্রোতঃ আসিয়া পড়ে। প্রবাদ আছে, এই রূপে সুপ্রসিদ্ধ রণজিৎ সিঙ্, একবার ৭০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য হারাইয়াছিলেন। উপবিস্থিত বৃহৎ ও গুরুভার নৌকা সকল মধ্যে মধ্যে মহাবেগে বহুদূরে প্রেরিত হয়। রাউলপিণ্ডি-জেলা-স্থিত আটক নগরের কিছু উপরে আফগানিস্থান-বাহিনী কাবুল নদী ইহার সহিত মিলিত। উভয় নদীরই জল ও বেগ, সমান-রূপ। বর্ষাকালে নদী-দ্বয়ের সংযোগ-স্থান বহুদূর পর্য্যন্ত জল রাশি পরিব্যাপ্ত হয়। উহা দেখিতে অতি সুন্দর। কাবুল নদীতে এই সংযোগ-স্থান হইতে ২০ কুড়ি ক্রোশ পর্য্যন্ত জাহাজাদি গতায়াত করিতে পারে; কিন্তু উচ্চতা-বশতঃ সিন্ধু-নদে তাহা হইতে পারে না।

সিন্ধু-নদে আটক নগর পর্য্যন্ত জাহাজাদি গমনাগমন করে। সিন্ধু-তীরস্থ ভারতের তাবৎ নগর-গুলির মধ্যে আটকই সর্ব্ব-প্রধান। এই নগরটী, যেন সিন্ধু-নদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই স্থান হইতে সিন্ধুর উৎপত্তি স্থান ৪৩০ ক্রোশ এবং সাগর-সঙ্গম স্থান ৪৭০ ক্রোশ। এই নগরে নদীর উচ্চতা, সমুদ্র-তল হইতে ২০৭৯-৬৯৩ গজ। বর্ষাকালে এই স্থানে নদীর বেগ, প্রতি ঘণ্টায় ৬ ক্রোশ এবং শীতকালে ২॥০ আড়াই ক্রোশ হইতে ৩॥০ সাড়ে তিন ক্রোশ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ প্রতিদিন জোয়ারের উচ্চতা ৫ ফিট পর্য্যন্ত। শীতকালে সর্ব্বোচ্চ জোয়ার উচ্চতা অপেক্ষা ৫০ ফিট উচ্চতর। এই স্থানে নদীর বিস্তার, সকল সময়ে সমান নয়। কোন সময়ে উহা ২০০ হস্তেরও কম, কখন বা ৫০০ পাঁচ শত হস্তেরও অধিক। আটকে সিন্ধুর উপরে নৌকা-নির্ম্মিত একটী সেতু আছে। পেশোয়ার যাইতে ট্রঙ্ক রোড (Trunk road) অর্থাৎ প্রশস্ত পথটী, আটক নগরেই সিন্ধু নদের উপর দিয়া গিয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু নদের উপরে রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণ হওয়ায় পেশোয়ার, কলিকাতা ও বোম্বাই পরস্পর রেলওয়ে দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত সেতু হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। আটক হইতে সিন্ধু-নদ, পঞ্জাবের পশ্চিম ভাগ দিয়া সোলেমান পাহাড় শ্রেণী হইতে সমতল ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। সিন্ধু হইতে বান্নু-গামী পথ, বহু যোজন ব্যাপিয়া ইহার পশ্চিম তীর দিয়া চলিয়াছে। পূর্ব্ব তীরে পূর্ব্বোক্ত পথের সমান্তরাল ভাবে মুলতান হইতে রাউলপিণ্ডি যাইবার পথ। পরে সিন্ধু-নদ, দেরা ইসমেল খাঁ ও দেরা গাজি খাঁ নামক জেলা-দ্বয়ের মধ্যস্থল ভেদ করিয়াছে। এই স্থানে ইহার পূর্ব্ব দিকে সিন্ধু-নদে দোয়াব অবস্থিত। দেরা গাজি খাঁ জেলার দক্ষিণে মিথন কোটের উপরে সিন্ধু নদ; পঞ্চ নদীর জলে সংমিলিত। সিন্ধু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থলে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নামক এই পাঁচ নদী প্রবাহিত। এই নদী পাঁচটী হইতে তৎস্থানের নাম পঞ্জাব হইয়াছে। "পঞ্চ" ও "অপ্" এই মূল হইতে পঞ্জাব শব্দ উৎপন্ন। পঞ্চ অর্থাৎ পাঁচ; অপ্—অর্থে জল। নদী গুলি নানা স্থানে মিলিত হইয়া পরে পঞ্চনদ নামে একটী বৃহৎ নদীর সৃষ্টি করিতেছে। এই পঞ্চনদ নদী পঞ্জাব ও বাহবল পুর রাজ্যের মধ্যসীমা রূপে কিছু দূর প্রবাহিত হইয়া মিথন কোটে সিন্ধুর সহিত মিলিত হইতেছে। এই সংযোগ স্থান হইতে সিন্ধুর সাগর সঙ্গম, প্রায় ২৪৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। পঞ্চনদের সহিত মিলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সিন্ধুর বিস্তার ১২০০ হস্ত, উহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ২॥০ আড়াই ক্রোশ এবং গভীরতা ৮।৯ হস্ত। এই স্থানে পঞ্চনদের বিস্তার ২১৫২ হস্ত, বেগ ঘণ্টায় এক ক্রোশ গভীরতা ৮।৯ হস্ত। নদীদ্বয় মিলিত হইয়া সিন্ধু নামে আখ্যাত হয় এবং সংযোগ স্থান হইতে ইহার বিস্তৃতি, সময়ানু-সারে অর্দ্ধ ক্রোশ হইতে কয়েক ক্রোশও হইয়া থাকে।

পঞ্জাবে সিন্ধু নদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপূর্ণ; কিন্তু ইহার তীর দেখিতে বড়ই মনোহর। বক্কুরের নিকটস্থ তীরে খর্জ্জুর, দাড়িম্ব প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

মিথন কোটে সিন্ধুর উচ্চতা সমুদ্র তল হইতে ১৭২ হস্ত। মিথন কোট হইতে কিছু দূর পঞ্জাবের সীমা-স্বরূপ প্রবাহিত হইয়া কাশ্মীর নগরের নিকট সিন্ধু দেশে প্রবেশ করিতেছে। সিন্ধু দেশের সিন্ধু তীরস্থ নগর নিচয়ের মধ্যে কাশ্মীরই সর্ব্বোত্তরাংশে স্থিত। সিন্ধু দেশস্থ বক্কুরের পরবর্ত্তী সিন্ধু নদ, নিম্নতর সিন্ধু নামে উল্লিখিত; কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা ইহাকে দেড়িয়া (Daryah) বলে। তৎপরে নদটী পশ্চিম দক্ষিণ মুখে ২৯০ দুই শত নব্বই ক্রোশ প্রবাহিত হইয়া শেষে বহুমুখে আরব সাগরে পড়িতেছে। সিন্ধু দেশে ইহার বিস্তার ৯৬৯ নয় শত ষাটি হইতে ৩২০০ তিন হাজার দুই শত হস্ত পরিমিত। তবে শীতকালে কিছু অল্পতর হয়, বর্ষাকালে কোন কোনও স্থানে অর্দ্ধ ক্রোশাধিক হইয়া থাকে। গভীরতা স্থান বিশেষে ৩ তিন হস্ত হইতে ১৬ ষোল হস্ত পর্য্যন্ত। এস্থানে নদীর বেগ, বৃদ্ধির সময় ঘণ্টায় ৪ চারি ক্রোশ এবং অন্য সময়ে ২ দুই ক্রোশ। জলের উষ্ণতা বায়ুর উষ্ণতা অপেক্ষা ১০° ডিগ্রী ফারেনহিট কম।

সিন্ধু নদের বদ্বীপের পরিমাণ ১৫০০ বর্গ ক্রোশ এবং সমুদ্র তীরস্থ বিস্তার ৬২৷৷০ ক্রোশ। এই স্থান প্রায় সমতল; কিন্তু বিলক্ষণ উর্ব্বর। তবে প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে এবং জলাভাগে তৃণাদিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। সাবন্দর জেলায় পর্য্যপ্ত লবণ পাওয়া যায়। "ব"-দ্বীপের জল-বায়ু শীতল; কিন্তু শীতকালে অতিরিক্ত শীত এবং গ্রীষ্মকালে উত্তাপ অতি অধিক। স্থানটী বর্ষাকালে অস্বাস্থকর হইয়া উঠে! ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু নদ "ব"দ্বীপের উপরে বাঘিয়ার ও সীতা নামে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে সেরূপ আর নাই। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খেদেবারি নামক মোহানা বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান ছিল, কিন্তু উক্ত খৃষ্টাব্দে উহা ভূমিকম্পে বদ্ধ হইয়া যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কাকেবারি মোহানা বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত হইল; কিন্তু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাহাও বদ্ধ হইল। বর্ত্তমান সময়ে হাজাম্রই, জাহাজাদি গমনের প্রধান স্থান। ইহার পূর্ব্ব দিকে ৬৩ তেষট্টি হস্ত উচ্চ একটী আলোক গৃহ আছে।

সিন্ধু-নদ অনবরতই তীর ভাঙ্গিয়া প্রবাহ স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত :—১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ঘোড়া বাড়ী, নদী তীরস্থ "ব"দ্বীপের অন্তর্গত প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল কিন্তু ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নদী, স্থান পরিবর্ত্তন করিল তখন তীরে কেটী নামক একটী নগর স্থাপিত হয়, কয়েক বৎসরের মধ্যে এই কেটীও জল গর্ভস্থ হওয়ায় অপর একটী নগর কেটী নামে কিয়দ্দূরে স্থাপিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে নদী গর্ভস্থ পাহাড় শ্রেণী জাহাজ যাতায়াতের অতিশয় প্রতিবন্ধক। কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহারা তীর হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী থাকে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ধারেজা অরণ্যের বহু পরিমাণ স্থান একেবারে জলসাৎ হইয়া গেল। বদ্বীপের নিকটে কতকগুলি পথিক, প্রতি মিনিটে শব্দানুসারে ১৩টী মৃত্তিকাস্তূপের পতন গণনা করিয়াছিলেন। ইহাতেই সিন্ধু-নদের তীর-ভঙ্গ কার্য্য কতকটা বুদ্ধিগম্য হইয়া থাকে। স্থান বিশেষে এক প্রকার দৃঢ়-তৃণের (Elephant grass) শিকড়, মৃত্তিকা মধ্যে বহুদূরগামী হওয়ায়, তীর ভূমি কিছুকাল রক্ষিত হয়।

সিন্ধু নদের জল, ফাল্গুন মাসের শেষ হইতে বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করে। ভাদ্র মাসে সর্ব্বাধিক গভীরতা ও বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয় এবং অশ্বিন মাস হইতে কমিতে থাকে।

সিন্ধু নদে অপর্য্যাপ্ত মৎস্য জন্মে। গঙ্গা নদীর ইল্‌সা মৎস্যের ন্যায় পাল নামে এক প্রকার মৎস্যের এখানে বাহুল্য। এই মৎস্যের অধিক রপ্তানি হয়। জল-সর্প, কুম্ভীর, কচ্ছপ ইত্যাদিরও অভাব নাই। আটক নগর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সিন্ধু-নদের তীরবর্ত্তী ইংরেজাধিকৃত স্থানে বৃষ্টিপাত অত্যল্প-পরিমাণেই হয়। এই জন্য মিসর দেশের ন্যায় এখানেও কৃষি-কার্য্য, প্রধানতঃ কৃত্রিম উপায়ে সম্পাদিত হয়। কিন্তু সিন্ধু-নদে নীল-নদীর ন্যায় কোন সদুপায় করিবার সুবিধা নাই। প্রথমতঃ, নিয়তই ইহার তীর ভগ্ন হইতেছে। তৎপরে হিমালয় হইতে দ্রবীভূত তুষার, মধ্যে মধ্যে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে কৃষকেরা, নানারূপ সেতু, পয়ঃ-প্রণালী প্রভৃতি দ্বারা প্লাবনের জল, বহু-দূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত করে। কোন কোন জল-প্রণালী, নদী-তীর হইতে ১৫।২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ। এগুলি, প্রাচীন হিন্দু-রাজাদিগের সমসাময়িক; কিন্তু ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারগণ, আজ পর্য্যন্ত সিন্ধু-নদে গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় কৃষি-কার্য্যের কোন রূপ উত্তম উপায় করেন নাই। বর্ত্তমান জল-প্রণালী-নিচয়, সাময়িক প্লাবনিক প্রণালী (Intermittent inundation canals) এই সাধারণ নামে আখ্যাত। ইহার অর্থ এই যে, যৎকালে বন্যার জল, প্রণালীর উর্দ্ধে উঠে, তখনই উক্ত পয়ঃ-প্রণালীগুলি দূরে জল প্রধাবিত করে। অন্য সময়ে তাহা করিবার শক্তি ইহাদের নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে একটী ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। তৎপরে ১৮৪১ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দুইটী প্রসিদ্ধ বন্যা হইয়াছিল।

সিন্ধু-নদের যে স্থান, সর্ব্বদাই জলপূর্ণ থাকে, সেই সেই স্থান হইতে সমস্ত-দেশব্যাপিনী কতকগুলি পয়ঃ-প্রণালী খনন করা আবশ্যক। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৩১॥ ক্রোশ দীর্ঘ ঐরূপ একটী পয়ঃ-প্রণালী গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হওয়ায়, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উহা কার্য্যে পরিণত হয়। এক্ষণে ইহা সুক্কুর খাল (Sukkur Canal) নামে অভিহিত। কিছু দিন হইল, কাশ্মীরের নিকট হইতে যে একটী বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দ্বারা সিন্ধু নদ হইতে বেগারি জল-প্রণালীতে জল বাহিত হইতেছে। এই বাঁধে অত্রত্য অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। সিন্ধু নদ ও সোলেমান পাহাড়ের মধ্য-স্থল-বর্ত্তী দেরাজাত জেলায় কৃত্রিম উপায়ে সিন্ধু হইতে জল পাওয়া যায়। এই স্থানে খালের মোট দৈর্ঘ্য ৩০৪ ক্রোশ। তন্মধ্যে ৫৪ ক্রোশ, ব্রিটিস রাজত্ব-কালে নির্ম্মিত। বাহবলপুর-রাজ্যে এবং মজঃফরগড় জেলায় সিন্ধু নদ ও ইহার দুইটী শাখা হইতে জল পাওয়ায়, কৃষি-কার্য্যের সুবিধা হয়। সিন্ধু দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী জল-প্রণালীই প্রধান। যথা—পশ্চিম তীরে সুক্কুর, সিন্ধু, ঘার, বেগারি। পশ্চিমে—নারা। পূর্ব্ব তীরে—পূর্ব্ব-নারা ও ফুলেলি।

বাণিজ্য-বিষয়ে সিন্ধু নদ তদ্রূপ সুবিধা-জনক নয়। পঞ্জাব ও সিন্ধু-জয়ের পূর্ব্বে ইংরেজেরা, ইহা দ্বারা মধ্য আসিয়ার রত্ন-রাশি সমুদ্রে আনিবার আশা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে, নির্বিপদ্ ও বেগবান্ বাষ্পীয় শকটের সহিত সমকক্ষতা করিতে ভারতীয় কোন নদ নদীই সমর্থ নহে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডস্ ভ্যালি ষ্টেট রেলওয়ে খোলা হইবার পর হইতে সিন্ধুর বাণিজ্য, অনেক পরিমাণে হ্রস্ব হইয়াছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু নদে প্রথম একখানি ষ্টীমার চলিতে থাকে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের অধীন ১০ খানি ষ্টীমার, সিন্ধু-নদে যাতায়াত করিত। কোট্রি নগরই, ষ্টীমারের কর্তৃপক্ষের সদর স্থান ছিল। কিন্তু লাভ না হইয়া ক্ষতি হওয়ায়, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উহা বন্দ হইল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একটী নূতন কোম্পানী কর্তৃক আবার কতকগুলি ষ্টীমার নির্মিত হইল। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাহা সিন্ধু রেলওয়ের সহিত সম্মিলিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু নদে ষ্টীমারের সংখ্যা ১৪ খানি হয়। ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে ষ্টীমার গতায়াত রহিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ওরিএণ্টাল ইন্‌লাণ্ড ষ্টীম্ কোম্পানিও, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে চলিতে আরম্ভ করে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদের ৩ খানি ষ্টীমারের গতি-বিধির সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু ষ্টীমারের গতির পক্ষে সিন্ধু নদের বেগ, বিঘ্নকারী হওয়ায়, উক্ত কোম্পানি, অবশেষে কার্য্য বন্ধ করেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দীয় ১ আইন অনুসারে নদী-বাহিনী নৌকা-রাজি, এক জন রেজিষ্ট্রার কর্তৃক রেজিষ্টারি হয়। উহাদের নিকট কিছু করও আদায় হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বাণিজ্য কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেই ব্যয়িত হইয়া যাইত—কিছুই উদ্বৃত থাকিত না।

সিন্ধু নদে চারি প্রকার নৌকা চলে। পণ্য-দ্রব্যের দুই প্রকার, পারাপারের এক প্রকার এবং মৎস্য ধরিবার এক প্রকার—এই চারি প্রকার।

ইদার।—ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে গুজরাটস্থ কাটিওয়ারের অন্তর্গত মহীকান্ত এজেন্সীর অধীন সর্ব্বপ্রধান রাজপুত-রাজ্য। ইহার উত্তরে সিরোহী এবং উদয়-পুর রাজ্য, পূর্ব্বে ডুঙ্গারপুর, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং বরদা রাজ্য। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃঃ) ২৫৮৪২৯। রাজস্ব স্থূলতঃ ৫২৪৪৪০৲ টাকা। পরিমাণ-ফল প্রায় ২৪৮৩ বর্গ ক্রোশ।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।—ভূমি সাধারণতঃ উর্ব্বরা। মেহুয়া, আম্র, খির্ণী এবং অন্যান্য বৃক্ষ, প্রচুর পরিমাণে জন্মে। উত্তর দিকের পর্ব্বত-নিকটস্থ জঙ্গল সকল অতিশয় নিবিড়। ধান্য, তিসি, মসিনা এবং ইক্ষু এখানকার কৃষিজাত প্রধান দ্রব্য। কিয়ৎ-পরিমিত এদেশীয় সাবানই অত্রত্য শিল্প দ্রব্য। এখানে অট্টালিকাদি-নির্ম্মাণে প্রস্তর ব্যবহৃত হয়।

এস্থানের অধিকাংশ অধিবাসী কোলি হইলেও—ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেনিয়া (বণিক্) এবং কুম্বিও অনেক বাস করে। আধুনিক রাজ-বংশ, অতি প্রাচীন রাজপুত-কুল হইতে উৎপন্ন; কিন্তু তাঁহারা অল্প কাল ইদারে আগমন করিয়াছেন। পরম্পরায় শোনা যায়, ইদারের পূর্ব্বতন রাজারা, ভাল্‌সুর-কোলি-বংশীয় ছিল। উক্ত-বংশীয় শেষ রাজা সাম্বলা, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরায়ণ এবং অত্যাচারী হওয়ায় মন্ত্রিগণ, তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া সাহায্যার্থে সিমাত্রা হইতে সনঙ্ রায়কে আহ্বান করেন। এই সনঙ্ রায়ই, এখানকার রাজা হন।

ইঁহারই বংশধরগণ, দ্বাদশ পুরুষ এই স্থানে রাজ্য করেন। পরে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মুরাদ-বক্স-নামক এক মুসলমান সেনানী, তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিয়া এই প্রদেশকে গুজরাটের অধীন করেন। তৎপরে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে যোধপুর-রাজ্য হইতে আনন্দসিংঙ্ এবং রায়সিংঙ্ নামক দুই জন আসিয়া পুনরায় এই স্থানে হিন্দু-রাজ্য স্থাপন করেন।

ইঁহাদের অন্যতম বংশধর শিব সিঙের রাজত্ব-কালে মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া, এই রাজ্যের অনেক অংশ কাড়িয়া লন; গুইকোয়ারও অবশিষ্ট অংশ হইতে বাৎসরিক কর আদায় আরম্ভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই রাজ-বংশে নানাবিধ পারিবারিক কলহ হয়। এই বংশীয় মহারাজ জোয়ান সিঙ কে সি আই, ই বোম্বায়ের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কেশরী সিঙ্, সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনিই এখানকার বর্ত্তমান মহারাজ। ইনি ইন্দোরস্থ রাজকুমার-কালেজে শিক্ষিত। ইনি প্রথম শ্রেণীর রাজ-ক্ষমতা পরিচালনা করেন। ফাঁসী দিবার ক্ষমতাও ইঁহার আছে। সম্মানার্থ ইনি ১৫টী তোপ প্রাপ্ত হন। ইঁহার পোষ্যপুত্র লইবার অধিকার আছে। ইনি এখনও গুই-কোয়ারকে বাৎসবিক ৩০৩৪০৲ টাকা কর দিতেছেন। এই রাজ্যে বংশানুক্রমিক সর্দ্দারগণ, যুদ্ধের সময় সাহায্য করিবেন বলিয়া নিষ্কর জমি ভোগ করেন। এই জন্য প্রায় ৫৬৮ অশ্ব-সৈন্য এবং এতৎ-সম-সংখ্যক পদাতিক সৈন্যও আছে। কিন্তু সকলেই যুদ্ধ-বিদ্যায় অশিক্ষিত। রাজ্যে ২২টী ফৌজদারী আদালত আছে। পুলিশের বন্দোবস্তও একরূপ মন্দ নয়। ২৩ তেইশটী বালক-বিদ্যালয়, এবং দুইটী বালিকা বিদ্যালয়ও আছে। এই রাজ্যেব প্রধান নগব ইদাব, আহম্মদ নগর হইতে ৩৭ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে (অক্ষান্তর ২৩° ৫০′ উত্তবে, দ্রাঘিমান্তর ৭৩° ৪′ পূর্ব্বে) অবস্থিত। এই নগরকে ইলদুর্গও বলে। অধিবাসীব সংখ্যা (১৮৮১ খৃঃ) ৬২২৩। এখানে একটী চিকিৎসালয় ও পোষ্টাফিস্ আছে। রাস্তায় আলোক দিবার ব্যবস্থারও অপ্রতুল নাই।

(১) ইনহৌনা।—অযোধ্যা প্রদেশে, রায়-বেরেলি জেলাস্থিত দিগ্বিজয়গঞ্জ তসিলের একটী পরগণা। ইহার উত্তর দিকে বড়-বাঁকি জেলার হায়দরগড় ও সুবেহা পরগণাদ্বয়, পূর্ব্ব-দিকে সুলতানপুর জেলার অন্তর্গত জগদীশপুর পরগণা এবং দক্ষিণ দিকে রায়-বেরেলি জেলার সিমৌটা ও মোহনগঞ্জ পরগণা-দ্বয়। পূর্ব্বে ভারেরাই, এখানকার অধিপতি ছিলেন। পরে সৈয়দ সালার মসায়ুদের এক জন সেনাপতি, ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া দুর্গ অধিকার করেন; কিন্তু তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। অবশেষে বিনার সা নামক এক ব্যক্তি, পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া ভারগণকে ও ধোবিদিগকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত প্রদেশ অধিকার-ভুক্ত করিলেন। পরগণার পরিমাণ-ফল ৫০ পঞ্চাশ বর্গ ক্রোশ। গবর্ণমেণ্ট-রাজস্ব ৬৬৩৯০৲ টাকা। পরগণায় ৭৭টী গ্রাম। তন্মধ্যে ১২ খানি জমিদারী, তালুকদারী ও পাট্টাদারী-রূপে গৃহীত। অধিবাসীর সংখ্যা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ৫১৮১৮ ব্যক্তি। তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগ, মুসলমানের ৫ পাঁচ গুণ অধিক।

(২) ইন্হৌনা।—অযোধ্যার অন্তঃপাতী রায়-বেরেলি জেলার একটী নগর। লক্ষ্ণৌ হইতে সুলতানপুর যাইবার পথের মধ্য-স্থলে, রায়-বেরেলি নগর হইতে ১৫ পনের ক্রোশ দূরে (অক্ষান্তর ২৬° ৩২′ উত্তরে ও দ্রাঘিমান্তর ৪১° ৩২′ পূর্ব্বে) অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগরই, তসিলের প্রধান স্থান ছিল। এখানে একটী থানা থাকিত। কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার জেলা সকলের পুনর্বন্দোবস্ত হইলে, এখান হইতে থানা উঠিয়া যায়। সেই অবধি ইহার বাণিজ্যাদি ক্রমশঃই খর্ব্ব হইতেছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অধিবাসীর সংখ্যা ৩০২৭ জন। নগরে একটী বিদ্যালয় ও রেতন্‌গঞ্জ নামে একটী বাজার আছে।

(১) ইন্দপুর।—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীস্থ পুনা জেলার মহকুমা। ইহার পরিমাণ ফল, ২৩৮॥ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৪৮১১৪। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা, মুসলমানের ২৪।২৫ গুণ। এই মহকুমায় ১ একটী দেওয়ানী ও ২ দুইটী ফৌজদারী আদালত এবং ১ একটী পুলিশ থানা আছে। গ্রাম-সংখ্যা ৮৬।

(২) ইন্দপুর।—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুনা জেলার ইন্দপুর মহকুমার প্রধান নগর। পুনা নগরের ৪২ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৫৫৮৮। মিউনিসিপলিটির বার্ষিক আদায় (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ১৮৫০৲ টাকা। এখানে একটী হাট আছে। সাত দিন অন্তর তথায় ক্রয়-বিক্রয় হয়। প্রতি বর্ষে অগ্রহায়ণ মাসে এই স্থানে মুসলমানদিগের একটী মেলা হয়। সদরে একটী পোষ্টাফিস্ ও ডিস্পেনসারী আছে। নিকৃষ্ট রকমের এতদঞ্চলীয় বস্ত্রের জন্য এই সহর বিখ্যাত।

ইন্দরপৎ।—পঞ্জাব প্রদেশস্থ দিল্লি জেলার একটী গ্রাম। ইহা প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের সীমার মধ্যে বর্ত্তমান দিল্লি নগরের অতি সন্নিকটে (অক্ষান্তর ২৮° ৩৬′ ৩০″ উত্তরে, দ্রাঘিমান্তর ৭৭° ১৭′ ৩০″ পূর্ব্বে) অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রপ্রস্থ নগর, যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। নদী, এক্ষণে পূর্ব্ব-স্থান হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে অপসৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার প্রাচীন-প্রবাহ-স্থান-নির্ণয় এখনও দুষ্কর নয়। মহাভারতোক্ত মহা-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজধানীর কোন-রূপ ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইন্দরপৎ গ্রাম, তাহারই উপর অবস্থিত আছে। গ্রামের বর্ত্তমান ইন্দরপৎ নামও, প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ নামের অপভ্রংশ।

প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ নগর, সম্ভবতঃ ১৫০০ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে আর্য্যবীরগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হয়। কিরূপে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, গঙ্গাতীরস্থ হস্তিনাপুর নগর হইতে সসৈন্য বহির্গত হইয়া অসভ্য নাগদিগকে দূরীভূত করেন এবং এই স্থানে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, তাহা মহাভারতে সবিস্তর বর্ণিত আছে।

ইন্দোর।—মধ্য-ভারতে মালব-প্রদেশস্থ একটী রাজ্য। হোলকার, গবর্ণর জেনারালের মধ্য-ভারতীয় এজেন্টের তত্ত্বাবধানে ইহার রাজকীয় কার্য্য পরিচালিত হয়। ইহার রাজধানী ইন্দোর নগর। ঐ নাম হইতেই সমস্ত প্রদেশের নাম ইন্দোর হইয়াছে।

পরিমাণ-ফল ৪২০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃঃ) ১০৫৪২৩৭। মহারাজের রাজস্ব (১৮৮১ খৃঃ) ৭০৭৪৪০০৲ টাকা। এই রাজ্য, অনেক-গুলি অসংযুক্ত ক্ষুদ্র প্রদেশের সমষ্টি। কিন্তু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহাকে একটী সুসংশ্লিষ্ট রাজ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দাক্ষিণাত্য এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিস্থ আহমদাবাদ-নগর, জেলার অধীন ভূমির বিনিময়ে ইংরেজদিগের নিকট হইতে নর্ম্মদা-তীরস্থ বাবোয়াই, ধুবগাও, খত্রবার ও মাণ্ডেসর পরগণাগুলি এবং নিমাবারস্থ ভূমি সকল গৃহীত হইয়াছে। তৎসঙ্গে ইন্দোর নগরের বর্ত্তমান অবস্থিতি-স্থানও গৃহীত হইয়াছে। এই প্রদেশের মধ্যে একটী ব্রিটিস্ সেনানিবেশ স্থাপিত আছে। ইহার উত্তরে সিন্ধিয়া রাজ্য, পূর্ব্বে দেওয়াস্ এবং থার নামক রাজ্য-দ্বয় এবং নিমার জেলা, দক্ষিণে বোম্বাই প্রেসি-ডেন্সীস্থ খান্দেশ জেলা এবং পশ্চিমে বারোয়াণি এবং ধার। অক্ষান্তর ২১° ২৪′ ও ৩৪° ১৪′ উত্তরে এবং দ্রাঘিমান্তব ৭৪° ২৮′ ও ৭৭° ১০′ পূর্ব্ব মধ্যে ইহা অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য, দক্ষিণোত্তর দিকে প্রায় ৬০ যাটি ক্রোশ, বিস্তার ৪১ এক চল্লিশ ক্রোশ। নর্ম্মদা নদী, ইহাকে প্রায় সমভাবে দ্বিখণ্ড করিতেছে।

এতদ্ব্যতীত হোলকারের অপর একটী রাজ্য-খণ্ড, ইন্দোরের উত্তরে (অক্ষান্তর ২৪° ৩′ ও ২৪° ৪০′ উত্তরে এবং দ্রাঘিমান্তর ৭৫° ৬′ ও ৭৬° ১২′ পূর্ব্ব-মধ্যে) অবস্থিত। রামপুর, ভানপুর ও চান্দবার ইহার প্রধান নগর। এই খণ্ডের দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩৫ পঁয়ত্রিশ ক্রোশ এবং বিস্তৃতি, ২০ কুড়ি ক্রোশ। ইন্দোরের উত্তরে অপর এক খণ্ডের প্রধান নগর মেহিদপুর। অক্ষান্তর ২৩° ২৯′ উত্তর, দ্রাঘিমান্তব ৭৫° ৪২′ পূর্ব্ব। ইন্দোরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত চতুর্থ খণ্ডের প্রধান নগর ধিই। অক্ষান্তর ২২° ১০′ উত্তর, ৭৪° ৩৯′ পূর্ব্ব। মালব-প্রদেশস্থ অপর অনেকগুলি ক্ষুদ্র ভূমি-খণ্ড ব্যতীত হোলকার-রাজের আরও অন্যূন ১৬০ খানি জন-পূর্ণ খাস গ্রাম আছে। এই গ্রামগুলি হইতে মহারাজের বার্ষিক আয় (১৮৮১ খৃষ্টাব্দ) ৪৬০২০০৲ টাকা।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।—এই রাজ্যের উত্তরাংশে সাম্বল নদী ও তাহার শাখা নদী সকল এবং দক্ষিণাংশে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত। বিন্ধ্য-গিরি, পূর্ব্ব-পশ্চিমে দক্ষিণাংশের মধ্য-স্থলে দণ্ডায়মান। সাতপুর পর্ব্বত, ইহার উত্তর সীমায় অবস্থিত। সুগভীর নর্ম্মদা নদীর দুই তীর, স্বভাবতঃই প্রস্তরময়। বর্ষাকালে এই নদী, মহাবেগে প্রবাহিত হয়। নর্ম্মদার উপকূল হইতে রাজ্যের মধ্য দেশে ঊর্দ্ধ পথে যাইতে হয় এবং কোন কোন স্থানে অতি উচ্চে উঠিতে হয়। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পার্শ্বে রেল রোড্‌কে ৪০০ হস্ত উপরে উঠিতে হইয়াছে। রাজ্যের মধ্য-স্থিত মাণ্ডোসার অধিত্যকা, সমুদ্র-তল হইতে ৪০০—৪৭৫ হস্ত ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই স্থান, বন্ধুর ও জঙ্গল-পূর্ণ। সমতল ভূমিতেও অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়। মালবের অপরাংশের ন্যায় ইন্দোরের ভূমিও—উর্ব্বরা। পাহাড়ে বেষ্টিত থাকায় সমুদয় জল, দেশ হইতে বহির্গত হইতে পায় না। অতএব বৃষ্টির উচ্চতা ২ দুই হস্ত হইলেই এখানে যথেষ্ট হইল। গম, ধান্য, তুলা, ইক্ষু, তিসি ও মসিনা এখানকার কৃষি-জাত প্রধান

দ্রব্য। এখানে পোস্তা-দানার চাসও প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। অতি উৎকৃষ্ট তামাকও বহুল জন্মে। লাক্ষার উৎপাদনেও লোকের মনোযোগ আছে। বন্য জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র, চিতা-বাঘ, হায়েনা, শৃগাল, নীলগাই ও বন্য বিড়ালই প্রধান। কাটকুট অরণ্যে এবং অন্যান্য বনে বাইজন এবং সাতপুরা পাহাড়ে বন্য মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়। কুম্ভীর এবং বিষময় সর্পও তথায় বহু।

প্রথমে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার লোক-গণনার রীতিমত চেষ্টা হয়। ইহার পূর্ব্বে যে লোক-গণনা হইত, তাহা ঠিক হইত না। অধিবাসীর মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরাই এখানকার সর্ব্ব-প্রধান। অন্যান্য হিন্দু জাতি, সামান্য মুসলমান এবং অনেকগুলি গণ্ড ও ভীল-জাতীয় অসভ্যও এখানে বাস করে। এই অসভ্য লোক ব্যতীত অপর সমস্ত ইন্দোর-বাসীরাই প্রায় কৃষি-জীবী। রাজ্যের বহিঃস্থ উত্তর-ভারত, পঞ্জাব, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে মাহারাজের সৈন্য সংগৃহীত হয়। বিন্ধ্য পর্ব্বতে ও সাতপুরাদ্রিতে অনেক ভীল বাস করে। এখানে ইহারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই রহিয়াছে। ভীলগণ, বন্য ফল মুল, মৃগয়া-লব্ধ জীবে এবং সভ্যগণ, নগরাদির লুণ্ঠিত বস্তুতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা ভারতের এক অসভ্যতম জাতি। কিছু দিন হইল, ইহারা অপেক্ষাকৃত সভ্যাবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে। তাহাদের অনেকেই পুলিস কনষ্টেবল ও সেনার কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। তাহারা এইরূপ কার্য্যে বিশ্বস্ততা এবং উপযোগিতাও দেখাইতেছে। ব্রিটিস্ সৈন্য মধ্যে 'মালবের ভীল সৈন্যদল' ৫২৭ জন ভীল দ্বারা সংগঠিত। উক্ত সেনা-পুঞ্জের অধীনে একটী বিদ্যালয় আছে। তাহাতে অনেক ভীলই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হোলকারের সৈন্য-দলে এ পর্য্যন্ত ভীলগণ গৃহীত হয় নাই। অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৮৪.৬ অংশ হিন্দু; ৬.৮ অংশ মুসলমান; ৮.১ অংশ অসভ্য ভীল ইত্যাদি; অবশিষ্টাংশ জৈন, শিখ ও পার্সী। এই রাজ্যে ১৭ সপ্তদশটী নগর আছে। কিছু কাল পূর্ব্বে ইন্দোর-রাজ, রাজ্য-মধ্যে ভারতীয় রেলওয়ে বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। আপাততঃ বোম্বাই, বরদা ও মধ্য ভারতীয় লাইনের অধীনে ৪৩ ক্রোশ দীর্ঘ একটী রেলওয়ে, খান্দা জংশন্ হইতে মাউ দিয়া ইন্দোর পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ইন্দোর পর্য্যন্ত এই শাখার 'হোল্কার ষ্টেট রেলওয়ে' নাম হইয়াছে। রেলওয়ের কর্তৃপক্ষকে রেলওয়ের উপযুক্ত ভূমি বিনা মূল্যে প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজ হোলকার, ইহার নির্ম্মাণ জন্য ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১০১ বৎসরে শোধ করিবেন বলিয়া শতকরা বার্ষিক ৪৷৷০ টাকা সুদে এক কোটি টাকা ঋণ লইয়াছেন। রেলের আয় হইতে এই সুদ দিবার নিয়ম। অবশিষ্টাংশের অর্দ্ধেক হোলকারের প্রাপ্য। এই লাইনের বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা, ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টই পরিচালিত করেন।

এই রেলওয়ের নির্ম্মাণে পূর্ব্বোক্ত বিন্ধ্য-পার্শ্বে ঊর্দ্ধ পথ এবং নর্ম্মদার উপরে সেতুই, প্রধান কারিগুরির কার্য্য। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই সেতু, প্রথম খোলা হয়। ক্রমে ইন্দোর হইতে সিন্ধিয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া এই রেলওয়ে—রাটলাম, জেওর ও মিওয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত

হইয়াছে। উহা, ইন্দোর নগরকে নসিরাবাদ, দিল্লি ও আগরার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। এই রেলওয়ের উত্তরাংশ, মহারাজ সিন্ধিয়া, ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক ৪ চারি টাকা শতকরা সুদে দেড় কোটী টাকা কর্জ্জ লইয়া নির্ম্মাণ করান। তাঁহার রাজ্য-মধ্য দিয়া একটী, গোয়ালিয়র হইতে আগরা পর্য্যন্ত এবং অপর একটী, ইন্দোর হইতে নিমাকৃ পর্য্যন্ত— এই দুইটী রেলওয়ে চলিতেছে। শেষোক্তটী, রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ের সহিত সংযুক্ত। ইন্দোর হইতে নসিরাবাদ পর্য্যন্ত সমস্ত লাইনটী "রাজপুতানা-মালোয়া-ষ্টেট রেলওয়ে" নামে অভিহিত। পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নসিরাবাদ হইতে চিতোর পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হয়।

বোম্বাই হইতে আগরা-গামী প্রধান পথটী, ইন্দোর এবং মাউর মধ্য দিয়া গিয়াছে। ধার পর্য্যন্ত ইহার একটী শাখাও আছে। ৪০ চল্লিশ ক্রোশ দীর্ঘ অপর একটী পথ নর্ম্মদার রেলওয়ে সেতুর উপর দিয়া যাওয়ায়, ইন্দোরকে খাণ্ডোয়ার সহিত মিলিত করিতেছে। মাউ হইতে নসিরাবাদ পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে।

পরিশ্রম-জাত দ্রব্য।—মহারাজের একটী বাষ্পীয় তূলার কল, ইন্দোরে অনবরত চলিতেছে। ইহাতে অনেক বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানে আফিঙও বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে ইন্দোর হইতে ১৩,৮৩৭ বাক্স আফিঙ্ রপ্তানি হইয়াছিল। ইন্দোরের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট জমিতে আফিঙের চাষ হয়। ইহাতে লাভও যথেষ্ট হয়। মহারাজ, গমের রপ্তানির উপর শুল্ক স্থাপন করিলেও, ইহার রপ্তানি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

ইতিহাস।—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে ইন্দোর-রাজ্যের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। হোলকার-রাজ-বংশ, মহারাষ্ট্রীয় জাতি হইতে সম্ভূত। কোন মেষ-রক্ষকের পুত্র মলহর রাও-নামক এক ব্যক্তি, এই রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যস্থ নীরা-নাম্নী নদী-তীরবর্ত্তী হল-নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 'কার' শব্দের অর্থ অধিবাসী। অতএব হল-কার শব্দের অর্থ 'হল গ্রামের অধিবাসী'। এই কারণে রাজ-বংশের নাম হল-কার হইয়াছে। 'হোলকার', "হল-কার" শব্দের রূপান্তর-মাত্র। মলহর রাও, বাল্যকালে স্বকীয় পৈতৃক মেষ-রক্ষণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় কোন সেনানীর অধীনে অশ্বারোহী সেনার কার্য্যে প্রবিষ্ট হন। তিনি ঐ কার্য্যে পটুতা দেখাইয়া, শীঘ্রই বিখ্যাত হন। তৎপরে তিনি ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া কর্তৃক পাঁচ শত অশ্বারোহীর সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন।

ইহার পর হইতেই ভাগ্য-লক্ষ্মী, তাঁহার প্রতি প্রসন্নতরা হইতে লাগিলেন। চারি বৎসর পরে তিনি কোন কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ এক খণ্ড ভূমি পান। উক্ত ভূমি-খণ্ডই, হোলকার-রাজ্যের বীজ-স্বরূপ। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি পেশোয়ার সর্ব্ব-প্রধান সেনানী হইয়া, মোগল-সম্রাটের প্রতিনিধিকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে বিজিত ভূমি-খণ্ডের অধিকাংশই, সেনা-পোষণের জন্য তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নর্ম্মদা নদীর উত্তর-তীরস্থ সমস্ত মহারাষ্ট্রীয়

সৈন্যের পরিচালক-পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া তিনি মোগলগণের ও পর্টুগিজগণের সহিত এবং অযোধ্যার নবাবের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে তাঁহার রাজ্য এবং তৎসঙ্গে সম্মান, দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শীঘ্রই তিনি ভারতবর্ষীয় সমস্ত সেনানীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ হইয়া উঠিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের সমরে তিনি সিন্ধিয়ার সহিত, মহারাষ্ট্রীয় অক্ষৌহিণীর দক্ষিণাংশ পরিচালন করেন। জনশ্রুতি এই, এই রণে মলহর রাও, স্বীয় পূর্ব্ব বীরত্বের উত্তম পরিচয় দিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি যুদ্ধের ভাবী ফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি যুদ্ধ-স্থল হইতে নিজের সৈন্য লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করাতেই, মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হন।

পানিপথের যুদ্ধের পর মলহর রাও, মধ্য-ভারতে আসিয়া নিজ-রাজ্যে সুন্দর-রূপ বন্দোবস্ত আরম্ভ করিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তাঁহার রাজ্যের আয়, অন্যূন পঁচাত্তর লক্ষ টাকা হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর মালি রাও-নামক তাঁহার শিশু পৌত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু ৯ নয় মাস মধ্যেই তিনি মৃত হন। তখন মালি রাওর মাতা সুপ্রসিদ্ধা অহল্যা বাই, নিজ হস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়া ৩০ ত্রিশ বৎসর প্রধান সেনাপতি টুকাজি রাওর সহিত সুনিয়মে রাজ্য পালন করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার কিছু দিন পরে টুকাজি রাও-ও পরলোক-গত হন। এই সময়ে পারিবারিক কলহে এবং জাতীয় সাধারণ বিবাদ-সমূহে মলহর রাওর বংশীয় রাজ-ক্ষমতা লুপ্ত-প্রায় হয়। কিন্তু টুকাজি রাওর উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র যশোবন্ত রাও, শীঘ্রই উহা পুনঃ-প্রদীপ্ত করেন। ইনি সিন্ধিয়া কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ দ্বারা আপন সৈন্যের সুশিক্ষা ও সুবন্দোবস্ত করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পুনার যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও পেশোয়ার সমবেত সৈন্য-নিচয় তৎ-কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়। তখন তিনি পুনা নগর অধিকার-ভুক্ত করিয়া লন। পরে বাসিন-নামক স্থানের সন্ধিতে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট, পেশোয়াকে পুনা নগরে অধীন রাজ-স্বরূপে পুনঃ স্থাপিত করেন। যশোবন্ত রাও, স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে, যশোবন্ত রাও হোলকার, কোন রূপ সাহায্য করেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ এই যুদ্ধে সিন্ধিয়ার বল-ক্ষয় এবং নিজের বল-বৃদ্ধির অভিলাষেই এরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। সার্জি আঞ্জেন গাঁওর সন্ধি হইলে, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তখন তিনি সন্ধি করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তাঁহার দাবী গুরুতর হওয়ায় যখন বুঝিলেন, সন্ধি হইবে না, তখন তিনি একাকী ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি প্রথমে কর্ণেল মন্‌সনকে পরাভূত করিয়া কিছু সুবিধাও করিয়াছিলেন। পরে হঠাৎ ব্রিটিস্ রাজ্য আক্রমণ করেন। এখানে কিন্তু ভাগ্য-লক্ষ্মী, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অনেক বার পরাজিত এবং লর্ড লেক কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া তিনি পঞ্জাবে গমন করিতে বাধ্য হন। তথায় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বিয়াস্ নদীর নিকটে তাঁহার সহিত এক সন্ধি

করেন। এই সন্ধিতে তিনি ইংরেজ-বিজিত তাঁহার সমস্ত রাজ্য-খণ্ডই ইংরেজদিগকে প্রদান করেন।

কিন্তু পর বৎসর এই রাজ্য-খণ্ড তাঁহাকে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল। পরে যশোবন্ত রাও, উন্মাদ-গ্রস্ত এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গত হন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র মলহর রাও হোলকার নাবালক ছিলেন। সমস্ত রাজক্ষমতা মৃত হোলকারের উপপত্নী তুলসী বাইর হস্তে ন্যস্ত হয়। পরে কিছু কাল গৃহ-বিবাদে এবং পিণ্ডারীদিগের উপদ্রবে রাজ্যটী গোলযোগ-পূর্ণ হয়। সৈন্যগণ বিদ্রোহ করিল। মহারাণী, নাবালক রাজার সহিত ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় লইতে অভিলাষিণী হইলেন। এই সময়ে পেশোয়ার সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইন্দোরে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। মহারাণী নিহতা হইলেন, কিছু দিন পরেই মেহিদপুরে হোলকার-সৈন্য, ব্রিটিসদিগের কর্তৃক সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। তখন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে একটী সন্ধি হইল। এই সন্ধিতে হোলকারের অনেক রাজ্য ইংরেজদিগকে প্রদত্ত হইল এবং হোলকারও একটী অধীন মিত্র রাজা হইলেন। এই সন্ধি-অনুসারেই আজ পর্য্যন্ত ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের সহিত হোলকার রাজ্যের সম্বন্ধ ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মলহর রাও হোলকার, ২৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র না থাকায়, বিধবা পত্নী, মার্ত্তণ্ড রাওকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু এই পোষ্য পুত্র-গ্রহণ, সকলের মনস্তুষ্টিকর হয় নাই। হরি রাও-নামক রাজ-বংশীয় এক জন, কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করেন। এই হরি রাও, বিদ্রোহের অপরাধে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কারা-নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার ক্ষমতা, প্রজাগণের এবং সেনাপুঞ্জের তুষ্টিকারী হইল। দীর্ঘকাল কারাবাস-বশতঃ হরি রাও, রাজ-কার্য্যে দক্ষ ছিলেন না। তদীয় রাজত্বকাল, বিবাদে ও নানাবিধ গোলযোগে অতিবাহিত হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় পোষ্য পুত্রও, অবিবাহিত অবস্থায় কয়েক মাস মধ্যেই গতায়ু হন। তখন ভবিষ্য রাজার নির্ব্বাচন-ভার, ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিন্যস্ত হয়।

একাদশ-বর্ষীয় ভাও, হোলকারের দ্বিতীয় পুত্র। টুকাজি রাও, তখন নির্ব্বাচিত ও রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনিই এখনও রাজ্য করিতেছেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় একটী রিজেন্সী দ্বারা রাজ-কার্য্য সম্পন্ন হইত। কিন্তু ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা সাবালক এবং সম্পূর্ণ রাজ-ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এক-রূপই আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহি-বিদ্রোহের সময় মহা-রাজের অনেক সৈন্য, উন্মত্ত হইয়া ইন্দোরের পলিটিকাল্ এজেণ্ট সার হেনরী ডুরাণ্ডকে আবদ্ধ করে। তিনি অনেক কষ্টে সন্তানাদি লইয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হন এবং ভূপালে গমন করেন। মহারাজ, এই সময়ে কোন-রূপ অবিশ্বাসের কার্য্য করেন নাই। বিদ্রোহী সৈন্যগণ, কিছু দিন পরে বশ্যতা স্বীকার করে। তৎপরে পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত হয়।

ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের সহিত ইন্দোরের সম্বন্ধ এই,—ইংরেজেরা, উক্ত রাজ্য রক্ষা করিবেন এবং অন্য কোন রাজ্যের সহিত বিবাদাদি হইলে, তাঁহারাই মধ্যস্থতা করিবেন। এই সুবিধার বিনিময়ে হোল্‌কারও, অপর রাজ্যের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ বদ্ধ করিতে, স্বকীয় সেনা সংখ্যা কমাইতে এবং ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত অন্য কোন ইয়ুরোপীয় বা আমেরিক কর্ম্মচারী না লইতে স্বীকার করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহার রাজ্য-রক্ষার্থে ব্রিটিস্ সৈন্যের আহারাদি-সংগ্রহের যে কোন উপায়েই হউক, সুবিধা করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। ইনি পোষ্য-পুত্র লইবার সনন্দ পাইয়াছেন। তিনি নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া, ও কম্পানিয়ন অব দি অর্ডার অব দি ইণ্ডিয়ান এম্‌পায়ার উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ নিজ রাজ্যে ২১টী তোপ এবং ব্রিটিস্ রাজ্যে ১৯টী তোপ প্রদত্ত হয়। বর্ত্তমান মাহারাজ, ভারতেশ্বরীর কাউন্সেলর হইয়াছেন। তিনি ব্রিটিস্ রাজ্যেও ২১টী তোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহারাজের ৩১০০ সজ্জিত পদাতি সৈন্য, ২১৫০ অসজ্জিত পদাতিক সৈন্য, ২১০০ সজ্জিত ও ১২০০ অসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য, এবং ৩৪০ জন আগ্নেয়াস্ত্রীয় এবং নাম-মাত্র ২৪ চব্বিশটী কামানও আছে। মহারাজের সৈন্য, প্রধানতঃ ব্রিটিস্ রাজ্য হইতেই সংগৃহীত। পঞ্জাব হইতে গৃহীত দুই দল শিখ সৈন্যও আছে। মহারাজের খুন করিবার এবং খুনী আসামীকে পরিত্রাণ দিবার ক্ষমতা আছে।

রাজ-কার্য্য।—রাজ্যের রাজস্ব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। সুতরাং ব্যয় বাদে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। শিক্ষা-বিভাগ, বিচার-বিভাগ, ডাক-বিভাগ, অধিক কি, ডাক্তারী বিভাগেরও সুবন্দোবস্ত আছে। এই সকলে অনেক টাকা ব্যয়িত হয়।

শিক্ষা-বিভাগ।—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যে ১০৭টী স্কুল ও সেই স্কুল সমূহে ৪৯৪২ জন ছাত্র ছিল। এতদ্দেশীয় রাজ-কুমার ও ভদ্র সন্তানগণের শিক্ষার্থে ইন্দোর নগরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে রাজ-কুমার-কলেজ স্থাপিত। কিন্তু ইন্দোর-রাজ্যের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

১২টী হইতে ২০টী পর্য্যন্ত রাজ-কুমার, এই কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এখানকার অধ্যক্ষ, রাজাদিগের সম্মতি-অনুসারে মধ্য-ভারতের প্রধান প্রধান ইংরাজি বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করেন। ইন্দোরে আরও তত্রস্থ ব্রিটিস্ রেসিডেন্সিস্থ ছাত্রগণের শিক্ষার্থ একটী রেসিডেন্সী স্কুল আছে। উক্ত রেসিডেন্সীর মধ্যে ক্যানেডিয়ান প্রেস্‌বিটারিয়ান খৃষ্টান সম্প্রদায়ের একটী মিসনারী স্কুলও রহিয়াছে। মহারাজের নিজ কর্ম্মচারীদিগের সন্তানগণের শিক্ষার্থ একটী এণ্ট্রেন্স স্কুলও আছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি সংস্কৃত বিদ্যালয়, আইন শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইন্দোর নগরে দুইটী বালিকা বিদ্যালয়ও বিদ্যমান।

বিচার বিভাগ।—বিচার-কার্য্যের জন্য ইন্দোর নগরে একটী সদর আদালত আছে। ইংরেজী শিক্ষিত কয়েক জন দেশীয় লোকই এখানকার বিচারক। এতদ্ব্যতীত ইন্দোরে,

মাণ্ডেসারে এবং রামপুরে তিনটী অধীন আদালত আছে। এবং উক্ত তিন স্থানেই এক একটী রাজকীয় জেল-গৃহও আছে। প্রধান নগরে দাতব্য চিকিৎসালয়, কুষ্ঠ নিবাস এবং ঔষধালয় আছে।

জল-বায়ু-মৃত্তিকার অবস্থা।—বার্ষিক বৃষ্টির উচ্চতা স্থূলতঃ অনধিক ২ দুই হস্ত। বায়ু উষ্ণ। গৃহ মধ্যে উষ্ণতা ৬০° হইতে ৯০° ডিগ্রি ফারেন হিট্ পর্য্যন্ত। মধ্যে মধ্যে কলেরা আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে।

(২) ইন্দোর।—পূর্ব্বোক্ত ইন্দোর রাজ্যের প্রধান নগর এবং মহারাজ হোলকারের বাসস্থান। এই নগর কাট্‌কি নদীর বাম পার্শ্বে (অক্ষান্তর ২২° ৪২′ উত্তরে ও দ্রাঘিমান্তর ৭৫° ৫৪′ পূর্ব্বে) অবস্থিত। সমুদ্রতল অপেক্ষা ইহার উচ্চতা প্রায় ১২০০ বার শত হস্ত।

গবর্ণর জেনারালের মধ্য-ভারতীয় পলিটিকাল এজেণ্ট, এই নগরে বাস করেন। হোলকার-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহর রাওর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র-বধু অহল্যা বাই ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এই নগর নির্ম্মাণ করেন। যে স্থানে ইন্দোর নগর অবস্থিত, সেই স্থানের পূর্ব্ব রাজধানী এই নগরের ৯ নয় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে কাম্পেল নামক স্থানে অবস্থিত। এই কাম্পেল এখন একটী ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথমে হোল-কারের কাছারি ইন্দোরে আনীত হয়। ইহা এক্ষণে একটী সমৃদ্ধ নগর ও রেলওয়ে ষ্টেসন। নগরের অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৭৫৪০১।

ইন্দোর নগর, এক উন্নত ও স্বাস্থ্যময় স্থানে স্থাপিত। সভ্য জাতির নবাবিষ্কৃত প্রণালী সকল ইহাতে এখন প্রবর্ত্তিত হইতেছে। পথ সকল প্রস্তর-ময় ও আলোক ভূষিত। এবং পয়ঃ-প্রণালী যুক্ত করা হইয়াছে। সহরের প্রত্যেক স্থান হইতেই মহারাজের উচ্চ প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

নানাবিধ জন্তু পূর্ণ এবং সুন্দর অট্টালিকা-যুক্ত রাজকীয় লালবাগ নামক উদ্যান, টাঁকশাল, ইংরাজি স্কুল, বাজার, ডিস্পেন্সারী, সাধারণ অধ্যয়ন গৃহ, এবং বৃহদাকার তুলার কল, এগুলিই প্রধান দৃশ্য। মহারাজ, তুলার কলের উপর বিশেষ মনোযোগ রাখেন। তিনি ইহাতে অনেক অর্থ-ব্যয়ও করিয়াছেন। নগরের পশ্চিম দিকে দীর্ঘ-শৃঙ্গ হরিণ-বাস অবস্থিত; এই স্থানে চিতা-বাঘের লড়াই দেখান হয়। প্রাসাদ হইতে রেল ষ্টেশন প্রায় আধ ক্রোশ।

ইন্দোর সহরের প্রান্ত ভাগে রেল ষ্টেশনের অপর দিকে ব্রিটিস্ রেসিডেন্সী। রেসিডেন্সী বলিলে গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্টের বাস গৃহ এবং সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে হোলকার হইতে প্রাপ্ত কিয়ৎ-পরিমাণ স্থান বুঝিতে হইবে। এই রেসিডেন্সীর মধ্যে একটী বাজার আছে, ইহা শস্যাদির রপ্তানি প্রযুক্ত ক্রমশঃই সমৃদ্ধতর হইতেছে। এই স্থানে প্রধান অহিফেন-ভাণ্ডার অবস্থিত। এখানকার হস্‌পিটাল অত্যুত্তম এবং অতীব উপকার-দায়ক। নিকটস্থ রাজ্য সকলে পতির অবহেলন পূর্ব্বক উপপতি গ্রহণ দোষে যে

সকল স্ত্রীলোক নাসিকাচ্ছেদ দণ্ডে দণ্ডিতা হয়, তাহারা এই স্থানে নূতন বৈজ্ঞানিক নাসিকা প্রাপ্ত হয়। দুঃখিত স্বামী, নিজের স্ত্রীর নাসিকাচ্ছেদ পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করেন। স্ত্রীলোক, স্বস্থানে বস্ত্র দ্বারা নাসিকা বান্ধিয়া ইন্দোরের হসপিটালে আসে। অধিকাংশ স্থলেই তাহারা নূতন নাসিকা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য এবং অন্যান্য কারণে এই হসপিটাল, মধ্য-ভারতীয় রাজ্যগুলিতে এবং রাজপুতানায় বড়ই বিখ্যাত। এক অতি মনোরম উদ্যানের মধ্য-স্থলে একটি সুন্দর প্রস্তরময় অট্টালিকা, রেসিডেন্টের আবাস-গৃহ। উচ্চ-স্থানে অবস্থিতি বশতঃ প্রবল গ্রীষ্মের দুই মাস ব্যতীত ইন্দোর নগরের বায়ু, শীতল ও তৃপ্তিকর।

এক দল ইয়ুরোপীয় এবং এদেশীয় সৈন্য, গবর্ণর জেনারালের এজেন্টের দেহ রক্ষা করে। তাহাদিগের জন্য একটী সুদীর্ঘ অথচ প্রশস্ত-গৃহ-বিশিষ্ট বারাক নির্ম্মিত আছে। রাজ-কুমার-কলেজ রেসিডেন্সীর অধীনেই অবস্থিত।

ইন্দোরী।—পঞ্জাব প্রদেশস্থ গুরগাঁও জেলার একটী পর্ব্বতীয় ক্ষুদ্র নদী। রাজ-পুতানার বহির্ভাগে মিওয়াট পাহাড় শ্রেণীর পার্শ্ব হইতে বহির্গত হইয়া, উত্তর মুখে ব্রিটিস্ রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক টাওরু ও বাহোরা নগর-দ্বয় অতিক্রম করিয়া সাহিবি নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া নাজফগর ঝিলে ইহা পতিত হইতেছে। ইন্দোরী নদী, মধ্যে মধ্যে পাহাড় শ্রেণীর নিকটস্থ ভূমি সকল জল-প্লাবিত করে। ইন্দোরী নামে অপর একটী ক্ষুদ্রতর নদী আছে। সেটী সাহিবি নদীতে পড়িতেছে। সাহিবি, তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া তিন ক্রোশ দূরে প্রথমোক্ত ইন্দোরী নদীতে পতিত হইতেছে। উভয় নদীই ক্ষুদ্র। উহা কেবল বর্ষাকালে বেগবতী হয়।

ইমামগড়।—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধু দেশে খয়ের রাজ্যস্থ একটী বিধ্বস্ত দুর্গ। অক্ষান্তর ২৬° ৩২′ উত্তর, দ্রাঘিমান্তর ৬৯° ১৬′ পূর্ব্ব। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে, মির রস্তম খাঁ তালপুর, এই দুর্গকে মরুভূমির মধ্যস্থ এবং দৃঢ় বিবেচনা করিয়া ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু সার চার্লস্ নেপিয়ার এক দল উষ্ট্রারোহিণী সেনার সহিত ইহাকে আক্রমণ করিলে তিনি অধীনতা স্বীকার করেন। এই দুর্গস্থ ভাণ্ডারে প্রচুর পরিমাণে বারুদ সঞ্চিত ছিল। নেপিয়ার সাহেব তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দুর্গটীও বিধ্বস্ত করেন।

ইমিনাবাদ।—পঞ্জাবের অন্তর্গত গুর্জানওয়ালা জেলার অধীন, গুর্জানওয়ালা তসিলের একটী নগর। গুর্জানওয়ালা নগর হইতে ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণে (অক্ষান্তর ৩২° ২′ ১৫″ উত্তরে, দ্রাঘিমান্তর ৭৪° ১৮′ পূর্ব্বে) গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরে ইহা অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৫৮৮৬। অধিকাংশই মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহা জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নগর কিন্তু এখন ইহার সমৃদ্ধি কিছুই দেখা যায় না। ইহার প্রাচীন কালের বিশেষ বিবরণও পাওয়া যায় না। আইনি অকবরীতে ইহা একটী বৃহৎ মহালের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত আছে। এখনও ইহাতে প্রবল পাতশাহদিগের সমকালীন মুসলমানী

কারু-কার্য্যের চিহ্ন সকল বিধ্বস্ত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। এ নগরে এক সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয়-বংশ বাস করেন। জম্মুর মহারাজের মন্ত্রী জাবালা সাহাই এবং মৃত দেওয়ান হরি-চাঁদ এই বংশ-সম্ভূত। এই নগরে অনেকগুলি রাস্তা, একটী শস্যের বাজার, পুলিশ থানা এবং স্কুল আছে। বাণিজ্য যৎকিঞ্চিৎ মাত্র হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসে তিন দিবস স্থায়ী একটী প্রকাণ্ড বাৎসরিক মেলা হয়। এখানে একটী তৃতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালটী আছে। তাহার বাৎসরিক আয় প্রায় ২১১০৲ টাকা।

ইংরেজইজ্ঞি।—ব্রিটিস্ বর্ম্মার অন্তর্গত বাসিন জেলার একটী হ্রদ। ইহার পরিধি প্রায় ১৷৷০ দেড় ক্রোশ। বিস্তার ২৮০ হইতে ৩০০ গজ। মধ্য-স্থলের গভীরতা কোথাও ২০ ফিট, কোথাও বা ৪৫ ফিট পর্য্যন্ত। এই হ্রদ, একটী ক্ষুদ্র মোহানা দ্বারা বাসিন নদীর ডাগা-নাম্নী শাখার সহিত সংযুক্ত। উক্ত সংযোগ-বশতঃই হ্রদটী ইরাবতী নদী হইতে জল পাইয়া সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে। উহাতে অতিরিক্ত জল জমিলেও, বহির্গত হইয়া যায়। কেহ কেহ বিবেচনা করেন, এই হ্রদ, ডাগা নদীর পূর্ব্বতন তল-ভাগ। হ্রদ, মৎস্য থাকিবার একটী উৎকৃষ্ট স্থান। এই জন্য ব্রহ্ম-দেশীয় গবর্ণমেণ্ট, ইহাকে কর-সংগ্রহের উপ-যোগী মনে করিয়া ইহার বংশানুক্রমিক অধিকারী পেনেঙের নিকট হইতে বাৎসরিক ৭৮০০৲ টাকা হিসাবে কর আদায় করিতেন; কিন্তু যাঁহারা মাছ ধরিতে নিযুক্ত, তাঁহাদিগের উপর ঐ পেনেঙই, সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করিতেন। মৎস্য ধরিবার সাধারণ কার্য্যের জন্য নিকটস্থ গ্রামবাসী-দিগের প্রত্যেকেরই স্বেচ্ছানুসারে টাকা জমা দিবার অধিকার ছিল। বৎসরান্তে লাভের টাকা হইতে উহারা পরিমাণানুসারে ভাগ পাইত। একটী ফ্রেম (ঠাট) সংযুক্ত উদ্ভিদ্‌জাত বন্য রজ্জুগুলি ভাসমান ক্যাপষ্টান সকলে বদ্ধ করিয়া তিন মাস ব্যাপিয়া (প্রত্যহ প্রায় ১৮০ হস্ত হিসাবে) এই হ্রদে টানা-জাল দেওয়া হয়। জুন (জ্যৈষ্ঠ) মাসের পূর্ণিমার দিবস হইতে এই কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রকারে ৭০০০০।৮০০০০ সহস্রের কম মৎস্য কখনও হয় না। ইহাদের অধিকাংশই প্রায় সার্স, সিব্রিনস্, গোবিও, লেবিও, সিমেলোডস্, সির্হিনস, সিপ্রিনোডন এবং সিলারাস্ জাতীয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারগুলি প্রত্যেকে প্রায় ২৭ সের ভারী হয়। টানা-জালে সকল আকারের কুম্ভীর নিরীক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা-দিগকে কখনও গুরুতর উৎপাত করিতে দেখা যায় না। এই মৎস্য বিক্রয়াদি কার্য্যে ৮০০০ হইতে ১০০০০ লোক নিযুক্ত হয়। প্রতি বৎসর প্রায় ১১০০।১২০০ মণ ওজনে মৎস্য এই স্থানে বিক্রীত হয়।

ইংলিস-বাজার।—(এংরেজাবাদ)—বাঙ্গলা দেশস্থ মালদহ জেলা-স্থিত মিউনি-সিপালিটির অধীন একটী নগর। ইহা উক্ত জেলার বিচার-বিভাগের সদর স্থান। অক্ষান্তর ২৫° ০′ ১৪″ উত্তর, দ্রাঘিমান্তর ৮৮° ১১′ ২০″ পূর্ব্ব। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ১২৪৩০। হিন্দু ৭২৬৮, মুসলমান ৫১৪৬, অন্যধর্ম্মী ১৬ জন। ইহার পরিমাণ ৫০০ পাঁচ শত বিঘা। মিউনিসিপালিটির আদায় (১৮৮১-১৮৮২ খৃষ্টাব্দে) ৬৯৬০৲ টাকা। ইহার মধ্যে

ট্যাক্স আদায় ৪৯৮০৲ টাকা। ব্যয় ৭১৬০৲ টাকা। মহানন্দা নদীর দক্ষিণ তীরের অনেক দূর ব্যাপিয়া ইহার অবস্থিতি; কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্য-পল্লীতে এই নগরটী সংগঠিত। নদী-তীরস্থ উচ্চ এবং অনাবৃত এই স্থানে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, প্রথমে রেশমের কুঠী-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই নগরে ফরাসি এবং ওলন্দাজদিগেরও অধিনিবেশ ছিল। একটী ওলন্দাজ ধর্ম্মশালাই (মঠই), ব্রিটিস্ পুলিসের অধ্যক্ষের আবাস-গৃহ-স্বরূপ প্রথমে স্থিরীকৃত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠী, অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৬৮৫ হইতে ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার দৈনিক কার্য্য-বিবরণী এবং মন্ত্রণা সকল অদ্য পর্য্যন্ত বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসে মালদহ এবং এংলেসাবাদ নামে রক্ষিত হইতেছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলিস্-বাজার, কোম্পানির ব্যবসায়ার্থ নিবাস স্থিরীকৃত হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত উহা উক্তরূপ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। এখন ইহা একটী শস্য-বাণিজ্যের প্রধান স্থান। গবর্ণমেণ্টের কাছারি বাড়ীই ইহার সর্ব্ব-প্রধানহর্ম্ম্য। ইহা প্রথমে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটী আড়ত গৃহ ছিল। ইহা চতু-র্দ্দিকে রীতিমত সুরক্ষিত। জেলাস্থ সমুদয় রাজকীয় কার্য্যালয় ইহার মধ্যে সংস্থাপিত। মালদহ জেলা, মধ্যে মধ্যে প্রায়ই জল-প্লাবিত হয়, কিন্তু এই নগরটী একটী ক্ষুদ্র বাঁধ দ্বারা উহা হইতে সুরক্ষিত থাকে।

ইরাবতী।—বর্ম্মা দেশের সর্ব্বপ্রধান নদী। উহা দক্ষিণ মুখে পেগু ও ইরাবতী নামক ব্রিটিস্ বর্ম্মার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার উৎপত্তি-স্থান নির্ণীত হয় নাই। এ বিষয়ে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন, এই নদী তিব্বত দেশীয় সার্পু নদীরই এক অংশ। কাহারও মতে ইহা পিন-লে-ফিঙ্ কিয়াঙ্ নদীর একাংশ। কাহারও বা মত—ইহার উৎপত্তি-স্থল চীন দেশে। কর্ণেল হেনরি ইউল বলেন, ইহা হিমালয় হইতে উদ্ভূতা। সে যাহা হউক, এক্ষণে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহা সাঁপুর সহিত সম্মিলিত। বোধ হয়, পাটকই পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগ হইতে ইরাবতী বহির্গত হইয়াছে। নদী, সাধারণতঃ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। উহা ব্রহ্ম দেশে অনেকগুলি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মোগাউঙ, ক্যাউঙ, মু, সিমাই, মৌলে ও ট্যাপিঙই প্রধান। যেখানে ইরাবতী, মোগাউঙের সহিত মিলিত, তথায় ইহার স্রোতঃ অতি প্রবল ও গভীর। ভামো নগরে ট্যাপিঙ শাখার সহিত মিলিত হইয়া বক্রভাবে পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যে প্রবাহিত। মান্দালয়ের কিছু উত্তরে, ইহার তীর দেশ নানাবিধ বৃক্ষাদিতে পূর্ণ। ১৭ ডিগ্রী অক্ষান্তরের পর হইতে ইরাবতীর গতি অতিশয় বক্র। তৎপরে নদীর বিস্তার, কোন কোন স্থানে দেড় ক্রোশও হইবে। আকাউক্ টাউঙে আরাকান পাহাড়ের নিকটে নদীতে বিস্তর "ব"-দ্বীপ দৃষ্ট হয়। হেঞ্জাদা নামক স্থানে প্রথমে এক শাখা পশ্চিম দিকে ধাবিত হইয়াছে। এই শাখা, বাসিন নগর দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, ইহার নাম বাসিন হইয়াছে। শাখাটী অবশেষে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া (দ্বি-মুখী হইয়া) সমুদ্রে পড়িতেছে।

হেঙ্গাদার কিছু নিম্নে অপর এক শাখা পূর্ব্ব মুখে বহির্গত হইয়া দশ ভাগে সমুদ্রে পড়িতেছে। এই দশটীর—দশ পৃথক্ নাম আছে। তন্মধ্যে কেবল দুই মুখে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে।

ইরাবতী নদীর উভয় তীরেই শস্য-পূর্ণ বিস্তৃত সমতল ভূমি। নদীর প্রথম ভাগে তাহার বিস্তার ৪০ চল্লিশ ক্রোশ। তৎপরে যতই দক্ষিণে আসা যায়, ততই অধিকতর বিস্তৃত। ইরাবতীর নিম্ন-দেশে এই সমতল তীর-ভূমি, সিটঙ নদীর তীর-ভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে নদী-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ, সুবিস্তৃত, শস্য-পূর্ণ সমতল। কিছু উত্তরে পেগুযম পর্ব্বত-শ্রেণী, এই উপত্যকা-দ্বয়কে বিভক্ত রাখিয়াছিল; কিন্তু এই স্থানে তাহারা ক্রমশঃ নিম্নতর হইয়া ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে। ইরাবতী নদীর উপত্যকাকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিতেছে। ১৮° ১৫′ উত্তর দ্রাঘিমান্তর হইতে সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত ইরাবতীর বিস্তৃত তীর-দেশ প্রতি বর্ষেই জল-প্লাবিত হয়। গবর্ণমেণ্ট, ঐ প্লাবন বন্ধ করিতে, অথবা হ্রস্ব করিতে বিধিমতে সচেষ্ট। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে হিন্‌জেদাস্থিত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আর, গর্ডন সাহেব, ইরাবতীর "ব"-দ্বীপের উপর হইতে দক্ষিণ মুখে ৭৫ পঁচাত্তর ক্রোশ দীর্ঘ, দুই তীরে দুইটী বাঁধ দিলে কিরূপ উপকার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। দক্ষিণ ব্রহ্ম দেশে এক তীরস্থ একটী দীর্ঘ বাঁধের অনেক অংশ ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জলে ভাসিয়া গিয়াছে। তৎপরে উক্ত কার্য্যের পুনঃ-সংস্কারের পূর্ব্বে গর্ডন সাহেব, তীরের সমতলতা এবং জলের বেগ নিশ্চয় করিবার জন্য আদিষ্ট হন। সবিশেষ অনুসন্ধানের পরে গর্ডন সাহেব, বাঁধ-নির্ম্মাণের পক্ষপাতী হন। এইরূপ আরও অনেক কারণে বাঁধের কার্য্য বিপুল উৎসাহের সহিত সম্পাদিত হইতেছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ আইন অনুসারে প্লাবনের সময় বাঁধের নির্ম্মাণ বা সংস্কার কার্য্যের জন্য উচ্চ-কর্ম্মচারিগণের সুপটু পরিশ্রমীদিগকে বল পূর্ব্বক আনিয়া, কার্য্য করাইবার ক্ষমতা আছে।

পূর্ব্ব-তীরস্থ ও পশ্চিম-কূলবর্ত্তী নামে বাঁধের কার্য্য প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে পশ্চিম তীরস্থ শেষোক্ত বিভাগ, পুনরায় ক্যাঙ্গিন, ম্যানঙ্ ও হেঙ্গাদা শাখাত্রয়ে বিভক্ত। পূর্ব্বোক্ত বিভাগ সামান্য জরিপের কার্য্যেই নিযুক্ত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঁধনির্ম্মাণে পশ্চিম তীরে সর্ব্বসমেত ৩০৫৮৮২০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে টাণ্টি ক্যানাল কর্ত্তন করিতে ২০০০০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই ক্যানাল, ৪ চারি ক্রোশ দীর্ঘ। ইহা ইরাবতী ও রেঙ্গুন নদীকে সংযুক্ত করিতেছে।

ইরাবতী নদীতে প্রচুর পরিমাণে মৃত্তিকাদি বহিয়া আসায়, ইহার মুখস্থ "ব"-দ্বীপ নিয়তই সমুদ্রের দিকে বর্দ্ধিত হইতেছে। উক্ত "ব"-দ্বীপের সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী ভাগ সঙ্কীর্ণ প্রণালী সকল বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালা-সঙ্কুল। দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী দ্বীপগুলি বর্ষা ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে মৎস্য-জীবী ও লবণ-প্রস্তুতকারী অধিবাসীতে কোলাহলময় হয়।

"ব"-দ্বীপের পরিমাণ ৯০০০ নয় হাজার বর্গ ক্রোশ। উৎপত্তি-স্থান হইতে ইরাবতীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫০ ক্রোশ। হেন্দেজা জেলাস্থ আকাউক-টঙ্ পর্য্যন্ত নদীর তল-দেশ প্রস্তরময়। কিন্তু তৎপরে দক্ষিণের তল-ভাগ, কর্দ্দমময় ও বালুকা-পূর্ণ। নদীর উপরে প্রচুর পরিমাণে চর দৃষ্ট হয়। কিন্তু বর্ষাকালে তাহারা জলমগ্ন হয়। জল অতিশয় আবিল। সমুদ্র-বক্ষের বহুদূর পর্য্যন্ত কর্দ্দম বাহিত হয়। ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগ হইতে নদীর জল বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে জৈষ্ঠ মাসে প্রথমে সামান্য হ্রাসের পর অতিরিক্ত ভাবে জল বাড়িতে থাকে; ভাদ্র মাসে চূড়ান্ত বৃদ্ধি হয়। প্রোম নগরে শীতকাল অপেক্ষা বর্ষাকালে জলের উচ্চতা ২২ হইতে ২৫ হস্ত অধিক। ম্যানঙের দক্ষিণে সেতু শূন্য পূর্ব্ব-তীর বহুদূর পর্য্যন্ত জল-প্লাবিত হয়।

ইরাবতী নদীতে সকল সময়েই ক্ষুদ্র ষ্টীমার ভামো নগর পর্য্যন্ত যাইতে পারে। বর্ষাকালে ষ্টীমার ও নৌকাগুলি প্যানহ্লেঙ ও ভলে নামক মুখ দ্বয় দিয়া রেঙ্গুন হইতে নদী-গর্ভে প্রবেশ করে। কিন্তু অন্য সময়ে রেঙ্গুন নদী দিয়া যাইতে হয়। হেন্‌জাদা পর্য্যন্ত জোয়ার দেখিতে পাওয়া যায়। পুজঙডঙ নামক স্থানে জোয়ারের উচ্চতা ১২ দ্বাদশ হস্তেরও অধিক। মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর বন্যাও দেখা যায়। তন্মধ্যে ১৮৭১, ১৮৭৫ ও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বন্যাই স্মরণীয়। আককটঙ এবং প্রোম নগরের মধ্যে ইরাবতী কোন শাখা নদীর সঙ্গে যোগ পায় নাই।

বাণিজ্যাদি।—ইরাবতী নদীর বক্ষঃস্থল সমুদ্র-গর্ভ হইতে দেশ মধ্যে যাইবার একমাত্র উপায়। এই পথ দিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে উত্তর ব্রহ্ম দেশ ও চীন সীমার বহু মূল্য রত্ন-নিচয় আনীত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইরাবতী ফ্লটিলা নাম ইংলণ্ডীয় এক কোম্পানি দ্বারাই বাণিজ্য নির্ব্বাহ হয়। স্বদেশীয় নাবিকদিগের বাণিজ্যও অল্প নয়।

উক্ত কোম্পানির অধীনে ৬০ ষাটি খানি জাহাজ আছে; তাহাতে ইয়ুরোপীয় ও এদেশীয় সর্ব্বসমেত ১৭৭০ জন লোক কার্য্য করে। রেঙ্গুন, ইহার সদর ষ্টেসন। এই স্থানে উক্ত কোম্পানি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাচীন ডক-ইয়ার্ড জহাজাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কার কার্য্যের জন্য ভাড়া লইয়াছেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইরাবতী-বক্ষে সর্ব্বসমেত উপর দিকে ১১৫ ও নিম্ন দিকে ১১০ খানি ষ্টীমার বাহিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ষ্টীমারের সংখ্যা অধিকতর ছিল; কিন্তু পরে ষ্টীমারের সংখ্যা হ্রাস হওয়ায়, স্বদেশীয় নৌকার সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাক, সৈন্য ও খাদ্য-দ্রব্যাদি বহিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে দুই বার করিয়া, রেঙ্গুন হইতে বাসিন ও মান্দালয় পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাতায়াত করে। মান্দালয়-গামী ষ্টীমার, সমুদ্র-তীর হইতে, ৫০০ পাঁচ শত ক্রোশ দূরস্থ ভামো নগর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে দুই বার গমন করে। রেঙ্গুন হইতে মান্দালয় পথে নিম্নলিখিত ষ্টীমার ষ্টেসনগুলিই প্রধান।—যাগুন (বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান), ডোনাবিউ, হেন্‌জাদা, ইজিন, ম্যানঙ (এই স্থানে পূর্ব্বে দেওয়ানি বিচার-কার্য্য সম্পন্ন হইত, এক্ষণে কিন্তু হেন্‌জাদাতে কার্য্যালয় অপসারিত হইয়াছে),

প্রোম, থাইয়েটমিও, মিয়ালা, মাণ্ডই * ইনান, মিয়ঙ, সিনিথুমিয়ান, [illegible], [illegible], পকোকো, লেটস্থাম্বিও, সাগাইঙ ও মান্দালয়। এখানে আনীত পণ্য-দ্রব্যের মধ্যে [illegible]-ইরের বস্ত্র, ধান্য, লবণ ও রেশমই প্রধান। তথা হইতে প্রেরিত পণ্য-দ্রব্যের মধ্যে তুলা, রবর, মসলা, বহুমূল্য প্রস্তর, বাহাদুরী কাষ্ঠ, গম, ছোলা ইত্যাদি শস্য ও একপ্রকার [illegible] এগুলিই সর্ব্বপ্রধান। উভয় দিকে বাণিজ্য দ্রব্যের মোট মূল্য বার্ষিক সার্দ্ধ দুই কোটী টাকা।

ইরাবতী-বক্ষে বাহিত এদেশীয় নৌকার সংখ্যা, প্রায় ৯৭৫০ খানি। ষ্টীমারের সংখ্যা (১৮৮২ খৃষ্টাব্দে) ২২৫ খানি। ব্রহ্ম-দেশ-বাসীরা, নদীতে নৌকা চালন-কার্য্যে বিশেষ পটুতা প্রদর্শন করে। ইহারা নদীর উপরে যাইবার সময়ে পা'ল্ তুলিয়া এবং নিম্নে আসিবার সময় জলের বেগে নৌকা চালায়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন-ইরাবতী-ষ্টেট-রেলওয়ে প্রোম নগর পর্য্যন্ত বাণিজ্যের জন্য খোলা হয়।

ইরাণ্ডোল—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খান্দেশ জেলার অধীন মহকুমা। তাপ্তী নদীর দক্ষিণে এবং গীর্ণা নদীর পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। পরিমাণ-ফল ২৩০ বর্গ ক্রোশ। ইহাতে দুইটী নগর এবং ১৯৬টী গ্রাম আছে। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৯০৮৭২ জন। অত্রত্য ভূমি, তাপ্তী নদীর নিকটস্থ বলিয়া অতি উর্ব্বরা। এখানে আম্রের বাগান প্রচুর দৃষ্ট হয়। অনেকগুলি নদী ব্যতীত কূপও অনেক না আছে, এমন নয়। ঐ কূপ-গুলির গভীরতা, স্থূলতঃ ২২।২৩ হস্ত। উহাদের সংখ্যা (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) ২০৬১টী। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একবার এই মহকুমার জরিপ এবং রাজস্ব স্থিরীকৃত হয়। জোনার, তুলা, ধান্য, গম, তিসি ও মসিনাই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাজস্ব (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) ২৪৮২৮০৲ টাকা।

ইরাণ্ডোলই, ইহার প্রধান নগর। ধুলিয়ার ২০ কুড়ি ক্রোশ পূর্ব্বে অঞ্জনী নদীর উপরে ইহা অক্ষান্তর ২০° ৫৬′ উত্তরে ও দ্রাঘিমান্তর ৭৫° ২০′ ৩০″ পূর্ব্বে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ১১৫১ লোক। মিউনিসিপাল আদায় ৫৮৬০৲ টাকা। এই নগরে সবর্ডিনেট জজের কোর্ট, পোষ্টাফিস এবং ডিস্পেন্সারী আছে। এই নগর হইতে ধুলিয়া এবং ধরনগাঁও নগর পর্য্যন্ত ৩ তিনটী প্রস্তরময় রাস্তা বহির্গত হইয়াছে। এই নগরটী কিছু প্রাচীন। কিছু পূর্ব্বে স্বদেজাত-কাগজ নির্ম্মাণের জন্য ইহা বিখ্যাত ছিল। এখনও ইহাতে অতি অল্প পরিমাণে তুলা, শস্য এবং নীলের ব্যবসা হইয়া থাকে। জালগাঁও-ষ্টেশনস্থ বিখ্যাত বাজার হইতে ৭ সাত ক্রোশ পশ্চিম-দক্ষিণে ইহা অবস্থিত।

ইরান—ভারতের মধ্য প্রদেশের (Central provinces) অন্তর্গত সাগর জেলার অধীন কিয়ৎ-পরিমিত স্থান এবং তাহার মধ্যস্থিত প্রধান গ্রাম। এই গ্রাম সাগর, হইতে ২৪ ক্রোশ পশ্চিমে (অক্ষান্তর ২৪° ৫′ ৩০″ উত্তর, দ্রাঘিমান্তর [illegible]° ১৫′ পূর্ব্ব) অবস্থিত। ইংরেজি

* এতৎ-স্থানীয় বাণিজ্য-স্থান। মধ্যে মধ্যে শ্যাম-দেশ-বাসিগণও, এই স্থানে আগমন করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গৃহ-সংখ্যা ৮৪ এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৩৩১। এই গ্রামটী রাজা ভরত-কৃত, কতকগুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আশ্চর্য্য কার্য্যের জন্য বিখ্যাত। বিষ্ণুর বরাহাবতারের একটী মূর্ত্তিই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। মূর্ত্তিটী প্রায় ৭ সাত হস্ত উচ্চ। উহা ঊর্দ্ধ মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার গাত্র, সুন্দর পরিচ্ছদ-যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্যাকৃতিতে আবৃত। কণ্ঠস্থলে একটী বিচিত্রিত বন্ধনী আছে। লম্বমান জিহ্বার অগ্র-ভাগে সুদীর্ঘ সরল একটী মনুষ্যাকৃতি অবস্থিত। মূর্ত্তির বক্ষঃস্থলে কিছু কিছু ক্ষোদিত আছে। দক্ষিণ দন্ত হইতে একটী নারী-মূর্ত্তি লম্বমান আছে। মূর্ত্তিটীর এক পার্শ্বে ৮ আট হস্ত দীর্ঘ চতুর্ভুর্জ অপর এক মূর্ত্তি আছে। ইহার গলদেশ হইতে পাদ-দেশ পর্য্যন্ত একটী সুচিত্রিত মাল্য ঝুলিতেছে। মূর্ত্তির সম্মুখস্থ স্তম্ভ-গুলিতে নানাবিধ মনোরম চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য আশ্চর্য্যের মধ্যে তিনটী সুন্দর-সিংহাকৃতি, এবং তৎসম্মুখে মৃত্তিকায় অর্দ্ধ-প্রোথিত একটী মন্দির এবং একটী সুবৃহৎ স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। স্তম্ভটীর তল-ভাগের পরিধি অতি বিস্তৃত। ইহার উচ্চতার প্রথম ১০ দশ হস্ত চতুষ্কোণ, তৎপরে প্রায় ৮ আট হস্ত গোলাকার। তদুপরি চিত্রিত খামালম্বী প্রায় ৮ অঙ্গুলি। তাহারও উপরে ২ দুই হস্ত উচ্চ আসনের উপর এক ক্ষুদ্র চতুর্ভুর্জ মূর্ত্তি। এই স্তম্ভস্থ ক্ষোদিত লিপি দেখিয়াই মগধের গুপ্ত-বংশীয় বুদ্ধগুপ্তের সময় স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই গ্রামে পুলিশ থানা আছে।

ইরিচ—পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ঝাঁসি জেলার একটী প্রাচীন নগর। ঝাঁসি নগরের ২১ একুশ ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর বিটোয়া নদীর দক্ষিণ তীরে (অক্ষান্তর ২৫° ৪৭′ উত্তরে ও দ্রাঘিমান্তর ৭৯° ৮′ পূর্ব্বে) ইহা অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ৫০০০ পাঁচ সহস্রের কম হইবে। পূর্ব্বে এই নগর, মোগল-সাম্রাজ্যের অধীন একটী সরকারের সদর নগর ছিল। তখন ইহা অতি সমৃদ্ধও ছিল; কিন্তু এক্ষণে ইহা ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমশঃই অল্পতর হইতেছে। আজও ইহার প্রান্তস্থিত কতকগুলি মস্‌জিদ ও সমাধি-গৃহ, পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংসের অধীনস্থ ব্রিটিস সেনা, গোয়ালিয়রে আসিবার সময় বিসূচিকা-গ্রস্ত হইয়া এই নগরে অবস্থিতি করিয়াছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ঝাঁসিতে আমির খাঁর উপদ্রব নিবারণ করিতে প্রেরিত ম্যাজর সেপার্ডের অধীন এক দল ব্রিটিস সেনা, এই নগরে অবস্থান পূর্ব্বক আমিরের ললিতপুর হইতে আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল। আমির, আসিয়া প্রথমে আপনাকে হীনবল বিবেচনা করেন এবং মালথানে প্রত্যাগমন করেন। ইহাতে ব্রিটিস্ সেনা, আমির একবারে পলায়ন করিয়াছেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া বাগুাতে গমন করে। কিন্তু আমির খাঁ, শীঘ্রই ইরিচে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কুচ ও কন্নি আক্রমণের জন্য এই স্থানেই সেনা-নিবেশ করেন।

নানা প্রকার ছিটের কাপড় এস্থানে প্রস্তুত হয়। এখানে একটী প্রথম শ্রেণীর পুলিশ-থানা, স্কুল ও পোষ্টাফিস আছে। পুলিশ-রক্ষার্থে নগরবাসিগণের নিকট হইতে যৎসামান্য ট্যাক্স আদায় হয়।

ইরোদ—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোইম্বাটুর জেলাস্থ একটী নগর। জেলার পূর্ব্ব সীমায় কাবেরী নদীর তীরে (অক্ষান্তর ১১° ২০′ ১৯″ উত্তরে, দ্রাঘিমান্তর ৭৭° ৪৬′ ৩″ পূর্ব্বে) অবস্থিত। ইহা, মান্দ্রাজ হইতে রেল পথে ১২৩ ½ ক্রোশ, ত্রিচিনোপলি হইতে ৪৭½ ক্রোশ, কোইম্বাটুর হইতে ৩০ ক্রোশ এবং মালেম হইতে ১৮½ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৯৮৬৪। হিন্দু প্রায় ৮৩৩৮, মুসলমান ১০৮৪, অবশিষ্ট অন্য জাতীয়। এই নগর ইরোদ তালুকের সদর। তজ্জন্য ইহাতে একটী নিম্নশ্রেণীর বিচার-স্থান, থানা, স্কুল, এবং পোষ্ট আফিস ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে। ইহা জেলার সব্‌কলেক্টরের আবাস-স্থান এবং এতৎস্থানীয় মিউনিসিপালিটীর অধীন। এই মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক আয় প্রায় ১০১৯০৲ টাকা। সুবিখ্যাত হায়দর আলীর সময় এই নগরে ৩০০০ তিন সহস্র গৃহ ছিল। একাদিক্রমে মহারাষ্ট্রীয়, মহীশুর এবং ব্রিটিশ আক্রমণে এই নগর, একেবারে জনশূন্য এবং বিধ্বস্ত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার মনোহারিতা এবং উর্ব্বরতা বশতঃ সন্ধি-স্থাপনের পরই অধিবাসিগণ, প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যেই ৪০০ গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং অধিবাসীর সংখ্যা ২০০০ হাজারেরও অধিক হইয়া উঠে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইহা হইতে সেনানিবেশ অপসারিত হয়। অত্রত্য দুর্গ, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় রিলিফ ওয়ার্কে অর্থাৎ সাহায্যে সমভূমীকৃত হয়।

দুর্গের প্রাচীর-মধ্যবর্ত্তী স্থানে অনেক দিন হইতে একটী তুলার কল, সোডার গুদাম এবং কতকগুলি গৃহ রহিয়াছে। তুলা, সোডা (যবক্ষার), ধান্য এবং চিনির রপ্তানিই এখানকার প্রধান বাণিজ্য। ইহা, রেল্-পথের সংযোগ-স্থানে অবস্থিত। ক্রমশঃ উহা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতেছে। এই নগরের ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বে কাবেরী নদীর উপরে ১৫৩৬ ফিট দীর্ঘ একটী কাষ্ঠময় সেতু নির্ম্মিত আছে। নগরটী বড়ই সুন্দর। অন্যান্য অট্টালিকার মধ্যে একটী সুন্দর কাচারি গৃহ এবং জেলখানা আছে।

ইল্‌কাল—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কালাদজি জেলাস্থ হন্সুদ মহকুমার মিউনিসিপালিটীর অধীন একটী নগর। অক্ষান্তর ১৫° ৫৭′ উত্তরে ও দ্রাঘিমান্তর ৭৬° ৯′ পূর্ব্বে, হন্সুদ নগর হইতে ৪ চারি ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে এবং কালাদজি নগর হইতে ২৬ ছাব্বিশ ক্রোশ দক্ষিণে ইহা অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৯৫৭৪। শতকরা ৪২ হিন্দু, অবশিষ্ট মুসলমান ও অন্যান্য জাতি। মিউনিসিপাল্ বার্ষিক আদায় (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৬৫১০৲ টাকা। এখানে পোষ্ট আফিস্ ও চিকিৎসালয় আছে। সমস্ত জেলার মধ্যে ইল্‌কাল্‌ই প্রধান বাজার। রেশম ও তুলা-জাত দ্রব্য, ধান্য ও অন্যান্য শস্যই, প্রধান পণ্য-দ্রব্য। এখানকার কার্পাসনির্ম্মিত সাড়ী, নিজাম রাজ্যে, পুনা, সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। লিঙ্ সাগরস্থ নিজামের সৈন্য-নিবাস, ইল্‌কাল হইতেই খাদ্যোপযোগী শস্য প্রাপ্ত হয়।

ইলাম-বাজার—বাঙ্গালা দেশস্থ বীরভূম জেলার একটী নগর, অজয় নদীর উপরে অবস্থিত। লাক্ষা-নির্ম্মিত অলঙ্কার ও নানাবিধ ব্যবসার জন্য উহা প্রসিদ্ধ। নিকটস্থ

জঙ্গল হইতে লাক্ষা আনীত হয়। আর্কিন এণ্ড কোম্পানি এই স্থানে একটী লাক্ষার কারখানা খুলিয়াছিলেন। কিছু দিন হইল, তাহা তুলিয়া লইয়াছেন। এখানে এতদ্দেশীয়-দিগের ১০।১২ দশ বারটী কারখানা আছে।

(১) ইলিচ্‌পুর—বেরারের কমিসনারের অধীনস্থ একটী জেলা। বেরার নামে খ্যাত প্রদেশগুলির মধ্যে এইটীই দূরতম উত্তরাংশে স্থিত। ইহার পশ্চিমোত্তরে এবং উত্তর দিকে মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত নিমার, হোসাঙ্গবাদ ও বিটল এই তিনটী জেলা; পূর্ব্বে বর্দ্ধা-নদী ও অমরাবতী জেলা; দক্ষিণে ও পশ্চিমে অমরাবতী ও আঁকোলা জেলাদ্বয়। পরিমাণ-ফল ১৩১১½ বর্গ ক্রোশ অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৩১৩৮০৫। ইলিচপুর নগরই এই জেলার সদর।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।—এই জেলার উত্তরাংশ সমস্তই—মেলঘাট বা গোয়ালগড় নামক পাহাড়-শ্রেণীতে ও উপত্যকায় পরিব্যাপ্ত। এই পাহাড়-শ্রেণী ও উপত্যকা-গুলি, সাতপুরাদ্রি-মালার একাংশ। এই পাহাড়গুলির মধ্যে সর্ব্বোচ্চটী, পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং সমুদ্র-তল হইতে ২৬৫৮ হস্ত উচ্চ। ইলিচপুর জেলার দক্ষিণ দিকের ভূমি সমতল এই দিকে পূর্ণা ও বর্দ্ধা-নদীর উপনদী সকল প্রবাহিত। ইলিচপুর সহর হইতে অমরাবতী পর্য্যন্ত রাস্তাই পাকা। আরও অনেকগুলি রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে। এই প্রদেশের মেটে পথে (খুসকী পথে) বৎসরের মধ্যে ৮ মাস কাল মাত্র যাতায়াত করা যায়। পার্ব্বত্য অঞ্চলে গমনাগমনের জন্য নিম্নলিখিত গিরি-পথ কয়টীই প্রধান;—পূর্ব্বদিকে হেবরা দেবী, কোমি ও মালহার এবং পশ্চিমে ডুলঘাট ও বিন-নগর। ইহার মধ্যে কোমি, মালহারা ও ডুলঘাট দিয়াই লোক জন ও শকটাদি যাতায়ত করিতে পারে। এ অঞ্চলে আম্রের বাগান বহুল দেখা যায়। ঐ সকল উদ্যানের পাদপ-নিচয়, হরিত-বর্ণ ফলগুচ্ছে ভূষিত হইলে, সমস্ত প্রদেশকে এক প্রমোদ-কুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

ইলিচপুর জেলায় ৬ ছয়টী নগর ও ৭২৭ সাত শ সাতাশটী গ্রাম আছে। অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর ভাগ, মুসলমানের ৯।১০ নয় দশ গুণ হইবে। হিন্দুরা, অধিকাংশই শৈব। উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রীয় ও গন্দই এখানকার চলিত ভাষা।

তুলা, ধান্য, উত্তম-জাতীয় গম, তিসি ও মসিনা এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এই সকল শস্য, ঘৃত ও বনজাত কাষ্ঠ, এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। উপত্যকাংশে তুলাই অধিক জন্মে; কিন্তু আম্র, লেবু, পিয়ারা, তিন্তিড়ি, আঙ্গুর ও দাড়িমের উৎপত্তিও বহুল হইয়া থাকে। শোনা যায়, মেলাঘাটে "চা" চাষও হইতেছে। ইংলণ্ডীয় ও এদেশীয় বস্ত্র, লৌহ ও তাম্র নির্ম্মিত যন্ত্র ও পাত্র সকল, তামাক, লবণ—এ স্থানের প্রধান আমদানী দ্রব্য।

ইতিহাস।—ইলিচপুর নগরের ইতিহাসে সমস্ত জেলার বিবরণ অন্তর্নিবিষ্ট। এই ইলিচপুর নগর, এক সময়ে সমুদয় দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-শক্তির এক প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল।

প্রবাদ আছে, ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে ইল নামক এক জৈন রাজা, ওয়াডগাঁওয়ের নিকটস্থ খাঞ্জামা নগর হইতে আসিয়া এই নগর স্থাপিত করেন। নগরটী যে সময়েই স্থাপিত হউক না কেন, ইহা ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক নগর গুলির মধ্যে অন্যতম। কিছু কাল ব্যাপিয়া ইহা একটী সুবিখ্যাত রাজধানীও হইয়াছিল। যৎকালে নিজাম উল্মুলক, দাক্ষিণাত্যের প্রধান অধিপতি হন, তখন একজন প্রতিনিধিকে এই নগরের আধিপত্যে স্থাপিত করেন। এই সময় হইতেই ইহার অবস্থা মন্দ হইতে আরম্ভ হয়। ইবাজ খাঁ, এইরূপে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম অধিপতি নিযুক্ত হন এবং ৫ বৎসর আধিপত্য করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী সুজায়ত খাঁ, মহারাষ্ট্রীয় সেনানী রঘুজি ভোঁসলার সহিত বিবাদ করিয়া যুদ্ধে নিহত হন, তদীয় কোষাগারও বিজেতা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। তাহার পর ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে সেরিফ খাঁ, তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু তিনি ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, নিজাম কর্ত্তৃক পদচ্যুত হন। তৎপরে নিজামের পুত্র আলিজা বাহাদুর, ইলিচপুরের অধিপতি স্থিরীকৃত হইলেন। কিন্তু তিনিও নিজে উপস্থিত না থাকিয়া প্রতিনিধি দ্বারা রাজ-কার্য্য চালাইতেন। তৎপরে তাঁহার উত্তরাধিকারী সালাবাত খাঁ, ২ দুই বৎসর রাজ্য করেন। কিন্তু এই ২ দুই বৎসরেই ইলিচপুর নগরের অনেক প্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি এক জন সাহসী বীর ছিলেন। এই সময়ে টিপু সুলতানের সহিত নিজামের যুদ্ধ ঘোষণা হইলে, তিনি যুদ্ধে সাহায্য করিতে আদিষ্ট হন এবং তথায় বিশেষ সুযশঃ লাভ করেন। তিনি কার্দালের যুদ্ধে ও তৎপরে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ওয়েলেস্লির সৈন্য-দলে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন। তদীয় পুত্র নামদার খাঁ, ইলিচপুর জেলায় দুই লক্ষ টাকার একটী জায়গির এবং অপর একটী তদ্রূপ জায়গির লাভ করিয়া নবাব উপাধি লইয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করিয়া যান। তাঁহার পিতা, তাঁহাকে ওয়েলেস্লির তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। ইলিচপুর ব্রিগেডের সৈন্যের ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে একটী জায়গিরও প্রদত্ত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি বকেয়া খাজনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া অধিকাংশ জায়গিরই ত্যাগ করেন। কেবল বার্ষিক ৩৫০০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি, তাঁহার অবশিষ্ট থাকে। তৎপরে তাঁহার উত্তরাধিকারী ইব্রাহিম খাঁ, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গত হন। তখন তাঁহার শ্বশুর গোলাম হাসন, ৭ সাত লক্ষ টাকা নজর দিয়া উক্ত সম্পত্তি লাভ করেন এবং নবাব উপাধি প্রাপ্ত হন। স্থানীয় কোন ধনীর নিকট হইতে তিনি উক্ত ৭ সাত লক্ষ টাকা ঋণ করেন। এই ধনীর আবেদনে ইলিচপুরের প্রাসাদ ও নবাবের অন্যান্য সম্পত্তি রাজ-সরকারের অধীনে রহিয়াছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বেরারের অন্যান্য জেলার সহিত ইলিচপুর জেলাও, নিজামের নিকট হইতে ব্রিটিস্ গবর্ণমেণ্ট লাভ করেন। যে সময়ে নিজাম উল্মুল্ক, দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, সেই সময় হইতে ইলিচপুরের ইতিহাস, সাদি খাঁ ও নাসি খাঁ নামক দুই জন পাঠান জমিদার-বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। এই দুই জন পাঠান, প্রথমে অশ্ব-ব্যবসায়ী হইয়া জয়পুর হইতে হায়দ্রাবাদে আসেন এবং তথায় নিজাম নাসির জঙ্গ

বাহাদুরের সুদৃষ্টিতে পড়িয়া শীঘ্রই স্বকীয় উন্নতিসাধন করেন। প্রায় ইলিচপুরের সমস্ত শাসন-কর্ত্তা ইহাঁদের বংশ হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন।

ইলিচপুর জেলায় ১৮৮২।৮৩ খৃষ্টাব্দে ৬ ছয় জন বিচারক ও ১০ দশ জন অধীনস্থ বিচারক ছিলেন। রাজস্ব ১২৩৭৫২০৲ টাকা। পুলিশ-রক্ষার ব্যয় ৪২৯৯০৲ টাকা। ইলিচপুর, আঞ্জাগাঁও, পাবতবাদা ও কারঞ্জাগাঁও—এই জেলার প্রধান নগর। ইলিচপুর সহরে একটী-মাত্র মিউনিসিপালিটি আছে। এই জেলায় একটীও রেলওয়ে-লাইন নাই। অত্রত্য স্কুল-সংখ্যা ১৩৫টী। এখান হইতে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বহির্গত হয়।

জল-বায়ু-মৃত্তিকার অবস্থা।—কার্ত্তিকের শেষার্দ্ধ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত এখানে শীতকাল বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু তখনও মধ্যাহ্নে সূর্য্যের কিরণ, অতিশয় প্রখর। অথচ রাত্রিতে বিলক্ষণ শীত। জ্যৈষ্ঠের শেষ ভাগ হইতে ভাদ্রের প্রথমার্দ্ধ অবধি বর্ষাকাল। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস, সাধারণতঃ অস্বাস্থ্যকর। এই সময়ে বিসূচিকা, বসন্ত, জ্বর ইত্যাদির ঘোর প্রাদুর্ভাব। বৈশাখ মাসে বায়ুর উষ্ণতা ৯৭° ফারেন্-হীট্। পৌষ মাসে ৫৬° ফারেন্-হীট্। এই জেলায় ৬ ছয়টী ডিস্পেনসারী আছে। বসন্ত-নিবাররণ জন্য বিস্তর টিকা দেওয়া হইয়া থাকে।

(২) ইলিচপুর—বেরারের অন্তর্গত ইলিচপুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। পরিমাণ-ফল ২৩৪½ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ১৪৮০৪১। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা কিছু অধিক হইবে। এই তালুকে ৫ পাঁচটী সহর এবং ২০৮ দুই শত আট খানি গ্রাম আছে। এখানে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) ৪ চারিটী দেওয়ানি ও ৬ ছয়টী ফৌজদারী আদালত এবং ৬ ছয়টী পুলিশ থানা আছে। মোট রাজস্ব ৪০৩৫৯০৲ টাকা।

(৩) ইলিচপুর—বেরারের অন্তর্গত ইলিচপুর জেলার প্রধান নগর। এখানে একটী মিউনিসিপালটী আছে। অক্ষান্তর ২১° ১৫′ ৩০″ উত্তর, দ্রাঘিমান্তর ৭৭° ২৯′ ৩০″ পূর্ব্ব। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ২৬৭২৮। হিন্দুর সংখ্যা, মুসলমানের প্রায় তিনগুণ হইবে। নগরটী এক-সময়ে অতি-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। তখন ইহা একটী প্রধান রাজধানী ছিল। নিজাম-বংশের স্থাপয়িতা নিজাম উল্‌মুলক, যখন স্বাধীন হন, তখন হইতে ইহার সেই সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে। তখন এক জন সামান্য রাজপ্রতিনিধি, ইহার আধিপত্যে নিযুক্ত হন। সেই সময়েই ইহার সমৃদ্ধি দিন দিন ক্ষীণতর হইতে থাকে। এখনও এই নগরে অনেক সুন্দর অট্টালিকা আছে।

দুর্গা-নামে এখানে একটী সুন্দর সমাধি-মন্দির আছে। ৪০০ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নবাব দুলা রহমান নামক এক ব্যক্তির স্মরণার্থ বাহমিনী-বংশীয় অনেক অধিপতি ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বতন অধিপতি সালাবাত খাঁ ও ইস্‌মেল খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রাসাদে অনেক সুন্দর কারু-কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এক্ষণে ক্রমশঃই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে সালাবাত খাঁ কর্ত্তৃক আরব্ধ আরও কয়েকটী সুন্দর সমাধি-গৃহ আছে। এস্থলে একটী প্রস্তরময় সুন্দর কূপ দেখা যায়। প্রবাদ আছে, ইহা ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত

হইয়াছিল। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে সুলতান খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী গর্হি নামক দুর্গও এখানকার এক দ্রষ্টব্য বস্তু। এখানে একটী ইংরেজী-মারাঠি স্কুল ও একটী বালিকা-বিদ্যালয় আছে। মিউনিসিপাল বার্ষিক আয় (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ১৪৮৭০৲ টাকা। এই নগরের এক ক্রোশ দূরে বিচান-নদীর তীরে এক সেনা-নিবাস আছে। এই স্থান হায়দরাবাদ কাণ্টনমেণ্টের অধীন। সকল প্রকার অস্ত্রবিশিষ্ট এক দল সৈন্য প্রায়ই বিদ্যমান থাকে। অত্রত্য সেনা-নিবাস কিন্তু তাদৃশ স্বাস্থ্যময় নয়। এই স্থান একটী ইংরাজি-স্কুল এবং নিকটস্থ বাজারে অপর একটী স্কুল ও একটী বালিকা-বিদ্যালয় আছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে একটী উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ডেপুটি কমিসনারের এবং আসিষ্টাণ্ট কমিসনরের আদালত ও একটী কোষাগার আছে।

ইলোরা এলুরু (ভেরুল)—দাক্ষিণাত্যে নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। আরাঙ্গবাদ হইতে ৬৷৷ সাড়ে ছয় ক্রোশ এবং দৌলতাবাদ হইতে ৩৷৷ সাড়ে তিন ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে (অক্ষান্তর ২০° ২′ উত্তরে, দ্রাঘিমান্তর ৭৫° ১৩′ পূর্ব্বে) অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৭৪২। এই গ্রামের কতক অংশ, প্রাচীর-বেষ্টিত। ইহাতে একটী মুসলমানের ধর্ম্মমন্দির আছে। ঐ মন্দির, সমগ্র দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে মহারোগ্যকারী বলিয়া বিখ্যাত। তদ্ব্যতীত ইহা অনেকগুলি পর্ব্বত-গুহার জন্য এবং হিন্দু জৈন মন্দিরের নিমিত্ত বিখ্যাত। ঐ সকল মন্দিরে হিন্দুর নানাবিধ দেবমূর্ত্তি, জৈন এবং বৌদ্ধের দেবমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। আরঙ্গবাদ হইতে একটী পথ, ঐ গুহা সকলের সহিত সংযুক্ত। এই পথ, দৌলতাবাদ দুর্গ বেষ্টন করিয়া এবং পিপ্পলঘাট উত্তীর্ণ হইয়া রেওজাতে উপস্থিত হইয়াছে। এই রেওজার নিম্ন দেশে গুহা সকল নিখাত আছে। ঘাটের চতুর্দ্দিকে হিন্দুদিগের পবিত্র পিপ্পলবৃক্ষ অবস্থিত থাকায় উহাকে পিপ্পল-ঘাঠ বলা হয়। এই দুর্গম ঊর্দ্ধ পথের মধ্যস্থলে দুইটী স্তম্ভে আওরঙ্গজেবের কাছারির কতকগুলি সদস্যের নাম লেখা আছে। তাহাতে বোধ হয়, উক্ত সভ্যগণই, গুহায় যাইবার পথ পরিষ্কার ও সহজ করিয়াছিলেন। দশম খৃষ্টাব্দীয় আরবদেশীয় বিখ্যাত ভৌগোলিক মাসুদির গ্রন্থে ঐ গুহাগুলি কেবল প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরে ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে আলা উদ্দিন এবং তাঁহার সেনানীগণ, এই গুহায় আগমন করেন। ডাউ (Dow) সাহেবের মতে এই সময়েই গুজরাটের একটী হিন্দু-রাজকুমারী এক জন মুসলমানের ভয়ে ভীত হইয়া এই গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে ধৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত ও সম্রাটের পুত্রের সহিত বিবাহিত হন।

য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে থেভ্নট সাহেবই, সর্ব্বপ্রথমে এই গুহাগুলির বর্ণনা করেন। সম-সাময়িক ভ্রমণকারীদিগের ন্যায় তিনিও ইলোরার দেবমূর্ত্তি সকলের সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। যে পর্ব্বতে এই গুহাগুলি ক্ষোদিত আছে, সেটী অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি। ইলোরাস্থিত গুহাগুলিতে দেখিবার বিষয় এই যে, সেগুলি পর্ব্বতের ক্রম-নিম্ন দেশে ক্ষোদিত এবং অন্যত্র গুহাগুলির ন্যায় পর্ব্বতের সমভাবে—লম্বমান অংশে নহে। এই জন্যই উহাদের প্রত্যেকের

সম্মুখ-দেশে বিস্তৃত সমতল অনাবৃত-স্থান পতিত আছে। আর, কাহারও কাহারও চতুর্দ্দিকে প্রবেশ-দ্বার-যুক্ত প্রস্তরময় একটী প্রাচীর দণ্ডায়মান আছে। এরূপ থাকায় বহিঃস্থ পথিকগণ, প্রাচীর-মধ্যস্থ গুহার বিষয় কিছুই জানিতে পারে না। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া পর্ব্বতের গাত্রে এই গুহা-সকল ক্ষোদিত আছে। ঐ গুহা-সকল বৌদ্ধ, হিন্দু এবং জৈন এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত। এতৎ স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা এই সকল গুহার অধিকাংশেরই বিশেষ বিশেষ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু এক দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অপর দিক্ পর্য্যন্ত সংখ্যানুসারে আখ্যাত করিলেও তুল্যরূপ সুবিধা হইতে পারে। এইরূপ করিলে সর্ব্ব-দক্ষিণে বৌদ্ধীয় গুহা হইতে আরম্ভ করিয়া উহাদের দ্বাদশটী অতিক্রম করিয়া হিন্দুদিগের নিম্নতম সপ্তদশটী এবং উর্দ্ধতন গুলির উপরে জৈনদিগের পাঁচটীতে শেষ হয়। ইন্দ্রসভা বা জৈন গুহা-নিচয়ের নিকটেই একটী বৃহদাকার জৈন মূর্ত্তিও অবস্থিত আছে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কৈলাস মন্দিরই, এখানকার সর্ব্বপ্রধান অট্টালিকা। ফার্গুসন্ সাহেব বলেন এই মন্দিরটী ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্য্যের আশ্চর্য্য আদর্শ স্থল। ইহার সৌন্দর্য্য এবং বিচিত্রতা, পথিকদিগের মনে বিস্ময়োৎপাদন করে। ইহা কেবল পর্ব্বতমধ্যে ক্ষোদিত মন্দিরের অভ্যন্তর-স্থল নহে, কিন্তু সমভূমির উপর নির্ম্মিত মন্দিরের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ও মনোরম। পর্ব্বতটী ভিতর এবং উপর—উভয় দিকেই কির্ত্তিত হইয়াছে।

এই মন্দিরের মধ্য-ভাগের দৈর্ঘ্য ১৬৪ হস্ত, বিস্তার ১০০ হস্ত এবং উচ্চতা কোন কোন স্থানে ৬৬ হস্ত।

প্রবাদ আছে, অষ্টম শতাব্দীতে ইলিচপুরের রাজা ইলু অত্রত্য একটী নির্ঝরের জল হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া তাহার প্রতিদান-স্বরূপ ইলোরা নগর স্থাপন এবং এই মন্দির গঠন করিয়াছিলেন। বার্জেস্ সাহেব বলেন এই মন্দিরের স্থপতি-কার্য্য এবং অত্রত্য ক্ষোদিত মূর্ত্তি সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহা পাট্যাদকালস্থ পাপনাথ মন্দিরের পরবর্ত্তী কিন্তু সম্ভবতঃ তত্রত্য বিরূপাক্ষ-দেবের মন্দিরের পূর্ব্বকালীন কোন সময়ে এই মন্দিরের সমস্ত অংশই, যথাযোগ্যরূপে রঞ্জিত হইয়াছিল। তৎপরে আরও অনেকবার এবং সম্ভবতঃ ক্রমশঃ হীনতর ভাবে রঞ্জিত হয় বর্ত্তমান রঞ্জন অতি নিকৃষ্ট ভাবেই হইয়াছিল। কিন্তু এখনও স্তম্ভের উপরিভাগে কোন কোন স্থানে পূর্ব্বতর দুই তিনটী রঙ্গিন আবরণ পাওয়া যায়। তাহার তুলনায় অজন্তার রঞ্জন কার্য্য হীনতর বলিয়া বোধ হয়। সকল প্রকার ভাব-পূর্ণ পরস্পর যুদ্ধকারী বৃহদাকার হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জীবাকৃতিময় মন্দিরের তলদেশ, আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। তৎপরে নানাবিধ মনোরম ক্ষোদিত চিত্র-পূর্ণ ষোড়শটী বৃহৎস্তম্ভ এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্রতর স্তম্ভ বিশিষ্ট হল্‌ঘর, চতুর্দ্দিকস্থ বারান্দার উপরিস্থিত ছাদ এবং মন্দিরের বহিঃস্থ দালান এবং মূল-মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ মন্দির পাঁচটী এই সকলের নানাবিধ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বোধ হয় প্রাচীনতর অপর সমুদয় মন্দিরকে সৌন্দর্য্যে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যেই ইহা গঠিত হইয়াছিল।

SURFACE LINE OF ROCK
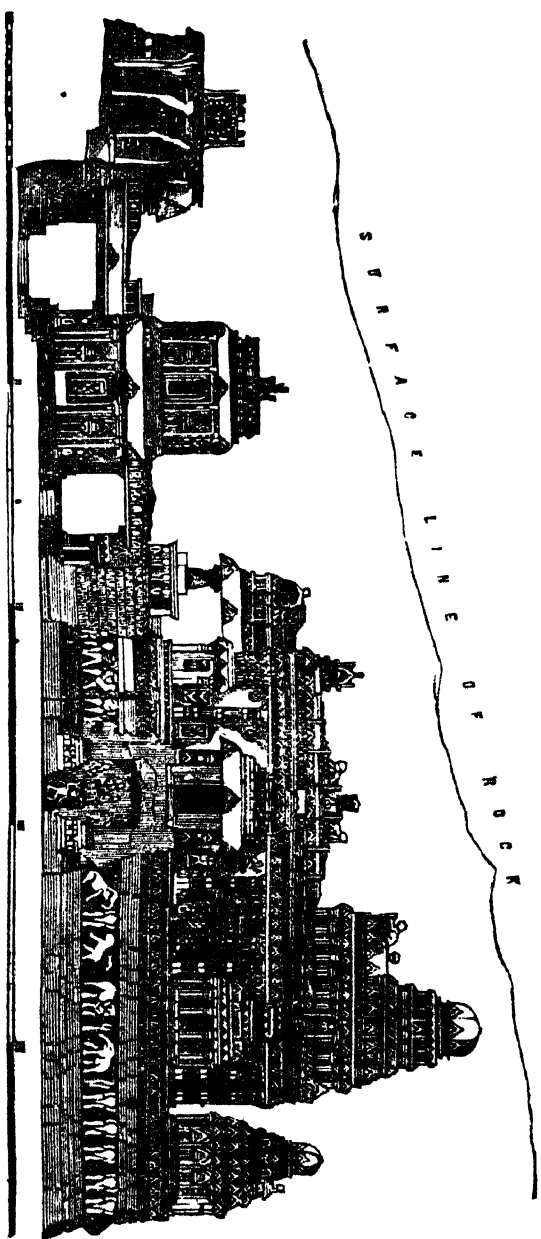
ইলোরার পর্ব্বত-গুহাভ্যন্তরস্থ মন্দির।

যদিও ইহা একটী শিব মন্দির কিন্তু ইহার চতুর্দ্দিকে বিষ্ণু এবং পুরাণোক্ত অন্যান্য সমুদয় দেবতার মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরের ক্ষোদিত দেব মূর্ত্তি সকল দেখিয়া বোধ হয়, যে ইহা স্মার্ত্তদিগের প্রাবল্য সময়ে গঠিত হইয়াছিল।

এই মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ এবং বহির্ভাগের কতক অংশ অগ্রে চূর্ণ মার্জ্জিত করিয়া পশ্চাৎ রঞ্জিত হইয়াছে। যেখানে এই রঞ্জন-কার্য্য দীর্ঘকাল উঠিয়া যায় নাই, সেই খানেই প্রস্তর ক্ষোদিত চিত্রগুলি ভ্রমণকারী অসংখ্য যোগী এবং দর্শকদিগের কৃত অগ্নির ধূমে সম্পূর্ণ কৃষ্ণাকৃতি হয় নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্বতন সমুদয় প্রস্তরময় মন্দির হইতে কৈলাস মন্দিরের পার্থক্য এই যে, ইহা নিকটস্থ পর্ব্বত হইতে ক্ষোদিত অভ্যন্তর এবং বহির্ভাগে ক্ষোদিত একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার চতুর্দ্দিকে ১৮৪ হস্ত দীর্ঘ ১০৩ হস্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড অনাবৃত স্থান। উহার সম্মুখ ভাগে শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবমূর্ত্তি-পূর্ণ প্রাচীর। তৎপরে দুই দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ-বিশিষ্ট মনোরম পথ। অনন্তর প্রথমেই একটী পদ্ম পুষ্পের উপরি উপবিষ্টা লক্ষ্মী-মূর্ত্তি। উহার পার্শ্বে হস্তি-মূর্ত্তি। তাহার পরে দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকাণ্ড হস্তীর আকৃতি। পরে পূর্ব্ব মুখে মন্দিরের বিস্তৃত দালানে উঠিয়া সম্মুখে নন্দীর মণ্ডপ। উহার দুই দিকে দুইটী ধ্বজ দণ্ড। প্রত্যেকে উচ্চতায় প্রায় ৩০ হস্ত। তদুপরি প্রায় তিন হস্ত উচ্চ ত্রিশূলাগ্র।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হোলকার, ইংরেজদিগকে ইলোরা প্রদান করেন। ইংরেজেরা ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের সন্ধিসূত্রে নিজামকে উহা অর্পণ করেন।

ইলোরার গুহা সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রবাদ আছে ইলু নামক নরপতির রাজত্ব কালে ইহা খোদিত হয়; কিন্তু ইহার আয়তন এবং হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন মতাবলম্বীদিগের দেব মূর্ত্তি সকল এতন্মধ্যে বর্ত্তমান থাকায়, ইহা বহুল রাজগণ কর্তৃক সম্পাদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

একটী অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার লোহিত গ্রাণিট পর্ব্বতাভ্যন্তর অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া ক্ষোদিত হইয়া এই বিখ্যাত গুহা সকল প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার স্থানের ব্যাস প্রায় ২॥০ ক্রোশ হইবে। স্থপতি কার্য্যে যত প্রকার গঠন ও অলঙ্কার পারিপাট্য থাকিতে পারে, সে সকলই এই গুহা সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—বহু ভূষণে বিভূষিত স্তম্ভ, অলিন্দ, চাঁদনী, সোপান-শ্রেণী, সেতু, শিখর, গুম্বজাকার ছাদ, বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি এবং ভিত্তি সংলগ্ন বহুবিধ ক্ষোদিত কারুকার্য্য এখানে ইহার কিছুরই অভাব নাই, অত্রত্য গৃহ সকল প্রায় দ্বিতল। এক একটী ত্রি-তলও বটে। কিন্তু প্রথম তল মৃত্তিকাদিতে প্রায় পরিপূর্ণ হওয়ায় তাহার মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ গুহাস্থ ইন্দ্র সভা অতীব বিস্তৃত ও মনোহর ইহার অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভ সকল ইদানীন্তন কালের স্তম্ভের ন্যায় নহে—একটী হাঁড়ী বিপর্য্যস্ত ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাকে পদ্ম-পাপড়ী দ্বারা বেষ্টন করিলে, অত্রত্য স্তম্ভ বোধিকার গঠন প্রণালী কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে। এই বোধিকা-গুলি বড়ই শ্রীসম্পন্ন।

ইহার মনোহর ভাস্কর্য্য এবং সমুদয় স্তম্ভের বিভূষণ সংযুক্ত গঠন দেখিলে হৃদয়, যে অপূর্ব্ব-ভাব-তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে অপরন্তু এই বোধিকা সকল উৎকল দেশীয় বিমান সকলের চূড়ার আকারে ক্ষোদিত। আমূলকী ফলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার পল বিশিষ্ট বলিয়া উহা আম্লাশীলা নামে খ্যাত। এই গুহার প্রশস্ত গৃহ সকলের বহিঃ-প্রকোষ্ঠে শোভনীয় কীলক শ্রেণী বা গরাদিয়া সকল কর্ত্তিত হইয়াছে। অপর, ইহার প্রবেশ-দ্বার, অতীব মনোহর ভাবে গঠিত দ্বাদশটী নাতিস্থূল স্তম্ভোপরি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত। ইহার সুন্দর গুম্বজ অদ্যাপি সুশোভিতই রহিয়াছে।

ইন্দ্র-সভার অভ্যন্তরে তিনটী গুহা আছে। একটীর ৬০ পাদ দীর্ঘতা এবং প্রস্থ ৪৮ পাদ; ইহার ভিত্তিতে অনেকগুলি বুদ্ধ মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ইহার গর্ভস্থানে ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। দ্বিতীয় গুহা গর্ভের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানীর মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে পরশুরামের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। তৃতীয় গুহার বহিঃ-প্রকোষ্ঠে গজারূঢ় পুরুষ এবং শার্দ্দূল-পৃষ্ঠে উপবিষ্টা এক স্ত্রী-মূর্ত্তি থাকায়, ইঁহাদিগকে ইন্দ্র ও শচী অনুমান করিয়া ব্রাহ্মণেরা এই গুহাত্রয়ের নাম ইন্দ্রসভা রাখিযাছেন। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, এই স্ত্রী-মূর্ত্তিই প্রথম ও দ্বিতীয় গুহায় ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী বলিয়া অভিহিত।

"দুমার লয়না" অর্থাৎ বিবাহশালা নামে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অপর এক গুহা আছে। ইহা ১২৫ হস্ত দীর্ঘ এবং ১০০ হস্ত প্রস্থ। এই গুহার মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে অনেক দেব-দেবীরও মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হর-পার্ব্বতীর বিবাহ-ব্যাপার ক্ষোদিত থাকায় এই গুহার নাম বিবাহশালা হইয়াছে। ইলোরার আর একটী প্রসিদ্ধ গুহার নাম কৈলাস। ইহা ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন মধ্যে নির্ম্মিত। ইহার প্রবেশ-দ্বারে একটি চমৎকার নহবৎ-খানা। ইহার মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দেবতার লীলা-প্রকাশক মূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয় যে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাঙ্গনের তিন দিকে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ এবং তাহার ভিত্তিতে বহুল দেবাদির মূর্ত্তি সকল ক্ষোদিত। গোপুরের পশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ। ইহাতে পাঁচটী মন্দির। মধ্য-মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহা ৪৪ হস্ত দীর্ঘ এবং ৩৭ হস্ত প্রস্থ। এই মন্দির সকল ক্ষোদিত গজ ও শার্দ্দূল-যুক্ত উপানোপরি স্থাপিত। এই গুহার পশ্চাদ্ভাগে একটী চাঁদনীর মধ্যে এত দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে যে, ইহাকে হিন্দু দেবতাদিগের প্রদর্শন-গৃহ (Exhibition room) বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই গুহার সন্নিকটে অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বত খুদিয়া তৎসমুদয়ই প্রস্তুত হইয়াছে। স্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর, অলিন্দ, গুম্বজ এবং অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি এ সকলই এক খণ্ড প্রস্তর। ইহার কোন অংশে গাঁথুনি নাই। এই সমস্ত পর্ব্বত ক্ষোদিত করিতে কত সময়, কত শ্রম ও কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে স্তব্ধ হইতে হয়। ব্রাহ্মণদিগের মতে এই বিখ্যাত গুহা ৭৮৯৪ বৎসর ক্ষোদিত হইয়াছে।

কিন্তু একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। কারণ, এলিফেন্টা কেভস্ (Elephanta Caves) প্রভৃতির গুহা সকল অপেক্ষা ইহাকে আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। ইহার আশ্চর্য্য গঠন-প্রণালী এবং চমৎকার কারুকার্য্য-গুলিই তাহার প্রমাণ। এই গুহা নির্ম্মাণকালে হিন্দুদিগের স্থপতি কার্য্য যে, মহোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ, ইহা হিন্দু কর্ত্তৃক বৌদ্ধদিগের দূরীকৃত হওয়ার অনেক পূর্ব্বে যে প্রস্তুত হয়, তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইলোরার গুহার প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হইলে, মনে বিস্ময়ের উদয় হয়। যাঁহাদিগের জ্ঞান প্রভাবে কল্পনাতীত ভারযুক্ত ছাদ সকল এরূপ সুন্দর ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তম্ভ শ্রেণীতে স্থাপিত হইয়াছে, সেই শিল্পীদিগের অলৌকিক বুদ্ধি ও শিল্প কৌশল অনুভব করিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। *

(১) ইলোল গুজরাট প্রদেশে মহিকান্ত পলিটিকাল এজেন্সির অধীন একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৫৬০৩। রাজস্ব ১৫৬৪০৲ টাকা। তুলা ও গম, প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এখানে একটী স্কুল আছে। অত্রত্য অধিপতি মাকোয়ানা কোলিস্ বংশীয় হিন্দু। এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন। রাজার পোষ্য-পুত্র গ্রহণের শক্তি নাই। বর্ত্তমান রাজা, ঠাকুর ভক্ত সিংহ কাটিওয়ারস্থ রাজ-কোটের রাজকুমার কলেজে শিক্ষিত। ইলোল-রাজ গুই-কোয়ারকে বার্ষিক ১৮৬০৲ টাকা এবং ইদার রাজকে ৪৩০৲ টাকা খাজনা দেন।

(২) ইলোল—গুজরাটস্থ ইলোল নামক রাজ্যের রাজধানী। এখানে একটী ডিস্পেন্সারী আছে। অক্ষান্তর ২৩° ৫৯′ উত্তরে, এবং দ্রাঘিমান্তর ৭৩° ১৮′ পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত।

(১) ইস্‌লামাবাদ—কাশ্মীর রাজ্যস্থ একটী নগর। ইহা ঝিলাম নদীর উত্তর তীরে অক্ষান্তর ৩৩° ৪৩′ উত্তরে ও দ্রাঘিমান্তর ৭৫° ১৭′ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে নদীর উপরে একটী কাষ্ঠময় সেতু আছে। নগরের অনতিদূরে একটী নির্ম্মল-জলপূর্ণ নির্ঝর। প্রবাদ এই নগরে কাশ্মীরী সাল, নানাবিধ ছিটের কাপড় কার্পাস বস্ত্র ও পশমী কাপড় বহুল পরিমাণে নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রাচীন নাম অনন্ত নাগ, পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা ইস্‌লামাবাদ নামকরণ করেন। এই স্থান হইতে ৩০ ত্রিশ ক্রোশ দূরস্থিত সুবিখ্যাত অমরনাথ শিব-মন্দির-যাত্রীরা এই স্থানে প্রায়ই বিশ্রাম করেন এবং খাদ্যাদি সঞ্চিত করিয়া লন। সমগ্র কাশ্মীর দেশে সমৃদ্ধি অংশে এই নগরটী দ্বিতীয়। ঝিলমবাহী জাহাজ সকল ইহার পর আর উপরে যাইতে পারে না। এই নগরে ১৫ পোনেরটী মসজিদ রহিয়াছে। এখানে ক্রোকস্ পুষ্প প্রচুর জন্মিয়া থাকে। এই পুষ্প হইতে জাফ্‌রান প্রস্তুত হয়। দৃঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাসী হিন্দুরা এই পুষ্প মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন।

* বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রণীত "আর্য্য-জাতির শিল্প-চাতুরী" নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

(২) ইস্লামাবাদ—বাঙ্গালা দেশে চাটিগাঁ জেলার প্রধান নগর।

(১) ইসাখেল –পঞ্জাব প্রদেশে বানু জেলাব একটী তসিল। এই তসিলটী চিচালী ময়দানী পাহাড় শ্রেণী ও সিন্ধুনদী দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। ইহার উত্তর প্রান্ত ভাঞ্জিখেল প্রদেশ নামে আখ্যাত। এইস্থান জঙ্গলপূর্ণ এবং অতিশয় বন্ধুর। ভাঞ্জিখেল, বিখ্যাত খাটক জাতির এক সম্ভ্রান্ত শাখা। কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা অধিক নহে। প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ভঞ্জিখেলেরা, এই প্রদেশ অধিকার করেন। আফগান জাতিব ইসাখেল-নাম্নী একটী শাখা হইতে এই ভূভাগেব নামকরণ হইয়াছে। শেষোক্ত আফাগান জাতিবা ষোড়শ শতাব্দীতে এই স্থানে আসিয়া বাস করে। মোগলেরা, দীর্ঘকাল ইহাদিগকে অধীনতা স্বীকার করাইতে পারে নাই। পরে ইহারা নবাব দেরা ইস্মাল খাঁর অধীন হয়। ইসাখেল, তসিলের পরিমাণ ৩৩৭৷৷০ বর্গ ক্রোশ। তন্মধ্যে ৬৪ বর্গ ক্রোশ পরিমিত স্থানে শস্যের আবাদ হয়। উৎপন্ন শস্যেব মধ্যে গম, যব ও বাজরাই—প্রধান। তসিলের রাজস্ব ৬৩৬১০৲ টাকা। অধিবাসীর সংখ্যা ৫৯৫৪৬। তন্মধ্যে মুসলমানের ভাগ, হিন্দুর ৯।১০ গুণ বেশী। গ্রাম-সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৪৭।

তসিলস্থ জমিদারেরা প্রায়ই ন্যায়জী-নামক আফগান জাতীয়। কিন্তু তাহারা, এই স্থানে দীর্ঘকাল বাস বশতঃ আপনাদের প্রাচীন জাতিভাষা ভুলিয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে প্রজাদিগের পঞ্জাবী ভাষায় কথাবার্ত্তা সম্পন্ন করে। তসিলে একটী দেওয়ানি ও একটী ফৌজদারী আদালত এবং দুইটী পুলিশ থানা আছে।

(২) ইসাখেল—পঞ্জাবস্থ বানু জেলার অধীনস্থ ইসাখেল তসিলের সদর নগর। এতোয়ার দেশবাদ হইতে ২১ ক্রোশ পূর্ব্বে সিন্ধুনদীর দক্ষিণ তীরে (অক্ষান্তর ৩২° ৪০′ ৫০″ উত্তরে এবং দ্রাঘিমান্তর ৭১° ১৯′ পূর্ব্ব) অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৬৬৯২। আহম্মদ খাঁ নামক মুসলমান সেনানী, নগরের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তা, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরটী সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ম্মিত হয় নাই। বাজার, গলি সকল সঙ্কীর্ণ; বক্র ও কদর্য্য। স্থানীয় বানিজ্য যৎসামান্য। ইসাখেল বাসী খাঁরা সিন্ধুনদীর বাম-তীরস্থিত ন্যাবজী আফগান জাতির শীর্ষস্থানীয়। তসিলী নামক প্রাচীন দুর্গে এক্ষণে পুলিশ থানা হইয়াছে। এখানে সরাই ও একটী ডিস্পেনসারী আছে। অত্রত্য তৃতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালটীর বার্ষিক আদায় (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৩৫৬০৲ টাকা।

ইসৌলী—অযোধ্যা প্রদেশের সুলতানপুর জেলার অধীন মুসাফারখানা নামে তসিলের মধ্যে একটী পরগণা। ইহার উত্তরে পশ্চিমরথ ও খান্দাউস পরগণা, পূর্ব্বে সুলতানপুর বারৎসা পরগণা, দক্ষিণে আমেথি ও সুলতানপুর পরগণাদ্বয় এবং পশ্চিমে জগদীশপুর পরগণা। অতি প্রাচীনকালে ভার জাতিরা ইহার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে এক-দল ক্ষত্রিয়, তাহাদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়া দেন। এই ব্যাপারে পাতসা আলাউদ্দিন, সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত ক্ষত্রিয়দিগকে ভালি সুলতান উপাধি প্রদান করেন।

ইহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি উক্ত উপাধি ধারণ করিতেছেন। পরিমাণ ফল ৭৪ বর্গ ক্রোশ। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৯৭৭২০৲ টাকা। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৭৩৫৯৩ জন, ৯৭৪৯ মুসলমান।

ইস্‌লামগড়—(অথবা নোহার)—রাজপুতনার সীমার অনতিদূরে পঞ্জাব দেশের বাহবলপুর নামক রাজ্যের দুর্গ। খাঁপুর হইতে যশল্মীরগামী পথের উপর শেষোক্ত নগর হইতে ৩২॥ ক্রোশ উত্তরে (অক্ষান্তর ২৭° ৫০′ উত্তরে ও দ্রাঘিমান্তর ৭০° ৫২′ পূর্ব্বে) অবস্থিত। দুর্গটী প্রাচীন ধরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত এবং চতুর্দ্দিকে ২০ হস্ত হইতে ৩৩ হস্ত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। নিকটে প্রায় চতুর্দ্দিকেই পাহাড় থাকায়, দুর্গ রক্ষা করা তদ্রূপ সুবিধা-জনক নহে। প্রাচীর মধ্যে কতকগুলি অট্টালিকা এবং বহির্দ্দেশে অল্প সংখ্যক গৃহ রহিয়াছে। দুর্গটী পূর্ব্বে যশল্মীরের রাজপুতদিগের অধিকারে ছিল; কিন্তু পরে বহবলপুরের খাঁ বাহাদুরেরা বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া লন।

ইস্‌লাম নগর—পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বদায়ুন জেলাস্থ বিসৌলি তসিলের একটী নগর। বিসৌলি হইতে সাম্ভলগামী পথের উপর শেষোক্ত নগর হইতে ৬ ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৫৮৯০। তন্মধ্যে হিন্দু প্রায় মুসলমানের দ্বিগুণ। নগরে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুলিশ থানা, স্কুল, সরাই, পোষ্টাফিস, ডিস্পেন্‌সারি ও খোঁয়াড় আছে। প্রত্যেক সোমবার ও শুক্রবারে একটী হাট বসিয়া থাকে। পুলিশ রক্ষার জন্য অধিবাসিগণের নিকটে যৎসামান্য ট্যাক্স আদায় হয়। নগরের প্রান্তভাগে আম্রোদ্যান বহুল দৃষ্ট হয়।

ইস্কার্দ্দু (অথবা স্কার্দ্দু)—কাশ্মীর দেশে বাল্টি প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান নগর। (অক্ষান্তর ৩৫° ১২′ উত্তরে ও দ্রাঘিমান্তর ৭৫° ৩৫′ পূর্ব্বে)। এই নগর ৯॥০ সাড়ে নয় ক্রোশ দীর্ঘ ও ৩॥০ সাড়ে তিন ক্রোশ বিস্তৃত, একটী উর্দ্ধ ভূমিতে সমুদ্র তল হইতে ৭৭০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিকে উচ্চ পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত। এই স্থানে সিন্ধু নদের সেগার শাখার সহিত সঙ্গমস্থলে একটী প্রস্তরময় দুর্গ আছে। সমভাবে উচ্চ একটী পাহাড়ের উপরি ভাগে নদী-তল হইতে ৫৪০ হস্ত উর্দ্ধে দুর্গ দণ্ডায়মান। কেহ কেহ বলেন, এই দুর্গ, জিব্রাণ্টরের ন্যায় অভেদ্য হইতে পারে। দুর্গের নিম্নদেশে নিকটস্থ, ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন কুটীর সকল দেখিয়া এই স্থানকে নগর বলা যায় না। ইহার শেষ মুসলমান রাজা আহম্মদ সাহ, অতি সৎস্বভাব ও ন্যায়বান্ শাসক ছিলেন। তাঁহার রাজ্য, পরে গোলাব সিংহের হস্তগত হয় এবং উহা তদীয় রাজ্যভুক্ত হয়।

উ

উজ্জয়িনী—ইহা "উজান" বলিয়াও খ্যাত। ইহা মালব দেশাধিপতি সিন্ধিয়ার রাজধানী। এই নগরটী শিপ্রা নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। ইহা বিশালা, অবন্তী এবং পুষ্পকরণ্ডিনী নামেও অভিহিত হয়। ভারত-দর্পণ দ্বিতীয় ভাগে অবন্তি শব্দে ইহার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ও মাহাত্ম্য, বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই নগর, এখন গোয়ালিয়ার-রাজ হোলকারের অধিকার-ভুক্ত। প্রাচীন উজ্জয়িনীর অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণে নূতন নগর। প্রাচীন নগর কোন অব্যক্ত প্রাকৃতিক উপদ্রবে এখন প্রায় ১০।১২ হাত মাটির নিম্নে প্রোথিত রহিয়াছে। কোন্ সময় কি দুর্দ্দৈবে সমগ্র নগরটী এরূপ ভাবে ভূগর্ভে নিহিত হয়, তাহা অদ্যাপি কি এদেশীয়, কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, কেহই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, বিক্রমাদিত্যের জন্মের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে এবং তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগে কয়েক ক্রোশ ব্যাপিয়া মৃত্তিকা বৃষ্টি হয়। এই মৃত্তিকা-রাশি নগরকে যেরূপ গভীর ভাবে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে, অন্যান্য স্থানকে বা ক্ষেত্র-নিচয়কে সেরূপ ভাবে আবৃত করে নাই। এই ঘটনা-সম্বন্ধে হণ্টার সাহেব * লিখিয়াছেন, উজ্জয়িনীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত গল্পটি বলিয়াছিল।

---

* The following narrative of this event involved in a cloud of fable is handed down by the Brahmens. A certain deity named Gandharbo Sein, was condemned, for an offence committed against the god Indrâ, to appear on earth, in the form of an ass, but on his entreaty he was allowed as a mitigation of the punishment to lay aside that body in the night and take that of a man. His incarnation took place at Oujein, during the reign of a Rajah, named Sundur Sein, and the ass, when arrived at maturity, accosting the Rajah in a human voice, proclaimed his own divine origin, and demanded his daughter in marriage. Having, by certain prodigies overcome the scruples of the Rajah, he obtained the object of his wishes. All day, in the form of an ass, he lived in the stable on corn and hay; but when night came on; laying aside the ass's skin, and assuming the form of a handsome and accomplished young prince, he went into the palace, and enjoyed, till morning, the conversation of his beautious bride. In process of time, the daughter of the Rajah appeared to be pregnant, and as her husband, the ass was deemed incapable of producing such a state in one of the human species, her chastity became suspected. Her father questioned her upon the subject and to him she explained the mystery. At night the Rajah, by her directions, hid himself in a convenient situation and beheld the wonder-

"গন্ধর্ব্ব সেন নামক অনেক দেব পারিষদ ইন্দ্রের নিকট কোন রূপে অপরাধী হওয়ায়, দেবরাজ তাঁহাকে 'মর্ত্ত্য-লোকে গিয়া গর্দ্দভ হইয়া থাক' বলিয়া শাপ প্রদান করেন। এই অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া সেই গন্ধর্ব্ব, যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও দুঃখিত হয় এবং দেবেন্দ্রের নিকট নানা রূপ অনুনয় বিনয় করে। তখন ইন্দ্রদেব তাঁহার শাপ কিয়ৎপরিমাণে লঘু করিয়া দেন। তিনি বলেন, 'তুমি দিবাভাগে গর্দ্দভ-রূপেই থাকিবে; কিন্তু রাত্রিকালে মনুষ্যের রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।' ঐ শাপগ্রস্ত গন্ধর্ব্ব, উজ্জয়িনী-রাজ সুন্দর সেনের শাসন সময়ে উজ্জয়িনীতেই গর্দ্দভ-রূপে আবির্ভূত হন। রাসভ, প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলে, একদা উজ্জয়িনী-রাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমি দেব-বংশ-সম্ভূত, আমি তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাই।

কতকগুলি অনৈসর্গিক কার্য্য দেখাইয়া গর্দ্দভ, নরপতির হৃদয়ের দ্বিধা সমুদয় বিদূরিত করিয়া অচিরেই আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিল।

সে, সমস্ত দিন রাজার অশ্বশালায় দানা ও ঘাস খাইয়া কাল যাপন করিত এবং নিশা-সমাগমে গর্দ্দভ-চর্ম্ম আবরণ পরিত্যাগ করিয়া, অতি রমণীয় রাজ-পুত্রের বেশ ধারণ করিয়া

---

ful metamorphosis. He lamented that his son-in-law should ever resume the uncouth disguise, and to prevent it, set the ass's skin on fire. Gandharbo Sein perceived it, and though rejoiced at the termination of his exile, denounced the impending resentment of Indra, for his disappointed vengeance. He warned his wife to flee; for, said he, my earthly tenement is now consuming, I return to heaven and this City will be overwhelmed with a shower of earth. The princess fled to a village at some distance, where she brought forth a son, named Vicramadithya, and a shower of earth falling from heaven, buried the City and its inhabitants. It is said to have been cold earth, and to have fallen in small quantity upon the fields all around to the distance of several Koshes, but to a great depth on the towns.

On the spot where the ancient city is said to have stood, by digging to the depth of from fifteen to eighteen feet they find brick walls entire, pillars of stone and pieces of wood of an extraordinary hardness. The bricks thus dug up, are used for building and some of them are of a much larger size, than any made in the present or late ages. Utensils of various kinds are sometimes dug up in some places, and ancient coins are found either by digging, or in the channels cut by the periodical rains; having been washed away or their earthly covering removed by the torrents.

—*Narrative of a journey from Agra to Oujein*, (*A. R. Vol: VI.*

এবং রাজ-ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় স্বীয় রূপলাবণ্য-বতী নব-বধূর সহিত উষা-সমাগম পর্য্যন্ত মধুর বাক্যালাপে রত থাকিত। কালক্রমে রাজ-কুমারীর শরীরে গর্ভ-লক্ষণ সকল প্রকটিত হইল। রাসভ কর্ত্তৃক এ ব্যাপার সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বিবেচনায় সকলে রাজ-কন্যার সতীত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল। নৃপতি, কন্যাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন। তখন রাজা, একদা রাত্রিতে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেন এবং স্বীয় জামাতার রূপ পরিবর্ত্তন ব্যাপার দেখিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনি মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, 'আমার জামাতা এমন সুন্দর—সুরূপ। তিনি কেন দিবাভাগে জঘন্য গর্দ্দভ শরীর ধারণ করিয়া থাকিবেন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া অশ্বশালায় রাসভের যে চর্ম্ম ছিল, তাহা অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। গন্ধর্ব্বসেন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। আপন শাপাবসান হইল ও গর্দ্দভত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ভাবিয়া তিনি সুখী হইলেন বটে, কিন্তু শাপ ব্যর্থ হইয়াছে জানিলে দেবরাজ ইন্দ্র, অতিশয় কুপিত হইবেন, ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন। তখন তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, 'তুমি এ নগর পরিত্যাগ করিয়া নগরান্তরে যাও। এই নগরে অচিরেই মৃত্তিকা বৃষ্টি হইবে।' গর্ভবতী রাজকন্যা এক দূরবর্ত্তী নগরে গিয়া বাস করিলেন। তথায় তাঁহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। তাঁহারই নাম বিক্রমাদিত্য। এদিকে আকাশ হইতে বর্ষাধারে কর্দ্দম রাশি নিপতিত হইয়া অচিরেই উজ্জয়িনী ও ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগকে সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। এই শীতল কর্দ্দম রাশি নগরে যেরূপ প্রবলভাবে নিপতিত হয়, অন্যান্য স্থানে তদ্রূপ হয় নাই।"

এখানে কোন কোন সময় মাটির নীচে নানা প্রকার তৈজসপত্র ও প্রাচীন মুদ্রাও পাওয়া যায়। মৃত্তিকা খনন করিলে অথবা বর্ষাকালে বৃষ্টি-ধারায় উপরিস্থিত মৃত্তিকাবরণ বিধৌত হইলে, এই সমস্ত মুদ্রাদি লোকের দৃষ্টি-গোচর হয়।

যেখানে প্রাচীন নগর ছিল, তথায় ১০।১২ হাত মৃত্তিকা খনন করিলে, অভগ্ন ইষ্টক প্রাচীর, অক্ষুণ্ণ প্রস্তর-স্তম্ভ ও অতীব সারবান্ কাষ্ঠ খণ্ড সকল দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্তিকা খনন করিলে, যে সকল ইষ্টক পাওয়া যায়, এখানকার লোকেরা তদ্দ্বারা ইমারতের কার্য্য করে। এই সকল ইষ্টকের মধ্যে কতকগুলি এরূপ বৃহদাকার যে, সে আকারের ইষ্টক, বর্ত্তমান কি প্রাচীন কোন সময়েও প্রস্তুত হইত বলিয়া বোধ হয় না।

এই স্থানের মৃত্তিকা অতিশয় কোমল বলিয়া বর্ষার ধারাপাতে তাহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ খাদ হইয়া যায়। এই প্রকার একটি খাদের ভিতর খনন করায় কতকগুলি প্রস্তর-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। এক স্থানে ৮।১০ হাত জায়গায় কতকগুলি মৃৎপাত্র (হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদি) স্তূপীকৃত-ভাবে সজ্জিত দেখা যায়। সকলে অনুমান করেন, ইহা কোন কুম্ভকারের কারখানা ছিল।

প্রাচীন ও নূতন নগরের মধ্যস্থলে একটি খাদ দৃষ্ট হয়, কিম্বদন্তি এই যে পূর্ব্বে এই

খাদে শিপ্রানদী প্রবাহিত হইত। যে সময় প্রাচীন নগরটী দৈব দুর্ব্বিপাকে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত হয় সেই সময় শিপ্রানদীর গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখিনী হয়।

শিপ্রানদীর বর্ত্তমান তটভাগ-বর্ত্তী ভূগর্ভ-নিহিত ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে মহারাজ ভর্ত্তৃহরির ভূগর্ভস্থ রাজ ভবনের চিহ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহার তোরণের সম্মুখে দুইটি প্রস্তর-স্তম্ভ শ্রেণী আছে; একটি উত্তর হইতে দক্ষিণে অপরটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রসারিত। দক্ষিণ দিকে রাজ ভবনে প্রবেশ দ্বার। ইহার মধ্যে রাজপুরীর দুই অংশস্থিত দুইটি গুহার প্রবেশ পথ রহিয়াছে। বাহিরের পথটি দক্ষিণ দিকে ভূমির প্রায় দুই হস্ত পরিমাণ নিচে। ইহা ঠিক পূর্ব্বাভিগামী, এটি একটি সুদীর্ঘ চত্বর, ক্ষোদিত মনুষ্য মূর্ত্তির ভাস্কর্য্য সুশোভিত স্তম্ভ শ্রেণীব উপর সংস্থিত।

মধ্যের প্রকোষ্ঠটিতে দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এ গৃহটী অনুচ্চ, মনোহর এবং প্রসস্ত; ইহার ছাদ প্রস্তর-স্তম্ভের উপর রহিয়াছে, এই ছাদে লক্ষ লক্ষ প্রস্তর-খণ্ড বড় বড় কড়িকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। উত্তর দিকে প্রবেশ-পথের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে, তাহা দ্বারা গৃহ মধ্যে অল্প অল্প আলোক প্রবেশ করে। ঐ গবাক্ষ হইতে অট্টালিকা সংলগ্ন, তীরভাগের নিম্ন ভূমি-খণ্ড সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ প্রকোষ্ঠের বাম দিকে অর্থাৎ পশ্চিমাংশে পাথরের মেজেব উপর একটি তিনকোণ-বিশিষ্ট গহ্বর আছে। ঐ গহ্বর দিয়া এক মনুষ্য প্রমাণ অবতরণ করিলে একটি ভূগর্ভস্থ অন্ধকার প্রকোষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকোষ্ঠটিও উপরক্ত প্রকোষ্ঠের ন্যায় প্রস্তর-স্তম্ভের উপর সংরক্ষিত। ইহা প্রথমে পূর্ব্বদিগাভিমুখে গিয়া দক্ষিণ দিগাভিমুখে গিয়াছে। বামপার্শ্বে প্রায় দুইটী প্রকোষ্ঠ আছে। দক্ষিণ প্রান্তভাগে একটি প্রবেশ পথ আছে তাহা দ্বারা অন্যান্য গৃহে গমন করিতে পারা যাইত কিন্তু তাহা মৃত্তিকা ও ভগ্ন ইষ্টক-রাশি দ্বারা পরিপূর্ণ। অত্রস্থ ফকিরেরা বলে যে এই ভূগর্ভস্থ পথের একটি এখান হইতে কাশী ও অপরটি হরিদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহাদের মুখে আরও শুনা যায় যে লোকজন মধ্যে মধ্যে এই সুড়ঙ্গের পথে হারাইত বলিয়া প্রায় ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এই পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

কথিত আছে যে এই স্থানে বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা মহারাজা ভর্ত্তৃহরি সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। কিন্তু ইহা কোন্ সময় এবং কি প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে বহুবিধ অসংলগ্ন গল্প আছে। কেহ কেহ বলেন, ভর্ত্তৃহরি নিজেই ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে মধ্যভাগের গৃহগুলি গন্ধর্ব্ব সেনের মন্ত্রণাগৃহ এবং সিংহদ্বারের সম্মুখস্থিত অলিন্দা সভাগৃহ ছিল। যদিও এক্ষণে ইহা মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে তথাপি উজ্জয়িনীর অন্যান্য ধ্বংসাবশেষের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

যে স্থান ১৮০০ শত বর্ষের পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী এবং শিল্প ও অন্যান্য বিদ্যার কেন্দ্রস্থল ছিল, সেই প্রাচীন নগরের বর্ত্তমান দুরবস্থা কিরূপে হইল এবং কি প্রকারেই বা এই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করা বর্ত্তমান দার্শনিকগণের একটি

গৌরবের কার্য্য। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে ভগ্নস্তূপের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাতের কোন চিহ্ন অর্থাৎ গলিত ধাতু ইত্যাদি কিছুই নাই; তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন এমন পর্ব্বতাদি নাই; যাহা কোন কালে অগ্ন্যুদ্গীরণ করিয়াছে। অতএব আগ্নেয়গিরীর অগ্ন্যুৎপাত যে নগরের এ দুরবস্থা করে নাই তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে।

এরূপ কিম্বদন্তিও প্রচলিত আছে যে, নদীতে প্রবল বন্যা হইয়া উজ্জয়িনীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বাস্তবিকই যৎকালে এই নদী উজ্জয়িনীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত, তখন ইহা সময় সময় এতই স্ফীত হইয়া উঠিত যে, সেই জলোচ্ছ্বাসে বর্ত্তমান নগরের অত্যুচ্চ স্থান সকলও জলমগ্ন হইত; তখন অসংখ্য গৃহ ও নিকটবর্ত্তী পল্লী সমুদয় সেই তীব্র স্রোতে তৃণ-গুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া যাইত। কিন্তু এই স্রোতস্বতির দৈর্ঘ্য কেবল চতুর্দ্দশ ক্রোশ মাত্র এবং ইহার বিস্তারও অতি অল্প; সুতরাং নদীর বন্যায় যে নগরের ও তাহার চতুস্পার্শ্বস্থ ভূভাগের এ অবস্থা হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস হয় না।

এখন আমরা এই সকল কিম্বদন্তির প্রাধান্য বজায় রাখিয়া, যতদূর পারি এই ব্যাপারের যথার্থ কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

ভূমিকম্প দ্বারা এই অবস্থা ঘটিয়াছে বলা যাইত, কিন্তু প্রাচীর গুলির অক্ষুণ্ণ অবস্থা দেখিয়া সে সিদ্ধান্ত করা যায় না। বায়ু তাড়িত ধূলা বা বালুকারাশি দ্বারা এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ ইয়ুরোপ খণ্ডে মধ্যে মধ্যে বায়ু তাড়িত বালুকারাশি দ্বারা বহু নগর ও গ্রাম ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে।

এ অঞ্চলের প্রচলিত জনশ্রুতি (গন্ধর্ব্ব সেনের উক্তি—"এই নগরের উপর মৃত্তিকা বৃষ্টি হইবে") আমাদিগের এই অনুমানের পোষকতা করিতেছে। এ প্রদেশের মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে, অত্যন্ত লঘু হয়; প্রাচীনকালে বোধ হয় ইহার লঘুতা আরও অধিক ছিল। সুতরাং বায়ু বিতাড়িত মৃত্তিকা ও বালুকাই যে, নগরটীকে এরূপ ভূগর্ভ-নিহিত করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। হণ্টার সাহেব মহোদয়ও তাহাই লিখিয়াছেন। *

বর্ত্তমান উজ্জয়িনী প্রায় তিন ক্রোশ পরিধি বিশিষ্ট। ইহার প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যই অধিক। নগরটী বুরুজ বিশিষ্ট প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ নগরে পতিত ভূমির

* "For none of the other causes would so much resemble a shower of earth as this, and sand driven by the wind would naturally be accumulated to the greatest height, on the towns, where the buildings would resist its farther progress in the horizontal direction. If we might be allowed to call into our aid a tradition, which though disguised in fable and absurdity, has probably a foundation in fact, it would be favourable to this hypothesis."—A. R. Vol. VI.

পরিমাণ অতি অল্প, অধিকাংশ ভূমিই গৃহ, অট্টালিকা এবং দেব মন্দিরাদিতে পরিপূর্ণ। এখানকার প্রধান বাজারটী বেশ প্রশস্ত, রাস্তা ঘাট পরিষ্কার ও প্রস্তর নির্ম্মিত। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দ্বিতল অট্টালিকা-শ্রেণী। অট্টালিকার নিম্নতল প্রায়ই বিপণির জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং উপর তলায় গৃহস্বামী বাস করিয়া থাকেন।

এখানকার অট্টালিকা সমূহের মধ্যে চারিটি মসজিদ ও কতকগুলি দেব মন্দিরই উল্লেখ যোগ্য। নগরের প্রান্ত ভাগে অঙ্কপাত নামক স্থানটীকে হিন্দুগণ অতীব পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। কিম্বদন্তি যে ত্রিভুবন পতি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অগ্রজ বলদেব এই স্থানে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। অঙ্কপাতে প্রস্তরময় সোপান বিশিষ্ট একটি সুন্দর জলাশয় আছে। ঐ জলাশয়টি প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত। ঐ বেষ্টনির মধ্যে দুইটি মন্দির আছে। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল পাবার বংশীয় রঙ্গরাব আপ্পা ঐ মন্দির দুইটি নির্ম্মাণ করান। দুইটি মন্দিরই চতুষ্কোণ, উহাদের উর্দ্ধ ভাগ শুণ্ডাকৃতি। পুরদ্বারের দক্ষিণে শ্বেত প্রস্তরের রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রতিমূর্ত্তি, এবং বাম দিকে কৃষ্ণ-প্রস্তরের কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ও শুভ্র প্রস্তরের রাধা মূর্ত্তি আছে। বিগ্রহগুলি অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে।

উজ্জয়িনীতে সিন্ধিয়ার একটি অতি সুবৃহৎ প্রাসাদ আছে। প্রাসাদটির কোনই সৌন্দর্য্য নাই; বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকে অসংখ্য গৃহ ও অট্টালিকা থাকাতে ইহার কিছুই উত্তম রূপে লক্ষিত হয় না। এই প্রাসাদের সন্নিকটে একটি সুবৃহৎ তোরণের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বাবসানের অল্পকাল পরেই এই তোরণটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে যে সমস্ত ক্ষোদাইর কায আছে, তাহা বিচিত্র হিন্দু ভাস্কর্য্যের আদর্শ। নগরের মধ্যে পূর্ব্বাংশের প্রাচীরের সন্নিকটে একটি অত্যুচ্চ পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ের নাম যোগসহীদ। ইহার উপর মহাদেবের মন্দির। মন্দির পার্শ্বে গোপা সিরিদ্ নামক এক জন মুসলমান সাঁইর সমাধি স্থান। বহুদূর হইতে ঐ পাহাড়টি দৃষ্টি গোচর হয়। এই পাহাড়ের নিচে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন প্রোথিত ছিল, এইরূপ কিম্বদন্তি। দক্ষিণদিকে কালির দীঘী নামক একটি সুবৃহৎ পুরাতন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, গৌড়ের পাতসাহ সুলতান নাসেরউদ্দিন খিলিজি ৯০৫ হিজরা শকে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। তিনি উজ্জয়িনীতে একাদশ বৎসর চারি মাস রাজত্ব * করিয়াছিলেন। এই প্রাসাদটি শিপ্রা নদীর একটি দ্বীপের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই

* A description of this extraordinary fabric is inserted in the Oriental Repertory, Vol. I., P. 226, from a letter of Sir C. W. Mallet, dated at Oujein 13th April 1785. The author gives an extract from a history of Malwa which proves the building to be the work of Sultan Nasir-ud-deen Giligee son of Gheas-ud-deen, who ascended the throne of Malava in the year of Hejira 905, and reigned eleven years and four months.—A. R. Vol. VI.

রাজ ভবনে যে দুইটি চতুষ্কোণ অট্টালিকা আছে, তাহাদের খিলান অদ্ধ চন্দ্রাকান্ত। ইহার নিম্নতলে আটটি প্রকোষ্ঠ, মধ্যস্থলে কতকটা অনাবৃত স্থান। একটি সুন্দর প্রস্তরময় সেতুর উপর দিয়া নগর হইতে, এই রাজ-প্রাসাদে লোক যাতায়াত করিতে পারে। সেতুর নিম্নে নদী বক্ষে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর গৃহ। "মিরাট ইস্কন্দরী" নামক ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতার মতে ইহা মুসলমান পাতসাহ নির্ম্মিত; কিন্তু অনেক কারণে আমরা তাঁহার মতকে সমিচীন বলিতে পারি না।

কবি চূড়ামণি কালি দাস তাঁহার প্রণীত ঋতু সংহার কাব্যের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"নিশাঃ শশাঙ্কক্ষত নীল রাজয়ঃ।
ক্বচি দ্বিচিত্রং জল-যন্ত্র মন্দিরম্॥"

পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদ ভিন্ন কালিদাস আর অন্য কোন্ প্রাসাদকে "জল-যন্ত্র মন্দিরম" বলিবেন? রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়েও ঐ জল-প্রাসাদ বর্ত্তমান ছিল। এই প্রাসাদের ভাস্কর্য্য হিন্দু প্রণালীর। ইহার প্রাচীরে সর্পোপরি শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ইহা ছাড়া আরও এমন অনেক মূর্ত্তি ও দৃশ্য, অট্টালিকার স্থানে স্থানে চিত্রিত আছে, যাহা দেখিলে ইহাকে মুসলমান নির্ম্মিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না।

এই প্রাসাদের নিকট হইতে শিপ্রা নদী বক্রভাবে পশ্চিমাভিমুখে উর্ব্বর ভূমি খণ্ড সমূহের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। নানাবিধ শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র, নানা প্রকার ফল পল্লব সুশোভিত পাদপ-রাজি লোক লোচনের প্রীতি বর্দ্ধন করিতেছে। শিপ্রার অপর তীরে বিরোণগড় নামক দুর্গ। এই দুর্গ ৮৮০ হাত দীর্ঘ। ইহা সুদৃঢ় মৃৎপ্রাচীর দ্বারা সংরক্ষিত। দুর্গ মধ্যে এখানকার বাস্তু দেবতার সুন্দর মন্দির। এই স্থান হইতে নদীর কিছু দূর উত্তরে আভা চিংনবীস ও রাণা খাঁর মনোহর উদ্যানদ্বয়। এই স্থানের অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে সা দেউলের সমাধি মন্দির। এই সমাধি মন্দিরের সন্নিকটে রঘু সরদারের সহিত সিন্ধিয়ার অতি ভীষণ সংগ্রাম হয়। রঘু পাগিয়া (অশ্ব সৈন্যের নায়ক) সিন্ধিয়ার এক জন অতি বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল। তাহার অধীনে ত্রিংশৎ সহস্র সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। সিন্ধিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে উদয়পুরে গিয়া, মাথোটের টাকা আনয়ন করিতে আদেশ করেন। রঘু, উদয়পুর হইতে বহু অর্থ লইয়া আসেন, কিন্তু স্বীয় প্রভুর নিকট তাহার হিসাব দিতে অস্বীকার করেন। সিন্ধিয়া রাগান্ধ হইয়া রঘুর পুত্র পরিবারদিগকে উজ্জয়িনীতে কারারুদ্ধ করেন। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে রঘু, বিপুল সৈন্য (৩০,০০০) সহ আসিয়া, উজ্জয়িনী আক্রমণ করেন। সে সময় উজ্জয়িনীতে সিন্ধিয়া, কেবল মাত্র পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া ছিলেন। এই স্বল্প সৈন্য লইয়াই সিন্ধিয়া, যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পরে ছয় হাজার গোঁসাই আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেয়। ঘোরতর যুদ্ধের পর রঘু, পরাজিত ও হত হইল। এই ভয়ানক যুদ্ধ, সা দেউলের দরগার সন্নিকটেই হয়।

নদীর অপর তীরে দেড় ক্রোশ বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী। এই সকল পাহাড় হইতে গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর সংগৃহীত হয়। ঐ সকল পর্ব্বতের মৃত্তিকা চাষের উপযুক্ত।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এক ক্রোশ ব্যাপী বৃক্ষশ্রেণী। এই বৃক্ষশ্রেণী, গণেশের মন্দিরের নিকট গিয়া শেষ হইয়াছে। পূবাকালে মহা সমারোহের সহিত যাত্রীগণ, ঐ স্থানে গণদেব চিন্তামণ্‌কে দর্শন করিতে যাইত।

নগরের দক্ষিণ প্রাচীরের নিকট দিয়া শিপ্রা নদী প্রবাহিত। এই স্থানেই ইহার আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নগরের এই স্থানকে জয়সিংপুর বলে। এখানে অম্বর রাজ জয় সিংহের নির্ম্মিত পর্য্যবেক্ষণিকা আছে, তজ্জন্য এ অংশের নাম জয়সিংহপুর হইয়াছে। অম্বরপতি জয় সিংহ অত্যন্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রামোদী ছিলেন। তিনি দিল্লি, মথুরা, জয়নগর, বারাণসি এবং উজ্জয়িনী এই পাঁচটী প্রধান নগরে জ্যোতিষ পর্য্যবেক্ষণিকা (Observatory) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত জ্যোতিষ নির্ঘণ্ট নামক গ্রন্থ পাঠে আমরা এই বিষয় অবগত হইয়াছি।

উজ্জয়িনীর পূর্ব্ব দিকের দৃশ্য আর এক প্রকার। যতদূর দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তত দূরই সমতল ভূমি, এক ক্রোশ কি দেড় ক্রোশ ব্যবধানে কেবল একটি হাতীশুঁড়া ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। পাহাড়ের সন্নিকটে একটি সুবৃহৎ হ্রদ। ইহার পরই সুপ্রসিদ্ধ ভূপাল নগরে যাইবার পথ। পথের দক্ষিণ পার্শ্বে সিন্ধিয়া ভূপতির মৃগশালা, ইহাকে রমনা বলে। এখানে বহু হরিণ থাকে।

সম্রাট আকবরের রাজত্ব সময়ে মহারাজ জয় সিংহই উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিছু দিন পরে নগরটী মহারাষ্ট্রদিগের হস্তগত হয়। ইহা অদ্যাবধি সিন্ধিয়ার অধিকারেই আছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যে আদম শুমার প্রস্তুত হয়, তাহাতে উজ্জয়িনীর মোট লোক সংখ্যা ৩৪,৬৯১ দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু ২৩,৩২৯, মুসলমান ৯,৪৭৬, খ্রীষ্টান ৩২, জৈন ৯২৪, শিখ ৫, পারসী ৭, অধ্যাত্মবাদী ৯১৮ জন।

পূর্ব্ব শতাব্দীতে এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অত্যধিক ছিল। অতি প্রাচীন কালে এখানে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত। তৎকালে অনুমান ১৫৭ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে এক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রায় ৪০০০০ চল্লিশ হাজার শিষ্য লইয়া অত্রস্থ দক্ষিণ গিরিমঠ হইতে সিংহল দ্বীপে যাত্রা করেন। সিংহলীদিগের "মহাবংশ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক তাঁহার পিতার রাজত্ব কালে তাঁহার প্রতিনিধি রূপে (Viceroy) উজ্জয়িনী শাসন করিতেন। ইহা প্রায় ২৬৩ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বের কথা। তৎপূর্ব্বেও উজ্জয়িনী মহা সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। গ্রীস দেশীয় সুবিখ্যাত প্রাচীন ঐতিহাসিক টলেমি তাঁহার গ্রন্থে উজ্জয়িনীকে (Ozênê) ওজিনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ওজিনি তিয়াস্তনের রাজধানী। তিয়াস্তন শব্দটি "চষ্টান" শব্দের অপভ্রংশ। পূর্ব্বকালে মালব

দেশের এক জন নরপতির নাম চষ্টান ছিল। কতকগুলি মুদ্রা ও শিলা লিপিতে চষ্টানের নাম ক্ষোদিত দেখা যায়। পেরিপ্লিস নামক আর এক জন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক তাঁহার গ্রন্থে উজ্জয়িনীর এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বারিগজ (বর্ত্তমান বরোচ) নগরের পূর্ব্বদিকে ওজিনি অবস্থিত। এ প্রদেশের রাজা এই ওজিনি নগরে বাস করেন। সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহারের জন্য এখান হইতে বারিজ নগরে "অকীক" পাথর, বাসন, উৎকৃষ্ট মলমল, কস্তুর বর্ণের কার্পাস-বস্ত্র এবং নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য আমদানী হইত। চীন পরিব্রাজক হিয়ন সিয়ঙও তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উজ্জয়িনীকে "উজেনন্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তখনও উজ্জয়িনীর শোভা সৌন্দর্য্য এবং সমৃদ্ধির অভাব ছিল না। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে উজ্জয়িনীর যেরূপ সমৃদ্ধ অবস্থা ছিল তাহা "অবন্তি" শব্দে (দ্বিতীয় ভাগ ভারত-দর্পণে) বিস্তৃত-রূপে বর্ণিত হইল।

উজ্জয়িনীতে কতকগুলি জৈন মঠ আছে। এই সমস্ত মঠের কতকগুলি শ্বেতাম্বরী-দিগের ও দিগম্বরীদিগের। ইহাদের মধ্যে জবরেশ্বর ও জৈন-ভগ্নীশ্বরের মঠই প্রধান।

কলিকাতা হইতে উজ্জয়িনী ১১৭৯ মাইল ৫৮৯½ ক্রোশ। কলিকাতা হইতে আলাহাবাদ ৫৬৫ মাইল, আলাহাবাদ হইতে ই, আই, রেলওয়ে দিয়া জব্বলপুর যাইতে হয় (দূরতা ২২৯ মাইল)। জব্বলপুর হইতে জি, আই, পি, রেলওয়ে যোগে ২৬৩ মাইল গিয়া খাণ্ডোবাতে থাকিতে হয়। খাণ্ডোবা হইতে মাও ও ইন্দোর দিয়া এইচ, এস, এন, রেলওয়ে যোগে ১২২ মাইল গিয়া উজ্জয়িনীতে নামিতে হয়।

উজ্জয়ন্ত—এটি হিন্দুদিগের একটি অতি পবিত্র গিরিতীর্থ। ইহা সৌরাষ্ট্র দেশে (বর্ত্তমান নাম কাথিবাড়) অবস্থিত। মহাভারতে এই সিদ্ধিকর মহা শিখরীর নাম উল্লিখিত আছে। ঋষিশ্রেষ্ঠ ধৌম্য ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন * "হে নরাধিপ সুরাষ্ট্র দেশে যে

---

* সুরাষ্ট্রেষ্বপি বক্ষামি পুণ্যানায়তনানি চ।
আশ্রমান, সরিতশ্চৈব সরাংসি চ নরাধিপ।
চমসোদ্ভেদনং বিপ্রাস্তত্রাপি কথয়ন্ত্যত।
প্রভাসঞ্চোদধৌ তীর্থং ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির।
তত্র পিণ্ডারকং নাম তাপসাচরিতং শিবম্।
উজ্জয়ন্তশ্চ শিখরী ক্ষিপ্রং সিদ্ধিকরো মহান্।
তত্র দেবর্ষি ধীরেণ নারদেনানুকীর্ত্তিতঃ।
পুরাণঃ শ্রূয়তে শ্লোকস্তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির।
পুণ্যে গিরৌ সুরাষ্ট্রেষু মৃগ পক্ষি নিষেবিতে।
উজ্জয়ন্তে স্ম তপ্তাঙ্গো নাক পৃষ্ঠে মহীয়তে।
পুণ্যা দ্বারবতী তত্র যত্রাসৌ মধুসূদনঃ॥

সকল পবিত্র এবং পুণ্যময় তীর্থ, আশ্রম, সরিত ও সরোবর আছে তাহা আপনার নিকট বলিতেছি। ব্রাহ্মণগণ বলেন ঐ স্থানে চমসোদ্ভেদ তীর্থ এবং সমুদ্রে দেবগণের প্রভাস তীর্থ আছে। ঐ স্থানে তাপসাচরিত পিণ্ডারক তীর্থ ও আশুসিদ্ধি প্রদায়ক উজ্জয়ন্ত পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ঐ পর্ব্বত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুণ। মৃগপক্ষিনিষেবিত সুরাষ্ট্র দেশীয় পবিত্র উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতে তপস্যা করিলে স্বর্গলোকে পূজ্য হয়। ঐ প্রদেশেই সুপবিত্রা দ্বারাবতী নগরী বিদ্যমান আছে। যে পুরীতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন।"

স্কন্দ-পুরাণের প্রভাস খণ্ডেও এই মহা পর্ব্বতের নাম উলিখিত আছে। * "সোম নাথের সন্নিকটে মহাগিরি উজ্জয়ন্ত অবস্থিত। তাহার পশ্চিমভাগে রৈবতক পর্ব্বত। এই উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতে এক পদ গমন করিলে মানুষ নিরোগী হয় ও স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দেবেন্দ্রের প্রিয় হস্তী গজরাজ ঐরাবত মহাগিরি উজ্জয়ন্তকে পদদ্বারা আক্রমণ করিলে গিরি কলেবর হইতে বহুবিধ পবিত্র সলিল নির্গত হইয়াছিল। গিরিবর উজ্জয়ন্ত মৈনাকের সহোদর। ইনি সৃষ্টির আদিকাল হইতে সুরাষ্ট্র দেশে বিদ্যমান আছেন"।

এই পর্ব্বত যে অতি পবিত্র ও পুণ্য তীর্থ তাহা পূর্ব্বোক্ত বচন সমুহের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। এই পর্ব্বত এখন গির্ণার নামে অভিহিত। ইহা বর্ত্তমান জুনাগড়ের অতি নিকটে (৫ ক্রোশ) দূরে অবস্থিত। সুবিখ্যাত সোমনাথ মহাদেবের মন্দিরের বিংশতি ক্রোশ উত্তরে। ইহা ৩৫০০ সার্দ্ধ তিন সহস্র ফিট উচ্চ। জৈন ধর্ম্মাবলম্বিগণও এই পর্ব্বতকে অতীব পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই পর্ব্বতের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের অঙ্গে মহারাজ অশোকের অনেকগুলি ক্ষোদিত লিপি দৃষ্ট হয়। "গির্ণারের" বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার সময় ঐ সমস্ত ক্ষোদিত লিপি প্রকাশিত করা হইবে। এই সকল ক্ষোদিত লিপির মধ্যে মহারাজ রুদ্ররামেরও একটি লিপি লক্ষিত হয়। তিনি দক্ষিণাপথের অধিপতিকে সমরে পরাস্ত করিয়া তদ্বিবরণ পর্ব্বতাঙ্গে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা ১৫০ খৃষ্টাব্দের কথা। অপর একটি লিপিতে সুদর্শন হ্রদের বাঁধভাঙ্গা ও একটি সেতুর পুনর্ন্নিমাণের বিবিরণ ক্ষোদিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সেতুটি জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইলে তাহা পুনর্নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়।

পর্ব্বত চূড়ার ৬০০ ফিট ব্যবধানে, সমুদ্র তল হইতে তিন সহস্র ফিট উর্দ্ধে, একটি

---

* সোম নাথস্য সান্নিধ্যে উজ্জয়ন্তো গিরির্ম্মহান্।
তস্য পশ্চিমভাগেতু রৈবতক ইতি স্মৃতঃ।
উজ্জয়ন্তে পদং গত্বা ততঃ স্বর্গং নিরাময়ঃ।
ঐরাবত পদক্রান্তো উজ্জয়ন্তো মহাগিরিঃ।
সুস্রাব তোয়ং বহুধা গজপাদোদ্ভবং শুচি॥

গিরি-শৃঙ্গ আছে। এই শৃঙ্গটির উপর অনেকগুলি জৈন ও হিন্দুদিগের দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে জৈন নেমী নাথের মন্দিরই সুবৃহৎ এবং সম্ভবতঃ প্রাচীনতম। জুনা গড়ের সার্দ্ধ দুই সহস্র ফিট উচ্চে অপর একটি শৃঙ্গের উপর আরও কতকগুলি জৈন মন্দির আছে। ভূগর্ত্তস্থ একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে জৈন দেব অমীঝরার পাষাণময়ী মূর্ত্তি। কিম্বদন্তি যে, এই পাষাণময়ী মূর্ত্তির শরীর হইতে স্বেদ বিন্দু নির্গত হয়। কথাটি কত দূর সত্য বলা যায় না। উজ্জয়ন্তের উচ্চতম শৃঙ্গের নাম কালিকা। এই শৃঙ্গটীর উপর "অম্বা" মাতার মন্দির। জৈন মন্দিরগুলির সন্নিকটেই সুবিখ্যাত "ভৈরব-ঝাঁপ"। এই প্রকাণ্ড শৈলটি শৃঙ্গের পার্শ্বদেশ হইতে উত্থিত হইয়া, পর্ব্বতের অত্যুচ্চ চূড়াকে কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছাদিত করিয়াছে। পূর্ব্বে অনেকে ঝাঁপ দিয়া শৃঙ্গ পৃষ্ঠে পড়িত বলিয়া, ইহার নাম হইয়াছে—"ভৈরব-ঝাঁপ"। গবর্ণমেণ্ট যদিও আজ কাল ঝম্প প্রদান রহিত করিয়া দিয়াছেন, তথাপি কখন কখন কেহ কেহ ঝাঁপ দিয়া থাকে। ইয়ুরোপীয়গণ, এরূপ ঝম্প প্রদানকে death leap বলিয়া থাকেন।

গোরক্ষ নাথ ও দত্তাত্রেয় নামে দুইটি শৃঙ্গ আছে। দুইটি শৃঙ্গই সার্দ্ধ তিন সহস্র ফিট উচ্চ। দত্তাত্রি রাজা নেমি নাথের প্রথম ও প্রধান শিষ্য। এই পর্ব্বতে অনেক সাধু, সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। পর্ব্বতের পাদদেশে যে সমস্ত জঙ্গলময় স্থান আছে, সেখানে অনেক অঘোরপন্থীগণ বাস করে।

উজ্জয়ন্ত গিরিশিখরে যে সমস্ত মন্দির আছে, তাহা অতীব সুন্দর। ইহাদের বিচিত্র ভাস্কর্য্য হিন্দু-শিল্পের আদর্শ। এক জন ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকার ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। *

উজ্জানক—আজ কাল যে প্রদেশ "স্বাৎ" নামে অভিহিত হইতেছে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কাশ্মীরের উত্তরাংশস্থিত সেই প্রদেশ প্রাচীনকালে উজ্জানক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা অতি পবিত্র তীর্থ। মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্ব পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে আঙ্গিরস তীর্থ যাত্রার বিবরণ উল্লিখিত আছে। পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে উজ্জানক তীর্থের নাম দৃষ্ট হয়। †

এই প্রদেশটী দক্ষিণ-পশ্চিম দিগাভিগামী একটি সুদীর্ঘ উপত্যকা। আজ কাল ইহা যবন রাজ্যের অন্তর্গত। এই উপত্যকার মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

---

* The most striking characteristics of their interiors are their fine tesselated marble pavements, their painted domes, their exquisitely shaped and carved pillars.

† উজ্জানক উপস্পৃশ্য আর্ষ্টি সেনস্য চাশ্রমে।
পিঙ্গায়াশ্চাশ্রমে স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
—(মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ৫৩ শ্লোক)।

উড়িষ্যা।—ভারতীয় প্রাচীন মনীষিগণ অব্দ গণনের কোনরূপ সুন্দর একটী প্রণালী প্রচলনের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন; বর্ত্তমান কালে প্রচলিত অনেকগুলি অব্দ গণন প্রথা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। কিন্তু এরূপ কোন পুস্তক দেখা যায় না, যাহাতে উক্তরূপ গণিত অব্দের সুচারু বিশ্বাস যোগ্য ব্যবহার হইয়াছে। অথবা যদিও কোন স্থানে দুই একটী ঘটনার বিষয়ে তাহা হইয়া থাকে, তথাপি তাহার সমকালীন, অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঘটনারই উল্লেখ নাই। এই কারণ প্রত্নতত্ত্ব, সুন্দর কাব্য, দর্শন (Philosophy), ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, অঙ্ক, তর্ক (Logic), উপন্যাস, চিকিৎসা প্রভৃতিতে সর্ব্বোচ্চ হইলেও ভারতবর্ষকে বিশ্বাস্য ইতিহাস শূন্য বলিতে পারা যায়।

এইরূপ ইতিহাসাভাব প্রাচীন হর্ম্ম্যাদি দ্বারাও অপনোদিত হইবার নহে; কারণ কালের সর্ব্বগ্রাসিনী শক্তি, এই দেশে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও মুসলমানগণের মন্দিরাদি বিধ্বংসিনী ইচ্ছার সহযোগ পাইয়া, অকালেই তাহাদিগকে ভূমিসাৎ করিয়াছে, এবং যাহা কিছু অদ্যাপি দৃষ্টি গোচর হয়, তাহা হইতে কোনরূপ ঐতিহাসিক জ্ঞানলাভ করা দুষ্কর। তজ্জন্য কোন লোক যে ভবিষ্যতে এই দেশের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে সক্ষম হইবেন, তাহাও বেশ আশা করা যায় না। কিন্তু বুভুৎসা বৃত্তি অসীম শক্তিশালিনী; পরিশ্রম এবং মনস্বিতার সহযোগ পাইলে ইহা দ্বারা অতি দুষ্কর কার্য্য সকলও সম্পাদিত হয়। অধিকন্তু যতই কেন পৌরাণিক হউক না, দেশীয় সাহিত্য হইতে ও গবেষণা সাহায্যে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব লাভ করা যায়। এই রূপে প্রাচীন হর্ম্ম্যাদি, খোদিত প্রস্তর খণ্ড এবং অস্ত্রাদি হইতেও ইতিহাসের অনেক সাহায্য হইয়া থাকে; কারণ তাহারা জাতীয় বুদ্ধি এবং কার্য্য কুশলতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করে। পূর্ব্বোক্ত উপকরণগুলির অসদ্ভাব না থাকিলেও সকল স্থানে তাহাদিগকে দেখা যায় না; সমৃদ্ধি সম্পন্ন, জনতাময় বাণিজ্য-শালী ভূভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্থান অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এবং বিদেশীয় আক্রমণ হইতে অনেকটা নিরাপদ, সেই সকল স্থানে উহাদের অন্বেষণ করা উচিত।

উড়িষ্যা প্রদেশ একটী এই উদ্দেশ্য সাধনের সুন্দর স্থান। ইহা এক দিকে পাহাড়-শ্রেণী এবং দুর্ভেদ্য বনমালা দ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রদেশ সকল হইতে বিচ্ছিন্ন এবং অপর দিকে সমুদ্রাবৃত তজ্জন্য ইহা অনেক কাল মুসলমান আক্রমণ হইতে নিরাপদ ছিল এবং কালক্রমে মুসলমান হস্তে পতিত হইলেও অন্যান্য প্রদেশ সকলের ন্যায় ইহা বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই।– বাণিজ্য এদেশে কিছুই ছিল না এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং অত্রত্য অধিবাসীগণ দেশীয় রাজত্ব ছায়ায় দীর্ঘকাল সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিয়া নানাবিধ কারুকার্য্য সম্পন্ন করিয়া জন্মভূমির উৎকর্ষ বিধানে বিশেষ সুবিধা পাইয়া ছিল। এই জন্য প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এই স্থানের হর্ম্ম্যাদি অধিক বিশ্বাসনীয়। এই প্রদেশের অনেক স্থান অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। এমন কি প্রদেশটীর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধেও অনেক সংশয় রহিয়াছে। প্রচলিত 'উড়িষ্যা' শব্দটী নিশ্চয়ই সংস্কৃত, ওড্র দেশ

(অর্থাৎ ওড্র জাতির বাসভূমি) শব্দের অপভ্রংশ মাত্র কিন্তু এই ওড্র জাতি কাহারা? তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। বৈয়াকরণগণের মতে উদ্ (গ্রহণে) ধাতু হইতে ওড্র শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু কেন প্রদেশটীকে ওড্র দেশ বলা হয় তাহা এই ব্যুৎপত্তি হইতে স্থিরীকৃত হয় না।

অপর কাহারও মতে ওড্র শব্দটী অ পূর্ব্বক (ঈষদর্থক) উদ্ ধাতু (ক্লেদার্থক) রক প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (দ নিপাতনে ড হইয়াছে) এবং ইহার অর্থ মলিন জাতির বাসস্থান এবং বঙ্গীয় লোকেরা সাধারণত উড়িয়াদিগকে অপরিষ্কার বিবেচনা করেন। কিন্তু সহজেই বুঝা যায় যে এই ব্যুৎপত্তিটী সম্পূর্ণ কাল্পনিক অতএব আমরা ইহাকে ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি।

মহোদয় ল্যাসেনের মতে ওড্র শব্দটী সংস্কৃত 'উত্তর' শব্দেব প্রাকৃতরূপ এবং ইহার অর্থ উত্তর দেশ। সংস্কৃত ভাষায় ওড্র শব্দ এক প্রকার সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ বুঝায়; এই জন্য অপর কাহারও মতে যেমন জম্বু (জাম) বৃক্ষ প্রচুব পরিমাণে থাকাতে ভারতবর্ষের নাম জম্বুদ্বীপ হইয়াছে সেইরূপ ওড্র বৃক্ষের আধিক্য বশতঃ এই দেশের নাম ওড্র দেশ হইয়াছে। (প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে জাম বৃক্ষের সংখ্যা অতি অধিক মাত্রায় ছিল)। কিন্তু পুরী এবং কটক জেলার ভূভাগ সমূহে অধিক ওড্র বৃক্ষ লক্ষিত- হয় নাই এবং যদিও উড়িয়াগণ ওড্র পুষ্পের বিশেষ আদর এবং ইহাকে মন্দার (দেবরাজের পুষ্প) "কুসম নামে" অভিহিত করে তথাপি উড়িষ্যার অধিকাংশ ভূভাগে ইহাদের এরূপ প্রাচুর্য্য নহে যে ইহাদের নামেই সমস্ত প্রদেশের নামকরণ হইবে।

মনুসংহিতায় ওড্র জাতির উল্লেখও দেখা যায় তথায় কথিত আছে যে ইহারা পূর্ব্বে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিল কিন্তু ধর্ম্ম সংস্কার সকলের প্রতি অবহেলা কবায় তাহা হইতে বিচ্যুত হয়। পৌণ্ড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক এবং অন্যান্য অনার্য্য জাতিগণের সহিত এক শ্রেণীতে ইহারা পরিনিবিষ্ট হইয়াছে। মহাভারতীয় হরিবংশ পর্ব্বেও সুরাষ্ট্র, বাহ্লিক, মদ্র, আভির, ভোজ, পাণ্ড, অঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, বামচুল এবং কেরল জাতির সহিত ওড্র জাতিও এক তালিকায় দৃষ্ট হয়, এই সকল জাতি অথবা ইহাদের অধিকাংশই অনার্য্য কিম্বা আদিমতর ছিল। এইরূপ রামায়ণেও অনেকগুলি অনার্য্য জাতির নামের সহিত ওড্র জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমুদায় দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে কোল, ভীল, কন্দ প্রভৃতির ন্যায় ওড্রও একটী অনার্য্য জাতি এবং এই জাতি হইতে প্রদেশটীর নাম ওড্র দেশ হইয়াছে।

এই অনুমান প্রামাণিক হইলে সংস্কৃত সাহিত্য পরিদৃষ্ট এই প্রদেশের দ্বিতীয় নাম 'উৎকল' শব্দেরও অর্থবোধ সহজ হইবে। মধ্যকালের শাব্দিকগণ উৎ (উপরি) এবং গমনার্থক ধাতু হইতে ইহার ব্যাকরণ নিষ্পন্ন করেন; অতএব উৎকল শব্দের অর্থ ভারবাহী পাল্কি অথবা ভারবাহী এবং উড়িয়াগণ আজ পর্য্যন্ত পাল্কি ও অন্যান্য ভার বহনেই

অধিক নিযুক্ত। অপর কেহ কেহ কলধাতুর অস্ফুট-স্বর-রূপ দ্বিতীয় অর্থ ধরিয়া বলেন যে ইহাদের বিশেষ স্বর হইতেই উৎকল শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই দুই প্রকার ব্যুৎপত্তিই কাল্পনিক বলিয়া বোধ হইতেছে অতএব একবার সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া অন্য দিকে শব্দটীর ব্যুৎপত্তি দেখা যাউক। ওড্র শব্দের উড়িয়া অর্থে প্রয়োগ অতি বহুল এবং প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়ম এবং স্থানীয় প্রয়োগ অনুসারে 'ওড্' অথবা 'উড়'ই vernacular আকার। এই আকারের সহিত অনার্য্য জাতির সাধারণ নাম কোল সংযোগ করিলে, শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং ইহার অর্থ ওড্ নামক কোল বা অসভ্য জাতি। পরে কোনরূপ সামান্য কারণে উৎকোল শব্দের আকৃতি উৎকল হইয়াছে।

কর্ণেল উইলফোর্ড বলেন উৎকল এবং উদ্‌কল এই শব্দ এবং ইহার অর্থ কোল জাতির সুবিখ্যাত আবাস স্থান। ডাক্তার হাণ্টারের মতে ওড্র শব্দ ওড্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাঁহার এবিষয়ে যুক্তি এইরূপ—ভারতীয় আদিম জাতিগণের অনেকের মধ্যে মনুষ্য জাতির নাম 'হা' বা 'হো'; এই শব্দদ্বয়ই পরে 'হা' হাড্ ও হড্ হইয়াছে। পরে সামান্য কারণে 'হ' ও বিচ্যুত হওয়ায় আমরা অড্ বা ওড্ আকার প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা হইতেই ওড্র শব্দ সংসাধিত হইয়াছে। হণ্টার সাহেব আরও বলেন যে কোল শব্দও উক্ত 'হা' বা হো হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে কিন্তু একই ভাষায় একই শব্দের এরূপ বিভিন্ন আকারদ্বয়ের সৃষ্টি সহজে স্বীকার করা যায় না। আমাদের বোধ হয় 'হা'র ন্যায় কা ও মনুষ্যবাচী এবং ব্রাহ্মণগণ যখন প্রথমে ওড্ জাতিকে দেখেন তখন তাহাদের নাম 'ওড্‌কোল' (ওড্ নামক অসভ্য জাতি) রাখেন যাহা হউক এক্ষণে আমরা শব্দের ব্যুৎপত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এরূপ বলিতে পারি যে, 'ওড্' একটী জাতি বিশেষের নাম। এখনও উড়িষ্যার অনেক স্থানে 'চাষা' নামক এক প্রকার জাতি আছে, যাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় এবং আকার ও প্রকৃতিতে হিন্দুগণ হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী হিন্দুগণ ইহাদিগকে সমাজভুক্ত না করায়, ইহাদিগের পৃথক পুরোহিতাদি আছে। এই চাষাগণ আপনাদিগকে প্রকৃত ভূম্যধিকারী জ্ঞান করে এবং বলে যে, উড়িষ্যার রাজগণ তাহাদের নিকট হইতে বল পূর্ব্বক অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিল। সরলা দাস নামক এক জন কবি স্বকীয় মহাভারতের অনুবাদ মধ্যে ইহাদের এইরূপ দাবী সমর্থন করিয়াছেন। জাতীয় প্রাচীন সঙ্গীত সকলের মধ্যেও ওড্‌মণ্ডলের প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। এই ওড্‌গণ ইক্ষু চাষ, বৃষ পৃষ্ঠে ভার বহন ইত্যাদি এমন অনেক কার্য্য করে, যাহা অপর হিন্দুগণ করিলে সমাজে নিন্দনীয় ও জাতিচ্যুত হন। ইহাদের সামাজিক আচার ব্যবহারও অন্যান্য হিন্দু হইতে অনেক বিভিন্ন। জাতিভেদ ইহাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। এই সকল দেখিয়া আমাদের বোধ হয় যে, বর্ত্তমান ওড্‌গণেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে সমস্ত প্রদেশটীর নামকরণ হইয়াছে।

খুর্দা (Khurda) পরগণায় এই ওড্‌গণের আধিক্য দেখিয়া এবং উড়িষ্যার ইতিহাসে এই স্থানের গৌরবাধিক্য জানিয়া বোধ হয় যে, এক কালে এই স্থানই ওড্ রাজ্যের

রাজধানী ছিল। কিন্তু উক্ত রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা বলা যায় না। তবে জানা যায় যে, গঙ্গা বংশীয় রাজগণের রাজ্য গৌড় হইতে কর্ণাট পর্য্যন্ত ভূভাগে পরিব্যাপ্ত ছিল।

আইন আকবরীর মতে উড়িষ্যা প্রদেশ জেলাসর, ভদ্রক, কটক, কালেন্দ্রপত্ত ও রাজমাহেন্দ্রী এই পাঁচটী সরকারে সংগঠিত ছিল। ইহাতে দেখাইতেছে যে দুই শতাব্দীর পূর্ব্বে উড়িষ্যা প্রদেশ মেদিনীপুর হইতে রাজমাহেন্দ্রী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তাকি খাঁর রাজত্বের সময়ে সুবা-উড়িষ্যা মেদিনীপুর হইতে ৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী রাধা-দেবল নামক স্থান হইতে টিকালি রঘুনাথপুর পর্য্যন্ত ১৭৬ ক্রোশ দীর্ঘ ছিল, তখন ইহাব বিস্তার ৮৫ ক্রোশ ছিল কিন্তু ইহার উত্তর সীমা কখনও স্থিররূপে নিরূপিত হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদীব দক্ষিণ ভাগ উড়িষ্যার উত্তর সীমা ছিল। উত্তরের ন্যায় দক্ষিণ সীমাও চিল্কাহ্রদ হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত ভূভাগের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল ছিল। কিন্তু সুবর্ণ রেখা নদী ও চিল্কাহ্রদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ চিরকালই উড়িষ্যার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল এবং এই স্থানে উড়িয়াগণের আচার ব্যবহার এবং প্রচলিত উড়িয়া ভাষা অন্যান্য স্থানের ন্যায় বিমিশ্র নহে।

কোন্ সময়ে আর্য্যজাতি এই ভূভাগে প্রথম পদার্পণ করেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ঋগ্বেদীয় স্তোত্র সকলে উড়িষ্যার নাম দেখা যায় না কিন্তু প্রদেশটী তৎকালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না কারণ উক্ত সময় হইতে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা সুবিখ্যাত কলিঙ্গ দেশের অংশ ছিল। এবং কলিঙ্গ রাজকুমারীর গর্ভে দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষিবৎ ঋষির উৎপত্তি স্থলে কলিঙ্গ দেশের নাম দেখা যায়, পাণিণীর ব্যাকরণে উৎকল বা ওড্র দেশের উল্লেখ নাই। রামায়ণে ওড্র জাতির উল্লেখ আছে এবং মহাভারতেও ওড্র দেশেরও বর্ণনা দেখা যায় কিন্তু তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, ইহার তাৎকালিক অবস্থা অতি হীন ছিল এবং অধিবাসীগণ বৈদিক আচার ব্যবহারে অনভিজ্ঞ ছিল।

তিনশত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে এই দেশ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং সম্রাট অশোক এই প্রদেশের পর্ব্বত গাত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদেশ সকল খোদিত করান। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম এই স্থানে অতি প্রবল হয় এবং অনেক বৌদ্ধমন্দির এবং মঠাদিও এই কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই এই প্রদেশ কলিঙ্গ নামের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল এবং ইহার বৌদ্ধ রাজগণ অনেক পর্ব্বতগুহা খনন করেন।

এই সময়ে (ভারত) উপদ্বীপের তীরভূমি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল; তাহাদের নাম মলবার উপকূল, করমণ্ডল উপকূল এবং কলিঙ্গ বা বঙ্গ উপকূল। শেষোক্ত কলিঙ্গ উপকূল আবার কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ, এবং মগকলিঙ্গ এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। কলিঙ্গ বিভাগ (Subdivison) এক্ষণে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কটক ও মান্দ্রাজের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ কলিঙ্গ নামে আখ্যাত হয় কিন্তু মুসলমানদিগের সময়ে এবং বর্ত্তমান কালীন ভূচিত্র সমূহে এই প্রদেশ উত্তর সরকার বা তেলেঙ্গানা নামে অভিহিত আছে। রঘুবংশে উৎকলের দক্ষিণ ভাগে ইহার (কলিঙ্গের) অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে।

Arrian's Periplus of the Erythean Sea নামক গ্রন্থে বঙ্গোপসাগরের তীরভাগের বাণিজ্য সংক্ষেপে বর্ণিত আছে তাহাতে উৎকল, কলিঙ্গ বা ওড্র দেশের নাম লক্ষিত হয় না। তাঁহাতে হস্তি দন্তের জন্য বিখ্যাত দেশারিণ নামক একটী স্থান বর্ণিত আছে। কাহারও মতে এই দেশারিণই উড়িষ্যার উপকূলের নামান্তর মাত্র; আমাদের এই অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় কারণ মহাভারতে বর্ণিত আছে যে ওড্ররাজ পাণ্ডুরাজকে উৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত উপহার দিয়াছিলেন। অপর কেহ বলেন দেশারিণ শব্দ দশারণ্যের অপভ্রংশ এবং বর্ত্তমান ছোটনাগপুর জেলার প্রাচীন নাম। প্রোফেসার উইলসন সাহেবের মতে এই দশারণ্য বিন্ধ্যগিবির উত্তরে সতীশগড় জেলার অন্তর্নিবিষ্ট। মেঘদূতে দশারণ নামক অসভ্য জাতির বর্ণনা দ্বারা তিনি এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু ইহা ঠিক হইলে দেশারিণ উপকূলবর্ত্তী ভূভাগ হয় না। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত পুস্তকে বঙ্গোপসাগরের তীর বর্ণনে তদ্রূপ ভৌগলিক সত্যতা দেখা যায় না কিন্তু ইহাও সহজে স্বীকার করা যায় না যে এরিয়ানের ন্যায় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তৎকালে অতিশয় সমৃদ্ধিপূর্ণ উড়িষ্যা তীরের নামোল্লেখ না করিয়া সমুদ্রতীর হইতে সুদূরবর্ত্তী হীনাবস্থ এক ভূখণ্ডের বর্ণনা করিবেন।

এই সকল দেখিয়া আমাদের বোধ হয় আরিয়ানের এই দেশারিণ, টলমীর দশারণ হইতে ভিন্ন নহে; এই দশারণ মহানদীর নামান্তর কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও মেঘদূতোক্ত দশারণ নহে। আর যদিই ইহার অর্থ দশারণ্য হয় তবে ইহাকে ছোটনাগপুর না বলিয়া সুন্দরবন ধরিয়া লইলে ক্ষতি বোধ হয় না।

খৃষ্টীয় প্রথম চারি পাঁচ শতাব্দি মধ্যে লিখিত সংস্কৃত সাহিত্যে উড়িষ্যা দেশের বিশেষ বর্ণনা দেখা যায় না। রঘুবংশে বর্ণিত আছে যে মহারাজ রঘু দ্বিরদবদ্ধ সেতু দ্বারা কপিশ নদী পার হইয়া উৎকলরাজ প্রদর্শিত পথে কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। রত্নাবলীতে একটী সিংহল রাজকুমারীর উড়িষ্যার উপকূলে পোতমগ্ন হওয়া বর্ণিত আছে কিন্তু বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ না থাকায় অনেকে এরূপ সন্দেহ করেন যে কবি সম্ভবতঃ উড়িষ্যা দ্বারা কলিঙ্গকে বুঝিয়া ছিলেন। বরাহমিহির রচিত বৃহৎসংহিতাতে উড়িষ্যার উল্লেখ দেখা যায়. এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত হয়।

৪র্থ খৃষ্টাব্দীয় বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ফাহয়েন সম্ভবতঃ উড়িষ্যা দেশে গমন করেন নাই। তাঁহার দুই শত বৎসর পরবর্ত্তী হুয়েন স্যাং তাম্রলিপ্তিতে (বর্ত্তমান তমলুকে) পদার্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে এই নগরে ১২টী বৌদ্ধ মঠ এবং ১০০০০ দশ সহস্র সন্ন্যাসী ছিলেন এবং সমস্ত তাম্রলিপ্তি জেলার পরিধি ২৫০ ক্রোশ ছিল। পরে সিংহল যাইবার উদ্দেশ্যে হুয়েন স্যাং উড়িষ্যা মধ্যে প্রবেশ করেন তখন এই স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু দুই সম্প্রদায়ই প্রবল ছিল। তিনি উড়িষ্যার এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—এই প্রদেশের পরিধি ১১৫০ মাইল ইহার রাজধানীর পরিধি ৩½ মাইল; ভূমি বেশ উর্ব্বর। বৎসরের সকল সময়েই নানাবিধ ফল ফুলে ভূষিত থাকে। অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায়

ও সাহসিক এবং তাহাদের অধিকাংশ বৌদ্ধীয় Little translation ক্ষুদ্রপাঠের পক্ষপাতী ; মহায়নাধ্যায়ী সন্ন্যাসীর সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র হইবেক। বিধর্ম্মীর সংখ্যাও প্রচুর তাহাদের ৫০টী দেবালয় আছে।

এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আর্য্যগণের নিকট উড়িষ্যা পরিচিত ছিল কিন্তু তাঁহারা ইহাকে অসভ্য বা হীনাবস্থ জাতির বাসস্থান বলিয়া জানিতেন কখনও ইহাকে তীর্থস্থান মনে করেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকগণ ইহাকে একটী উৎকৃষ্ট স্থান বিবেচনা করিয়া প্রথমে এই স্থানেই কার্য্য আরম্ভ করেন এবং সহজেই অসভ্য অধিবাসীগণকে স্বমতাবলম্বী করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোক ইহার নানা স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাদেশ লিখিত করান। খণ্ডগিরির গুহা সকল দৃষ্টে বোধ হয় যে ইহার পরবর্ত্তী সময়েব অধিবাসীগণ অধিকাংশই বৌদ্ধ ছিল।

হুয়েন স্যাংএর সময়ে উড়িষ্যাতে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মই প্রবল ছিল কিন্তু অল্পকাল পরেই বৌদ্ধধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া একবারে এই প্রদেশ হইতে দূরীভূত হয়। প্রবাদ অনুসারে শঙ্করাচার্য্য দ্বারা হিন্দুধর্ম্মেব প্রাবল্য পুনঃস্থাপিত হয় ; কাহারও মতে অনেক ভয়ানক যুদ্ধ এবং নিগ্রহাতিশয্যের সাহায্যে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত করেন কিন্তু তাহার কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরীতে শঙ্করাচার্য্যের একটী মঠ সংস্থাপিত আছে। শঙ্করের জীবনীতে শাস্ত্রীয় তর্ক ব্যতীত কোনরূপ যুদ্ধ বিগ্রহাদির উল্লেখ দেখা যায় না। আর তিনি যে সন্ন্যাসী হইয়া বিধর্ম্মীর স্থায় উৎপীড়ণ করিবেন তাহাও সম্ভবপর বোধ হয় না।

আমাদের বোধ হয় যেমন (বৈদিক কর্ম্ম সকলে পশু হত্যার প্রাচুর্য্য দেখিয়া) মনুষ্যগণের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাহারা অহিংসাময় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল সেইরূপ পরে আবার তাহারা বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট মানসিক উন্নতি প্রভৃতি আয়াস সাধ্য বিবেচনা করিয়া এবং হিন্দুধর্ম্ম যাজকগণের কর্ম্মকাণ্ডে পশু হিংসার তিরোভাব এবং নূতন প্রকার সাম্যভাব দেখিয়া তাহাতেই যোগ দিয়া ছিল। হিন্দু উপদেষ্টা সকল আপনাদের ত্রুটি বুঝিয়া শীঘ্রই কর্ম্মকাণ্ডে পশু বধ নিবারণ করেন এবং সকল জীবে সমানরূপ দৃষ্টির উপদেশ দেন। তাঁহারা আবও বুদ্ধকে ভগবানের অবতার স্বীকার করিয়া বৌদ্ধগণের বন্ধুতালাভ করেন এবং শীঘ্রই তর্ক দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস দূর করিয়া সহজে তাহাদিগকে হিন্দুমতে ফিরাইয়া আনেন। এইরূপে তাঁহারা বৌদ্ধমন্দির সকলকে তীর্থস্থান বলিয়া এবং অনেক বৌদ্ধ আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মকে দেশ হইতে বিলুপ্ত করেন।

এই সকল কারণে অন্য স্থান অপেক্ষা উড়িষ্যার মন্দির সকল অধিকতর পবিত্রতাময় এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকগণ যেমন উড়িষ্যাকে অসভ্য জাতির বাসস্থানরূপে বর্ণিত করিয়াছেন ৭ম শতাব্দী হইতে আর সেরূপ দেখা যায় না। ব্রহ্মপুরাণ পুরী ও ভুবণেশ্বরকে শিব ও বিষ্ণুর প্রিয়স্থান বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণানুসারে পুরী বিষ্ণুর প্রিয় স্থান এবং

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থ। স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগের অবসানে পুরীর নীলাচল পর্ব্বতে জগন্নাথদেবকে আনয়ন করেন।

শিবপুরাণে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন উৎকল দেশে সর্ব্বপাপ নাশিনী গন্ধবতী নদীর তীরে একাম্র নামক অরণ্য কৈলাসের ন্যায় আমার প্রিয়।

এই সকল পৌরাণীক উক্তির পরে আরও অনেক (ধর্ম্মপুস্তকে উড়িষ্যার তীর্থসকলের মাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছিল) তাহাদের নাম যথা কপিলসংহিতা, একাম্রপুরাণ, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য, একাম্র চন্দ্রিকা, তীর্থচিন্তামণি ও পুরুষোত্তম তত্ত্ব। (১) এই সকল পুস্তকে তীর্থ সকলের নাম এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে কিন্তু তাহাদের অবস্থিতি, সীমা, বিস্তার প্রভৃতি ভৌগলিক অথবা অধিবাসীর অবস্থা, রাজার নাম প্রভৃতি ঐতিহাসিক তত্ত্বের কিছুই উল্লেখ নাই।

মাদলা পাঞ্জিই উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস। ইহাতে সত্যযুগের রাজগণের নাম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অনেক প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভাষাকে উড়িয়া দেখিয়া বোধ হয় যে ইহা ছয় শত বৎসরের পূর্ব্বে সংগৃহিত হয় নাই এবং ঐ সময় হইতেই যে পরবর্ত্তী ঘটনা সকল যথার্থভাবে সংগৃহীত হইয়াছে সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। যাহা হউক মোটের উপর ইহা একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস।

উড়িষ্যার মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে আবুল ফজেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহার সময়েই উড়িষ্যা মোগল রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁহার বর্ণনা বংশাবলীর বর্ণনা হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন হইলেও অধিক বিশ্বাস্য।

এখন উড়িষ্যা ইংরেজগণের অধীন ভারত-সাম্রাজ্যের একটী অতি প্রধান প্রদেশ। ইহা বাঙ্গালা দেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বেহার, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম বাঙ্গালার সহিত ইংরেজজাতির হস্তগত হয়। এই প্রদেশ বঙ্গোপসাগরের উপরে (অক্ষাংশের ১৯° ২৮′ ও ২২° ৩৪′ উত্তর এবং দ্রাঘিমন্তের ৮৩° ৩৬′ ও ৮৭° ৩১′ পূর্ব্বের) মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ফল ১১১৫৪॥ বর্গ ক্রোশ। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশের দক্ষিণ ভাগস্থিতা মহানদী, মধ্য ভাগস্থিতা ব্রাহ্মণী ও উত্তর ভাগস্থিতা বৈতরণী নাম্নী এই নদীত্রয়ের "ব"-দ্বীপ সকলের এবং অত্রস্থ ১৭টী করদ মহলের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৪৩১৭৯৯৯। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত করদ মহল সমূহের লোক সংখ্যা ১২৮৩৩০৯ এবং পরিমাণ ফল ৮১০৯ বর্গ ক্রোশ। মহানদীর দক্ষিণ তীরে এই প্রদেশীয় উর্দ্ধ ভূমি (অধিত্যকা) কোন কোন স্থানে সমুদ্রতল হইতে ১১০০ এগার শত হস্তেরও অধিক উচ্চ হইয়াছে এবং পূর্ব্ব ঘাট পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে ইহার উচ্চতা ২৩০০ দুই হাজার তিন শত

---

(১) ভারতদর্পণ দ্বিতীয় ভাগ "উৎকল," "নীলাচল" ও "শ্রীক্ষেত্র" শব্দে শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ সমস্ত উদ্ধৃত হইল। সম্পাদক।

হস্ত অপেক্ষা অধিক। অত্রস্থ "ব"-দ্বীপ সকল উর্ব্বর। এই প্রদেশ মধ্যে মধ্যে বন্যা এবং অনাবৃষ্টি এই উভয় কারণেই অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষতি গ্রস্ত হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সেই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনকারীগণের উপদ্রবে উহা চতুর্গুণ উগ্রতর হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র তীরবর্ত্তী ভূমি সকল প্রবল ঝটিকায় ভূতলশায়ী হয়। ১৮৩৫ ও ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জল-প্লাবনে এই ভূভাগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। পরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের অনাবৃষ্টিতেই ইহাকে আরও অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অনাহার বশতঃ মৃত লোক সমূহের একটী তালিকা, প্রাদেশিক জমিদারগণের সাহায্যে ডিপুটি কালেক্টর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সর্ব্ব সমেত ৮১৪৪৬৯ জন লোক আহারাভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং ১১৫০২৮ জন লোক দেশ ত্যাগ করে। অর্থাৎ সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে মৃত এবং দেশ ত্যাগীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩১ জন হিসাবে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দীয় বন্যায় দেশের ৫২৬ বর্গ ক্রোশ পরিমিত স্থান জল-প্লাবিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের অধিবাসীর সংখ্যা ৪০৪৭৩৫২। পুরুষ ১৯৮২৪৯৩ স্ত্রী ২০৬৪৮৫৯।

এই প্রদেশে উত্তর ভাগ হইতে দক্ষিণ ভাগগামী প্রসিদ্ধ পথটী সমুদ্র তীব হইতে ৪॥০ সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র জলে ইহাব অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিযাছে। এই ভীষণ প্লাবনে অসংখ্য মনুষ্য, গ্রাম্য ও বন্য পশু সকল জলমগ্ন হইয়াছিল এবং পথের উপর স্তূপাকারে প্রায় ৭ সাত হস্ত উচ্চ হইয়া তাহাদের মৃতদেহ সকল নানা স্থানে একত্র হইযাছিল। এই তো হইল বালেশ্বরের উত্তরের ব্যাপার। দক্ষিণ দিকেব ব্যাপার ভীষণতর। একখানি গ্রামেব একমাত্র মৃতাবশিষ্ট অধিবাসী তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ;—সন্ধ্যার পরে প্রথমে ঝটিকা দেখা গেল এবং সমুদ্রের জল উচ্চতর হইতে লাগিল ; নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীগণ তখন সমুদ্র তীরে গমন করিল এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ঝটিকা দেখিয়াছিল, তাহারা তীরভূমি ত্যাগ পূর্ব্বক দেশ মধ্যে যাইবার সঙ্কল্প করিল। কিন্তু যুবক ও বালকগণ বলিল, সমুদ্র জল আমাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না। সুতরাং তাহারা সেই স্থানেই থাকিতে মনঃস্থ করিল। এই লোক-সমূহের সকলেই জলমগ্ন হইয়াছিল। কেবল একজন নিকটস্থিত বৃক্ষের উপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হয় কিন্তু সেও দুইবার জলমগ্ন হইয়াছিল। তীর হইতে জল অপসৃত হইলে, সে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করে। কিন্তু কাহাকেও জীবিত দেখে নাই। এই প্রবল ঝটিকার অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ২২৫০০ জন লোক জলমগ্ন এবং আরও অসংখ্য লোক খাদ্য এবং শীতবস্ত্রাভাবে মৃত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অপর একবার ঝটিকা আইসে কিন্তু প্রাবল্যের সময় ইহা সমুদ্র মধ্যে থাকায়, দেশের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিতে পারে নাই। এই সকল উৎপাত দেখিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পুনরাবির্ভাব নিবারণ করিতে তৎপর হয়েন। অত্রস্থ নদী সাতটীতে অনেক "ব"-দ্বীপ দেখা যায়। এই নদী সকলের নাম যথা ;—মহানদী, ব্রাহ্মনী, বৈতরণী, লহুন্দী, বড়বাহিনী, সুবর্ণরেখা,

এবং কসিয়া। ইঞ্জিনিয়ার, এই স্থানে প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এতৎ-প্রদেশীয় প্রজা-লোকেরা অনাবৃষ্টিতে অধিকতর কষ্ট ভোগ করে। অতএব যে সময়ে মনুস্থন্ (সাময়িক বায়ু), পশ্চিম-দক্ষিণ-দিগ্বাহী হয়, তখন এই দেশে যে অতিরিক্ত পরিমাণে জল আইসে, তাহাকে কোন-রূপে সঞ্চিত করিতে পারিলে, অনাবৃষ্টি আর অধিক ক্ষতি করিতে পারিবে না। অধিকন্তু দেশকে প্লাবন হইতেও রক্ষা করিবে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ঐ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, ইতিমধ্যে অনেক উপকার পাওয়া গিয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ, কিয়ঞ্জর এবং বড়ের পর্ব্বতীয় বন্য-ভূমিতে ভুরিয়া, ভূমিজ, বাহুদি, গন্দ, খন্দ, খয়রা, কোল, পান, সাঁওতাল, সবারা প্রভৃতি জাতি বাস করে। তাহারা সংখ্যায় প্রদেশের সমস্ত অধিবাসীর প্রায় ¼ এক-চতুর্থাংশ হইবে। জগন্নাথ দেবের মন্দিরে উড়িয়া ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তিকা রক্ষিত আছে। ইহার নাম—বংশাবলী ও রাজ-চরিত। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহার লিখন আরম্ভ হয়। প্রথমে পুরাণোক্ত দেব-দেবীর কিছু কিছু বর্ণনা করিয়া, ইহাতে ভারতবর্ষীয় হিন্দু-রাজাদিগের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত কতকগুলি রাজার ইতিহাসান্তে ইহাতে বট-কেশরী রাজার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এরূপ লিখিত আছে যে, তিনি ১৬২ খৃষ্টাব্দে এই ভূভাগে প্রথম রাজা হন। তিনিই কেশরী রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মধ্যে ১৪৬ বৎসর কাল যবনেরা এই স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনরায় ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে যযাতি কেশরী, রাজ্য লাভ করিয়া রাজধানীতে (জাজপুরে) রাজ্য করিতে লাগিলেন। এই রাজা অতিশয় সাহসী এবং যোদ্ধৃ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্ স্থান হইতে আসিলেন, তাহা কিছুই জানা যায় নাই। এই সময় হইতে ১১৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কেশরী বংশ, এই ভূভাগে রাজত্ব করেন। তৎপরে সারঙ্গ-দেবের আক্রমণ হইতে গঙ্গা-বংশের রাজগণ, ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা নারসিংহ দেব, কানারকে কৃষ্ণ-মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

১৪৫১ হইতে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সূর্য্য-বংশীয়গণ রাজত্ব করেন। পরে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে খুর্দ্দ রাজগণ, আসিয়া রাজা হন। তাঁহাদের শেষ রাজা মুকুন্দ দেব, ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ জাতি কর্ত্তৃক পদচ্যুত হন।

উড়িষ্যা দেশে এক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বুদ্ধ দেবের ধর্ম্ম প্রবল ছিল। কিন্তু এখন তাহার বিশেষ প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না। কোল-পর্ব্বত-গুহা-মধ্যে বৌদ্ধ যতি-গণের আবাস-গৃহ এবং বর্ত্তমান কালে পঠিত কতকগুলি প্রাচীন লিপি (শাসন), সামান্য পরিমাণে বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাব বিজ্ঞাপন করিতেছে। পুরী ও কটকের মধ্য-স্থলে খণ্ডগিরি-নামক স্থানে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান আশ্রম ছিল। সর্প, হস্তী ও ব্যাঘ্র নামক গুহা-ত্রয় এবং রাণীনুর নামক দ্বিতল মঠ-গৃহ, দেখিতে বড়ই সুন্দর। এইগুলি বৌদ্ধদিগের তিন রূপ ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিতেছে; অর্থাৎ ইহাদের এক শ্রেণীর গুহা সকল, বন্য জন্তুর বাস স্থানের ন্যায় ক্ষুদ্র এবং সহজে সে সকলে যাওয়া যায় না। এগুলি সন্ন্যাসিগণের প্রাদুর্ভাব-

সময়ে নির্ম্মিত। দ্বিতীয় শ্রেণী, বিস্তৃত মন্দির শোভিত। এই সকলে ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণ, সমবেত হইতেন। ইহা দ্বারা বৌদ্ধগণের মধ্যকাল সূচিত হইতেছে। তৃতীয়গুলি নানাবিধ আড়ম্বর-পূর্ণ। তন্মধ্যে রাণীনুর-নামক মন্দিরে প্রতিষ্ঠাতার জীবন-বৃত্তান্ত, প্রস্তর-গাত্রে লিখিত রহিয়াছে। জেনারাল কনিঙ্হাম সাহেব বলেন,—চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউন স্যাঙের লিখিত অচা অথবা অডা নামক প্রদেশ, বর্ত্তমান ওড্র বা উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে বিভিন্ন নয়। যৎকালে উক্ত পরিব্রাজক, ভারতে আসেন, তৎকালে এই দেশের পরিধি ৫৮৩॥ পাঁচ শত সাড়ে তিরাশী ক্রোশ ছিল। ইহা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল। সমুদ্র-তীরে এই দেশের চেলিটা লোচিও বা চরিত্রপুর নামক বন্দর ছিল। কনিঙ্হাম্ সাহেবের মতে, এই 'চরিত্রপুর'ই পুরী নামে আখ্যাত হয়। পরে এই স্থানের নিকটে জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মিত হয়। উক্ত চীন পরিব্রাজক আরও লিখিয়াছেন যে,—চরিত্রপুরের বহির্ভাগে পাঁচটী ঊর্দ্ধ-শৃঙ্গ স্তূপ ছিল। কনিঙ্হামের মতে,—জগন্নাথ দেবকে ইহার একটী অর্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা এই মূর্ত্তি-ত্রয়, বৌদ্ধগণের বুদ্ধ, সংঘ এবং ধর্ম্মের বহির্দৃষ্ট আকৃতির স্মরণ করাইতেছে। বুদ্ধদেব উত্তরকালে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক নারায়ণের অবতার-নিচয়ের মধ্যে অন্যতম বিবেচিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেই নিঃসংশয় সপ্রমাণ হইতেছে, এই মূর্ত্তি, প্রথমে বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, প্রবল হিন্দুরাজগণের সময়ে উড়িষ্যার সীমা, উত্তরে গঙ্গা ও দামোদর পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু প্রাচীন ওড্রদেশ (অথবা অদেশ) মহানদীর তীরভূমি এবং সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ-ভাগের তীরভূমিতে সংলিপ্ত ছিল। তৎকালে ইহা বর্ত্তমান কটক ও সম্বলপুর জেলা-দ্বয় এবং মেদিনীপুর জেলার কতক অংশের অন্তর্গত ছিল। তৎকালে ইহার উত্তর সীমা, সিংভূম ও যাজপুরের পর্ব্বতীয় ভূভাগ-সকল; পশ্চিম সীমা গণ্ডোয়ানা; পূর্ব্ব সীমা সমুদ্র এবং দক্ষিণে গঞ্জাম ছিল। হিউনস্যাঙের সময়েও ইহার এই সীমা থাকাই সম্ভব। কারণ, এই সীমার পরিমাণ, তৎকথিত পরিমাণের সমান। প্লিনি, ওরেট নামক এক-জাতীয় লোকের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহারা ভারতবর্ষের একটী জাতি এবং ইহাদের দেশে মেলিয়স্ পর্ব্বত অবস্থিত। কিন্তু অন্য দুই স্থানে তিনি উক্ত মেলিয়স্ পর্ব্বতের অবস্থান, ভিন্ন-রূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যাহা হউক, তদ্দর্শনে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তৎ-কথিত ওরেট শব্দের অর্থ উড়িষ্যার অধিবাসী।

উড়িয়ারা হিন্দুমতাবলম্বী। কটকের নিকটবর্ত্তী সমতলে ও অধিত্যকায় তাহারা বাস-করে। কল বা হো জাতীয়গণ, প্রদেশের উত্তরাংশের অধিবাসী। কন্দগণ, মধ্যভাগে বাস করে। শেষোক্ত জাতিত্রয়, আপনাদিগকে এই স্থানের আদিম-অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দেয়। কলেরা বিশ্বাসী, সৎস্বভাব সদানন্দ। নিকটস্থ হিন্দুদিগের ন্যায় ইহারা মিথ্যাবাদী নহে। ইহারা আতিথ্যপ্রিয়ও বটে; কিন্তু অতি-ক্রোধপরায়ণ এবং প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ক্রোধপরবশ হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে। কন্দেরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-কাল পর্য্যন্ত পৃথিবী দেবীর

সম্মানার্থ নরহত্যা করিত। নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল হইতে লোক চুরি করিয়া আনিয়া বলির জন্য কন্দের নিকট বিক্রয় করিত। কারণ, ইহাদের মধ্যে নিয়ম আছে, কন্দ-জাতীয় কোন লোককে বলি দেওয়া হয় না এবং মূল্য দিয়া না ক্রয় করিলে বলি সিদ্ধ হয় না।

প্রথমে পুরোহিতগণ, উৎসবের দিন নির্ণয় করিয়া দিতেন। পরে উক্ত সময়ে প্রথমে দুই দিন দিবারাত্রি মদ্যপানাদি আমোদে অতিবাহিত হইত। তৎপরে তৃতীয় দিবসে হতভাগ্য নর-গুলিকে আনিয়া একটী দণ্ডে বদ্ধ করা হইত। তাহার পর প্রথমে তাহাদের অঙ্গ ভগ্ন করিয়া পুরোহিত, কুঠার দ্বারা সামান্যাংশ কর্ত্তন করিতেন। তাহা হইলেই সকলে এক-বারে তাহাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত এবং প্রায় প্রত্যেকেই উহার এক এক খণ্ড লইয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, অনেক চেষ্টা দ্বারা এই ভীষণ ব্যাপার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রদেশের দক্ষিণ-ভাগ-স্থিত সৌরগণও, কন্দদিগের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন; বরং তাহারা অধিকতর অসভ্য এবং দুর্দ্দান্ত। এই জাতীয় কোন ব্যক্তি, একটী সামান্য কারণেও মনুষ্য-হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। তাহাতে কোন রূপ দ্বিধা করে না। উড়িষ্যাবাসিগণের আকৃতি সুন্দর এবং হনু-ভাগ কিছু উন্নত। ডাক্তার হণ্টার সাহেব বলেন, ইহাদের মধ্যে এই একটী বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, কোন ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার যদি ভ্রাতা, বিদ্যমান থাকে, সে ব্যক্তি মৃত ভ্রাতার বিধবা পত্নীর পাণিগ্রহণ করে। খাদ্য-সম্বন্ধে উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ, অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতে কিছু পৃথক্। ইহাদের অনেকাংশ কৃষিজীবী। এতদ্ব্যতীত ইহারা আরও অনেক ইতর-জাতীয় কার্য্য করিয়া থাকে।

উড়িষ্যার দক্ষিণ ভাগে পানা নামক আর এক প্রকার অসভ্য জাতি বাস করে। এই প্রদেশে জোয়াঙ্গো নামক আর একপ্রকার বন্য জাতি আছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাদের স্ত্রীলোকগণ, কেবল পত্র পরিধান করিত। এই জাতির অপর নাম পাটুয়া।

হিন্দোল, একতম করদ মহল। ইহার পরিমাণ ১৫৬ বর্গ ক্রোশ, অধিবাসীর সংখ্যা ২৮০২৫ জন। তাহার অধিকাংশ সম্পূর্ণ হিন্দু নয়। তাহারা অসভ্য ও অর্দ্ধ-হিন্দু।

উড়িষ্যা-দেশের প্রচলিত ভাষা "উড়িয়া"। পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে অড় বা অর জাতীয়েরা এই স্থানে আসিয়া বাস করায়, প্রদেশটীর নাম ওড্রদেশ ওদেশ, পরে উড়িষ্যা হইয়াছে। পূর্ব্বে অত্যল্প পরিমিত ভূভাগ, তাহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের প্রাবল্য-কালে উড়িষ্যার সীমা, উত্তরে মেদিনীপুর ও হুগলী পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উড়িয়া ভাষা, বাঙ্গালার একটী শাখা। গঞ্জাম হইতে তেলুগু ভাষা, প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আরও ২৭।২৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত উহা উড়িয়ার সহিত মিশ্রিত থাকে; তৎপরে বিশুদ্ধ তৈলঙ্গী ভাষায় পরিণত হয়। গঙ্গা-তীরবর্ত্তী হিজলি ও তমলুক বিভাগ পর্য্যন্ত উড়িয়া ভাষা শোনা যায়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল স্থান অপেক্ষা উড়িষ্যায় মন্দির সংখ্যা অধিক। ইহাদিগের অধিকাংশ ৫০০ খৃষ্টাব্দে ও ১২০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত। ভুবনেশ্বরের মন্দির ৬৩৭

খৃষ্টাব্দে এবং পুরীর মন্দির, ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। কেশরী বংশীয় রাজগণের সময়ে পুরী-স্থিত জগন্নাথদেবের মন্দির ব্যতীত অপর সমস্ত মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাঁহারা ৪৭৩ হইতে ১১৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরে গঙ্গাবংশীয়গণ, এই স্থানে রাজত্ব করেন। এই বংশের তৃতীয় রাজা জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পরশুরাম ঈশ্বরের মন্দিরটী ২৫ হস্তেরও অধিক উচ্চ। অত্রস্থ স্থপতি-কার্য্য অতি সুন্দর সুতরাং উত্তম। এই মন্দিরটী ৪৫০ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুক্ত-ঈশ্বরের মন্দির, ইহা অপেক্ষাও অধিক সুন্দর। ফার্গুসন সাহেবের মতে ভুবনেশ্বরের মন্দিরটী, ইন্দ্রকেশরীর রাজত্বকালে (৬১৭ হইতে ৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হয়। ইহা ভারতবর্ষীয় হিন্দু-মন্দির-সমূহের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত-স্থল। ইহা ২০০ হস্ত দীর্ঘ ও ৫০ হস্ত বিস্তৃত। ইহার সমস্ত স্থান, সুন্দর-কারুকার্য্য-পূর্ণ। ইহার নাটমন্দির, ১০৯৯ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সালিনীর স্ত্রী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত রাজ-রাণীর মন্দির এবং অপরাপর অনেক মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। কানারক মন্দিরকে ইংরেজেরা "ব্লাক প্যাগোডা" অর্থাৎ কৃষ্ণমন্দির বলেন। পুরীস্থিত জগন্নাথদেবের মন্দিরের বহির্ভাগের পরিমাণ, স্থান-বিশেষে ৪২৬ হইতে ৪৪৬ হস্ত পর্য্যন্ত। ইহার চতুর্দ্দিকে ১৩ হইতে ২০ হস্ত উচ্চ প্রাচীর আছে। উক্ত প্রাচীরের চারি-দিকে চারিটী প্রবেশ-দ্বার। মন্দিরের উচ্চতা ১২৮ হস্ত।

কটক জেলাস্থ বৈতরণী-তীরবর্ত্তী জাজপুব নগর, এক-কালে সমস্ত প্রদেশের রাজধানী ছিল। এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড স্তম্ভ রহিয়াছে। উহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। খৃষ্টীয় অব্দারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০০ পাঁচ শত বৎসর কাল, উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। বৌদ্ধগণ, উড়িষ্যাব পর্ব্বত-গুহাসমূহ নির্ম্মিত করেন। এক্ষণে ইহার অধিবাসিগণ, বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা অধিকতর হিন্দুমতাবলম্বী ও সংস্কারাপন্ন এবং কিছুতেই প্রাচীন-মত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত নয়। সমস্ত প্রদেশ, হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ স্থান। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় এখানে অসংখ্য যাত্রী ও দর্শক আগমন করেন।

(১) উদয়গিরি।—উড়িষ্যায় এই নামে একটী পর্ব্বত আছে। ইহা কটক হইতে ১০ দশ ক্রোশ দক্ষিণ ও ভুবনেশ্বরের শিবমন্দির হইতে আড়াই ক্রোশ পশ্চিম। ভুবনেশ্বরের শিবালয় হইতে এক ক্রোশ পথ অগ্রসর হইলেই, একাম্রক্ষেত্রের বিক্ষিপ্ত আম্রকুঞ্জের মধ্য হইতে সহসা দুইটি গিরিখণ্ড দেখা যায়। দুইটি, একই পাহাড় এবং সাধারণতঃ খণ্ডগিরি নামেই অভিহিত। মধ্যে কেবল একটিমাত্র নিম্ন পার্ব্বত্য পথ ব্যবধান হইয়া এই গিরিখণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নাম হইয়াছে, খণ্ড-গিরি ও উদয়-গিরি। এই গিরিদ্বয়ের বক্ষকোটরে এক সময় অসংখ্য বৌদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেন। এই গিরি দুইটিতে অনেক গুহা আছে। মানব বুদ্ধি বলে পাষাণ কর্ত্তিত করিয়া ক্ষুদ্র গিরিখণ্ডকে আপন বাসোপযোগী করিয়া লইয়াছে। তাহার উপর তলা, প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ, বারা-

ন্দায় বিচিত্র ভাস্কর্য্য-সুশোভিত প্রস্তর-স্তম্ভরাজি, স্তম্ভশ্রেণীর শিরোদেশে উন্নত-বক্ষঃ নারী-দেহ, ব্রাকেটের আকারে পাষাণ-ছাদ, ভার বহন করিতেছে। দেয়ালেও মধ্যে মধ্যে নানা মূর্ত্তি ক্ষোদিত, নর-নারী, সৈনিক, প্রহরী, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রমোদ-বিলাস। হয়তো কোনও প্রাচীন বৌদ্ধ উপাখ্যানের অবশেষ, কোথাও বা বিশেষ একটা চিহ্ন মাত্র।

বৌদ্ধ রাজা ও রাণীরা, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের জন্য এই সকল বিচিত্র শিল্প-রচিত গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সকল গুহা-নির্ম্মাণের জন্য কত অর্থই যে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। রাণী-গুম্ফা নামে একটী গুহা, এখনও বিদ্যমান আছে। বোধ হয়, কোন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজার পত্নী, নিজব্যয়ে এই গুহা নির্ম্মাণ করান। এই পর্ব্বতের গুহা-বলীতেই প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এখন আর কিছুই নাই। আর বৌদ্ধ-যাজকেরা, উদয়গিরির শিখরদেশে দাঁড়াইয়া প্রতিদিন সূর্য্যাস্ত-সময়ে গম্ভীর-স্বরে সংঘ-ধর্ম্ম-ও বুদ্ধের শরণ-মন্ত্র ধ্বনিত করেন না। গিরিপ্রাঙ্গণ হইতে মধুর নিনাদে আর সান্ধ্য ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হয় না। গুহায় গুহায় দীপালোক বা ধূপ-গন্ধ, আর প্রাণে আনন্দ দেয় না। এখন গুহা-গুলির যার পর নাই ভগ্নাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। গণেশ-গুম্ফা, রাণীহংসপুর, ব্যাঘ্র-গুম্ফা, হাতি-গুম্ফা নামক গুহা-গুলিই প্রধান। প্রায় দুই শত কি তিন শত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে এই পর্ব্বত, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুহার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে অনেক বৌদ্ধযাত্রী, এই পবিত্র পর্ব্বত ও গুহা সমস্ত দেখিবার জন্য এখানে আসিত। খৃষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনীয়-পরিব্রাজক হিউএনসিয়ঙ, উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে পুষ্পগিরি নামক সঙ্ঘারামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই আরামটি, বোধ হয়, উদয়গিরির নিকটেই অথবা উপরে ছিল। উদয়গিরির গুহার অনেকগুলি কলিঙ্গ-রাজগণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত গুহার মধ্যে পালী অক্ষরে অনেক শিলা-লিপি ক্ষোদিত আছে। বৌদ্ধদিগের মুদ্রার উপর যে পাঁচটি প্রধান চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, এই সমস্ত শিলা-লিপিতে সে গুলি বিদ্যমান আছে। অধিকন্তু এক প্রকার নূতন ধরণের বোধিবৃক্ষ অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত শিলা-লিপির কতকগুলি দেবনাগর অক্ষরে প্রায় পঞ্চম কি ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত হইয়াছে। একটি দশম শতাব্দীর লিপি আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, জগন্নাথ-ক্ষেত্রের মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীদিগের জন্য সত্যনিষ্ঠ নরপতি, এই গুহা নির্ম্মিত করাইলেন।

(২) উদয়গিরি।—ভূপালের নিকট বিশ-নগরের এক ক্রোশ পশ্চিম দক্ষিণে এই নামের আর একটী পাহাড় আছে। হিন্দুগণ ইহাকে একটী পুণ্যতীর্থ বলিয়া জ্ঞান করেন ও এই স্থান-সন্দর্শনাদি করিবার জন্য অনেকে আসেন। এখানে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। গঙ্গা ও যমুনা, স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতেছেন, এই দৃশ্যটীর ভাস্কর্য্য অতীব চমৎকার। এই পর্ব্বতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজার ১০৬ গুপ্তাব্দের একখানি অনুশাসন-পত্র আছে।

(৩) উদয়গিরি—মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নেল্লোর জেলার একটী গ্রাম ও পাহাড়। লাঙ্গুলিয়া জগপতি, যখন রাজা ছিলেন, তখন এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরায়, জগপতি রায়ের বংশধরগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইহার পর কয়েক জন মাত্র স্বাধীন সামন্ত, এই স্থান শাসনও সংরক্ষণ করিতেন। পরে এখানে আর্কটের নবাবের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। তিনি ইহা জায়গির-স্বরূপ কয়েক জনকে বিলি করিয়া দেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জায়গির-দারদিগের নিকট হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, ইহা কাড়িয়া লন।

উদয়নালা।—বাঙ্গালায় উদয়নালা একটী ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা মুর্শিদাবাদ হইতে ৬২ ক্রোশ পূর্ব্বে, রাজমহলের নিকট অবস্থিত। ১১৭১ সালে (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে) ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যগণ, মেজর এডামের সৈনাপত্যে নবাব মিরকাসিমের সৈন্যগণের সহিত এই খানে ঘোরতর সংগ্রাম করে। সংগ্রামে মেজর আদম জয়লাভ করেন। এখানে সম্রাট্ শাহজঁহার দ্বিতীয় পুত্র শাহসুজা, একটী অত্যুৎকৃষ্ট সেতু নির্ম্মাণ করান। এই সেতুটী মুসলমানী ধরণে নির্ম্মিত।

উদয়পুর—রাজপুতনার অন্তর্গত মেবার বা উদয়পুর রাজ্যের রাজধানী। চিতোরই পূর্ব্বে মেবারের রাজধানী ছিল। মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক উহা বিধ্বস্ত হইলে, উদয়পুরেই রাজধানী হয়। অকবর, দুই বার চিতোর আক্রমণ করেন। প্রথম বার সম্রাট, ভীম দর্পে আপন বিজয়িনী সেনা সমভিব্যাহারে চিতোরে আপতিত হইলে, কাপুরুষ রাণা উদয়সিংহ, তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সাহসী হন নাই; কিন্তু সর্দ্দারগণের উত্তেজনায় ও রাজ্য-চ্যুতির ভয়ে, অবশেষে সসৈন্যে অকবরের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া অকবরের ভীম-বিক্রান্ত সৈনিকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু যিনি তাহাদিগের রাজা—অধিনায়ক, তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনা না পাইলে, তাহারা আর কাহার জন্য কিসের বলে যুদ্ধ করিবে? সুতরাং সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালাইয়া আসিল। হতভাগ্য উদয়সিংহ, বিজয়ী অকবরের বন্দী হইলেন। মোগল সম্রাট্, তাঁহাকে নিজ-শিবিরে লইয়া গেলেন। সর্দ্দারগণ, তাঁহার মুক্তির জন্য অণুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন না। ফলতঃ, চিতোরপুরী তখন সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ ও নিস্তেজ বলিয়া প্রতীত হইল। সেই নিঃস্পৃহ ও নিস্তেজ ভাব অবলোকন করিয়া, উদয়সিংহের উপ-পত্নীর হৃদয়, দারুণ অভিমানে ও ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই বীর-রমণী, নিদারুণ ক্রোধে ও জিঘাংসায় উন্মাদিত হইয়া, কোমলাঙ্গে কঠিন লৌহ-বর্ম্ম ধারণ করিলেন এবং করে ধনুর্ব্বাণ ও তরবার লইয়া, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। চিতোরের সেই নির্জ্জীব ও নিঃস্পৃহ ভাব বিদূরিত করিয়া, রাজপুত-সৈন্যগণকে নবীন উৎসাহে প্রোৎসাহিত করিয়া, কাপুরুষ উদয়সিংহের বীরা উপ-পত্নী, সসৈন্যে মোগল-শিবির-শ্রেণীর সম্মুখে ভীম বলে আপতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থ প্রচণ্ড ভল্লাঘাতে এবং নিক্ষিপ্ত শর-পাতে অনেক যবন সৈনিক নিপাতিত হইল। ক্ষণ-কাল যুদ্ধের পরই যবনগণ, পশ্চাদপসৃত হইতে লাগিল।

উগ্রচণ্ডা রাজপুত-রমণী, অধিকতর উৎসাহে ও বিক্রমে তাহাদিগকে তাড়িত করিয়া ক্রমে অকবরের প্রধান সেনা-নিবেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বীর-নারীর অদ্ভুত বীরত্ব-দর্শনে মোগল সম্রাট্, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন তিনি অবশেষে নানা প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া, সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রমণীর যুদ্ধে আজি ভারতের সম্রাট্-শেখর মোগল-বীর অকবর, পরাভূত হইলেন। রমণীর বিক্রমে আজি বিজয়িনী মোগল-সেনার দুর্দ্দম বল, পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। ইহা রাজপুত-বীরত্বোচ্ছ্বাসের একটী জ্বলন্ত উদাহরণ"।

পরে মেবারের সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়া অকবর, ভীম মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় বারে চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হইবা-মাত্র ভীরু উদয়সিংহ, স্ব নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। বিশাল মোগল-অনীকিনী, উদ্বেল সাগরের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া, ভীষণ বিক্রমের সহিত চিতোর দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রলয়-কালীন মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় তাহাদিগের বিকট কামান-শ্রেণী, জ্বলন্ত গোলক-পুঞ্জ উদ্গার করিয়া শ্রবণ-ভৈরব নিনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল। সেই কাল দিবসে চিতোরের যে বিষম সর্ব্বনাশ হইল, তাহা আর ভুলিবার নহে। সেই দিন রাজপুত-স্বাধীনতার মহাশক্তি-রূপিণী ভগবতী মহামায়া, চিতোরপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যে চিতোর, এতদিন স্বাধীনতা ও সনাতন ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য অজেয় দুর্গ-স্বরূপ প্রথিত ছিল, আজি তাহার নিদারুণ অধঃপতন হইল। শোভা-সৌন্দর্য্যে একদা যাহা সুর-নগরী অমরাবতীর তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আজি নিষ্ঠুর অকবর, তাহার সেই সৌন্দর্য্য একবারে বিনষ্ট করিল। শোভনীয় সৌধ-রাজি ও সুদৃশ্য মন্দির-গুলিকে একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন।

কাপুরুষ হতভাগ্য উদয়সিংহ, চিতোর পরিত্যাগ করিয়া রাজ-পিপ্পলী নামক গভীর অরণ্যস্থ গোহিলদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দারুণ দুঃখ ও মনোবেদনায় তথায় কয়েক দিবস যাপন করিয়া, তিনি আরাবল্লির অভ্যন্তরস্থ গিরবো নামক স্থানে গমন করিলেন। চিতোর জয় করিবার পূর্ব্বে তদীয় পূর্ব্ব-পুরুষ বীর-কেশরী বাপ্পা রাওল, ইহার সন্নিহিত স্থানে অজ্ঞাতবাসে অবস্থিত ছিলেন। চিতোরের এই মহানর্থ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে, উক্ত গিরবো উপত্যকার পুরোভাগে উদয়-সিংহ, একটী বিশাল সরোবর খনন করিয়া, স্বীয় নামানুসারে তাহাকে উদয়-সাগর অভিধা দান করিয়াছিলেন। সেই উপত্যকার প্রশস্ত বক্ষ বিধৌত করিয়া, অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-তরঙ্গিণী, কল নিনাদে বক্র গতিতে প্রবাহিত। উদয়-সিংহ, তন্মধ্যস্থ একটী তরঙ্গিণীর স্রোত প্রতিরোধ করিয়া, একটী বিশাল বাঁধ স্থাপন করিলেন এবং তদুপরিস্থ গিরি-ব্রজের সানুদেশে "ন চৌকি" নামে একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রাসাদের চতুঃপার্শ্বে অচিরকাল মধ্যে অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা উত্থিত হইল; ক্রমে তাহা একটী ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইয়া দেখিতে

দেখিতে বৃহৎ হইয়া উঠিল। উদয়-সিংহ, তাহাকে স্বনামে আখ্যাত করিলেন। এইরূপে উদয়পুর সেই দিন হইতে মেবারের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়। বীর-শ্রেষ্ঠ প্রতাপ, এই যুদ্ধের অবসানে উদয়পুরে আসিয়া কয়েক মাস বিরাম লাভ করেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত মোগলগণ, তাঁহাকে অধিক দিন শান্তি-সুখ ভোগের অবকাশ দেয় নাই। নব বসন্তের সমাগমে পথ-ঘাট সমূহ পরিষ্কৃত হইলে, দুর্দ্ধর্ষ মোগলগণ, পুনরায় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ প্রতাপ, সেই বিশাল মোগল-বাহিনীর বিরুদ্ধে অধিক কাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অবিলম্বে উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া কমলমীরে গিয়া সেনা-দল সংস্থাপন করিলে, মহব্বৎ খাঁ উদয়পুর অধিকার করিল। অল্প দিনের মধ্যেই বীর-পুঙ্গব প্রতাপ-সিংহ, উদয়পুর পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। সে উদ্যমে তাঁহাকে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। শত্রুকুল বিনা বিবাদেই সেই নগর পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিল। প্রবাদ আছে,—উদয়পুরের চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত প্রদেশ, প্রতাপের হস্তগত হইলে, সেই নগর-রক্ষার উপায় না দেখিয়া সম্রাট্, তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ভট্ট-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—রাজপুত-বীরের অসীম সাহস, অলৌকিক বীরত্ব এবং অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়া, মোগল সম্রাটের কঠোর হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। তিনি অপূর্ব্ব-ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া, প্রতাপ-সিংহকে আর কষ্ট প্রদান করিতে পারেন নাই।

মেবারের শেষ স্বাধীন নৃপতি মহারাজ অমর সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণ, পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে আরোহণ করেন। ইনি উদয়পুরের চতুঃপার্শ্ব, প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া দিলেন এবং পেশোলা সরোবরের জল-অবরোধের জন্য যে একটী বিস্তৃত বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেটিকে আরও বিস্তৃত করিয়া লইলেন। অদ্যাপি শিশোদীয় কুলের মহিষীগণ যে একটী স্বতন্ত্র অন্তঃপুর বাটীকায় অবস্থিতি করেন, সেটি, কর্ণই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

জাহাঁগিরের পুত্র খরম্ (পাতসাহ শাহজহা নামে খ্যাত) স্বীয় জ্যেষ্ঠ পারবেজকে নিহিত করিয়া, দিল্লির শাসন-দণ্ড করায়ত্ত করিবার জন্য ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করেন। সেই নবোত্থিত বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য সম্রাট স্বয়ং, বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। খরম্, সেই সময় পালাইয়া উদয়পুরের শান্তিময় ছায়া-তলে গিয়া কিছু দিন বিশ্রাম করেন। রাজা কর্ণ, তাঁহার জন্য আপন বিশাল প্রাসাদের এক অংশ ছাড়িয়া দিলেন। সেই ভবনাংশে সুলতান খরম্, আপন পারিষদবর্গের সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুচরগণ, রাজপুত-সংস্কারের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করাতে, সুলতান স্বয়ং অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং সেই রাজ-ভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। খরমের সেইরূপ অত্যুদার ভাব দেখিয়া, রাণা, পরম আপ্যায়িত হইলেন এবং তত্রত্য হ্রদ-গর্ভস্থ দ্বীপের উপরি-ভাগে তাঁহার জন্য একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া-

দিলেন। সেই অট্টালিকা নানাপ্রকার শোভনীয় দ্রব্যে সমলঙ্কৃত হইল। তাহার শীর্ষদেশে ইসলামের অর্দ্ধ চন্দ্র-শোভিত নানা বর্ণের পতাকা উড্ডীন হইয়া, তাহাকে শত গুণে রমণীয় করিয়া তুলিল। সেই মনোহর অট্টালিকার প্রশস্ত অঙ্গন ভূমিতে মাদার শাহ ফকিরের একটী ক্ষুদ্র চৈত্য নির্ম্মিত হইল। সেই পেশোলার বিমল-সলিল-বিধৌত, সেই শোভনীয় অট্টালিকার অভ্যন্তরে স্বীয় অনুচর ও পারিষদ দলে পরিবৃত হইয়া, সুলতান খরম অনেক দিন বাস করেন।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে মাধাজি সিন্ধিয়া উদয়পুর অবোরোধ করেন। তখন ইহার রক্ষণোপযোগী প্রাকার বা পরিখা কিছুই ছিল না। উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একলিঙ্গ গড় নামে একটী উচ্চ শৈলকূট ছিল। ধরিতে গেলে, ইহাই উদয়পুরের প্রধান দ্বার-স্বরূপ। রাণা অরি সিংহ, স্বীয় অতি সুদক্ষ মন্ত্রী মহাপুরুষ অমর চাঁদ বারোয়ার বুদ্ধি-কৌশলে অত্যল্প-কালের মধ্যেই একলিঙ্গ গড় হইতে কামানের নির্ঘোষ শুনিতে সমর্থ হইলেন। দুর্দ্দান্ত মাধাজি সিন্ধিয়া, উদয়পুরের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক গাঢ়তর করিয়া কতক দিন অবস্থিত রহিলেন। রাণার বিদ্রোহী সৈন্ধবী সৈন্যগণকে যখন অমর চাঁদ তাহাদিগের প্রাপ্য বেতন দিয়া সন্তুষ্ট করিল, যখন তাহারা রাণার সম্মুখে আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল,—"এক্ষণে আপনার নিকট এই শপথ করিতেছি যে, আর আমরা আপনাকে ত্যাগ করিব না, আজি উদয়পুর আমাদিগের জন্ম-ভূমি। উদয়পুরের সহিতই আমাদের জীবন উৎসর্গ করিব"। তাহাদের এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার সংবাদ, সিন্ধিয়ার কর্ণগোচর হইল। এদিকে উৎসাহিত সৈন্ধবীগণ সিন্ধিয়ার অগ্রবর্ত্তী সেনাদলের উপর জ্বলন্ত গোলক নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগের উৎসাহিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিল। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া সিন্ধিয়া ৬৩,৫০০০০৲ সাড়ে তেষট্টি লক্ষ টাকা লইয়া সন্ধি সংস্থাপন করিলেন।

ইহার পর ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ আর একবার উদয়পুরে আসিয়া আপতিত হয়। এই সৈন্যগণ, হুলকারের অনুধাবন করিতেছিল। হুলকার, তাহাদিগকে নিকটস্থ দেখিয়া উদয়পুরের ১২॥ সাড়ে বার মাইল উত্তরে পুণ্যতীর্থ নাথদ্বারে আসিয়া উপনীত হন্। তথাকার পুরোহিত ও অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ৩০০০০০৲ তিন লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইলেন। হুলকার, এই সময় নাথদ্বারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া, দেববিগ্রহকে শত অভিশাপ প্রদান এবং শ্রীকৃষ্ণের নামে শত সহস্র গালিবর্ষণ করেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, রাণার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া বসন্ত-কালে মেবারে এক জন দূত প্রেরণ করেন। রাণা অম্বজি, তখন মেবারের শাসনকর্ত্তা, অতঃপর উদয়পুর—দুরাচার মির খাঁ, পাষণ্ড জামসিদ ও বাপু সিন্ধিয়া প্রভৃতি নরপিশাচ-গণের অত্যাচারে যার পর নাই শ্রীভ্রষ্ট ও শোচনীয় শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়। পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত রাণার সন্ধিবন্ধন হইলে বাপু সিন্ধিয়া, আজমিড়

হইতে বিতাড়িত হইল ও মেবারের অধিবাসিগণ বহু দিন পরে শান্তি-সুখের আস্বাদন পাইল।

উদয়পুর আগ্রা হইতে প্রায় ২০০ দুই শত ক্রোশ। এখন রাজপুতনা ষ্টেট রেলওয়ে খোলায় উদয়পুর যাইবার আর কোন কষ্ট নাই। বরাবর উদয়পুর পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে।

উদয়পুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে একজন ইংরাজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ, তত্রস্থ দুধতালা অথবা বাঁধের উপর হইতে নগরের চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্য অবলোকন করিলে, বোধ হয় যে, ইহার ন্যায় প্রকৃতির সুন্দরতর ছবি, কল্পনায় চিত্রিত করাও দুষ্কর। প্রাতঃকালের দৃশ্য বড়ই রমণীয়। অদূরে হ্রদের কাকচঞ্চু-সন্নিভ কৃষ্ণ সলিল রাশি, পশ্চাতে ততোধিক কৃষ্ণ ভূধরের সুবিশাল কলেবর, মধ্যে হ্রদ-বক্ষঃস্থ মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত শুভ্র-প্রাসাদ-নিচয় বালারুণ-কিরণে উদ্ভাসিত হইতেছে দেখিয়া, অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের (১) আবির্ভাব হয়।

এই প্রাচীন নগরে দেখিবার জিনিস অনেক আছে। তন্মধ্যে উদয়-সাগর ও তদুপরিস্থ হর্ম্ম্যরাজি, রাজভবন, রাজনগরের বৃহৎ হ্রদ এবং 'আহাবই' প্রধান।

উদয়-সাগরের কতক অংশ রাণা উদয় সিংহ খনন করান। ইহার উত্তরাংশ বোধ হয় রাণা স্বরূপ সিংহ দ্বারা খানিত হয়। তজ্জন্য এ অংশের নাম স্বরূপ-সাগর। সমস্ত হ্রদটীকে পেশোলাও বলে। যে, প্রথম এই হ্রদ খনন করার চুক্তি গ্রহণ করে, তাহার নাম ছিল পেশোলা। এই হ্রদ কুম্ভীর-পূর্ণ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হ্রদের একটী প্রাসাদের উপর মেজর আউটর‍্যাম ও মহারাণা পাদচারণ করিতেছিলেন। মহারাণা অনেক কথা-বার্ত্তার পর হ্রদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই কুম্ভীর-সঙ্কুল বিশাল হ্রদে লাফাইয়া পড়ে, এমন সাহস বোধ হয় কাহারই নাই"। রাণার কথা শেষ হইতে না হইতে মেজর বাহাদুর লাফাইয়া হ্রদে পড়িলেন এবং সাঁতরাইয়া নির্ব্বিঘ্নে অপর পারে গিয়া উঠিলেন। ধন্য ইংরাজ! ধন্য তোমার সাহস!

পেশোলার দ্বীপ-নিচয়ে যে সমস্ত হর্ম্ম্য, প্রমোদ-কুঞ্জ এবং উদ্যান আছে, সেগুলি অতীব রমণীয়। তাহা দেখিতে সমস্ত দিন ফুরাইয়া যায়।

রাজ-ভবন দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশ, ইংরাজি ধরণে নির্ম্মিত ও সজ্জিত। এই অংশই সচরাচর লোকে দেখিতে পারে। অপর অংশে রাণা স্বয়ং, পুত্র পরিবার লইয়া অবস্থিতি করেন। সে অংশটী অপর সাধারণে দেখিতে পায় না।

---

(1) "It is difficult to concieve any thing more beautiful than the views obtained from the Palace, the embankment, or the Dudh Talao, more especially in the morning when the early sun lights up the marble of the water palaces with the dark water beyond and the still darker back ground of the hills."—Murray.

আহারায় উদয়পুরের ভূতপূর্ব্ব রাণাদিগের সমাধি আছে। সগ্রামসিংহের সমাধি মন্দিরটী অত্যুৎকৃষ্ট।

সমস্ত উদয়পুব সহর, বুরুজ-বিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত। সহরের দক্ষিণে বড় বড় কতকগুলি বাগান আছে। পশ্চিমে বিশাল হ্রদ, উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে গড়খাই, হ্রদের জল দ্বারা পরিপূরিত হয়। দক্ষিণে দুর্ভেদ্য একলিঙ্গ গড় নামক অত্যুচ্চ শৈল্য-দুর্গ। নগরের চারিটী তোরণ। উত্তরে "হাতী ফটক", দক্ষিণে খেরবারা ফটক, পূর্ব্ব দিকে সূরয-পোল অথবা সূর্য্য-ফটক এবং দিল্লি-ফটক। এই ফটক হাতী ফটক ও সূর্য্য ফটকের মধ্যে অবস্থিত। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এখানকাব অধিবাসীর সংখ্যা ৪৬,৬৯৩। তন্মধ্যে ২৪৮৭৩ পুরুষ, ২১৮২০ স্ত্রীলোক। হিন্দু ২৮৩১৭, মুসলমান ৯৪২৩, খৃষ্টিয়ান ৯৪, জৈন ৬৩২৬, পারসী ও অন্যান্য ২৫২৭ জন।

(২) উদয়পুর—ছোট নাগপুবের একটী নগর। ইহার উত্তরে সরগুজা, পূর্ব্বে রাযগড় ও যশপুর রাজ্য, পশ্চিমে বিলাসপুর, দক্ষিণে রায়গড়। এখানে অল্প অল্প স্বর্ণ ও লৌহ পাওযা যায়। উদয়পুরের এলাকায় অতি বিশাল কয়লার জমী আছে। এখানকার বাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন কবিয়া নানারূপে কোম্পানিব উপকাব কবেন, তজ্জন্য এই রাজ্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে অর্পিত হইয়াছে।

(৩) উদয়পুর - পার্ব্বত্য ত্রিপুরাতেও এই নামে একটি নগর আছে। ইহা গোমতী নদীর বাম তটে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী "পুবাণ উদয়পুর" নগরের কয়েক ক্রোশ ভাটিতে অবস্থিত।

উনাই—গুজরাট প্রদেশের অন্তঃপাতী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ও সৌরাষ্ট্র প্রদেশ হইতে ৫০ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এখানে একটী কূপ আছে। তাহার জল উষ্ণ। জনশ্রুতি এই যে, শ্রীরামচন্দ্র এই কূপ খনন করান। এই জন্য স্থানটী একটী তীর্থ স্থানে পরিণত হইয়াছে। সময় সময় এখানে অনেক তীর্থযাত্রী আগমন করিয়া থাকে।

উনাও—অযোধ্যাব উনাও জেলার প্রধান নগর। ইহা কানপুরের সার্দ্ধ চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই প্রদেশের ভূমি, অত্যন্ত উর্ব্বর। উনাও এবং ইহার উত্তরাংশে অনেক বড় বড় ঝিল আছে। তৎসমুদয়ে মৎস্যও যেমন প্রচুর, পাণিফলও (সিঙ্গাড়া) তেমনই। এস্থানে অনেক আহীর বাস করে।

উত্তি-কাল-মণ্ড—ইহার চলিত নাম এখন উত্তকামণ্ড (Utakamandu.) মান্দ্রাজ প্রদেশে নীলগিরি পর্ব্বতীয় জেলার একটী নগর। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীতে এখানে ১৫০৫৩ লোকের বাসের কথা লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৯০৭১ জন হিন্দু, ১৭৯০ জন মুসলমান এবং ৪১৬৪ জন খ্রীষ্টান, অবশিষ্ট অন্যান্য জাতি। সমুদ্র-তল হইতে এই নগর ৭২২৮ ফিট উচ্চ। এখানে কখনই উত্তাপাধিক্য হয় না। সাধারণতঃ ৫৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপমান যন্ত্র থার্ম্মমেটারের পারদ উঠে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে এই নগরই প্রধান পর্ব্বতীয় নিবাস। এখানে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বহু ইয়ুরোপীয়ের সমাগম হয়। পাঁচটী পার্ব্বতীয় পথ (ঘাট) দিয়া উতকামন্দে যাওয়া যায়।—(১) কুনুর, (২) শীগুর, (৩) কোটাঘেরী, (৪) নিঝিবত্তম এবং (৫) গোদালুর।

নীলগিরি পর্ব্বতের মাল-ভূমির ঠিক্ মধ্যস্থলে দোধাবেতা নামক শৃঙ্গের পশ্চিম তলে উতকামণ্ড অবস্থিত। পশ্চিমোত্তর দিক ভিন্ন ইহার আর তিন দিকেই শ্যাম-শষ্পাচ্ছাদিত পর্ব্বত, বাস-ভবনগুলি বেশ শৃঙ্খলা মত নির্ম্মিত নয়। এখানে উদ্যান-পরিবেষ্টিত দুই এক খানি বাড়ী, আবার ২।৩ রশি দূরে কয়েকটি ছায়া-কুঞ্জের মধ্যে দুই চারি খানি বাড়ী দৃষ্ট হয়। ইহাতে নগরের রমণীয়তা বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হয় নাই। এখানে সিঙ্কোনার চাস হয়। এই গাছের ছাল হইতেই কুইনাইন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যিনি উতকামন্দ যান তিনি যেন কোটাগিরিতে রঙ্গ-স্বামীর মন্দির, বোটানিক্যাল গার্ডন, উদ্ভিদ-বিদ্যা সংক্রান্ত উদ্যান, মুরকুর্ত্তি শৃঙ্গ, গগন চিকি দুর্গ ও লরেন্স আসাইলম দেখেন। এ কয়েকটীই দেখিবার উপযুক্ত স্থান।

উনিয়ারা—আজমির রাজ্যে এই নামে একটী অত্যুচ্চ মৃৎ-প্রাচীর বেষ্টিত গ্রাম আছে। এখানে উনিয়ারা নামক রাজপুত জাতির বাস।

এ

এটা—পশ্চিমোত্তর প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন একটী জেলা। আগরা বিভাগের সর্ব্বোত্তরাংশে এই জেলা অবস্থিত। ইহার উত্তরে গঙ্গা নদী, পশ্চিমে আলিগড় ও আগরা, দক্ষিণে মৈনপুরী, ও পূর্ব্বে ফরেক্কাবাদ। পরিমাণ ৮৬৯ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৭৫৬৫২৩ লোক। এটা নগর ইহার সদর; কিন্তু কাশগঞ্জ ইহার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান। উহার অধিবাসীর সংখ্যাও অধিক।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।—মধ্য দোয়াবের পূর্ব্ব ভাগে যে স্থানে উচ্চ অধিত্যকা ক্রমশঃ গঙ্গা নদীর তীর-ভূমির সহিত সমতল হইয়াছে, সেই স্থানে এটা জেলা অবস্থিত। গঙ্গা নদী হইতে পূর্ব্বোক্ত অধিত্যকার সীমা পর্য্যন্ত বরাবর সমতল ভূমি। ইহার পশ্চিমে বড়-গঙ্গা বা গঙ্গার নদীর প্রাচীন প্রবাহ-স্থান। এই সমতল ভূমিখণ্ড, তরাই নামে আখ্যাত। গঙ্গার পূর্ব্বোক্ত প্রবাহ-স্থান এখন জলা-ভূমিতে পরিণত। এই স্থানে নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্র সমূহের জল আসিয়া পতিত হয়। গঙ্গা নদীর বর্ত্তমান এবং প্রাচীন প্রবাহ-স্থান-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী তরাই নামক স্থান, পলল-ময় (পলি-মাটি-যুক্ত) এবং প্রায়ই জল-পূর্ণ থাকে। এখানে জল আনিবার কৃত্রিম কোন উপায়ের আবশ্যকতা নাই। তেরায়ের প্রশস্ততর স্থানে এই পলি

মাটির কিছু অধিক গাঢ়তা। বড়-গঙ্গার জলাভূমির উপরে গঙ্গার প্রাচীন তীর-ভূমি দিয়া ক্রমশঃ মধ্য-দোয়াবের উচ্চ ভূমিতে আসিতে হয়।

এটার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই দ্বিতীয় দোয়াবও ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত পীত প্রস্তরময় সমতল ভূমিখণ্ড-পূর্ণ। কিন্তু সুবিধা মত জলের অভাব জন্য এই স্থানে মিরট বিভাগের ভূমি খণ্ডের ন্যায় উত্তম রূপে আবাদ হয় না এবং ভূমিও তদ্রূপ উর্ব্বর নয়। কিন্তু আশা করা যায়, বর্ত্তমান কালের যে 'নিম্ন গাঙ্গেয় পয়ঃ-প্রণালী' (Lower-Ganges-canal) নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে এটা জেলার সকল অভাব মোচন করিবে। এইরূপে জেলাটী শীঘ্রই আলিগড় ও বুলান্দসারের ন্যায় উর্ব্বর হইবে। পূর্ব্বোক্ত মধ্য দোয়াবের অধিত্যকার পশ্চিমে গঙ্গার একটী শাখা অবস্থিত। উহা "কালী নদী" বলিয়া বিদিত। সমস্ত জেলার জল, এই নদী দ্বারা বাহিত হয় এবং অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় মধ্যে মধ্যে এই নদীর জল বাড়িয়া নিকটবর্ত্তী ভূমি সকল প্লাবিত ও উর্ব্বর করে। কালী নদীর পশ্চিম-দক্ষিণ দিকের ভূমিই জেলার মধ্যে উর্ব্বরতা গুণে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। এই স্থানে কানপুর ও এটাবা নামক গঙ্গার ক্যানালের দুই শাখা জল আনয়ন করে। ইহার মধ্যে মধ্যে অনুর্ব্বর ভূমিরও অভাব নাই। ফল কথা, সমস্ত জেলাটীই প্রায় বৃক্ষশূন্য। বৃহৎ নগর ও গ্রাম সকল উদ্যান দ্বারা বেষ্টিত বটে, কিন্তু কোনও স্থানে বন বা জঙ্গল দেখা যায় না। ⅓ এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক জমি পতিত থাকে; কিন্তু ইহার অর্দ্ধেক ভাগে আবাদ করা যাইতে পারে এবং জল আনিবার কোন ব্যবস্থা হইলেই আর পতিত থাকিবে না। যদিও এটা জেলা দোয়াবের উত্তর-ভাগস্থ জেলা সকলের ন্যায় সু-সমৃদ্ধ নয় বটে, কিন্তু ইহা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগস্থ অধিকাংশ জেলা অপেক্ষা সমৃদ্ধতর।

ইতিহাস।—প্রচলিত কিংবদন্তী-অনুসারে কালী নদীর তীরে অনেক জনপূর্ণ নগরের অস্তিত্ব প্রাচীন কালে ছিল। পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীর চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের লিখিত বৃত্তান্তেও ইহার কিছু কিছু প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। ঐ সময়ে এই জেলা, নানাবিধ মন্দির ও ধর্ম্মমঠাদি পূর্ণ ছিল। বাস্তবিক যে স্থানে বুদ্ধ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেস্থান ঐরূপ হওয়াই সম্ভব। বুদ্ধদেবের জীবনের অনেক ঘটনা, অত্রস্থ অত্রঞ্জির সহিত সংসৃষ্ট। ষষ্ঠ হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত এটা জেলা সম্ভবতঃ আহীর ও ভার-দিগের অধিকৃত থাকে। তৎপরে রাজপুতগণ, পূর্ব্বদিকে আসিয়া ইহা অধিকার করিলেন। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে যখন বিখ্যাত মহম্মদ গজনবী, কনোজের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন তিনি অবশ্যই পথ-মধ্যস্থ এটাও জয় করিয়াছিলেন। তদনন্তর ২০০ দুই শত বৎসর পরে যখন দ্বিতীয় মুসলমান বীর মহম্মদঘোরী, রাঠোর-রাজ জয়চাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, সম্ভবতঃ তিনি ইহার মধ্য দিয়া গমন করিয়া থাকিবেন। এই সময় হইতে "এটা" কনোজ অথবা কইলস্থ মুসলমান অধিপতিদিগের অধীনে ছিল। পুনরায় কোন হিন্দু রাজা ইহার অধিকার পান নাই। কিন্তু তৎসময়ে জেলাটী জঙ্গলময় ছিল। ঐ জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে দস্যুগণের দুর্গ ও দুর্দ্দম্য

কৃষকগণেব নিবাস ছিল। যে পর্য্যন্ত জেলাটী ইংরেজগণের হস্তগত না হইল, সেই অবধি ইহার উত্তমরূপ অবস্থা ছিল। অত্রস্থ পাতিয়ালি নামক নগরটী তৎকালে দস্যুতে পরিব্যাপ্ত ছিল। এই দস্যুগণের উৎপাতে বিরক্ত হইয়া বুলবন-পাতসা, ১২৭০ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং এই স্থানে আগমন-পূর্ব্বক দস্যুদিগকে দূরীভূত করিয়া তদীয় দুর্গ সকলে প্রহরী স্থাপন করেন। নগরকে পথ দ্বারা হিন্দুস্থানের অন্যান্য স্থানের সহিত সংযুক্তও করেন। বর্ত্তমান মুসলমান অধিবাসীরা বুলবনের সময় হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি স্থির করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যৎকালে অনবরত মুসলমানদের আক্রমণ হইতে ছিল, তখন "এটা" প্রায়ই উভয় পক্ষীয় দ্বারাই লুণ্ঠিত হইত। অকবর-সাহ ইহাকে কনোজ, কল ও বদায়ুন সবকারের অধীন করেন। বিদ্রোহী মৈনপুরী হিন্দুদিগের শাসনের জন্য এই স্থানে একটী সেনানিবাসও স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে "এটা" অযোধ্যার নবাব উজিরের হস্তগত হয়। ১৮০১—১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা উহা প্রাপ্ত হয়েন। তৎকালে ইহা নিকটবর্ত্তী এটাবা, ফরাক্কাবাদ, আলিগড় ও মুরাদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এই জেলার প্রান্তবর্ত্তী পরগণা সকলে তাৎকালিক সদর ষ্টেশন হইতে অতিশয় দূরবর্ত্তী হওয়ায়, ১৮১১ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালি নগরে একটী ফৌজদারী বিচার, ক্ষমতাবিশিষ্ট ইংরেজ কর্ম্মচারী স্থাপিত হন। তৎপবে অনেক পবিবর্ত্তনেব পর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এটাব চতুর্দ্দিগবর্ত্তী পরগণা সকলের অবস্থা অতি বিপদ-সঙ্কুল হইয়া উঠে। এই স্থানে ডাকাইতি ও লুটপাট একরূপ অবিরতই চলিতে থাকে। তজ্জন্য সুন্দর রূপ পুলিশেব বন্দোবস্তের অত্যন্ত আবশ্যকতা বোধ হয়। এখনও জেলাব অনেক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ও দস্যু-দুর্গ-পূর্ণ। জমিদারগণ, বিশেষ বলাভাবে প্রজাদিগেব নিকট হইতে সকল সময়ে কর-আদায়ে সাহস করিতে পারিতেন না। এই সকল কারণে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পাতিযালি নগরে একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কলেক্টর স্থাপিত হয়। তৎপরে উহা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সদর ষ্টেশন পাতিয়ালি হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড-স্থিত "এটা" নামক গ্রামে উঠাইয়া আনা হয়। এই গ্রামের নাম হইতেই জেলার "এটা" নামকরণ হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৎসরে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) যখন মিরাটে বিদ্রোহানল প্রথম উত্থিত হয়, তখন এটা-স্থিত সৈন্য সকল, আলিগড়ের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সেনা-নিবাস পরিত্যাগ করে; কিন্তু কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। নগরে সৈন্যবল অথবা দৃঢ় স্থান না পাইয়া তাৎকালিক মাজিষ্ট্রেট, বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে অবাধে নগর দিয়া যাইতে দেন। শীঘ্রই জেলাটী, বিদ্রোহগণের আয়ত্ত হয়। এটার রাজা দমর সিংহ, আপনাকে জেলার দক্ষিণ ভাগে স্বাধীন বলিয়া ঘোষিত করেন। কিন্তু আরও অনেক জন ইহার দাবী করায়, মহা-গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপরে ফরাক্কাবাদের বিদ্রোহী নবাব, কয়েক মাসের জন্য ইহার প্রকৃত অধিকার প্রাপ্ত হন। জেনারেল গ্রেথেটের অধীনস্থ সৈন্যের আগমনে বিদ্রোহিগণ, কিছু কালের জন্য পলায়ন করে; তখন কক্স সাহেব এটা ও আলি-গড়ের স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য-বল অল্প হওয়ায়, তখনও

বিদ্রোহীরা, কাশগঞ্জ অধিকার করিতেছিল। তৎপরে ১৫ই ডিসেম্বার কর্ণেল সিটনের অধীনস্থ সেনাগণ, গাঙ্গিরী নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ ও সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়া কাশগঞ্জ বশীভূত করিয়া লন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্য-ভাগে এই স্থানের সুবন্দোবস্ত ও শান্তি স্থাপিত হয়। তদবধি আজ পর্য্যন্ত এই জেলায় কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই জেলার পরিমাণ ৮৬৯॥ বর্গক্রোশ। অত্রত্য গ্রাম এবং নগর-সংখ্যা ১৪৮৯। অধিবাসীর মোট সংখ্যা ৭৫৬৫২৩ জন। এই জেলায় অনেক ব্রাহ্মণ জমিদার আছেন। মুসলমান দিগের মধ্যেও অনেকে জমিদার। এখানকার মুসলমানেরা প্রায় সমস্তই সুন্নি-মতাবলম্বী। জেলার অধিবাসীরা অতিগ্রাম্য এবং সমর্থ পুরুষদিগের মধ্যে ⅔ দ্বি-তৃতীয়াংশ কৃষিজীবী। হিন্দিই সাধারণতঃ প্রচলিত ভাষা।

কৃষি।—প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য—গম, তূলা, ইক্ষু, নীল ও পোস্ত। ভূমিতে দুই বার করিয়া বৎসরে শস্য জন্মে। ১৮৮১।৮২ খৃষ্টাব্দে জেলাস্থ ভূমির প্রায় অর্দ্ধ ভাগ আবাদ হইয়াছিল। জেলার অনেক ভূমি উষর ও অকৃষ্ট (অনাবাদী)। এক বিঘার তৃতীয়াংশ পরিমিত ভূভাগে গড়ে ১৩ তের মণ গম উৎপন্ন হয়। ভূমির সকল স্থানেই সার দেওয়া হয়। তবে এক বার দিলেই বাৎসরিক দুই প্রকার শস্যের কার্য্য হইয়া থাকে। তূলা উৎপত্তির পর তামাক ও শাকাদি এবং নীলের পর গম বা যব উৎপন্ন হয়। কোনরূপ শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিলে যে, কৃষকগণ পূর্ব্বে আর সংবৎসর কৃষিকার্য্য করিত না, এখন তাহাদের সে স্বভাব তিরোহিত। প্রধানতঃ কূপ ও খালের জলেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়। আপাততঃ লোয়ার্-গ্যাঞ্জেস-ক্যানালে দেশের অনেক উপকার সাধিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে জলাভাবে ইক্ষুর চাস কিছু অল্প হইয়াছে। অত্রস্থ কৃষকেরা মিরাট বিভাগের কৃষকগণের তুলনায় অল্প-ধনী হইলেও, একপ্রকার সুখ-সন্তোগ অনুভব করিতেছে। তাহারা বুন্দেলখণ্ডের নির্ধন কৃষকগণ অপেক্ষা অধিক ধনী। মন্দির বা মসজিদাদির সংখ্যা অল্প। গবর্ণমেণ্ট পুরুষানুক্রমিক প্রজাগণের অধিকার লোপ করিতে এবং জমির খাজানা অন্যায় ভাবে বর্দ্ধিত করিতে অনিচ্ছু থাকায় ক্ষেত্র সকলের খাজানার হার অতি অধিক নয়। জেলার সমস্ত জমির প্রায় ¼ এক-চতুর্থাংশ লাখরাজ। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মোট রাজস্ব ১৪০৫৯৫০৲ টাকা।

এখানকার সূত্রধর, কর্ম্মকার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতির দৈনিক পারিশ্রমিক ।০ চারি আনা। দর্জিদিগের মজুরি ৶০ তিন আনা এবং কুলি প্রভৃতির ৵০ দুই আনা। চাষের মজুর দিগকে মজুরির বেতন-দান-কালে পয়সার পরিবর্ত্তে প্রায়ই শস্য দিতে হয়। প্রত্যেক পুরুষ, গড়ে দুই আনা হিসাবে পায়। শস্যের মূল্য গত ৩০ ত্রিশ বৎসর হইতে ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। অধিবাসীর প্রধান খাদ্য—জোনার ও বাজরা।

প্রাকৃতিক উপদ্রব।—"এটা" জেলায় পঙ্গপাল, উই, পিপীলিকার আবির্ভাব বড় বেশী। এতদ্ব্যতীত শস্যাদি আরও অনেক প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিম্ন ভূমি সকলে অনেক সময় গঙ্গার জল উঠিয়াও অনেক ক্ষতি করে। কিন্তু দোয়াবের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এস্থানেও

অনাবৃষ্টিই শস্যের সর্ব্বপ্রধান বিঘ্নকর। তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থাপিত করে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ বিশেষ ক্ষতিকর। অধিবাসীরা ইহাকে সাতসেরী দুর্ভিক্ষ বলে অর্থাৎ সেই সময়ে ১৲ এক টাকায় সাত সের চাউল বিক্রীত হইত। এই দুর্ভিক্ষের সময় অধিবাসীরা বন্য-ফল, মূল, লতাদি এবং তৃণ-বীজ খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। ১৮৬৮।৬৯ খৃষ্টাব্দের অনাবৃষ্টি, এটার বিশেষ কষ্টদায়ক হয় নাই। শস্যের উৎপত্তি অল্প হইলেও, তাহা দুর্ভিক্ষের কারণ নয়। তখনও ১৲ এক টাকায় ১৩ তের সের গম মিলিত। যখন গমের দর ১৲ এক টাকায় ১২ বার সেরেরও ন্যূন হয়, তখনই এদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আশা করা যাইতে পারে, লোয়ার-গ্যাঞ্জেস্-ক্যানালের জলে, এই জেলাকে ক্রমশঃ একেবারে দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিবে।

বাণিজ্য।—"এটা" জেলা হইতে শস্যের রপ্তানি প্রচুর-পরিমাণে হইয়া থাকে। এস্থানে ২০০ দুই শত নীলের কুঠী আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ইয়ুরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত। জেলার উত্তর ভাগে শর্করা নির্ম্মলীকৃত হয়। গঙ্গাতীরস্থ পরগণা সকলে লবণ প্রস্তুতও হইয়া থাকে। তথায় অধিক মাত্রায় না হউক, অল্প পরিমাণে রজ্জুও নির্ম্মিত হয় এবং কলিকাতায়ও কতক প্রেরিত না হয়, এমন নয়।

বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই জেলায় বিস্তর সুন্দর আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত হইত। কিন্তু অস্ত্র-বিষয়ক আইন প্রচারের পরে তাহার ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। সরণ নগরে বৎসরে এক বার করিয়া ধর্ম্ম-সংক্রান্ত মেলা হয়। "এই" সময়ে হিন্দুরা, বড়-গঙ্গাতে স্নান করেন এবং প্রাচীন বস্ত্র ও অন্যান্য অনেক বস্তু জলে ভাসাইয়া দেন। এটা জেলার কাদির-গঞ্জ নামক গ্রামের ঠিক্ বিপরীত দিকে বদায়ুন জেলাস্থ কাকোরা নগরে আর একটী মেলা হয়। এই সময়ে ব্যবসায়িগণ, নদীর তীরে বদায়ুন জেলাতেই দ্রব্যজাত বিক্রয়াদি করে; কিন্তু যাত্রীরা অনেকে কাদির-গঞ্জে অবস্থান পূর্ব্বক স্নানাদি কার্য্যে নিরত থাকে। জেলার মধ্যে কোন রেল-রোড নাই। কিন্তু জেলার সদর "এটা" নগর হইতে ঈষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের সিকোহাবাদ নামক ষ্টেশন পর্য্যন্ত ১৭॥০ সাড়ে সতর ক্রোশ দীর্ঘ একটী পাকা রাস্তা আছে। জেলায় আরও অনেক বিস্তর ভাল ভাল রাস্তার অসদ্ভাব নাই। জেলার সকল স্থানেই গঙ্গা নদীতে নৌকাদি যাতায়াত করে। কাশগঞ্জ ও দল্গারগঞ্জ হইতে জল পথে অনেক দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হয়। লোয়ার-গেঞ্জেস্-ক্যানালের কানপুর শাখা দ্বারাও সামান্য পরিমাণে বাণিজ্য চলে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় "এটা"-বাসী লোকের অধীনে দুইটী মুদ্রাযন্ত্র পরিচালিত হইত।

১৮৬০।৬১ খৃষ্টাব্দে জেলার মোট রাজস্ব ৮৮৮৬৭০৲ টাকা। পরে ১৮৭০ ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ক্যানাল-ট্যাক্স, ইনকম্-ট্যাক্স ও অন্যান্য কারণে ১১৯৩৯১০৲ টাকার রাজস্ব আদায় হয়। রাজস্ব-বৃদ্ধির সহিত রাজ-কার্য্যের সুচারু বন্দোবস্ত, শিক্ষাবিভাগ, ডাকবিভাগ, ক্যানাল-বিভাগ প্রভৃতিতে সরকারী ব্যয়ও অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৮৮২।৮৩ খৃষ্টাব্দে জেলার তসিল আগ্রা

জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন ও 'এটা' জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, মোট রাজস্ব ১৩৫,৭৮০৲ টাকা হয়। উক্ত সময়ে জেলার ২ জন সিভিলিয়ান, ১১ এগারটী ফৌজদারী, ২ দুইটী দেওয়ানি ও ৯ নয়টী রেভেনিউ আদালত ছিল। এই জেলায় একটী-মাত্র জেলখানা। তাহাতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গড় দৈনিক কয়েদীর সংখ্যা ১১৭ জন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২১০ জন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৫৭ জন। এটা জেলায় শিক্ষার উন্নতি অল্প হইলেও তাহা প্রকৃত সার বস্তু। অত্রত্য কতকগুলি স্কুল, অতি সুচারু রূপে পরিচালিত। ১৮৭০।৭১ খৃষ্টাব্দে জেলায় গবর্ণমেণ্ট-পরিদৃষ্ট স্কুলের সংখ্যা ১৬৬।. ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ স্কুলের সংখ্যা অল্পতর হইলেও, ছাত্র-সংখ্যা বিলক্ষণ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি গবর্ণমেণ্ট ইনস্পেক্টর কর্তৃক অপরিদৃষ্ট বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অধীনে স্কুল আছে। জেলাতে ৪টী তসিল, ১৩টী পরগণা। কাশগঞ্জ, জলেশ্বর, এটা, সরণ, মারেহ্রা ও আলিগঞ্জ এই ৬ ছয়টী মিউনিসিপালটী আছে। ১৮৮২।৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহাদের সর্ব্ব সমেত আদায় ৫০৭৩০৲ টাকা ব্যয় ৭২৬৩০৲ টাকা।

স্বাস্থ্য-বিষয়।—এটার জল-বায়ু-মৃত্তিকা নির্ম্মল এবং স্বাস্থ্যকর। কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রত্যহই ঝড়ে এই প্রদেশকে বালুকাকীর্ণ ও ধূলিপূর্ণ করে। শীতকালে, বায়ু শীতল থাকে। তাৎকালিক বৃষ্টির সময় অগ্নি জ্বালিবার আবশ্যকতা হয়। জ্বর এবং বসন্তই এখানকার অধিবাসিগণের প্রধান পীড়া। মধ্যে মধ্যে প্রবল বিসূচিকার আবির্ভাব হইয়া থাকে। জেলায় ৭ সাতটী দাতব্য ঔষধালয়। তন্মধ্যে ২ দুইটী, ব্যক্তি-বিশেষের দানে পরিপোষিত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই ডিস্পেন্সারী-ঘর হইতে প্রায় ৩৭০০ লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(২) এটা—পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় এটা জেলার অধীন একটী তসিল। এই তসিলটী, উক্ত জেলার দক্ষিণে কালী নদীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত। লোয়ার-গ্যাঞ্জেস্-ক্যানেলের তিনটী শাখার জলে এই ভূভাগ, জলসিক্ত হইয়া থাকে। পরিমাণ ফল ২৪৫।০ বর্গ ক্রোশ; লোক-সংখ্যা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ২২৬৮৯২ জন। হিন্দুর ভাগ, মুসলমানের ১২ বার গুণ অধিক হইবে। জৈনের সংখ্যা ২১৯২। খাজানার তসিলের নগর ও গ্রামের সংখ্যা ৪৭০ গবর্ণমেণ্ট মোট রাজস্ব, বার্ষিক ৪০২৫৬০৲ টাকা।

(৩) এটা—পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় এটা জেলার একটী নগর। এখানে মিউনিসিপালটী আছে। এই নগরটীই জেলার সদর। কালী-নদীর ৪৷৷০ সাড়ে চারিক্রোশ পশ্চিমে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরে ইহা অবস্থিত (অক্ষান্তর ৭° ৩৪´ উত্তর দ্রাঘিমান্তর ৭৮° ৪২´ পূর্ব্ব)। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) ৮০৫৪জন। নগরের পরিমাণ ফল ২৩০ একার। ১৮৮২।৮৩ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপালটীর আদায় ১০৪৭০ টাকা। এটাকে নগর না বলিয়া সুসমৃদ্ধ গ্রাম বলাই উচিত। এখানে যাতায়াতের সুবিধা বশতঃ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালি নগর হইতে এই স্থানে বিচারালয় উঠাইয়া আনায়, ইহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোনগঞ্জ নামক অত্রস্থ বাজার ভূতপূর্ব্ব জেলা-কলেক্টর লেন সাহেবের নাম স্মরণ করিতেছে। উহার পশ্চিম দিকে এটা সহরের তসিলের স্কুলটী অবস্থিত এবং পূর্ব্বদিকে অত্যাচ্চ উচ্চ

অট্টালিকা সকলের মধ্যে এটার রাজা দিলসুক রায়ের মন্দির বিদ্যমান। এই নগরে মিউনিসিপাল-হল, বিচারালয়, তসিলি কার্য্যালয, ডিস্পেন্সরী এবং সুশ্রী সোপান-মালা-শোভিত একটী বৃহৎ জলাশয় রহিয়াছে। নগরের অবস্থানভূমি কিছু নিম্ন হওয়ায় পূর্ব্বে ইহা মধ্যে মধ্যে জল-প্লাবিত হইত কিন্তু মেন্ সাহেবের নির্ম্মিত ইশা নদীর সহিত সংযুক্ত একটী পয়ঃপ্রণালী দ্বারা সে উৎপাত বন্ধ হইয়াছে। নগর-মধ্যে মৃত্তিকা-গৃহই অধিক; কিন্তু রাস্তা সকল সচরাচর পাকা এবং জল-নিকাশের ব্যবস্থাও সুন্দর।

এখানে উচ্চ-রাজকর্ম্মচারিগণের আবাস গৃহ অল্প সংখ্যক এবং যাহা কিছু আছে, সে গুলিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এই নগর, প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সংগ্রাম সিংহ নামক এক জন চৌহান ঠাকুর কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। উঁহার নির্ম্মিত মৃত্তিকাদুর্গ অদ্যাপি নগরের উত্তর ভাগে বর্ত্তমান। রাজোপাধি ধারী তদীয় বংশধরগণ নিকটবর্ত্তী স্থান অধিকার করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম রাজা দমর সিংহ সিপাহি-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহাচরণ করায়, রাজবংশের সম্মান হইতে বিচ্যুত হন। আলনামক এক-প্রকার রঙ্, নীল, তুলা এবং ইক্ষু প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। প্রতি সপ্তাহে সোমবারে ও শুক্রবারে হাট বসে।

এটাওয়া।—ইংরেজাধিকৃত ভারতের পশ্চিমোত্তর-প্রদেশের লেপটেনান্ট গবর্ণরের অধীন একটি জেলা। (অক্ষাংশর ২৬° ২১′ উত্তরও এবং দ্রাঘিমান্তর ৮৮° ৪৭′ পূর্ব্বও ৭৯° ৪৭′ পূর্ব্বের মধ্যে)।

এটাওয়া জেলা, আগরা বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট। এই জেলার উত্তর সীমা মৈনপুরী ও ফরক্কাবাদ, পূর্ব্বে কানপুর; দক্ষিণে যমুনা নদী এবং পশ্চিমে যমুনা নদী, আগরা জেলা, সাম্বল নদী, কুয়ারী নদী এবং গোয়ালিয়র রাজ্য। ১৮৮১খৃষ্টাব্দে ইহার পরিমাণ-ফল ৮৪৬।০ আট শত সাড়ে ছ চল্লিশ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসী ৭২২৩৭১ জন। সমস্ত জেলার মধ্যে এটাওয়া নগর কেবল সুসমৃদ্ধ স্থান। এই নগরই জেলার সদর।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।—এটাওয়া জেলা দোয়াবের সমতল ভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া যমুনা নদীর তীর ভূমি দিয়া সাম্বল নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য জেলার সম্পূর্ণ ক্রম বিভাগ। নানাবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্যে নয়ন-মনঃ চরিতার্থ হয়। পাচার নামক জেলার পূর্ব্বোত্তরে দোয়াবের উর্দ্ধ ভূমির প্রাকৃতিক ভাব পরিলক্ষিত হয়। সেঙ্গার নদী এই পাচারকে জেলার অন্যান্য স্থান হইতে বিভক্ত করিতেছে। এই স্থানের ভূমি উর্ব্বরা; কিন্তু মধ্যে মধ্যে উষর এবং জলা-ভূমিও অনেক। এই সকল জলা হইতে বহির্গত নদী সকল এবং কৃত্রিম ক্যানাল সমূহের জন্য এই স্থানের জলাভাব হইতে পায় না। ক্যানালের কান-পুর শাখা পাচারের মধ্যে প্রবেশ না করিলেও, ইহার সীমা দিয়া প্রবাহিত এবং ইহার পূর্ব্ব ভাগ ও উর্দ্ধ ভাগ, উক্ত শাখার প্রশাখা সমূহে জলপূর্ণ থাকে। এতদ্ব্যতীত এটোয়া শাখা এবং লোয়ার গ্যাঞ্জেস ক্যানালের ভগীপুর বিভাগ, উক্ত ভূভাগে অনবরত জল

আনিয়া দিতেছে। পাচাবের অধিকাংশ স্থান উর্ব্বর। উহা, সময়ে গম এবং ইক্ষুক্ষেত্রে সমাচ্ছন্ন। সেঙ্গার নদীর অপর দিকে যমুনা নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অপর এক খণ্ড উচ্চ ভূমি, প্রাকৃতিক দৃশ্যে পাচাবেরই তুল্য। এই ভূভাগ, গাড় (Garh) নামে আখ্যাত। এই স্থানে জল কেবল সুগভীর কূপ হইতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য এখানে ধান্য গোধুমাদির পরিবর্ত্তে তুলা এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর শস্য উৎপন্ন হয়। কারণ, প্রথমোক্তগুলির চাষে অধিক জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধুনাতন ভগ্নীপুর, ক্যানালে এই ভূভাগের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। এই ভূমিখণ্ড, ক্রম নিম্নভাবে যমুনার তীর ভূমির সহিত সংমিলিত। এই ক্রমনিম্নভাগ, জঙ্গলপূর্ণ। এই ভূমির পার্শ্বে গ্রাম-সংখ্যা অল্প। কৃষিকার্য্য দুঃসাধ্য এবং তাহা বিশেষ লাভজনকও নয়। নদীর তীরবর্ত্তী ভূমি, স্থান-বিশেষে উর্ব্বর, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উহা অতি উচ্চ এবং অনুর্ব্বর, যমুনা-নদীই, এই জেলার প্রাকৃতিক সীমা হওয়া উচিত, কিন্তু নদীর অপর তীরে সাম্বল ও কুয়ারি নদী দ্বারা বিভক্ত গোয়ালিয়র রাজ্যাংশ, ব্রিটিস-রাজ্যভুক্ত এবং এই জেলার অন্তর্নিবিষ্ট। এই পর-তীর বর্ত্তী ভূভাগে স্থানে স্থানে উর্ব্বর ভূমি থাকিলেও, অধিকাংশ স্থানই পাহাড়ময় ও ভয়ঙ্কর-দৃশ্যপূর্ণ। ভারের উপরি ভাগ হইতে দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহ দ্বারা সংযুক্ত নিবিড় জঙ্গলসঙ্কুল। প্রাচীন কালিক দস্যুগণের দুর্গশোভিত পাহাড় সকল অতি মনোরম। এই স্থানের নাম পঞ্চনদ অর্থাৎ পঞ্চ-নদীযুক্ত ভূভাগ। এই বন্ধুর স্থানের প্রাকৃতিক ভাব, পূর্ব্ব দিগ্বর্ত্তী দোয়াবের শস্যপূর্ণ সমতল ভূমির সম্পূর্ণ বিপরীত। এটাওয়া জেলা, প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয় উপায়েই রীতিমত জল প্রাপ্ত হয়। জেলার পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রধান নদী সকলের নাম। যথা,—

(১ম) পাণ্ডনদী, জেলার উত্তর ভাগে বহির্গত হইয়া জেলা কানপুরের মধ্য দিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এটাওয়া জেলার এই নদী, বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় শুষ্ক থাকে।

(২য়) বিন্দ বা অরিন্দ নদী, আলিগড় জেলায় উপস্থিত হইয়া ভাউমেরা গ্রামের নিকট এটাওয়া জেলা স্পর্শ করিয়া ইহার উত্তর সীমা দিয়া পূর্ব্ব মুখে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী সাভদ গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া দক্ষিণ-মুখে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কিছু দূরে পুরাহা ও আহেরী নাম্নী শাখা-দ্বয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে কানপুর জেলাতে প্রবেশ করিয়াছে। বিন্দ নদীতে সংবৎসর জল থাকে। কিন্তু শীতকালে উহার গভীরতা অতি অল্প। এই নদীর তীর-ভূমি অতি উর্ব্বরা। ইহার শাখা দ্বয় বর্ষাকালে এই প্রদেশের পয়ঃপ্রণালীর কার্য্য সম্পন্ন করে। কিন্তু তৎপরে শুষ্ক হইয়া যায়।

(৩) সেঙ্গার নদী, তীর-বাসী সেঙ্গার শাখীর ঠাকুরদিগের নাম হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে। নদী, পশ্চিমোত্তরাংশে জেলায় প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ মুখে জেলার মধ্য দিয়া কানপুর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এই নদীর প্রথম অংশ, বিশেষ প্রবল নয়। তীর-ভূমিতে সুন্দররূপ কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু এটাওয়া নগরের প্রায় দুই ক্রোশ

উত্তরে ইহা সার্সা নামক একটী ক্ষুদ্র শাখার সহিত সংযুক্ত। সংযোগের পূর্ব্বে এই সার্সা শাখা, সেঙ্গারের প্রায় সমান্তর-ভাবে প্রবাহিত ছিল। এই শাখার সহিত সংযোগের পরই সেঙ্গার নদী, মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে। নিকটবর্ত্তী ভূমি-ভাগের জল, অসংখ্য গভীর প্রণালী দ্বারা প্রবাহিত হইয়া নদীতে পড়ায়, নদীর তীর, উক্ত প্রণালী-সমূহে ছিন্নভিন্ন এবং কৃষিকার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সকল পশ্বাদিচারণোপযোগী তৃণাদি এবং বাহাদুরী কাষ্ঠোপযোগী বৃক্ষ, প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

(৪র্থ) যমুনা নদী, এই জেলাকে প্রথমে পশ্চিমোত্তর কোণে স্পর্শ করিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইতেছে। ৫৭।০ সাড়ে সাতান্ন ক্রোশ ব্যাপিয়া কোন স্থানে জেলার সীমারূপে কোন স্থানে জেলার সীমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বর্ষাকালে এই নদীতে গুরুভার নৌকা সকলও যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু নদীর বক্রতা-বশতঃ উক্ত কার্য্যে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে নদীবক্ষঃস্থিত বৃহদাকার প্রস্তর স্তূপ সকলে উহা দুঃসাধ্য এবং বিপৎ সঙ্কুল করিয়া তোলে। এই জন্য এ স্থানে বাণিজ্য অতি অল্প। প্রত্যহ গড়ে দুইখানি পণ্য বাহিনী নৌকা, উপর দিকে ও নিম্ন দিকে চলে কি না সন্দেহ। এক দিকের তীরভূমি, অত্যুচ্চ-ভাবে দণ্ডায়মান। অন্য দিকের ভূমি, নিম্ন এবং বৃষ্টির সময় জলপ্লাবিত হইয়া থাকে। এই কারণে বর্ষাকালে নদীর বিস্তার, বড়ই অধিক হয়। স্রোতের বেগ তদ্রূপ অধিক না হওয়ায়, ইহা তীর-ভূমির বহুল স্থান, উর্ব্বর পলিমৃত্তিকাপূর্ণ করে। নদীবক্ষে বাণিজ্য-পথে অনেক পারঘাট আছে।

(৫ম) সম্বলনদী, প্রায় যমুনার সমান্তর ভাবে প্রবাহিত। এই নদী, প্রায় ১২।০ সাড়ে বার ক্রোশ ব্যাপিয়া এটাওয়া জেলার সীমারূপে প্রবাহিত হইয়া জেলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। অবশেষে "ভারে" নামক স্থানে যমুনার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই স্থানে সাম্বল নদীর আকৃতি ও প্রকৃতি, যমুনার তুল্য। এই নদীতে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বন্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। অতিরিক্ত বেগবশতঃ যমুনা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইহাতে জল প্রবাহিত হয়। অতি প্রবল বন্যার সময়ে নদীর তীর হইতে অপর তীরে গমন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নদীর জল অতি নির্ম্মল। যমুনার সহিত ইহার সংযোগের পরেও কিছু দূর পর্য্যন্ত ইহার জল ও যমুনার কর্দ্দম-ময় আবিল জল, পৃথক অনুভূত হয়।

(৬ষ্ঠ) কুয়ারী নদী, পূর্ব্বোক্ত পাঁচটীর পরে উল্লেখ্য। এই নদীও, ১০ দশ ক্রোশ ব্যাপিয়া জেলার সীমা ও সীমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যমুনা ও সাম্বলের সঙ্গম-স্থানের সামান্য নিম্নে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বোক্ত নদী সকলের সম-স্বাভাবিক এবং সম-জাতীয়। বর্ষাকালে ইহাতে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বন্যা আসিয়া পড়ে; কিন্তু শীত-কালে প্রায় শুষ্ক থাকে। এই নদীত্রয়ের সংযোগ-স্থানের নিকটবর্ত্তী ভূমি সকল গভীর ও সঙ্কীর্ণ পয়ঃপ্রণালী সমূহ দ্বারা বিভক্ত। এই প্রণালী সকল উক্ত তিন নদীর মধ্যে কোন একটীর সহিত এক পার্শ্বে মিলিত হইতেছে। এই কারণে উক্ত ভূভাগের এক-চতুর্থাংশের

অনিক স্থানে কৃষিকার্য্য হয় না। উষর ভূভাগ সমূহ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে এটাওয়া জেলা সাধারণতঃ বৃক্ষাদিপূর্ণ; তথায় কোনরূপ জঙ্গল প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু পাচারের মধ্য দিয়া একখণ্ড বিস্তৃত ও দীর্ঘ জঙ্গল বর্ত্তমান আছে। এই জঙ্গল, পূর্ব্বে আকারে বৃহৎ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহার অনেক অংশ, ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যের উপযোগী করা হইতেছে। এই জেলার অনেকাংশ উষর ভূমিতে পরিপূর্ণ। তজ্জন্য কৃষিজাত দ্রব্য অতি অধিক নহে। এই স্থানের অধিবাসিগণ, পরিশ্রমী। তাহারা উষর ভূমির মধ্যবর্ত্তী সামান্য উর্ব্বর ভূমি খণ্ড সকলেও চাষ করিয়া থাকে। যে সকল পয়ঃপ্রণালী অতি বিস্তৃত, তথায় তাহারা বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহাতে নিকটবর্ত্তী ভূমি, হঠাৎ জলপ্লাবিত হইতে পারে না। যে স্থানে এরূপ করিবার সুবিধা নাই, তথায় গবাদি পশুর জন্য তৃণ এবং জ্বালানি কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। অধিবাসিগণ, ঐ সকল স্থানে গো-মহিষাদি চরাইয়া তাহাদের দুগ্ধে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় লব্ধ অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই জেলায় কোন প্রকার ধাতুর খনি নাই। তবে কোন কোন পয়ঃপ্রণালী গর্ভে কাঁকর উৎপন্ন হয়। তাহা পাকা রাস্তা নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। আর কতকগুলিকে পোড়াইয়া চূণও প্রস্তুত হয়। এই জেলার বন্যজন্তুর মধ্যে—চিতাবাঘ নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, নীল গাই, দীর্ঘশৃঙ্গ হরিণ, বন্যবরাহ প্রভৃতিই প্রধান। সুদৃশ্য পক্ষীও এখানে বিস্তর। জেলাস্থ নদী এবং বৃহৎ জলাশয় সকলে মৎস্য, কচ্ছপ কুম্ভীরাদি অনেক জীব আছে। বিষধর সর্প বিশেষতঃ গোক্ষুর প্রায়ই দেখা যায়।

ইতিহাস।—প্রাচীন কালের আক্রমণকারিগণ, এটাওয়ার স্বাভাবিক গঠনের বিশেষত্ব বশতঃ ইহাতে বড় প্রবেশ করিতে পারিত না। তজ্জন্য অনেক দিন ব্যাপিয়া এই স্থান, স্বেচ্ছাচারী দস্যুগণের আবাস ভূমি ছিল। এতন্মধ্যে যে উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপগুলি আজ পর্য্যন্ত অবলোকিত হইতেছে, তাহা উক্তরূপ দস্যুগণের বাসস্থান বলিয়া বোধগম্য হয়। প্রথম প্রথম মুসলমান-আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত উহারা এই স্থানের অধিকারী ছিল। তৎপরে এস্থান হইতে বিতাড়িত হয়। কারণ, আধুনিক অধিবাসিগণের ইতিহাস, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে আর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহম্মদ গজনবী এবং কুতবুদ্দীন উভয়েই এতদ্দেশীয় রাজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে সম্ভবতঃ এটাওয়াতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে এতৎ স্থানীয় বিশেষ কোন পরিচয় বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিকটবর্ত্তী জেলা সকলে অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবার বাস করিতেছেন। কিন্তু এটাওয়াতে কেবল অল্প সংখ্যক সেখ ও সৈয়দ জাতির বাস। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,—অত্রস্থ হিন্দুগণ, অনেক কাল ব্যাপিয়া মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সম্ভবতঃ রাজপুতগণ, দ্বাদশ শতাব্দীতে এই স্থানে আগমন করেন। তাহার কিছুদিন পরেই কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণও, এস্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান জমিদারগণের মধ্যে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণের ভাগই অধিক। মুসলমান-দিগের ইতিহাসে এটাওয়ার দুর্ভাগ্য কাফেরগণের বিরুদ্ধে সৈয়দ-সেনানী-পরিচালিত

অনেক যুদ্ধ যাত্রার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। মুসলমান আক্রমণের সময় হিন্দুরা কিছু কিছু অনির্দ্দিষ্ট টাকা দিয়া সন্ধি করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বিধর্ম্মী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে স্বদেশ রক্ষা করিতে পারিতেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাবর পাতশা, দোয়াবের অন্যান্য স্থানের সহিত এই স্থানও অধিকার করেন। তদবধি সের সা কর্ত্তৃক হুমায়ুনের পরাজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা মোগলদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে এই স্থান, সেরসাহের হস্তগত হইল। তিনি বুঝিলেন, যাতায়াতের সুবিধা না হইলে, কখনই রাজকার্য্যের সুচারু ব্যবস্থা হইতে পারে না, তজ্জন্য শীঘ্রই তিনি অনেক সুন্দর পথ নির্ম্মাণ করাইলেন, অনেক স্থানে থানা স্থাপন করিলেন। দ্বাদশ সহস্র অশ্বসৈন্যের অধিপতি এক জনকে এই স্থানে তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশ, কাল এবং পাত্র বিবেচনা করিয়া একরূপ আইন সকল প্রচারিত করিলেন। তৎকৃত ব্যবস্থা সকল, ভাবী মোগল সম্রাটের সুচারু বন্দোবস্তের মূল ভিত্তি স্বরূপ। আকবর, এটাওয়া জেলাকে আগরা, কনোজ, কাল্পি ও ইরিচ সরকার চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু উক্ত সুপ্রসিদ্ধ সুচতুর বাদসাও এটাওয়াকে দিল্লির সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারেন নাই। দোয়াবের অন্যান্য জেলার ন্যায় মুসলমানগণ, এই জেলার কোনরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। মোগল-সাম্রাজ্যের অবনতির সময় এটাওয়া, প্রথমে মহারাষ্ট্রীয়গণের সর্ব্বগ্রাসী কবলে পতিত হয়। পানিপথের যুদ্ধের পর কিছুকাল ইহা তাঁহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইলেও, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পুনরায় সমস্ত দোয়াব হস্তগত করেন। কিন্তু ৩ তিন বৎসর পরে যখন জাফর খাঁ তাঁহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দেন। তখন অযোধ্যার নবাব উজির, গঙ্গা পার হইয়া এই স্থানে আপনকার অধিকার স্থাপিত করেন। তৎপরে কিছু দিন পর্য্যন্ত এই ভূভাগ, কখনও অযোধ্যার নবাবের কখনও বা মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে আইসে। কিন্তু অবশেষে ইহা একেবারে অযোধ্যার নবাবের অধিকারভুক্ত হইল। পরে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, নবাবের নিকট হইতে এই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজদিগের হস্তগত হইবার পরেও, কিছুদিন অত্রত্য সর্দ্দারগণ, স্বাধীন ভাবেই ছিলেন। তৎপরে ভূম্যধিকারীগণ, অধীনতা-স্বীকারে বাধ্য হন। ইংরেজ রাজ্য-ভুক্ত হইবার পূর্ব্বে এই স্থানে ঠগীগণের উপদ্রব অতি প্রবল ছিল। পরে তাহা তিরোহিত হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের সর্ব্বক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও, রাজকার্য্যের সুচারু বন্দোবস্ত প্রযুক্ত এই স্থান, ক্রমশঃই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল। গঙ্গা নদীর বহু সংখ্যক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট কৃত্রিম ক্যানেলে ক্ষেত্র সকলের উর্ব্বরতা সম্পাদন করিল। সমাজভুক্ত প্রত্যেক জাতিই, ক্রমে অধিকতর সুখ ও সচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। অনেকগুলি বিদ্যালয়-স্থাপনে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাও অঙ্কুরিত হইল।

কিছুকাল পরে মিরটের বিদ্রোহের সংবাদ, দুই দিন পরে এটাওয়াতে উপস্থিত হইল। এক সপ্তাহ মধ্যে একদল বিদ্রোহী, জেলায় প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চ কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা শীঘ্রই নিহত হইল। তৎপরে অপর একদল বিদ্রোহী

যশোবন্ত নগর আক্রমণ করিল এবং উপযুক্ত প্রতিবোধ সত্ত্বেও, নগর অধিকার করিয়া লইল। ২২শে মে তারিখে এটাওয়া নগর হইতে সেনানিবেশ অপসারিত করা আবশ্যক বিবেচিত হয়; কিন্তু এই কার্য্যে পথিমধ্যে সৈন্যগণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং অনেককষ্টে কর্তৃপক্ষীয়গণ, সপরিবারে বাইপুরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তাঁহারা এক দল গোয়ালিয়ার-রেজিমেণ্টের সহিত মিলিত হইলেন; কিন্তু তাহাও শীঘ্র বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন একেবারে জেলা ত্যাগ পূর্ব্বক আগরা গমনই সুবিধা জনক বোধ হইল। কিছুকাল পরেই ঝাঁসির বিদ্রোহিগণ, এটাওয়া অধিকার পূর্ব্বক মৈনপুরীর দিকে প্রধাবিত হইল। ইতিমধ্যে এদেশীয় অনেক কর্ম্মচারী, বিশ্বস্ত ভাবে আগরায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সমস্ত সমাচার যথাসাধ্য পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে ডিসেম্বার মাস পর্য্যন্ত বহু-দল সৈন্য এই জেলার অনেক স্থান দিয়া প্রধাবিত হইতে লাগিল। পরে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোলের সৈন্যসমূহ, বড় দিনের সময় এই জেলায় পুনঃ-প্রবেশ করিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারি এটাওয়ার সেনানিবাস অধিকার করিল; কিন্তু তখনও জেলার অনেক অংশ বিদ্রোহিগণের হস্তগত রহিল। উক্ত খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঐ স্থান সকলের পুনর্জ্জয়ের নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও, সৈন্য-সংখ্যা অল্প হওয়ায় কোনটীই সফল হইল না অতি ক্ষীণ ভাবেই ব্যবস্থা স্থাপিত হইতে লাগিল। এমন কি, উক্ত খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বরে অযোধ্যার ফিরোজ সাহের অধীন একদল লুণ্ঠনকারী, জেলামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত ভূভাগ আত্মসাৎ করিল। স্থানটী, জনশূন্য হইল। হরচাঁদ-পুরের নিকট তাহারা আক্রান্ত ও পরাজিত হইল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইল। এই বিষম পরীক্ষার সময়ে এটাওয়ার অধিবাসীবৃন্দের রাজভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অনবরত বিদ্রোহিগণ, জেলা মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইতেছিল, তথাপি স্বদেশীয় উচ্চ-রাজকর্ম্মচারি-গণ, সুব্যবস্থা-স্থাপনে সর্ব্বদা নিরত ছিলেন। ঘোর অরাজকতার মধ্যেও তাঁহারা রাজস্ব-আদায়ে এবং কোষাগার-রক্ষণে তৎপর ছিলেন। প্রধান জমিদারগণ, তুল্যরূপ বিশ্বাসী ছিলেন।

অধিবাসীর সংখ্যা।—১৮৬৫, ১৮৭২ এবং ১৮৮১ এই তিন খৃষ্টাব্দে তিন বার লোক-গণনায় লোক সংখ্যার বৃদ্ধি জানা গিয়াছে। তন্মধ্যে শেষবারে স্থিরীকৃত হয়— জেলার পরিমাণ-ফল ৮৪৬.০ বর্গ ক্রোশ। নগর ও গ্রামের সংখ্যা ১৪৭৮, অধিবাসীর সংখ্যা ৭২২৩৭১। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের ভাগ অপেক্ষা কিছু অধিক; পূর্ব্বে এই স্থানে যে প্রসবান্তে কন্যাবধ প্রচলিত ছিল। তাহাতেই এরূপ হইয়াছে। এখনও বোধ হয়, এই অমানুষিক ব্যবহার, কোন কোনও স্থানে গুপ্তভাবে প্রচলিত আছে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে সকল জেলায় মুসলমানগণ, কোনরূপ বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই, এটাওয়া সেই সকল জেলার অন্যতম। শত করা ৯৪ জন হিন্দু, অবশিষ্ট মুসলমান ও অন্যান্য জাতি। জেলাস্থ গ্রাম সমূহের অর্দ্ধেক, প্রায় ব্রাহ্মণগণের এবং এক তৃতীয়াংশ ক্ষত্রিয়-গণের অধিকৃত। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ কুসীদজীবিগণ এবং বণিকগণ, ক্ষত্রিয় অপেক্ষা

অধিক ধনী হইয়া উঠিতেছে। চামারের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহারা সকলেই প্রায় কৃষিজীবী। এতদ্ব্যতীত আহীর, কায়স্থ এবং অন্যান্য অনেক জাতীয় হিন্দু বাস করেন। মুসলমানেরা অধিকাংশই সেখ বা পাঠান বংশীয়; প্রায় তন্মধ্যে সকলেই সুন্নি-মতাবলম্বী। অধিবাসীরা প্রায়ই গ্রাম্য; তাহাদের সভ্য হইবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জেলায় তিনটী নগর ছিল। যথা এটাওয়া, কাফুন্দ ও অরেইয়া।

কৃষি। এটাওয়ার অনেক ক্ষেত্র উর্ব্বর এবং জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ভূভাগের অর্দ্ধেক স্থানে আবাদ হইয়াছে। কৃষি ব্যবস্থা, দোয়াবের অন্যান্য স্থানের ন্যায়। এস্থানেও ভূমিতে সার দিতে হয়। কোন কোনও স্থানে দুইবার শস্য-সংগ্রহও হইয়া থাকে। জল পাইবার সুচারু বন্দোবস্ত আছে। তাহাতে বিশেষ উপকার হইতেছে। আবাদী জমি সকলের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক ভাগ কৃত্রিম উপায়ে জল পায়। অন্যান্য স্থানের মত এই স্থানেও ক্যানাল দ্বারা যে অধিকতর ক্ষেত্র আবাদ হয়, তাহা নয়। সামান্য নীচ জাতীয় শস্যের পরিবর্ত্তে নীল, ইক্ষু, অহিফেন এবং অত্যাবশ্যকীয় শস্য সকলও উৎপন্ন হইতেছে। কৃষকদিগের অবস্থা স্বচ্ছন্দতা পূর্ণ; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভূম্যধিকারিগণ, সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিকারিগণের অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিস্তর লাখেরাজ (নিষ্কর) জমিও অনেক আছে। অধিবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শস্যের মূল্য-বৃদ্ধির সহিত রাজস্বেরও বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু অধিবাসি-কুল, পূর্ব্ব নিরিখ মত রাজস্বের পক্ষপাতী হওয়ায় রাজস্ব-বৃদ্ধি ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব-সমেত ১৫৩৬৬৪০৲ টাকা আদায় হইয়াছিল। মজুরদিগের পারিশ্রমিক কয়েক বৎসর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। সাধারণ মজুরের দৈনিক পারিশ্রমিক ৵৹ দুই আনা; কর্ম্মকার ইত্যাদি ।/৹ পাঁচ আনা। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, ইক্ষু, তুলা, জোনার নীল, ধান্য প্রভৃতি প্রধান।

প্রাকৃতিক উপদ্রব।—পূর্ব্বকালে অনাবৃষ্টিতে এটাওয়ার অনেক ক্ষতি সংসাধিত করিত। অতি পূর্ব্বে প্রায়ই তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ হইত। ১৮৬০।৬১ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ, তদ্রূপ কষ্টদায়ক হয় নাই। তথাপি পূর্ত্ত-কার্য্যে ৫৪০০০ অপেক্ষাও অধিক লোক সাহায্য পাইয়াছিল। ১৮৬৮।৬৯ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ, এটাওয়াতে তদ্রূপ অনুভূত হয় নাই। এই এটাওয়াতে এক টাকায় ৯ নয় সেরের হিসাবে গম বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৭৮।৯ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষেও জেলার বিস্তর ক্ষতি করিয়াছিল। এই সময়ে অনাবৃষ্টি বশতঃ অধিকাংশ শস্যই নষ্ট হইয়াছিল। যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছিল, তাহা কেবল ক্যানালের সাহায্যে ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ক্যানাল দ্বারা এ স্থানের মহোপকার সাধিত হইতেছে। মনুষ্য দৃষ্টি ত যত দূর দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, লোয়ার গ্যাঞ্জেস্ ক্যানাল এই স্থানকে দুর্ভিক্ষ হইতে নিরাপদ রাখিবে।

বাণিজ্য।—কৃষিজাত দ্রব্যই এটাওয়ার প্রধান পণ্য দ্রব্য; তন্মধ্যে কার্পাস, নীল, তিসি এবং মসিনাই প্রধান। এই স্থানের কার্পাস্ কখনও বম্বাই পর্য্যন্ত, এমন কি—ভারতবর্ষ

অতিক্রম করিয়া অন্য স্থানেও প্রেরিত হয়। বস্ত্র, ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্য, মসলা এবং ঔষধই আমদানী দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত মেলার সময়েই অধিবাসিগণ আবশ্যক মতে এই সকল ক্রয় করিয়া লন; এই মেলার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দোবার মেলায় ৩০০০০ ত্রিশ সহস্র লোক সমবেত হয়। ঘৃতের কারবারও অনেক পরিমাণ হইয়া থাকে। জেলার মধ্য দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে প্রধাবিত; এই জেলায় উহার পাঁচটী ষ্টেশন আছে। যমুনা-নদী দিয়া অনেক বাণিজ্য সম্পাদিত হয়। জেলা মধ্যে সর্ব্ব-সমেত ৩১৷৷০ সাড়ে একত্রিশ ক্রোশ পাকা রাস্তা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রাস্তা অনেক রহিয়াছে।

রাজকার্য্য।—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এটাওয়াতে দুই জন সিভিলিয়ান, ৭ সাত জন নিয়তন কর্ম্মচারী এবং ১৪ চৌদ্দটী ফৌজদারি, দেওয়ানি এবং রেভিনিউ ১৩ তেরটী আদালত ছিল। একটী মাত্র যে জেলখানা আছে, তাহাই ফৌজদারী আসামীগণের পক্ষে যথেষ্ট। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে দৈনিক কয়েদীর সংখ্যা গড় ২২৬ জন, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৪৪ জন ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১৩২টী গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাইভেট স্কুলের (বে-সরকারী বিদ্যালয়) সংখ্যার আধিক্য ছিল। এই জেলার কলেক্টর হিউম সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিউমস্ হাই স্কুলটী অতি বিখ্যাত। জেলায় ৫ পাঁচটী তসিল আছে। ১৮৮২—৮৩ খৃষ্টাব্দে কেবল এটাওয়া নগরে মিউনিসিপালিটী ছিল।

স্বাস্থ্য।—এখানকার জল-বায়ু-মৃত্তিকা পূর্ব্বে অতিশয় উষ্ণ ছিল; কিন্তু ক্যানালের বিস্তৃতি এবং বৃক্ষ রোপণ কার্য্য দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ নাই। এ সময়ে এইস্থান শীতল এবং ভারতীয় সমতল ভূমি সকলের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটী সর্ব্বপ্রধান স্থান। ম্যালেরিয়া জ্বরই অধিবাসিগণের সর্ব্বপ্রধান পীড়া। বসন্ত এবং বিসূচিকারও মধ্যে মধ্যে প্রাদুর্ভাব হয়। গৃহ জাত পশুগণেরও দুই প্রকার পীড়া দেখা যায়।

(২) এটাওয়া—পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় এটাওয়া জেলার অধীন একটী তসিল। এই তসিলটী উক্ত জেলার পশ্চিমোত্তর ভাগে অবস্থিত। দোয়াবের অনেক স্থান এই তসিলের অন্তর্নিবিষ্ট। গ্যাঞ্জেস্ ক্যানালের একটী শাখা, এই ভূভাগের অনেক স্থানে জল যোগাইয়া থাকে। যমুনা নদীর অপর তীরস্থ এক খণ্ড ভূমি যাহা এটাওয়া জেলার অন্তর্গত তাহাও এই তসিলের অন্তর্ভুক্ত। পরিমাণ ফল ৪২৫ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ভূভাগে আবাদ হইয়া থাকে। অধিবাসীর সংখ্যা ১৯৩২১১ জন। ভূমির খাজনা ২৭৮১৩০৲ টাকা। গভর্ণমেণ্টের মোট আদায় ২৯৪৭৩০৲ টাকা। এই তসিলে একটী দেওয়ানি, ৭ সাতটী ফৌজদারী এবং পুলিশ থানা রহিয়াছে।

(৩) এটাওয়া—পশ্চিমোত্তরাঞ্চলে এটাওয়া জেলার একটী নগর। ইহাই উক্ত জেলার সদর এবং মিউনিসিপালটীর অধীন। যমুনা নদীর বাম তীরস্থ পয়ঃপ্রণালীর উপরে (অক্ষাংশ ২৬° ৪৬′ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৭৯° ৩′ পূর্ব্ব) অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা

৩৪৭২১, তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগ মুসলমানের দ্বিগুণেরও অধিক। মিউনিসিপাল আদায় ২৩৬৫০৲ টাকা; ব্যয় ২২৯৮০৲ টাকা।

এই নগরের অন্তর্গত পল্লী সমূহ নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু মূল নগরটী নদী হইতে এক ক্রোশের চতুর্থাংশ অধিক দূরবর্ত্তী। এই নগরের উত্তর প্রান্তস্থ গৃহ সমূহ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনস্থ এটাওয়া ষ্টেশন ক্রোশের অষ্টাংশের মধ্যে অবস্থিত। মূল এটাওয়া নগরটী গভীর পয়ঃ-প্রণালী সমূহের মধ্যে অবস্থিত। এই সকল পয়ঃ-প্রণালীর প্রাকৃতিক গঠন একরূপ মনোরম; যে যে স্থানে উহারা বিস্তৃততর এবং চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ শোভিত তথাকার দৃশ্য অতি চমৎকার। স্থানে স্থানে এই বৃক্ষ সংখ্যা এরূপ অধিক যে, সমস্ত নগরটীকে একটী পত্র পূর্ণ উদ্যান বলিয়া বোধ হয়। একটী বিস্তৃততর পয়ঃ-প্রণালী, প্রাচীণ নগরকে আধুনিক নগর হইতে পৃথক করিতেছে। কিছু কাল পূর্ব্বে এই দুই ভূভাগের এক দিক্ হইতে অন্য দিকে যাওয়া বহ্বায়াস-সাধ্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে উক্ত প্রণালীর উপরে সেতু এবং বাঁধ নির্ম্মিত ও দীর্ঘ পাকারাস্তা সকল প্রস্তুত হইয়াছে। আগরা ও মৈনপুরের দুই রাস্তা, নগরের বহির্ভাগে উত্তর পশ্চিম দিকে সংযুক্ত হইয়া নূতন নগরের বাজার দিয়া লম্বমান রহিয়াছে। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে সুন্দর বিপনী সমূহ দণ্ডায়মান। নগর মধ্যস্থলে অবস্থিত ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার হিউম সাহেবের নামানুসারে স্থানের হিউম-গঞ্জ নামকরণ হইয়াছে। হিউম-গঞ্জ সুন্দর অট্টালিকা সমূহে পরিশোভিত। এই স্থানে একটা বাজার, মাজিষ্ট্রেটের আদালত, পুলিশ থানা, ডিস্পেনসারি ও মিশনারী গৃহ আছে। হিউমস্ হাই স্কুল নামক বিদ্যালয় গৃহটী একটী সুন্দর অট্টালিকা; ইহা প্রধানতঃ সংগৃহীত চাঁদা দ্বারা নির্ম্মিত। এই স্থানের উত্তর এবং দক্ষিণ ভাগে শস্য এবং কার্পাসের বাজার অবস্থিত। ইহার অতি সন্নিকটেই সুন্দর কূপ-বিশিষ্ট একটী পান্থ নিবাস (সরাই)। নগরের উত্তর ভাগে এই স্থান হইতে প্রায় ক্রোশের চতুর্থাংশ দূরে দেওয়ানি কার্য্যালয় স্থাপিত। এই নগরে অনেকগুলি ছায়াপূর্ণ বৃক্ষ শোভিত মনোজ্ঞ পাকারাস্তা রহিয়াছে। রেলওয়ে সম্পর্কীয় অট্টালিকা সমূহ ষ্টেশনের পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত; তৎপরেই জেলখানা। কলেক্টরের কার্য্যালয় এবং মাজিষ্ট্রেটের আদালত, জেলখানা হইতে ক্রোশের অষ্টমাংশ পশ্চিমে বর্ত্তমান। এই সকল অতিক্রম করিলে পশ্চাৎ সরকারী বাগান, গির্জ্জা, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাফিস্ অবলোকিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই নগরে একটী সেনা-নিবাস ছিল, সৈন্য সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প করিয়া পরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে এই স্থান হইতে অপসারিত করা হয়। তৎপরে সৈন্যদিগের আবাস-গৃহও বিধ্বস্ত ও লুপ্ত হইয়াছে। এটাওয়া নগরে ঘৃত, কার্পাস, কলায়, তিসি ও মসিনার বাণিজ্য বহুল-পরিমাণে নির্ব্বাহিত হয়, ব্যবসায়ীগণ অধিকাংশই কুর্ম্মি-জাতীয়। এখানে কোনরূপ প্রসিদ্ধ শিল্পজাত দ্রব্য দেখা যায় না। তাপ্তী নামক এক প্রকার রঙ্গিন বস্ত্র বয়ন হয় এবং দাব-গড়ান নামক পল্লীতে ঘৃত ও তৈল ধারণোপযোগী চর্ম্ম নির্ম্মিত

এক প্রকার পাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে; দবগড় নামক এক জাতি এই সকল নির্ম্মাণ করে। তাহাদের নামানুসারেই এই স্থানের নাম উক্তরূপ হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পিপা এবং টিনের ক্যানেস্তার ব্যবহার অধিক হওয়ায় উক্ত ব্যবসায়ও ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। সাকলি গড়ান নামক অপর একটী মহলে সাকলি-গড় নামক এক জাতীয় লোক চিরুণি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এটাওয়া নগর পেথা নামক এক প্রকার মিষ্টান্নের জন্য প্রসিদ্ধ। তদ্দেশীয় লোকগণ ইহার বড়ই প্রিয় এবং দূর দেশ পর্য্যন্ত ইহার রপ্তানি হয়। এই নগর হইতে গোয়ালিয়র যাইবার পথের দক্ষিণ দিকে বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ। এই মসজিদটী পূর্ব্বে কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ-মন্দির ছিল। এখনও ইহাতে মধ্যে মধ্যে প্রাচীন আর্য্য কারু-কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এটাওয়া নগরের পশ্চিম দিকে কুঞ্জবনস্থ অস্থল নামক মন্দিরটী হিন্দুদিগের একটী পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির গোপাল দাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা, নরসিংহ-দেবের (বিষ্ণু অবতারের) সম্মানার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অপর একটী মহাদেবের মন্দির, এই নগরও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মান করিয়াছিল। যমুনা নদীর ঘাট সকল নানাবিধ সুরম্য মন্দিরে সুশোভিত। তন্মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে নির্ম্মিত সুন্দর শুভ্র চূড়া শোভিত জৈনগণের একটী মন্দির একটী সুন্দর দৃশ্য বস্তু। অত্রস্থ দুর্গটী এক্ষণে ধ্বংসাবস্থায় পরিণত; ইহার প্রকাণ্ড বুরুজ-সমূহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। তাহা দ্বারা উপরিভাগে যাওয়া যায়। এখনও ইহার ভূমি গর্ভস্থ সুরঙ্গ সকল দেখা যাইতেছে। এই দুর্গটী প্রাচীনকালে ঠাকুর বংশীয় কোন রাজ-পুরুষের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বোধ হয়, তিনিও ইহাকে কোন অপর প্রাচীনতর দুর্গের উপরে নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।

ইতিহাস।—মুসলমানগণের আগমনের পূর্ব্বেও এই নগর বিখ্যাত এবং সমৃদ্ধ ছিল। মহম্মদ-গজনবী এবং সাহেবুদ্দিন-ঘোরী, উভয়েই ইহা লুঠ করিয়াছিলেন। চৌহান জাতীয় রাজপুতগণ এই বন্য-ভূভাগে আসিয়া ইহাতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং কিছুকাল এই স্থানে রাজত্বও করেন তৎপরে একজন মুসলমান সেনাপতি তাঁহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া রাজ্য করিতে থাকেন। বাবর এবং অন্যান্য মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ, এই স্থানকে অতি দৃঢ় বলিয়া অনেকবার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই নগর একটী সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই মোগল-সাম্রাজ্যের অবনতিতে মহারাষ্ট্রীয় এবং রোহিলাগণের আক্রমণে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এই নগরের পরবর্ত্তী ইতিহাস এবং সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ের অবস্থা এটাওয়া জেলার ইতিহাসে বিবৃত হইয়াছে।

এলিফ্যান্টা।—(নিকটবর্ত্তী অধিবাসীরা ইহাকে ঘারাপুরী নামে আখ্যাত করে) বোম্বাই বন্দরে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ; বোম্বাই সহর হইতে ৬ ছয় মাইল এবং উপকূল হইতে ৪ চার মাইল দূরে (অক্ষান্তর ১৮° ৫৭' উত্তর ও দ্রাঘিমান্তর ৭৩° পূর্ব্ব) অবস্থিত। এই দ্বীপটী

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত থানা জেলার অধীন প্যানোএল মহকুমার অন্তর্নিবিষ্ট। দ্বীপটীর পরিধি ৪ চার মাইল হইতে ৪½ মাইলের মধ্যে। ইহার মধ্যস্থলে দুইটী পাহাড় বর্ত্তমান আছে। ভূমির পরিমাণ ফল সমুদ্রের জোয়ার ও ভাটানুসারে ৪ চার ও ৬ ছয় বর্গ মাইল। পর্ত্তুগীজেরা দ্বীপটীর দক্ষিণ ভাগে জাহাজ হইতে অবতরন স্থানে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহদাকার হস্তী দেখিয়া ইহার নাম এলিফ্যাণ্টা রাখেন। উক্ত হস্তীটী প্রায় ৯ নয় হস্ত দীর্ঘ ও ৫ পাঁচ হস্ত উচ্চ ছিল। কিন্তু ইহার মস্তকটী ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং অবশেষে দেহটীও একটী প্রস্তর-স্তূপে পরিণত হয়, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উহাকে বোম্বাইস্থিত ভিক্টোরিয়া নামক উদ্যানে স্থাপিত করা হইয়াছে। পাহাড়-দ্বয়ের সংযোগ স্থলেব সন্নিকটে পূর্ব্বকালে একটী প্রস্তরময় অশ্ব-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল ; এই মূর্ত্তিটীর বিষয়ে একজন প্রাচীন লেখক এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—'অশ্ব-মূর্ত্তিটী এরূপ সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এরূপ কৌশল-পূর্ণ, এরূপ ভাবে রঞ্জিত যে অনেকেই দূর হইতে ইহাকে জীবিত মনে করেন।' এই অশ্ব-মূর্ত্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে। পাহাড়দ্বয়ের পার্শ্ব-দেশ ও উত্তরপূর্ব্ব ভাগ ব্যতীত সকল স্থানই জঙ্গল-পূর্ণ। নিম্নভাগে আম্র, তিন্তিরী ও করঞ্জ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি উচ্চ তালবৃক্ষ অনেক আছে। নিম্ন ভূমিতে ধান্যপূর্ণ ভূমি সকল অবস্থিত। তীর ভূমি বালুকা ও কর্দ্দমময়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'সভ্যতার পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন কোন ম্লেচ্ছ জাতীয় লোক' এই মূর্ত্তির দুই মুখের নাসিকা-দ্বয়ের কিছু অংশ ছেদন করে তৎপরে আরও অনেক মূর্ত্তি ঐরূপে কুব্যবহৃত হওয়ায় তিন জন রক্ষক মন্দিরের রক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ত্রিমূর্ত্তির দুই পার্শ্বে যথাক্রমে ৮½ ও ৯ হস্ত উচ্চ দুইটী প্রস্তরময় দ্বারপাল নির্ম্মিত আছে। এই মূর্ত্তিদ্বয়ও নানা প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে লিঙ্গ-পূজাস্থান, এই স্থানের গাত্রে নানাবিধ খোদিত প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই গুহার মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোদিত মূর্ত্তিপূর্ণ কুঠারি আছে। এই সকলের প্রত্যেকের বর্ণনা এই স্থলে দেওয়া হইল না। পাঠক তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাঁহাকে বার্জেস সাহেবের লিখিত মন্দিরটীর সুবিস্তৃত বিবরণী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বার্জেস সাহেব বলেন—"মন্দিরে প্রবেশ করিলে আবির্ভূত মনোভাব বাক্যে বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কেবল মনে সামান্য অনুভব করা যাইতে পারে। পর্ব্বতীয় উষ্ণপ্রধান প্রদেশের উত্তপ্ত সূর্য্য-কিরণ সহ্য করিয়া প্রকাণ্ড স্তম্ভ-মালা শোভিত মন্দিরে প্রবেশ করিলে মনোমধ্যে এক প্রকার অদ্ভুত ও অনিশ্চিত বিস্ময় উদিত হয় তৎপরে শীতল ও সামান্য আলোক মধ্যে যখন পাহাড় হইতে কর্ত্তিত মন্দির এবং মন্দির গাত্রে অসংখ্য সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায় তখন উক্ত বিস্ময় আরও অধিক হইয়া উঠে"। ডি কৌটো বলেন, যে পর্ব্বত হইতে মন্দিরটী খোদিত হইয়াছে তাহা ধূসর বর্ণ। সপ্তদশ শতাব্দীর উক্ত পরিদর্শক আরও বলেন—'মন্দির-মধ্যস্থ স্তম্ভ, প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি সকল বস্তুই পূর্ব্বকালে চূর্ণ ও অন্যান্য রঙ্গ দ্বারা রঞ্জিত থাকায় তাহাতে ইহার

সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয় ছিল'...বর্ত্তমান সময়ে এই রঞ্জন কার্য্যের কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

ইতিহাস।—বোধ হয় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত দ্বীপটীতে একটী সমৃদ্ধ নগর অবস্থিত ছিল এবং এই দ্বীপও একটী বিখ্যাত তীর্থস্থান ছিল। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে এই স্থানে পুরী নামক মৌর্য্য নগর অবস্থিত ছিল। পাহাড়ের গুহা গুলি সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু উত্তরবর্ত্তী বন্দরের পূর্ব্ব ভাগে ক্ষেত্র সকলে ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত ভিত্তি সকল, ভগ্ন-স্তম্ভ ও শিবমূর্ত্তি এবং প্রাচীন নগরের অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান বন্দর দ্বীপের পশ্চিমোত্তর দিকে অবস্থিত। বোম্বাই নগরে আপোলো বন্দরে বাষ্পীয় অথবা পালবাহী নৌকা সকল ভাড়া করিয়া, ১ ঘণ্টায় এই দ্বীপে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার বন্দরে নির্ম্মিত জেটীতে একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার নিরাপদে অবস্থিতি করিতে পারে। অত্রস্থ গুহাগুলি দেখিবার জন্য অনেক যাত্রী এই স্থানে সমাগত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যাত্রীর সংখ্যা ৫৪০০। এই সকল গুহায় দেব মন্দির অবস্থিত আছে, তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের পাহাড়ে সমুদ্রতল হইতে প্রায় ২০০ হস্ত উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত গুহাস্থ প্রস্তর-মন্দিরটীই সর্ব্বপ্রধান এবং এখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যাত্রী সমাগত হয়। অবতরণ ঘাট হইতে ¼ মাইল দীর্ঘ একটী বক্র পথ দিয়া এই মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দিরটী উত্তরমুখী ও সুবিস্তৃত। অনেকগুলি বৃহৎ স্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে ৮টী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং অপর-গুলিও নানারূপে নষ্ট হইয়াছে। মন্দিরের তল ভাগ এবং ছাদ সমতল নহে। মন্দির গাত্রে নানাবিধ খোদিত মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে পশ্চাৎ ভাগের ত্রিমূর্ত্তি নামক তিনমুখী অতি প্রকাণ্ড সুবিখ্যাত অর্দ্ধ দেহটী সর্ব্বপ্রধান। এই মূর্ত্তি মহাদেবের সৃষ্টিকারী, পালনকারী ও সংহারকারী তিন ভাবই একত্রে প্রকাশ করিতেছে। অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যেও প্রত্যেকেই মহাদেবের কোন না কোন প্রকার রূপ প্রদর্শন করিতেছে। পশ্চিম ভারতীয় অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরটীও শৈব। ত্রিমূর্ত্তির উচ্চতা প্রায় ১২ হস্ত এবং মস্তক-ত্রয়ের মোট পরিধি প্রায় ১৪½ হস্ত। প্রথমে সৃষ্টিকারী (অথবা ব্রহ্ম) মুখ মধ্যে বিষ্ণু মুখ তৎপরে শিব মুখ; মুখত্রয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পশ্চাল্লিখিতটী কিছু বৃহত্তর।

এই গুহার সামান্য দূরে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে উত্তর পূর্ব্বমুখী দ্বিতীয় গুহা অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৭২ হস্ত। অত্রস্থ মন্দিরটী সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত এবং গুহাটী ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ, এই জন্য ইহার মন্দিরের বিশেষ বর্ণনা করা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে কেবল এক স্থানে কতকগুলি খোদিত মূর্ত্তি দেখা যায়। এই গুহার দক্ষিণে একটী বৃহৎ প্রস্তর-স্তূপ আছে, তাহার উপর দিয়া তৃতীয় গুহার একটী কুঠারীতে প্রবেশ করা যাইতে পারে; আর কিছু দক্ষিণে উহার (৩য় গুহার) প্রধান প্রবেশ দ্বার। এস্থানের মন্দির দ্বিতীয়টী অপেক্ষা আরও অধিকতর বিধ্বস্ত। চতুর্থ গুহা-মন্দির দ্বিতীয় পাহাড়ে প্রথমোক্ত মন্দির

হইতে ৬৬ হস্ত উচ্চতর স্থানে অবস্থিত, দেশীয় লোকেরা ইহাকে সীতা বাইয়ের দেওয়াল বলে। এই মন্দিরটী শেষোক্ত দুইটী মন্দির অপেক্ষা কিছু ভাল অবস্থায় আছে, কিন্তু ইহার দ্বারস্থ সুন্দর কারুকার্য্য শোভিত মার্ব্বেলময় তোরণটী তিরোহিত হইয়াছে।

এই দ্বীপস্থ পূর্ব্বোক্ত গুহা সকলের সময় নির্দ্ধারণ করিবার উপযুক্ত প্রমাণাদি বিশেষ পাওয়া যায় নাই। তদ্বিষয়ে নিকটবর্ত্তী স্থানে নানারূপ প্রবাদ আছে। তন্মধ্যে কাহারও মতে ইহারা পাণ্ডবদিগের দ্বারা, কাহারও মতে বাণসুর নামক কানাড়া রাজের দ্বারা, কাহারও মতে আলেক্‌জাণ্ডার কর্ত্তৃক এই সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল প্রবাদের তুল্য-রূপ আনুমানিক প্রমাণও শুনিতে পাওয়া যায়।

ফার্গুসন সাহেব বলেন,—খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথমটী নির্ম্মিত হয়। কিন্তু বার্জ্জেসের মতে ৮ম অথবা ৯ম শতাব্দীতে ইহার নির্ম্মাণ হয়। এই সকল গুহায় কোনরূপ লিখনাদিও দেখা যায় না। কিন্তু ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগিজ রাজ প্রতিনিধি ডম জোয়া ডি ক্যাষ্ট্রো যে এক খণ্ড প্রস্তর স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা পুনঃ প্রাপ্ত এবং পঠিত হইলে মন্দিরের সময় নির্দ্ধারণের আশা করা যাইতে পারে।

প্রথমোক্ত মন্দিরটী হিন্দুদিগের দ্বারা (বিশেষতঃ বণিকগণ দ্বারা) শৈব উৎসবে উৎসব পূর্ণ হয়। শৈব উৎসব সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিব রাত্রিতে। ফাল্গুনী চতুর্দ্দশীতে এই স্থানে একটী সুবৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। প্রথম গুহার সম্মুখ ভাগের দৃশ্য বড়ই মনোরম। নিকটস্থ একটী পুরাতন বাঙ্গলা হইতে বোম্বাই বন্দরের সুন্দর দৃশ্য লাভ করা যায়।

এডোয়ার্ডসাবাদ—(দলিপনগর)—পঞ্জাব প্রদেশে বান্নু জেলার একটী নগর। এই নগরে একটী সেনা নিবাস আছে, এই নগরই জেলার সদর। অধিবাসীর সংখ্যা ৮৯৬০, তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রায় সমসংখ্যক; অল্প সংখ্যক শিখও এই স্থানে বাস করে। নগরটী দেরাইস্‌মাল খাঁয়ের ৮৯ মাইল উত্তরে ও কোহাট হইতে ৮৪ মাইল দক্ষিণে, কুরাম নদীর ১ মাইল দক্ষিণে জেলার উত্তর পশ্চিম কোণে (অক্ষান্তর ৩২° ৫৯′ ৪৫″ উত্তর ও দ্রাঘিমান্তর ৭৮° ৩৯′ পূর্ব্বে) অবস্থিত। মেজর (পরে যিনি সার হার্বার্টিহন) এডোয়ার্ডেস্ সাহেব রাজনৈতিক কোন কারণে এই স্থানটী মনঃস্থ করিয়া, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই নগরটী স্থাপিত করেন। ঐ সময়ে নির্ম্মিত দুর্গটী পঞ্জাবের তরুণ মহারাজ দলিপ সিংহের সম্মানার্থ দলিপগড় নামে আখ্যাত হয় এবং বাজারটী দলিপনগর নাম প্রাপ্ত হয়। বাজারের চতুর্দ্দিকে শীঘ্রই একটী নগর নির্ম্মিত হইল এবং অনেক হিন্দু ব্যবসায়ীগণ নিকটবর্ত্তী বাজার আহম্মদাবাদ হইতে আসিয়া এই স্থানে ব্যবসা করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত বাজার আহম্মদাবাদ নামক স্থানটী ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইবার পূর্ব্বে বান্নু উপত্যকার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। এডোয়ার্ডসাবাদের বাজারটীর মধ্যস্থল দিয়া একটী সুন্দর ও বিস্তৃত রাস্তা গিয়াছে এবং হাটের স্থানটী অতি সুন্দর।

নগরের চতুর্দ্দিকে একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রাচীর, এই প্রাচীরের মধ্যে এক স্থানে

একটী পুলিশ থানা বর্ত্তমান। দুর্গের পশ্চিম দিকে বিচারালয়, কোষাগার, জেল, সরাই, বাঙ্গলা, ডিস্পেনসারী, অশ্বারোহী পুলিশ থানা এবং পোষ্টাফিস্ আছে। চার্চ মিশনারী সোসাইটীর অধীনে একটী ক্ষুদ্র গির্জ্জা ও স্কুল গৃহ অবস্থিত আছে। দলিপগড় দুর্গে দুই দল (Regiments) পদাতিক সৈন্তের ও অশ্বারোহী সৈন্তের আবাস স্থান আছে এবং দুর্গের বহির্ভাগে কামান স্থাপনের ব্যাটারীও বর্ত্তমান আছে। কর্ম্মচারীগণের কতকগুলি বাঙ্গলা আছে। নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে জল নির্গমের সুব্যবস্থা না থাকায়, এডোয়ার্ডসাবাদ স্থানটী অতি অস্বাস্থ্যকর এবং অত্রস্থ সেনা নিবাসে সৈন্সগণ ম্যালেরিয়াতে বড়ই কষ্ট পায়। এই স্থানে বায়ু উপত্যকা জাত দ্রব্যের বহুল বাণিজ্য হয়। ১২৪ মাইল দূরে পঞ্জাব নর্দ্দার্ণ ষ্টেট রেলওয়ে স্থিত কুশলগড় ষ্টেসনটী এখান হইতে সর্ব্ব নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেসন। একটী সাপ্তাহিক হাটে গড় হিসাবে ২০০০ বিক্রেতা ও বহুসংখ্যক ক্রেতা আগমন করে। কার্পাস ও পশম নির্ম্মিত বস্ত্র, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তু সকল, তূলা, তামাক ও শস্যই প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। মিউনিসিপাল আদায় (১৮৮২ খৃষ্টাব্দে) ১৯৪০০৲ টাকা, ব্যয় ২৫০২০৲ টাকা।

ঐরিকিন—মধ্য প্রদেশে এই নামে একটী নগর আছে। এরকন্ন ইহার অন্যতম নাম। এখানে কতকগুলি পুরাতন মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহাতে "এরকন্ন" নাম খোদিত আছে। ইহার চলিত নাম এরণ। যে সময় ভারতবর্ষে আর্য্য কুলোদ্ভব রাজন্যগণের আধিপত্য ছিল, যখন গুপ্ত রাজগণ এদেশের রাজ চক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে এই নগর সংস্থাপিত হয়। ইহা বীণা নদীর বাম ধারে এবং বেত্রবতী নদী হইতে ৮ আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই নগরটীর তিন দিকে স্বচ্ছ সলিলা বীণা নদী প্রবাহিত থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য অতীব মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। অদ্যাপিও হিন্দু রাজগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ নিচয় এখানে শোভা পাইতেছে। এখানকার লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, রাজা ভরত ঐ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। মগধের গুপ্ত বংশীয় রাজা বুধ গুপ্তের সময়ে এখানে এক অতি প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, এই স্তম্ভের ভাস্কর্য্য অতীব সুন্দর। স্তম্ভের পাদদেশে এই খোদিত লিপিটী দৃষ্ট হয়। "শতে পঞ্চ ষষ্ট্যাধিকে বর্ষাণাং ভূপতৌ চ বুধ গুপ্তে। আষাঢ় মাস শুক্ল দ্বাদশ্যাং সুরগুরোর্দ্দিবসে"। বুধ গুপ্তের রাজত্ব কালে (১৬৫) সম্বতে আষাঢ় মাস শুক্ল পক্ষ দ্বাদশী তিথি বৃহস্পতিবারে এই স্তম্ভ স্থাপিত হয়। স্তম্ভের শিরোভাগে দুইটি যুগল মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। পশ্চিম ভাগে অনেকগুলি হিন্দু দেব দেবীর মন্দির আছে! এই সমস্ত দেব দেবীর মূর্ত্তির মধ্যে নারায়ণের বরাহ মূর্ত্তিটীই অতি চমৎকার। ইহা দেখিলে হিন্দু মাত্রেরই হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। মূর্ত্তিটী প্রায় ৭॥ হাত উচ্চ। সেই বরাহ মূর্ত্তির মধ্যদেশে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ধন্ত-বিষ্ণুর নাম ও পরিচয় খোদিত হইয়াছে। তাহার অদূরে রাজা তোরমাণের অনুশাসন পত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই মন্দিরের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, নানা স্থান পড়িয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাও আর বুঝি থাকে না। সেই মন্দিরের ভগ্নস্তম্ভ সকল অবলোকন করিলে প্রাচীন হিন্দু

শিল্পিগণের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেই স্তম্ভগুলি যে সুচারুরূপে বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা পাশ্চত্য শিল্প শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতেছেন। জেনারেল কনিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন,—"The ornamentation is, perhaps, too elaborate, but several parts of it are very rich and beautiful." বরাহ মন্দিরের উত্তর দিকে বিষ্ণু, নরসিংহ প্রভৃতির কয়েকটি মন্দিরও আছে।

নগরের তোরণ দ্বারের দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে দানাবীর নামে একটী বৃহৎ স্তূপ এবং কয়েকটী সতী স্তম্ভ আছে।

ওঙ্কার মান্ধাতা—একটি পবিত্র দ্বীপ। মধ্য-প্রদেশের নিমার জেলার অন্তর্গত নর্ম্মদা নদী বক্ষে ইহা অবস্থিত। লোকে সচরাচর ইহাকে মান্ধাতা বলে। এখানে ওঙ্কার মূর্ত্তিধারী মহাদেবের মন্দির আছে, তজ্জন্য লোকে ইহাকে ওঙ্কার মান্ধাতা বলে। ইহার প্রাচীন নাম বৈদূর্য্য শৈল। (১) রাজা মান্ধাতা ওঙ্কার মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করেন, "হে দেবেশ! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে বৈদূর্য্য শৈলকে 'মান্ধাতা' এই নামে অভিহিত করুন। সেই দেব স্থানে যে সকল লোক অন্ন দান, তপস্যা, পূজা ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, আপনার প্রসাদে তাহারা শিবলোক প্রাপ্ত হইবে"। শিব মান্ধাতার সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমার প্রসাদে এ সমস্তই হইবে।" সেই সময় হইতে বৈদূর্য্য গিরির নাম হইল "মান্ধাতা"।

দুইটী স্বচ্ছ সলিলা নদীর সঙ্গম স্থলে এই দ্বীপ অবস্থিত। ইহার উভয় পার্শ্বে শ্যাম পাদপ-পুঞ্জ শোভিত পর্ব্বত-শ্রেণী। সেই পর্ব্বত-মালার মধ্য দিয়া রজত সূত্রের ন্যায় প্রবাহিনী সমস্ত খরতর বেগে প্রধাবিত হইতেছে। দ্বীপটীর অতি নিকটেই কাবেরী নদী।

মান্ধাতোবাচ।

(১) যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ! বরং দাতুং ত্বমিচ্ছসি।
বৈদূর্য্যো নাম শৈলেন্দ্রো মান্ধাতাখ্যাতুমর্হতু॥
দেব স্থানে সমং হ্যেতৎ তৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি।
অন্ন দানং তপঃ পূজা তথা প্রাণ বিসর্জ্জনম।
যে কুর্ব্বন্তি নরাস্তেষাং শিবলোক নিবাসিতা।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মান্ধাতুঃ পরমেশ্বরঃ।
উবাচ বচনং দেবো মান্ধাতারং মহীপতিম॥
সর্ব্বমেতন্নৃপশ্রেষ্ঠ! মৎ প্রসাদাদ্ভবিষ্যতিঃ।
তদা প্রভৃতি মান্ধাতা বৈদূর্য্য গীয়তে গিরিঃ॥

(স্কন্দ পুরাণ রেবাখণ্ড।)

ওড্র—উড়িষ্যা দেশের অন্যতম নাম ওড্র দেশ। মনু বলেন,—(১) ক্রমে ক্রমে ক্রিয়া লোপ হওয়ার জন্য এই সমস্ত ক্ষত্রজাতি জগতে পতিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সেই সকল জাতির নাম যথা,—পৌড্রক, ওড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, (Afghan) যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, ও খস। মনুসংহিতা ভিন্ন হরিবংশ, মহাভারত এবং রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য ও পুরাণাদিতেও ওড্র জাতি অসভ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের সভা পর্ব্বে যে স্থলে দুর্য্যোধন স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতেছেন, তিনি সেই স্থানে বলিতেছেন,—"তদনন্তর (২) চীন শক ও ওড্র দেশবাসী এবং বনবাসী, বর্ব্বর জাতি, বৃষ্ণিবংশীয়, হূণ দেশীয়, হিমালয়, নীপ ও অনুপদেশীয়গণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা উপহারার্থ যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণগ্রীব মহাকায় শতক্রোশগামী সুশিক্ষিত প্রসিদ্ধ দশ সহস্র রাসভ প্রদান করিয়াছিল।"

হরিবংশ দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

> সুরাষ্ট্রৈশ্চৈব বাহ্লীকাঃ মদ্রাভীরাস্তথৈব চ।
> ভোজাঃ পাণ্ড্রাশ্চ অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
> তথৈব চৌড্রাঃ পৌড্রাশ্চ বামচূলা-সকেরলাঃ॥

তথায় মৎস্য, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রচর, ভদ্রক, কুরুগণ, ভদ্রকদিগের সহিত, গান্ধারগণ, যবন, শক, ওড্র, পারদ, বাহ্লীক প্রভৃতি জাতিগণকে কাঞ্চন ও কমল দ্বারা সংবৃত দেখিলাম। (৩)

---

(১) শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ স্থাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্র কাশ্চৌড্র-দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খসাঃ॥
(মনু)

(২) চীনান্ শকাংস্তথা ওড্রান্ বর্ব্বরান্ বনবাসিনঃ।
বার্ষ্ণেয়ান্ হার হূণান্ কৃষ্ণান্ হৈমবতাংস্তথা।
নীপানুপানধিগতান্ বিবিধান্ দ্বারিবারিতান্॥
বল্যর্থং দদতস্তস্য নানারূপাননেকশঃ।
কৃষ্ণগ্রীবান্ মহাকায়ান্ রাসভান্ শতপাতিনঃ॥

(৩) তত্র মৎস্যান্ পুলিন্দাংশ্চ শূরসেনাংস্তথৈব চ।
প্রচরান্ ভদ্রকাংশ্চৈব, কুরূংশ্চ সহ ভদ্রকৈঃ॥
গান্ধারান্ যবনাংশ্চৈব শকানোড্রান্ স-পারদান।
বাহ্লীকানৃষিকাংশ্চৈব পৌরবানঘ কিঙ্করান্॥

"রামায়ণে কিষ্কিন্ধা কাণ্ডের ৪১ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে,—সুগ্রীব অঙ্গদ প্রমুখ বানরগণকে সীতান্বেষণের জন্য দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলেন (১) সহস্র শিখর সমন্বিত নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা সমূহে সমাচ্ছাদিত বিন্ধ্যগিরি এবং মহোরগ নিষেবিত রমণীয় নর্ম্মদা, গোদাবরী, মহানদী ও কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদী সকল অন্বেষণ করিবে। পরে মেকল, উৎকল, দশার্ণ নগর, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষ্টিক, মাহিষিক, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক, প্রভৃতি এই সকল দেশ অনুসন্ধান করিয়া পর্ব্বত, নদী ও গুহা সমন্বিত দণ্ডকারণ্যবর্ত্তি গোদাবরী প্রদেশ অন্ধ্র পুণ্ড্র চোল, পাণ্ড্য ও কেরল প্রভৃতি স্থান অন্বেষণ করিবে।"

এই অসভ্য পতিত ওড্র জাতির যে দেশে বাস, সেই দেশ ওড্রদেশ নামে খ্যাত। "ত্রিকাণ্ড শেষ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে "ওড্রা উৎকল নামানঃ,"—উৎকলজাতীয়েরাই ওড্র নামে অভিহিত। উৎকল চন্দ্রবংশীয় সুদ্যুম্ন নরপতির পুত্র। হরিবংশে উৎকলের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই বিবরণটী বর্ণিত হইয়াছে। মহাত্মা মনু, সন্তান কামনায় মিত্র এবং বরুণের তৃপ্তি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞ করেন। তিনি যজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলে কুণ্ড মধ্য হইতে দিব্য বসন পরিহিত, দিব্য মাল্য ও অলঙ্কার ভূষিত এক অলোক সামান্যা রমণী উত্থিত হইল। কে তাহার পাণিগ্রহণ করিবে এই প্রশ্ন লইয়া মহাবিবাদ উপস্থিত হয়। পরে ইহাই স্থির হইল যে, রমণী তাহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত করিয়া একবার স্ত্রী ও একবার পুরুষমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূতা হউন। রমণী তদনুসারে স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সোম পুত্র বুধের ধর্ম্মপত্নী হন। তাঁহার গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয়। অনন্তর পুরুষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে তাঁহার নাম হয় সুদ্যুম্ন। এই সুদ্যুম্ন নরপতির তিন পুত্র উৎকল, গয় এবং বিনতাশ্ব। উৎকল দেশে উৎকলের, পশ্চিম দেশে বিনতাশ্বের এবং পূর্ব্বে গয় পুরীতে গয়ের আধিপত্য সংস্থাপিত হইল।

"সুদ্যুম্নস্য তু দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভারত॥

---

(১) সহস্রশিরসং বিন্ধ্যং নানাদ্রুম লতাবৃতম্।
নর্ম্মদাঞ্চ নদীং রম্যাং মহোরগ নিষেবিতাম্॥
ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্।
মেকলামুৎকলাংশ্চৈব দশার্ণ নগরাণ্যপি॥
আব্রবন্তীমবন্তীঞ্চ সর্ব্বমেবানুপশ্যত।
বিদর্ভানৃষ্টিকাংশ্চৈব রম্যান্মাহিষকানপি॥
তথা মৎস্য-কলিঙ্গাংশ্চ কৌশিকাংশ্চ সমন্ততঃ।
... ... ইত্যাদি।

উৎকলস্তোৎকলা রাজন্ বিনতাখস্ত পশ্চিমাঃ।
দিক্ পূর্ব্বা ভরতশ্রেষ্ঠ গয়স্ত তু গয়পুরী ॥
(হরিবংশ, দশম অধ্যায়)

রঘুবংশে লিখিত আছে (১) "তিনি (রঘুরাজ) হস্তিশ্রেণী সেতুর আকারে সজ্জিত করিয়া সৈন্যসহ কপিশা নদী পার হইলেন। পরে উৎকল দেশীয়দিগের প্রদর্শিত পথে কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।"

বৃহৎ সংহিতার কয়েক স্থানে "ওড্র" শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, যথা (২)। সূর্য্য বা চন্দ্র, মেষ রাশিতে অবস্থিতি করিবার সময়ে গ্রহণ হইলে পাঞ্চাল, কলিঙ্গ, শূরসেন, কাম্বোজ, ওড্র, কিরাত প্রভৃতি জাতি এবং যাহারা শস্ত্রব্যবসায়ী ও যাহারা কর্ম্মকার, তাহারা নানা পীড়াগ্রস্ত হইয়া কষ্ট ভোগ করে।

আর চৈত্র মাসে গ্রহণ হইলে চিত্রকর, লেখক, গায়ক, রূপোপজীবি, বেদাধ্যায়ী, স্বুবর্ণ ব্যবসায়ী এবং পৌণ্ড্র, ওড্র ও অশ্মকদিগের নানা দুঃখ উপস্থিত হয়। (৩)

এই সমস্ত উদ্ধৃত বচন পাঠে জানা যায় যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আর্য্যগণ ওড্র দেশের কথা অবগত ছিলেন। তাঁহারা এই দেশকে অসভ্য বা হীনাবস্থ জাতির বাসস্থান বলিয়া জানিতেন। কখন ইহাকে তীর্থস্থান বা পুণ্যভূমি জ্ঞান করেন নাই। এক সময় এখানে বৌদ্ধ মন্দির ও মঠাদিও নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মকে উৎসাদিত করিবার জন্যই এদেশে হিন্দুগণ, স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের আন্দোলন উপস্থিত করেন। শৈবগণই এখানে সর্ব্বারম্ভে অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শৈবগণের পরেই বৈষ্ণবগণ আবির্ভূত হন। নিম্নলিখিত পুরাণ সমূহে উৎকল ক্ষেত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। (১) কপিল সংহিতা, (২) একাম্র পুরাণ, (৩) পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য, (৪) একাম্র চন্দ্রিকা (৫) তীর্থ চিন্তামণি এবং পুরুষোত্তম তত্ত্ব। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রথমোক্ত খানি (কপিল সংহিতা) অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থ। সত্যজিৎ কপিল মুনির সন্নিধানে নিবেদন করিলেন, প্রভু! উৎকল দেশের মাহাত্ম্য শুনিতে বাসনা হইয়াছে, ঐ দেশের তীর্থ সকলের মহিমা বর্ণনা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। কপিল এইরূপে

---

(১) "স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদ-সেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥

(২) পাঞ্চাল-কলিঙ্গ-শূরসেনাঃ কাম্বোজোড্রাঃ কিরাত-শস্ত্র বার্ত্তাঃ।
জীবন্তি যে হুতাশ বৃত্তাস্তে পীড়ামুপযান্তি মেষ সংস্থে ॥

(৩) চৈত্রে তু চিত্রকর লেখক গেয়সক্তান্, রূপোপজীবি নিগমজ্ঞা হিরণ্যপণ্যান্।
পৌণ্ড্রৌড্র-কৈকয় যজনানথ চাশ্মকাংশ্চ তাপঃ স্পৃশত্যমরযোঽত্রবিচিত্রবর্ষী ॥

জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, (১) ওড্রদেশ দেবকল্পিত এবং সর্ব্বপাপহর, হে বিপ্রগণ! তোমরা বিস্তৃত রূপে তাহার বিবরণ শ্রবণ কর। সেই ওড্রদেশে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সূর্য্যদেব, পার্ব্বতী এবং পরমেশ্বর শিব সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের এক এক জনের এক এক ক্ষেত্র সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশক। সেই দেশে সর্ব্ব-পাপ-নাশিনী মহানদী প্রবাহিতা, তাহার মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ বলিব। সেই নদীতে স্নান করিলে মনুষ্য, দেবলোকে গমন করে।

ঐ কপিল সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে (২) ওড্রদেশ এই নামে বিখ্যাত ভারতসংজ্ঞক দেশ, চতুর্থ অধ্যায়ে (৩) সেই দক্ষিণ সমুদ্রতটে পুণ্যভূমি উৎকলদেশ। পুনরায় একবিংশতিতম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে (৪) সেই সর্ব্বোত্তম স্থান ওড্রদেশে লোকে দিব্যচক্ষে ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সমস্ত পুরাণাদির বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অতীব প্রাচীন। তৎসমুদয়ের সহিত কপিল-সংহিতাদির তুলনা করিলে এ গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে। যাহা হউক, ওড্রদেশ অতি প্রাচীন কালে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইত না। বৌদ্ধদিগের সময়েই এই দেশ হিন্দুগণের পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া কতক আধুনিক পুরাণ সমূহে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মাহাত্ম্যাদি সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভাগে উৎকল, নীলাচল ও শ্রীক্ষেত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

এই দেশের কতক বিবরণ এই গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় "উড়িষ্যা" শব্দে প্রদত্ত হইয়াছে। উপস্থিত প্রস্তাবে অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল। প্রাচীন ওড্রদেশের যথার্থ ইতিহাস কিছুই নাই। "মাদলা পঞ্জি" নামক তালপত্রের গ্রন্থে এ দেশের অনেক বিব-

---

(১) সর্ব্বপাপহরং দেশমোড্রং দেবৈস্তু কল্পিতম্।
শৃণুধ্বং কথ্যমানং হি বিস্তরেণাপি ভো দ্বিজাঃ॥
তস্মাদোড্রে সদা সন্তি কৃষ্ণার্ক-পার্ব্বতী হরাঃ॥
একৈকস্য ক্ষেত্রং তু সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্॥
তত্র দেশে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নদীনামুত্তমা নদী।
মহানদীতি বিখ্যাতা সর্ব্বপাপাপনোদিনী॥
তস্যা নদ্যাস্তু মাহাত্ম্যং কথয়ামি পুনঃ পুনঃ।
যস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠা দেবলোকমবাপ্নুয়াৎ॥

(২) ওড্রদেশ ইতি খ্যাতো দেশো ভারতসংজ্ঞকঃ

(৩) স পুণ্যো চোৎকলে দেশে দক্ষিণার্ণবতীরগে

(৪) তত্রাপরং চোড্রদেশঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ।
অত্যাশ্চর্য্যনেত্রেণ পশ্যন্তি ব্রহ্মরূপিণং।

রণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, ইহা অনেক দিন পর্য্যন্ত এ দেশীয় নরপতিগণের শাসনাধীনে ছিল।

ভাগবতের নবম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অনু, দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বসুর বংশ বিবরণ লিখিত আছে অনুর তিন তনয় সভানর, চক্ষু, এবং পরেক্ষু। সভানরের পুত্র কালনর। তাহার পুত্র সৃঞ্জয়। তাহা হইতে জনমেজয় জন্মেন। জনমেজয়ের তনয় মহাশাল। তাহার সন্তান মহামনাঃ। মহামনার দুই পুত্র উশীনর এবং তিতিক্ষু। তন্মধ্যে উশীনরের চারি তনয়। যথা—শিবি, বর, কৃমি, এবং দক্ষ। ইহাদের মধ্যে শিবি হইতে বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র, কেকয়, এই চারি পুত্র হয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ। তাহার তনয় হেম, তৎসুত সুতপাঃ। সুতপা হইতে বলি উৎপন্ন হন। ঐ বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমাঃ হইতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি এবং সুহ্ম, পণ্ড্র, ওড্র নামে বহু নরপতি উৎপন্ন হন। এই ওড্র নরপতিই এই দেশের প্রথম শাসন কর্ত্তা। কারণ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা স্ব স্ব নামে ঐ ছয় জনপদ এবং প্রাচ্য দেশ সকল স্ব স্ব বিষয় (১) করিয়াছিলেন। নরপতি ওড্রর নামানুসারেই এই দেশের নাম ওড্র হইয়াছে। দক্ষিণ ভাগে গোদাবরী নদীর বদ্বীপই কলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ এবং উত্তরে মহানদীর বদ্বীপ ওড্র মণ্ডল, ওড্রদেশ উৎকল বা উড়িষ্যা বলিয়া খ্যাত। এই দেশে প্রথমতঃ বালেয় ক্ষত্রিয়ের বাস ছিল। কারণ দীর্ঘতমা ঋষি বলিভার্য্যাগণের গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপাদিত করেন, তাঁহারা বালেয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছেন (২)। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ, তৎপুত্র হেম। হেমের পুত্র সুতপাঃ, তৎপুত্র বলি, এই বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা নামক ঋষি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচ জন বালেয় ক্ষত্রিয় উৎপন্ন করেন। এই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ কালক্রমে ক্রিয়াহীন হওয়ায় পতিত হইয়া পড়েন। চিলকা হ্রদের দক্ষিণভাগে যে পর্ব্বতশ্রেণি সমুদ্র পর্য্যন্ত লম্বমান হইয়া আছে তাহাই কলিঙ্গ এবং ওড্র এই উভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী সীমা রেখা এই গিরি মালার উত্তর ভাগের অধিবাসিগণের ভাষা উড়িষ্যা। ইহার দক্ষিণাংশের অধিবাসিগণের ভাষা তৈলঙ্গী।

---

(১) ততোহেমোহথ সুতপা, বলিঃ সুতপসোহভবৎ।
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদ্যা সুহ্মঃ পুণ্ড্রোড্র সংজ্ঞিতাঃ॥
জজ্ঞিরে দীর্ঘতমসো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ।
চক্রুঃ স্বনাম্না বিষয়ান্ ষড়িমান্ প্রাচ্যগাং শ্চতে॥
(ভাগবত, ৯ম স্কন্দ, ২৩ অধ্যায়। এসিয়াটিক সোসাইটী, No. III. B. 1.)

(২) তিতিক্ষোরুষদ্রথঃ পুত্রোঽভূত ততো হেমঃ হেমাৎ সুতপাঃ তস্মাদ্বলিঃ
যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ-সুহ্ম পুণ্ড্রাখ্যং বালেয়ঃ ক্ষত্রমজন্যত
তন্নাম-সন্ততি সংজ্ঞাশ্চ পঞ্চ-বিষয়া বভূবুঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, ১৮ অধ্যায়

ওড্‌নরপতি কোন্‌ সময়ে এদেশে আগমন করেন, তাহা বলিবার উপায় নাই। এই ওড্‌বংশীয়গণের শাসন সময়ে অথবা তাঁহাদের রাজত্বের অবসান কালে এদেশে বৌদ্ধগণ সমাগত হন। উড়িষ্যায় অদ্যাপি যে অসংখ্য গুহা, বৃহদাকার বুদ্ধমূর্ত্তি, শিলা-লিপি এবং বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে এ দেশে এক সময়ে বৌদ্ধগণের যে একাধিপত্য ছিল, সে কথা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলা যাইতে পারে। খুরদা, পুরী ধাউলি প্রভৃতি স্থানের সন্নিহিত পর্ব্বত গাত্রে এমন সমস্ত গুহা ও বৌদ্ধকীর্ত্তি বিদ্যমান আছে, যাহা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিলে, দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেও উড়িষ্যায় যে বৌদ্ধগণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে সপ্রমাণ হয়। ভারতবর্ষের কোন প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস বা কাব্যে এই সমস্ত পর্ব্বত গুহাবলী বা যতি সন্ন্যাসিগণের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সিংহলে "ধাথাদ্ধাতবংশ" নামক এক খানি পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থে ওড্‌দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার এই উপাখ্যানটী দৃষ্ট হয়। যে সময় এই উৎকল দেশ কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই সময় উত্তর ভারতে চন্দ্রবংশীয় একজন নরপতি এই বিপুল ভারত সাম্রাজ্যের এক-ছত্রাধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে (অনুমান খৃঃপূঃ ৫৪৩ অব্দে) বুদ্ধদেব দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সুসমাহিত হইবার অব্যবহিত পরেই এক জন শাক্যশিষ্য বুদ্ধদেবের দন্ত সহ কলিঙ্গ দেশে প্রেরিত হয়। কলিঙ্গে তখন ব্রহ্মদত্ত নামক এক জন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন।

তিনি মহাসমারোহে সেই বুদ্ধদন্তের পূজা করেন এবং প্রতিবর্ষে দন্তের পূজোপলক্ষে মহোৎসবের দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। কিয়ৎকাল অতীত হইতে না হইতেই ওড্‌মণ্ডলের ব্রাহ্মণদিগের সহিত এই নবীন বৌদ্ধদিগের তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। কোন কোন রাজা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বুদ্ধদন্তের উপাসনা করিতেন, কেহ বা উহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। পরে ব্রহ্মদত্তের একজন বংশধর বৌদ্ধধর্ম্মে এতদূর আস্থাবান্‌ হইয়া উঠেন যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষী অনেক ব্রাহ্মণকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন; এবং তাঁহার রাজত্বের সকল প্রজাকেই রাজাজ্ঞানুসারে উপাসনা ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে হইবে; এইরূপ নিয়মবদ্ধ পূর্ব্বক রাজ্যমধ্যে তাহা প্রচারিত করেন। অচিরে এ কথা উত্তর ভারতে ছত্রপতি হিন্দু রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ওড্রের বৌদ্ধগণকে সুশাসিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং বিবাদের মূল সেই বুদ্ধদন্ত আনিবার জন্য একজন অধীনস্থ করদ রাজাকে তথায় প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই রাজা ওড্রে আসিয়াই বুদ্ধদন্তের অব্যক্ত শক্তি প্রভাবে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। পরে তিনি এবং ওড্‌াধিপ—উভয়েই বুদ্ধদেবের দন্ত সহ ভারতাধিপতির নিকটে গিয়া উপনীত হন। ছত্রাধিপতি সেই দন্তকে তুচ্ছ মনুষ্যাস্থি বিবেচনা করিয়া তাহাকে প্রথমতঃ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজাজ্ঞায় দন্ত প্রজ্বলিত হুতাশন

মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল; কিন্তু অনল তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিল না, দন্ত অচিরেই একটী রমণীর কুসমাকারে অগ্নি শিখার মধ্য হইতে বহির্গত হইল। পরে রাজা ইহাকে নেহাইয়ের উপর রাখিয়া লৌহ মুদগর প্রহারে বিচূর্ণ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু কর্ম্মকার তাহাকে বিচূর্ণ করিতে পারিল না। ইহা নেহাই ভেদ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, এবং অবিলম্বে রজত ও স্বর্ণময় পত্র বিশোভিত বিকচ কমলাকার ধারণ করিয়া পৃথিবী মধ্য হইতে উত্থিত হইল। রাজা তখন দন্তটাকে পূতি গন্ধপূর্ণ নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। দন্ত নর্দ্দমায় নিক্ষিপ্ত হইলে নর্দ্দমা বিকচ কমলমালা শোভিত স্বচ্ছ-সলিল সরোবরের আকার ধারণ করিল। রাজা এই দন্তকে ধ্বংস করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের মন্ত্রণায় অন্যান্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন উপায়েই সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ঐ দন্তকে "তুচ্ছ মনুষ্যাস্থি" মনে না করিয়া তাহাকে পরমেশ্বরের অংশ বোধে পূজা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পর খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে পুনরায় ইতিহাসে উড়িষ্যা রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ সময়ে রাণী গুম্ফার দক্ষিণে প্রায় সপ্তদশ ক্রোশ দূরে দয়ানদীর তীরবর্ত্তী একটী পাহাড়ে কতকগুলি বৌদ্ধ অনুশাসন খোদিত হয়। এই সমস্ত অনুশাসন বাক্য মহারাজ অশোক শৈল গাত্রে খোদিত করাইয়াছেন। এই সমস্ত শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে কলিঙ্গ দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে একটী অতি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। তৎকালে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণকে সমুদ্রে পোত পরিচালন বিদ্যা ও জলপথে বাণিজ্য করা শিক্ষা করিতে হইত। তখন যবদ্বীপ ও পূর্ব্ব সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

জগন্নাথ দেবের মন্দিরে যে তালপত্রের মাদলা পঞ্জি নামক উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত উড়িষ্যার ইতিহাস গ্রন্থ আছে, তাহাতে ৩১০১ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে ১৮০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত একশত সাত জন হিন্দু রাজার নাম দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে ইহাঁদের প্রত্যেকের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়ার যথার্থ সময় প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—যুধিষ্ঠির কল্যব্দ এক শত আট হইতে একশত বিংশতি অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকাল দ্বাদশ বৎসর মাত্র। তদনন্তর পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, শঙ্করদেব, (ইনি স্থানীয় প্রথম রাজা), গোতমদেব, মহেন্দ্রদেব, ইষ্টদেব, সেবকদেব, বজ্রনাভদেব, নৃসিংহদেব, মনকৃষ্ণদেব, ভোজরাজ, বিক্রমাদিত্য ও শকাদিত্য এই ত্রয়োদশ জন নরপতি ১২০ কল্যব্দ হইতে তিন হাজার চারি শত চতুঃসপ্ততিতম অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা রাজ্যের উপর আধিপত্য করেন।

ইহাদের পর কর্ম্মজাতিদেব ১ শকাব্দ হইতে ৬৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হাটকেশ্বর, বীরভুবনদেব, নির্ম্মলদেব, ভীমদেব, চন্দ্রদেব ইহাঁরা ছয় জন ৬৫ শকাব্দ হইতে ২৫০ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর ২৫০

শক হইতে ৩৯৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত যবনগণ উড়িষ্যা রাজ্য ভোগ করে। অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি যযাতি কেশরী যবনগণকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষ রাজ্যভোগ করেন। ৩৯৬ শক্ হইতে ৪৪৮ শক্ পর্য্যন্ত যযাতি কেশরী রাজ্য করিয়াছিলেন। অনন্তর কেশরীবংশের সূর্য্যকেশরী, অনন্তকেশরী, অলাবুকেশরী, কনক, বীর, পদ্ম, বন্ধ, বট, গজকেশরী, বসন্ত, গন্ধর্ব্ব, জনমেজয়, ভরত, কলি, কমল, কুন্দল, চন্দ্র, বীরচন্দ্র, অমৃত, বিজয়, চণ্ডপাল, মধুসূদন, ধর্ম্ম, জনক, নৃপ, মকর, ত্রিপুর, মাধব, গোবিন্দ, নৃত্য, নৃসিংহ, কূর্ম্ম-কেশরী, মৎস্য-কেশরী, বরাহকেশরী, বামনকেশরী, পরশুকেশরী, চন্দ্র, সুজন, শালিনী, পুরঞ্জয়, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সুবর্ণকেশরী, এই ৪৩ জন রাজা ৪৪৮ শক্ হইতে ১০৫৪ শক্ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা রাজ্য ভোগ করেন। সুবর্ণ কেশরীর রাজত্ব অবসানে কিছুদিন পর্য্যন্ত এ দেশে কোন রাজা ছিল না। ইহা অরাজক অবস্থায় ছিল। তাহার পর গঙ্গাবংশীয় রাজগণ সিংহাসন অধিকার করেন। চোর-গঙ্গা এই বংশের প্রথম নরপতি। ইনি ১০৫৫ শক্ হইতে ১০৭৪ শক্ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর গঙ্গেশ্বর, একজটা কামদেব, মহাদেব, অনঙ্গ ভীমদেব, রাজরাজেশ্বর দেব, নাঙ্গুড়িয়া, নৃসিংহ, কেশরী নৃসিংহ, গতিকান্ত, কপিল নৃসিংহ, শঙ্খ, ভাস্থর নৃসিংহ, শঙ্খ বাসুদেব, বলি বাসুদেব, বীর বাসুদেব, কালি বাসুদেব, নেঙ্গটা আঁটা বাসুদেব, নেত্র বাসুদেব রাজত্ব করেন। পরে ১৩৭৪ শকে গঙ্গাবংশ লুপ্ত হয় ও কপিলবংশীয়গণের প্রথম রাজা কপিলেন্দ্র দেব, পুরুষোত্তম দেব, প্রতাপরুদ্র (ইঁনিই শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের শিষ্য হন) কানুয়াদেব, কথয়াকুয়াদেব, গোবিন্দ বিদ্যাধর, চন্দ্র প্রতাপ, নৃসিংহ, রঘুরাম ছোটরা, মুকুন্দদেব, গোড়িয়া গোবিন্দ—প্রভৃতি নরপতি ১৪৮৩ শক্ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনন্তর ১৯ বৎসর কাল উড়িষ্যা অরাজক অবস্থায় থাকে। পরে ১৫০২ শকে রামচন্দ্রদেব সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি ২৯ বৎসর রাজত্ব শাসন করিয়া দেহত্যাগ করেন। তাহার পর পুরুষোত্তম দেব, নৃসিংহদেব গঙ্গাধরদেব, বলভদ্র দেব, মুকুন্দ দেব দ্রব্যসিংহ দেব, কৃষ্ণদেব, গোপীনাথ, রামচন্দ্র, বীরকিশোর, দ্বিতীয় দ্রব্যসিংহদেব, মুকুন্দ দেব, রামচন্দ্র দেব ইহাঁরা ১৪ জন ১৭৮১ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দুর্ভেদ্য গিরি প্রাকার সুরক্ষিত ও দুরুত্তীর্ণ নদী নিচয় বেষ্টিত হইয়াও উড়িষ্যা বিজাতীয় দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। সময় সময় দেশীয় নরপতিগণকে শত্রু হস্তে নানা নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে। ভূপতি সেবক দেবের রাজত্ব সময়ে এক দল যবন আসিয়া পুরী আক্রমণ করে। পুনরায় ২৪৫ শকাব্দে যখন শোভনদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন ছিলেন তখন রক্তবাহু জলপথে আসিয়া পুরী অধিকার করে। কিছু দিন পরে রক্তবাহুর রণতরী ও সৈন্যগণ সকলেই সমুদ্র জলে নিমজ্জিত হয়। এই সময় হইতে বৌদ্ধ ও যবনগণ উড়িষ্যায় যৎপরোনাস্তি প্রতিপত্তি লাভ করে। এক

শত ষট্‌ চত্বারিংশ বৎসর যবনগণ এ দেশে রাজ্য করে। অনন্তর প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি যযাতি কেশরী যেন দৈব প্রেরিত হইয়া এই রাজ্যকে ম্লেচ্ছ হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত করেন।

৩৯৬ শকে (৪৭৪ খৃঃ অব্দে) রাজা যযাতি কেশরী ওড্রেশ্বর হইলেন। তাঁহার শাসন প্রভাবে যবন ও বৌদ্ধগণ ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। রাজা যযাতি এক জন পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি পুরীতে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি আনাইয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠাপিত করেন। ভুবনেশ্বরের অপূর্ব্ব মন্দির সকল তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য খৃঃ অব্দ ৫০০ সালে আরম্ভ হইয়া (১) ৬৫৭ খৃঃ অব্দে শেষ হয়। কেশরী বংশের রাজত্বাবসানে গঙ্গাবংশীয় ভুপতিগণ উৎকল রাজ্য ভোগ করেন। চোরগঙ্গা এই বংশের প্রথম রাজা। গঙ্গাবংশাবতংশ অনঙ্গভীমই পুরীর বর্ত্তমান জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করান। চতুর্দ্দশ বৎসরে ইহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। কনারকের অরুণ স্তম্ভও গঙ্গাবংশীয় সপ্তম রাজা নৃসিংহ দেব নির্ম্মাণ করান। গঙ্গাবংশীয় গণের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইলে কপিল নামে একজন সূর্য্যবংশীয় নরপতি উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। এই বংশীয় নরপতিগণ কপিল বংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। প্রথিত নামা চৈতন্য শিষ্য রাজা প্রতাপরুদ্র কপিলেরই একজন বংশধর।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উড়িষ্যাবাসীদিগকে পাঠানদিগের আক্রমণ নিবারিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হয়। ১২০৩খৃঃ অব্দে বখ্‌তীয়ার খিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপে আসিয়া আপতিত হইলে বঙ্গরাজ যবন ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রাভিমুখে পলায়ন করিলেন। এই ঘটনার নয় বৎসর পরেই (১২১২ খৃঃ অব্দে) হিসামুদ্দিন ডোজ্‌ গিয়াসুদ্দিন অতুল বিক্রমে সৈন্য সামন্ত লইয়া উড়িষ্যাভিমুখে অভিযান করে। কিন্তু হিন্দু সৈন্যগণের নির্ভীকতা ও রণ দক্ষতায় যবনগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। তাহার পর গৌরের পাতসাহা আজাউদ্দিন টোগান খাঁ স্বয়ং সৈন্য সমভিব্যাহারে উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে যান। তিনিও উড়িষ্যারাজের সৈন্যগণের হস্তে অত্যন্ত লাঞ্ছিত হন। হিন্দু সেনা প্রবল বিক্রমে যবন গণের অনুসরণ করে ও বাঙ্গালার মধ্য ভাগে আসিয়া উপনীত হয়। অনন্তর ওড্রাধিপতি আপন সৈন্যবল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ ভাগীরথীর তটভাগবর্ত্তী পথে সুসজ্জিত রাখিয়া পাতসাহার রাজধানী গৌর অক্রমণ করিলেন অপর ভাগ রাজপথ দিয়া বীরভূমে গিয়া আপতিত হইল।

---

(1) "Their founder began the lofty fane at Bhavaneswar about 500 A. D. two succeeding monarchs laboured on it and the fourth (Alabu Kesari) of the house completed it in A. D. 657. (Hunter)

এবার হিন্দু সৈন্যের হস্তে পাঠানগণকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। উড়িয়া সৈন্য গণ তখনকার প্রধান সহর নগর কোট (বীরভূম) লুঠ ও মুসলমান অধিবাসীগণকে নানা প্রকারে অপমানিত করে। উড়িষ্যাধিপতি সমরে বিজয় লাভ করিয়া যবন রাজের বহু ধন রত্ন ও দ্রব্যসম্ভার সহ মহা হর্ষে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। দশ বৎসর পরে আবার এক জন গৌরের শাসনকর্ত্তা উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে যায়, সেও পরাভূত ও লাঞ্ছিত হইয়া আসে। ভারতবর্ষের প্রায় অন্যান্য সকল স্থানই দুরন্ত যবন গণের পদবিমর্দ্দিত হইয়া শত্রুহস্তে কত নিগ্রহ ও কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে, কিন্তু উড়িষ্যা বহুদিন পর্য্যন্ত স্বীয় সৈন্য ও বিক্রান্ত নরপতিদিগের বলবীর্য্যে এবং স্বদেশের গিরি গহন ও নদ নদী প্রভৃতি দুরুত্তীর্ণ প্রাকৃতিক পরিখা প্রাকারের সাহায্যে স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিছু কাল পরে এদেশের কয়েকটী অবোধ রাজা পাঠান দিগের সহিত নানা ষড়যন্ত্রে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের পদে আপনারাই কুঠার আঘাত করে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উড়িষ্যা স্বদেশের দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী রাজ্যের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিল। মান্দ্রাজের উপকূলস্থিত যে ভূভাগ গোদাবরী পর্য্যন্ত বিলম্বিত আছে তাহা বহুকাল হইতে উড়িষ্যা রাজের অধিকার ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু এই জনপদের অধিবাসীগণ রাজ শাসনের সর্ব্বদাই অবমানানা করিত। এই প্রদেশের প্রজাদিগকে স্ববশে আনিবার জন্য উড়িষ্যাধিপতি দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্ত্তার সাহায্য গ্রহণ করেন। যবন সৈন্যের সহায়তায় তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল সত্য, উদ্ধৃত প্রজাগণ স্ববশে আসিল; কিন্তু যবনগণের কুচক্রে ক্রমে ক্রমে হিন্দুবংশীয় নরপালগণের প্রভুত্বের ভিত্তি শিথিল হইতে লাগিল। ১৫১০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার ইতিহাসে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয় নিম্নে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহা প্রকাশিত হইল। এই ঘটনা চক্র নিচয়ের আবর্ত্তনে কাল ক্রমে উড়িষ্যার শাসন দণ্ড হিন্দুরাজগণের হস্তস্খলিত হইয়া বিদেশীয় গণের হস্তগত হয়।

দাক্ষিণাত্যের যবন রাজা কুলি কুতুব সাহার সহিত ১৫২০ খৃঃ অব্দে তেলিঙ্গানার অধিবাসী গণের কন্দাপিলিতে এক মহাযুদ্ধ হয়। যবন রাজা কুতুব সেই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া তেলিঙ্গানা অধিকার করেন।

১৫৬৭।৬৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা বেহারের অধীশ্বর সুলেমান করাণি উড়িষ্যা জয় করেন। তাঁহার সহিত হিন্দুগণের জাজপুরে যে তুমুল যুদ্ধ হয়, সেই মহাযুদ্ধে উড়িষ্যার শেষ হিন্দু রাজা মুকুন্দ দেব নিহত হন। এই সময়েই কালাপাহাড় পুরী এবং তন্নগরস্থিত জগন্নাথদেবের মন্দির লুণ্ঠন করে।

এই ঘটনার তিনবৎসর পরে গোলকুণ্ডার মুসলমান রাজা ইব্রাহিম কুতুব সাহার প্রধান সেনাপতি মাণিক নায়েব আসিয়া রাজমাহেন্দ্রি আক্রমণ ও অধিকার করে। অনন্তর ১৫৭২ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত বঙ্গাধিপ সুলেমান করানির মৃত্যু হয় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দাউদ বাঙ্গালার

সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া খাঁ জাহান আফগানকে উড়িষ্যার (গবর্ণর) শাসন কর্ত্তৃত্বে এবং কতলু খাঁ লোহানিকে পুরীর গবর্ণরের পদে নিয়োজিত করেন। অনন্তর দুই বৎসর পরে বঙ্গেশ্বর দাউদ সম্রাট আকবরের অত্যন্ত বিরাগ ভাজন হন। সম্রাট সসৈন্যে আসিয়া বেহার অধিকার করেন। দাউদ প্রাণভয়ে পলাইয়া উড়িষ্যায় লুকায়। অনন্তর সম্রাটের দুইজন প্রধান সেনাপতি রাজা টোডার মল ও মনিম খাঁ মোগল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন এবং দাউদ খাঁ স্বয়ং পাঠান সৈন্যের সৈনাপত্য গ্রহণ করেন। পাঠান বল এক বারে বিধ্বস্ত হয়, দাউদের সৈন্য মোগলদিগের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। অনন্তর মোগল সেনাপতি মনিম খাঁ মহোৎসাহে বিজয়ী সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া কটকে উপনীত হন। দাউদ খাঁ বাঙ্গালা ও বেহারের প্রভুত্ব মোগল হস্তে সমর্পণ করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করে। মোগল সেনাপতি দাউদকে উড়িষ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা বিজেতা মনিমের মৃত্যু হয়। দাউদ সুযোগ পাইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ ও অধিকার করেন। মনিমের মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া সম্রাট আকবর হুসেন কুলি খাঁ জাহানকে বাঙ্গালা বেহারের গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করেন। হুসেন কুলি আসিয়া ১৫৬৭ খৃঃ অব্দের ১২ জুলাই তারিখে রাজমহলের যুদ্ধে পাঠান সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করিয়া তাহাদের প্রভু দাউদ খাঁর প্রাণবধ করে। হুসেন কুলির মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে আর একবার পাঠানগণ বিদ্রোহী হয়। পাঠান সৈন্য পুনরায় হুগলির সন্নিহিত একটি স্থানে মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হয় ও উড়িষ্যায় পলায়ন করে। সম্রাট উড়িষ্যাকে খাস করিয়া লইবার আদেশ প্রদান করেন। ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে হুসেন কুলীর মৃত্যু হয়। মজফার খাঁ তৎপদে অভিষিক্ত হন এবং মাসুম খাঁ কাবুলিকে সম্রাট উড়িষ্যার গবর্ণর নিযুক্ত করেন। মাসুম খাঁ গবর্ণর হইয়া আসিয়াই সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যায় ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত করিয়া তুলে। দুরাত্মা মাসুমের ষড়যন্ত্রে বিদ্রোহীগণ বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা মজফর খাঁর প্রাণবধ করিল এবং উড়িষ্যা হইতে সম্রাটের সমস্ত লোককে বিতাড়িত করিয়া দিল। পরে ঘোড়া ঘাটের পাঠান গণ উড়িষ্যার পাঠান গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া বেহার অধিকার করে। অনন্তর কতলু খাঁ সম্রাটের অনভিমতে উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে অধিরুঢ় হয়। সম্রাট আকবর এই সংবাদে ক্রোধান্ধ হইয়া সপ্তগ্রামের শাসন কর্ত্তা মির্জ্জা নাজ্জাতকে সসৈন্যে কতলুখাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বলেন। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের নিকট সেলিমাবাদে কতলু খাঁর সৈন্যের সহিত মির্জ্জা নাজ্জাতের সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কিন্তু মোগল সৈন্য পরাভূত ও লাঞ্ছিত হয়। বিজয়ী কতলু খাঁ দামোদর নদের তটভাগবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল। অনন্তর সম্রাট আকবর কোকা খাঁকে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইহাঁর পুরা নাম মির্জ্জা আজিজ কোকা খাঁ ই আজম। ইনি আসিয়া ১৫৮২ খৃঃ অব্দে বেহার এবং বাঙ্গালায়

পশ্চিমাংশ পুনরধিকার করেন ও কত্‌লু খাঁকে দমন করিবার জন্য কয়েক জন প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইয়া দেন। এই সকল সৈন্যাধ্যক্ষ গণ সসৈন্যে উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করে বটে কিন্তু এবার যুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত কতলু খাঁর কোনই অনিষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। পরে ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের দক্ষিণে মোগল মারীর নিকট দামোদর তীরে পাঠান কতলু খাঁর সহিত দুইজন মোগল সৈন্যাধ্যক্ষের (সাদিক্ খাঁ ও সাকুলি মহরমের) ভয়ানক যুদ্ধ হয়। কতলু পরাভূত হয়। এই বৎসর দুবাত্মা কালাপাহাড়ের মৃত্যু হয়। কতলু খাঁ ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। এই সন্ধিতে কতলুকে উড়িষ্যা রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। সম্রাট আকবর এই সন্ধি বন্ধনে স্বীকৃত না হইয়া ১৫৯০ খৃঃ অব্দে রাজা মান সিংহকে বাঙ্গালা ও বেহারের শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। মানসিংহ মান্দারানে আসিয়া ছাঁউনি করিয়া থাকেন, এবং উড়িষ্যা আক্রমণ জন্য স্বীয় পুত্র জগৎ সিংহের সৈনাপত্যে কতক গুলি সৈন্য প্রেরণ করেন। ধারপুরের যুদ্ধে কতলু খাঁ মোগলদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং জগৎ সিংহকে বন্দি করিয়া লইয়া যান। অতঃপর কতলু খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহার প্রধান মন্ত্রি ইশা রাজা মানসিংহের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন এবং জগৎ সিংহকে কারামুক্ত করেন এবং পুরী জেলা মোগল সম্রাটকে দেন। ১৫৯০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৯২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইশা উড়িষ্যা শাসন সংরক্ষণ করেন।

১৫৯২ খৃঃ অব্দে ইশার মৃত্যু হইলে কতলু খাঁর দুইপুত্রই খোউজা সোলেমান ও খোউজাওসমান উড়িষ্যায় আধিপত্য করেন। তাঁহারা সন্ধি অবহেলা করিয়া পুরী আক্রমণ করিলেন। এবার রাজা মানসিংহ স্বয়ং আসিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং বাণাপুরে মোগল পাঠানে অতি ভয়ানক যুদ্ধ হয়। মানসিংহ পাঠান সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যুদ্ধে বিজয় লাভ করিলেন পরে জলেশ্বর, কটক ও আল দুর্গ লুণ্ঠণ করেন। আর একবার স্বর্ণ গড়ে পাঠানগণ মোগল দিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয়—এই তাহাদের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাস্ত ও হতশ্রী হইয়া কতলু খাঁর দুইটী পুত্র দিল্লীশ্বরের দাসত্ব স্বীকার করে। উড়িষ্যা এই বৎসর হইতে (১৫৯২ খৃঃঅব্দে) সম্রাটের খাস রাজত্ব হয়। রাজা মান সিংহ বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। উড়িষ্যার তদানীন্তন হিন্দু রাজা রাম চন্দ্র দেব ও তাঁহার দুই পুত্র মোগল সম্রাটের দরবারের প্রধান আমীর বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

১৫৯৮ খৃঃ অব্দে মানসিংহকে সম্রাটের কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য বাঙ্গালা ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়। তিনি স্বীয় পুত্র জগৎ সিংহকে বাঙ্গলার শাসন ভার দিয়া যান। এই সময় উড়িষ্যার পাঠানগণ সুযোগ বুঝিয়া ওসমানের সৈনাপত্যে পুনরায় বিদ্রোহী হয় এবং ভদ্রকের যুদ্ধে মান সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র মহাসিংহকে পরাস্ত করে।

বিদ্রোহীগণ পুনরায় উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার দক্ষিণ অংশ অধিকার করে পর বৎসর আবার মানসিংহ আসিয়া দেবপুরের যুদ্ধে ওসমানকে পরাভূত করিয়া বিষ্ণুপুরের সন্নিকট মহেশপুর পর্য্যন্ত তাঁহাকে তাড়াইয়া লইয়া যান। দক্ষিণ অংশ ভিন্ন উড়িষ্যার অন্যান্য সমস্ত প্রদেশই পুনরায় মোগল সম্রাটের করতলগত হইল।

১৬০৫ খৃঃ অব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর জাঁহাঁগীর দিল্লির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি মানসিংহকেই বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মানসিংহ ১৬০৭ খৃঃ অব্দে দিল্লি গমন করিলেন। জাঁহাঁগীরের পোষ্য ভ্রাতা কুতবুদ্দিন তাঁহার পদে নিয়োজিত হয়। কুতব বাঙ্গালায় আসিয়া পদার্পণ করিলে জগদ্বিখ্যাতা সুন্দরী নুরজেহাঁর স্বামী সের খাঁ বর্দ্ধমানে তাঁহার প্রাণ বধ করে।

এই দুর্ঘটনার জন্য বেহারের তদানীন্তন শাসন কর্ত্তা জাঁহাগীর কুলী খাঁকে বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যার ও শাসন কর্ত্তার কার্য্য করিতে হয়।

১৬০৭ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র গবর্ণর রাখার নিয়ম হয়। হাসীম খাঁ এদেশের প্রথম গবর্ণর। তিনি কাশ্মীরে বদলি হইয়া গেলে রাজা কল্যাণ মল তৎপদে অভিষিক্ত হন। এই সময় (১৬১১ খৃঃ অব্দে) ওসমান আবার এক বার স্বদল বলে স্বাধীনতা লাভের জন্য মোগল দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; কিন্তু সুবর্ণরেখার তীরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সুজাত খাঁ তাহার প্রাণ বিনষ্ট করে এবং পাঠান সৈন্য দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। এখন খুড়দা ও রাজমাহেন্দ্রী ভিন্ন আর সমস্ত উড়িষ্যাই সম্রাটের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য ভুক্ত হইল। মেঘারাম খাঁ এদেশের গবর্ণরের পদে অভিসিক্ত হইয়া ১৬১৮ খৃঃ অব্দে খুড়দার রাজার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তাঁহার রাজ্যও মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লন। এখন কেবল রাজমাহেন্দ্রীই স্বাধীন থাকে। এই যুদ্ধের পর মোগল পাঠানে অন্য কোন যুদ্ধ হয় নাই। ইহার পর ১৭৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ষ্টারলিং ও ইষ্টুয়ার্ট সাহেব মহোদয় দ্বয় ১৬২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্তের নিম্ন লিখিত ঘটনা গুলি তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন।

১৬২১ খৃঃ অব্দে দিল্লির সম্রাট জাঁহাঁগীরের পুত্র সাজাহাঁ বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যাভিমুখে অভিযান করেন। তথাকার ডেপুটি গবর্ণর আহম্মদ বেগ সাজাহাঁর সৈন্যগণকে অপসারিত করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বণ করিবেন ভাবিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার কোন উপায়ই ফলপ্রদ হয় নাই; পাতসাহাপুত্র সমস্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া অবিলম্বে উড়িষ্যা অধিকার করিলেন। পাঠান গণ অনেকে তাঁহার সৈন্য শ্রেণি ভুক্ত হইয়াছিল। তিনি পাঠান সরদারগণের এবং তাহাদের সৈন্য সামন্তের সাহায্যে অচিরেই বর্দ্ধমানে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং ঐ নগর হস্তগত করিলেন। কয়েক বৎসর পরে ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে জাঁহাঁগীর পাতসাহার মৃত্যু হইলে সাজাহাঁ ভারত সাম্রাজ্যের

এক ছত্রাধিপতি হইলেন এবং ইংরেজ গণকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার জন্য সনন্দ প্রদান করিলেন। তদানীন্তন গবর্ণর আজিম খাঁ কিন্তু বালেশ্বরের নিকট পিপলি ভিন্ন অন্য কোন বন্দরে ইংরেজদিগের জাহাজ আসিতে দিতেন না। সুতরাং ইংরেজ-গণ প্রথম প্রথম পিপলিতেই একটি সুদৃঢ় কুঠি সংস্থাপিত করিল। একদা পাৎ-সাহা সাজাহাঁর একটী অতি প্রিয়তমা কন্যার বসনে আগুণ লাগিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়। ইংরেজ সার্জ্জন গেব্রেল বোউটন ঐ কন্যাকে আরাম করেন। বোউটনকে সম্রাট অতি সন্তোষজনক রূপে পুরস্কৃত করিতে চাহেন; কিন্তু বোউটন পাতসাহা সমীপে অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না কেবল বলেন "দিল্লীশ্বর যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমাকে পুরস্কৃত করা যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয় তবে আমার জাতি ভাই দিগকে বিনা শুল্‌কে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা" দেশে বানিজ্য করিবার আজ্ঞা প্রাদান করুণ ইহা ভিন্ন আমার আর অন্য কোন প্রার্থনা নাই। পাতসাহা এই মহাস্বজাতি বৎসল সার্জ্জনের প্রার্থনা পুরণ করিলেন। ১৬৪০ খৃঃ অব্দে ডাক্তার বোউটন তদানীন্তন বাঙ্গলার গবর্ণর সাসুজার কোন এক অন্তঃপুর মহিলার পীড়া আরাম করিয়া স্বজাতীয় গণের বালেশ্বর এবং হুগ-লিতে কুঠি সংস্থাপিত করার অনুমতি লন। এ অনুমতিও বোটনেরে পুরস্কার স্বরূপে প্রদত্ত হয়।

১৬৮৫ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাটের কার্য্যকারক গণের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নির লোকদের বিরোধ উপস্থিত হয়। বালেশ্বরের গবর্ণর ইংরেজ কোম্পানির কুঠি বিনষ্ট করিতে উদ্যত হন এবং দুইজন ইংরেজকে কারারুদ্ধ করেন। এই ঘটনায় ক্যাপটেন হীথ রাগান্ধ হইয়া বালেশ্বর নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠণ করেন।

১৬৯৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। শুভা সিংহ নামক এক জন বর্দ্ধমানের জমীদার এই বিদ্রোহের নায়ক। সে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালায় মহা উৎপাত আরম্ভ করে পরে রহিম খাঁ নামক এক জন পাঠান সেনাপতি উড়িষ্যা হইতে সসৈন্যে আসিয়া শুভার সহিত যোগ দেয়। ইহারা কিছুকাল বাঙ্গালায় আধিপত্য করে কিন্তু সম্রাটের সৈন্যগণ আসিলে ইহাদের হস্ত হইতে বাঙ্গালার শাসন দণ্ড স্খলিত হয়। স্বর্গীয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতপ সিংহ হণ্টার সাহেব মহোদয়কে এই সময়কার এই গল্পটী বলেন। বিদ্রোহী শুভা সিংহ পাঠান সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বর্দ্ধমান আক্রমণ করিল। নগর বাহিরে তদানীন্তন বর্দ্ধমানরাজ সসৈন্যে বিদ্রোহীদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বীয় সুতীক্ষ্ণ কৃপাণাঘাতে বহু শত্রুসৈন্য সংহার করিয়া সমর ক্ষেত্রেই দেহত্যাগ করেন। অতঃপর বিদ্রোহীগণ মহা আস্ফালন করিয়া নগরে প্রবেশ করে ও রাজ বাড়ী লুঠ করিতে যায়। রাজ অন্তপুরের মহিলাগণ বিদ্রোহী হস্তস্পর্শে স্ব স্ব দেহ কলুষিত হইতে দেওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া আগেই সকলে হলাহল পান করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন কেবল একটী

মাত্র রমণী জীবিতা ছিলেন, বিষপানে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। সেই ললনার অলোক সামান্য রূপে বিদ্রোহী সেনাপতি শুভা সিংহ মুগ্ধ হইয়া অনেক বিনয় নম্র বচনে তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করেন কিন্তু রমণী তাহাতে সম্মতা হইলেন না। সেনাপতি যখন, বল প্রয়োগে অভীষ্ট সিদ্ধ করার মনস্থ করিল, তখন সেই দুরাত্মার নৃশংস ব্যবহারে ক্রোধান্ধা হইয়া রমণী নিজ কোটি বন্ধ হইতে এক খানি তীক্ষ্ণধার ছুরীকা বাহির করিয়া সযোড়ে তাহার বক্ষে আঘাত করেন শুভা সেই আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সেই বীর রমণী সেই ছুরীকা নিজ বক্ষে বসাইয়া দেন ও মর্ত্ত্য লীলা সাঙ্গ করেন। উল্লিখিত বীর নারীগণের এই জহর ব্রতের কথা সকলের স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখিবার জন্য বর্দ্ধমানাধিপতি অদ্যাপিও (১) বসন্ত কালে রাজ বাটীতে একটী পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

শুভা সিংহের মৃত্যুর পর উড়িষ্যা হইতে রহিম খাঁ নামক যে সেনাপতি বহু পাঠান সৈন্য লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিল সে কিছু কাল বাঙ্গালার উপর একাধিপত্য করে। এই দুর্ব্বৃত্তের দৌরাত্ম্যে দেশ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হয়। পরে সম্রাটের সৈন্যগণ আসিয়া সমস্ত উপদ্রব প্রশমিত করে।

১৭০৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর মুরশিদ কুলিখাঁর জামতা সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁকে উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করেন। ভূপতি রায় ও কিশোর রায় নামক দুই জন ব্রাহ্মণ তাঁহার কার্য্য সচিব নিযুক্ত হয়। এই সময়ে মেদিনীপুর বাঙ্গলার সামীল হয়; ইহা পূর্ব্বে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

"At the siege of the capital of Bardwan District, when all hope of relief had departed, the ladies of the Hindu Raja's family resolved with one consent to prefer death to the mercies of a rebel. The Raja himself, whose descendant of the sixth generation now enjoys the principality as one of the great subjects of the British crown, had fallen in battle out side the walls. While the rebels poured into the city, the whole ladies of the palace took poison and the conquerors broke into their apartments only to find them dead. On one, however, the poison had not acted, and she was reserved for the rebel chief. But no arts could persuade the noble Hindu girl to receive such a lover. The enraged rebel at last substituted force for entreaty on which the Princess drew a knife from her clothes, stabbed the ruffian to the heart, and then plunged it in her own. The Bardwan Maharajas still commemorate these heroic ladies by a graceful domestic ritual each succeeding spring." I obtained this account in conversations with His Highness the present Maharaja."

১৭২৫ খৃঃ অব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় মুরশিদ কুলির উপপত্নীর গর্ভজাত এক পুত্র মহম্মদ তকি খাঁ উড়িষ্যায় ডেপুটি গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার শাসন সময়ে তমলুক ও মেদিনীপুরের মধ্য সীমাস্থিত জনপদ যাহা সরকার জলেশ্বর নামে অভিহিত হইত তাহা উড়িষ্যা হইতে খারিজ হইয়া বাঙ্গলা প্রদেশের সামীল হয়। দক্ষিণে হাইদ্রাবাদের নিজাম টিকালী রঘুনাথপুর ও চিলকা হ্রদ অধিকার করে। এই দুইটীই খুড়দার হিন্দু রাজা, রাম চন্দ্র দেবের সম্পত্তি। রাজা নিজামের এই অন্যায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন কিন্তু কিছুই ফল হয় না। অবশেষে যবন হস্তে তাঁহাকে বন্দী হইতে হয়। এই সময় যবন গণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া জগন্নাথের পাণ্ডাগণ ঠাকুর লইয়া চিল্‌কা পার হইয়া পলায়ন করে। এই ঘটনার নয় বৎসর পরে (১৭৩৪ খৃঃ অব্দে) মহম্মদ তকির মৃত্যু হইলে সুজাউদ্দিনের জামাতা মুরশীদ কুলী উড়িষ্যার শাসন ভার প্রাপ্ত হন। তিনি পাণ্ডাগণকে নানা রূপে বুঝাইয়া জগন্নাথ দেবকে পুনরায় মন্দিরে আনয়ন করান। বিগ্রহের অনুপস্থিতি সময়ে উড়িষ্যার আয় অতীব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তজ্জন্যই বিধর্ম্মী যবনের পুরীতে বিগ্রহ আনাইবার জন্য এত মিনতি। এই সুজাউদ্দিনের আমলে বাঙ্গালা দেশে এক টাকায় আট মোণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল (১)। সুজার মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর নিযুক্ত হয়।

১৭৪০ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ সরফরাজ খাঁকে সম্মুখ সমরে পরাভূত ও নিহত করিয়া বাহুবলে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার গবর্ণরের পদ অধিকার করিল। আলি বর্দ্দি মুরশিদ কুলিকে উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলে; সে তাহার কথায় কর্ণ পাত করে না। অনন্তর দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া আলি বর্দ্দি উড়িষ্যাভিমুখে অভিযান করেন। তথায় বালেশ্বরের উত্তরে মুরশিদ কুলির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। মুরশিদ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পোতারোহণে মসলিপত্তনাভিমুখে পলায়ন করে। আলি বর্দ্দি কটকে গিয়া স্বীয় সেনাপতি সৈয়দ আহম্মদকে উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তৃত্বে অভিষিক্ত করেন। সৈয়দ আহম্মদের কুশাসনে উড়িষ্যার অধিবাসীগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। তাহারা অবিলম্বে সৈয়দকে তাহার নিজ বাস ভবনেই বন্দী করিয়া রাখে। অনন্তর বাখির্ খাঁ নামক জনৈক পাঠান উড়িষ্যার শাসন ভার গ্রহণ করে। আলিবর্দ্দি পুনরায় উড়িষ্যায় আসিয়া যুদ্ধে বাখিরকে পরাস্তকরেন ও মহম্মদ মাসুমকে উড়িষ্যার শাসন ভার অর্পণ করিয়া যান।

১৭৪১ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া মেদিনীপুরে কিছুদিন থাকেন, তথায় শুনিতে পান যে উড়িষ্যার পথ দিয়া আসিয়া মারহাট্টাগণ বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধমানাভিমুখে চলিয়া যান এবং কয়েকটী যুদ্ধে মারহাট্টা গণকে পরাস্ত

(1) "Excessive cheapness of food; rice selling at 320 lbs for Shilling in Bengal" Hunter's Orissa.

করেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াও মারহাট্টাগণ বাঙ্গালা হইতে অপসারিত হয় না। তাহাদের অধিনায়ক ভাস্কর পণ্ডিত প্রকাশ করে যে, নবাব আলিবর্দ্দি যদি তাহার সমস্ত হস্তীগুলি এবং নগদ এক কোটি টাকা আমাদিগকে দেয় তবে আমরা এ দেশ হইতে যাই। আলিবর্দ্দি ভাস্করের এ কথাগুলিকে উন্মত্ত প্রলাপ জ্ঞান করিয়া তাহাতে কর্ণপাত করে না। অনন্তর মারহাট্টাগন বাঙ্গালার অনেক স্থানে অনেক প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল।

এক দল মারহাট্টা গিয়া উড়িষ্যা আক্রমণ ও তথাকার গবর্ণরের প্রাণ সংহার করে। এই সংবাদে নবাব আবদুল, রসুল খাঁকে গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠান। নূতন গবর্ণর আসিয়া মারহাট্টাগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

১৭৪৫ খৃঃ অব্দে রঘুজি ভোঁস্‌লা বাঙ্গালা আক্রমণ ও উড়িষ্যার নবাবের প্রাধান্য ধ্বংস করে এবং মীর হবীবের হস্তে উড়িষ্যার সংরক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া স্বীয় রাজধানী নাগপুরে চলিয়া যায়। অতঃপর ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দি মারহাট্টা ও পাঠানদিগকে কটক হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য মীরজাফরকে নিযুক্ত করে, মীরজাফার কার্য্যোদ্ধারে অক্ষম হওয়ায় আতাউল্লা খাঁকে ঐ গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করে। আতাউল্লা বর্দ্ধমানের সন্নিহিত একটী স্থানে মারহাট্টাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। অনন্তর আলিবর্দ্দি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনেকগুলি যুদ্ধে মারহাট্টাদিগকে পরাভূত করিয়া দেন। এই সময় বেহারের পাঠানগণ বিদ্রোহী হইয়া মারহাট্টাদিগের সহিত মিলিত হয়, কিন্তু নবাবের বিপুল বিক্রমে তাহারা সকলেই পরাভূত হইয়া যায়।

১৭৫০ খৃঃ অব্দে রঘুজি ভোঁসলার পুত্র জানোজি মীর হবীবকে কটক সংরক্ষণের জন্য রাখিয়া নাগপুরে প্রত্যাগমন করেন। এই বার্ত্তা অবগত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দি সসৈন্যে কটকাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার আশা ছিল, এবার মারহাট্টাদিগকে উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিবেন; কিন্তু তাহাদিগকে তিনি আদৌ রীতিমত সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইতে পারিলেন না। অবশেষে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া আলিবর্দ্দি এবার একরকম মারহাট্টা হস্তে উড়িষ্যা সমর্পণ করিয়া এবং বাঙ্গালার জন্য তাহাদিগকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌত দিতে স্বীকৃত হইয়া আসেন। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দি মারহাট্টাদিগের সহিত (১) যেরূপ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন ষ্টিউয়ার্ট সাহেব তাহার যে সার সংগ্রহ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। মারহাট্টা সহচর মীর হবীব উড়িষ্যার

(1.) The abstract of the Treaty, as given by Major Stewart runs thus——

(a) That Mir Habib (an Orissa ally of the Marhattas) should be considered as the deputy of the Nawab; that he should receive orders to appropriate the revenues of Orrissa to the payment of the arrears due to the troops of Raja Raghuji Bhonsla; and that over and

নবাবের কার্য্য সচিব-রূপে থাকিবেন। তাঁহার প্রতি এই রূপ আদেশ থাকিবে যে, তিনি উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় করিয়া তন্মধ্য হইতে রাজা রঘুজি ভোঁসলার সৈন্যদিগের বাকী বেতন দিতে পারিবেন, ইহা ভিন্ন রাজার কর্ম্মচারীকে ঐ খাজনার তহবীল হইতে প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ টাকা এই সর্ত্তে দিবেন যে, মারহাট্টাগণ যেন বাঙ্গালার নবাবের রাজ্য মধ্যে পদার্পণ না করে।

(খ) বালেশ্বরের নিচে দিয়া যে সুবর্ণরেখা প্রবাহিত হইতেছে তাহাই উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা এই উভয় দেশের সীমা রেখা বলিয়া পরিগণিত হইবে। মারহাট্টাগণ এই নদী পার হইতে অথবা ইহার জলে পদার্পণ করিতে পারিবে না।

১৭৫১ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০২ সাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় মারহাট্টা প্রভুত্ব বিদ্যমান ছিল কিন্তু ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ সেনানায়ক লর্ড ওয়েলেস্‌লি উড়িষ্যা হইতে মারহাট্টা প্রাধান্যের মূল উৎপাটিত করেন।

পুরী, বালেশ্বর এবং কটক উড়িষ্যায় এই তিনটী বড় জেলা। ইহা ভিন্ন ১৯টী করদ রাজ্য আছে। আঙ্গুল, আথগড়, আথমালিক, বাঙ্কি, বরম্বা, বোদ, দশপাল, ঢেন, কানাল, হিন্দোল, কেওঞ্জোর, খণ্ডপাড়া, ময়ূরভঞ্জ, নরসিংহপুর, নীলগিরি, নয়াগড়, পাললাহাড়া রণপুর, তালচের এবং তিগাড়িয়া উড়িষ্যার এই উনবিংশটী করদ রাজ্য।

উড়িষ্যায় অনেকগুলি নদী আছে। তন্মধ্যে কুশভদ্রা, প্রাচী, ভার্গবী, নূন ও দয়া নদী পুরী জেলায় প্রবাহিত। বালেশ্বরে সুবর্ণরেখা, বুড়াবলাঙ, জামীরা, বংশ ভৈরঙ্গি, কংসবংশ, বৈতরণি, মাতাই, গামাই। কটকে মহানদী, কাটজুড়ি, বৈতরণি, ব্রাহ্মণী, বিরূপা, গেঙ্গুতি, বড় দেবী, ছোট দেবী, পৈকা চিত্রলা ও অলঙ্কা। করদ মহালে সপুয়া, দণ্ডতপা, মানো, কুসুমি, কাটৈ, জোড়াম্ব, হীনমন্দা, গঙ্কুনী, বোলাৎ, শঙ্খীবাগ, মারিণী এবং তেল। মহানদী, বৈতরণি ও ব্রাহ্মণীও করদ মহাল বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

উড়িষ্যার করদ মহালে পঞ্চদশটী পর্ব্বত আছে। মলয়-গিরি পাল লাহাড়া রাজ্য মধ্যে অবস্থিত, এই পর্ব্বত ৩৪৭৯ ফিট উচ্চ। মেঘাসনি মৌরভঞ্জের মধ্যে, উচ্চ

---

above the said assignment, the sum of twelve lakhs of rupees should be paid to the said Raja's agents yearly, on condition that the Marhattas should not again set foot in His Highness the Bengal Governor's territories.

(b) That the river Subarnorekha, which runs by Balasar, should be considered as the boundary between the two dominions; and that the Marhattas should never cross that river, nor even set foot in its waters.

৩৮২৪ ফিট। গন্ধমাদন পর্ব্বত কেওঞ্জর রাজ্যের মধ্যে, উচ্চ ৩৪৭৯ ফিট। ঠাকুরাণী পর্ব্বত কেওঞ্জরে, উচ্চ ৩০০৩ ফিট। তোমাক্ কিউঞ্জরের ও শুকিন্দার সীমা রেখায় অবস্থিত, ২৫৭৭ ফিট উচ্চ। গোয়াল দেব দশপালার মধ্যস্থিত পর্ব্বত, উচ্চ ২২৪৬ ফিট। শুলিয়া নয়াগড়ের মধ্যে, উচ্চ ২২৩৯ ফিট। কপিলা পর্ব্বতের শিখর দেশে কপিলের মন্দির আছে। ইহা আথগড় ও ঢেনকানালের সীমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে বৃহৎ মেলা হয়। এই পর্ব্বতের উপরে সুবিস্তৃত সমতল ভূমি আছে। এখানে গ্রীষ্মকালে বড়ই আরামে থাকা যায়। বোদে বাঙ্কোমণ্ডি নামে একটি পর্ব্বত আছে, সেটী ২০৮০ ফিট উচ্চ। নরসিংহপুর ও হিন্দোলের মধ্যে কণক-শৃঙ্গ নামক ২০৩৮ ফিট উচ্চ একটী পর্ব্বত আছে। বাঘমারী পর্ব্বত ময়ূরভঞ্জ ও সিংহভূমের সীমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। টাঙ্গারী পাহাড় আঙ্গুলে, উচ্চ ১৯৫২ ফিট। খণ্ড পাড়ার সাপুয়ামণ্ডি পাহাড় উচ্চ; ১৭৯৯ ফিট।

উড়িষ্যায় চিল্কা ও সর নামক দুইটী প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। ভার্গবী নদীর জল চতুঃসীমাবদ্ধ হইয়া সর হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। উড়িষ্যার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে চিল্কা হ্রদ। এই হ্রদের আকার বরষা ফলকের ন্যায়। দুই শত গজ প্রশস্ত এক খণ্ড সুদীর্ঘ বালুকাময় ভূমি ভারত মহাসাগর ও চিল্কা হ্রদের ব্যবধান ভূমিরূপে বিলম্বিত আছে। এই সুবৃহৎ হ্রদের পশ্চিম দিক্ অত্যুচ্চ গিরি-প্রাকার বেষ্ঠিত। দক্ষিণে অনুচ্চ বালুকাময় পাহাড় শ্রেণী এবং ইহার উত্তর দিক জঙ্গল পূর্ণ নূতন দ্বীপ-পুঞ্জে ও অসংখ্য খাল-বিলে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে এই হ্রদের পরিমাণ ফল ৪৫০ বর্গ মাইল হয়, অন্যান্য ঋতুতে আয়তন সার্দ্ধ তিন শত বর্গ মাইল হইয়া থাকে। একটী নাতি প্রশস্ত খাঁড়ি চিল্কা হ্রদকে মহাসমুদ্রের সহিত সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে। এই হ্রদ ৪০ মাইল দীর্ঘ। ইহার উত্তর দিক ২০ মাইল প্রসস্ত এবং দক্ষিণ দিকের বিস্তার গড়ে ৫ মাইল।

উড়িষ্যা ডিভিজনে কটক, পুরী, বালেশ্বর এই তিনটী জেলা এবং আঙ্গুল ও খণ্ডমহল প্রভৃতি করদ রাজ্য। উল্লিখিত তিনটী জেলায় ও করদ রাজ্যে পাঁচটী সহর ও আঠার হাজার এক শত আটাত্তর খানি গ্রাম আছে। পুরী, কটক ও বালেশ্বর এই তিন জেলার অধিবাসীর সংখ্যা ১৮৯১ খৃঃ অব্দের সেন্‌সস্ রিপোর্ট অনুসারে বার লক্ষ, ছয় হাজার, তিন শত চৌরানব্বই। ইহার মধ্যে দশ লক্ষ, সপ্তাশী হাজার, একচল্লিশ জন হিন্দু, এক লক্ষ, সাতচল্লিশ হাজার, সাতষট্টি জন মুশলমান; আটাইশ হাজার, ছাব্বিশ জন খৃষ্টান, বৌদ্ধ তিন জন, একচল্লিশ জন জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী যোল জন।

করদ রাজ্যে মোট অধিবাসীর সংখ্যা একলক্ষ ছয় হাজার পাঁচ শত বেয়াল্লিশ জন; তন্মধ্যে হিন্দু, এক লক্ষ, দুই হাজার, ছয় শত দশ, মুশলমান তিন হাজার,সাত শত আটচল্লিশ, খৃষ্টান সাতষট্টি জন, বৌদ্ধ দুই জন, জৈন এক শত দশ জন, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী পাঁচ জন।

ওনাও—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষৌ বিভাগের একটী জেলা। ইহার পরিমাণ ফল ১,৭৪৭ বর্গ মাইল। এই সুবিস্তীর্ণ পললময় সমতল ক্ষেত্র গঙ্গা দ্বারা বিধৌত।

এই জেলার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের আদম সুমার পাঠে জানা যায়, এই জেলার প্রধান নগর ওণাওয়ে ১২,৮৩১ লোকের বাস। ইহার মধ্যে ৬,৩৪৫ হিন্দু, ৫,৫৫১ মুসলমান, শিক ২০ জন।

ইতিহাস—ইহা সূর্য্যবংশাবতংশ মহারাজ রামচন্দ্রের অযোধ্যা রাজ্যের একাংশ ছিল। কিন্তু রামায়ণ বা অন্যান্য কোন পুরাণ গ্রন্থে ইহার নামের কোন উল্লেখ নাই। রামচন্দ্রের রাজত্বের প্রায় দ্বাদশ শত বর্ষ পরে দুরাচার যবন সাহেববুদ্দিন ঘোরীর দ্বারা বিতাড়িত হইয়া অনেক রাজপুত এই জেলায় আসিয়া বাস করে। আমরা এই জেলার ঐ সময়েরও কোন বিবদ বৃত্তান্ত জানিতে পারি নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। তখন গোরক্ষপুর হইতে বিষিণ বংশীয় বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার এই স্থানে আসিয়া অধিবাস সংস্থাপন করে, সে সময় বিষিণ বংশীয় রাজা অনন্ত এই জেলার শাসন সংরক্ষণ করিতেন। তাঁহার নাম অনুসারেই ইহার নামকরণ হয়। ওণাওয়ের দূরতম পশ্চিম দিকে চণ্ডালগণের বাস। এই জেলার উত্তরে হারদোই, পূর্ব্ব দিকে লক্ষ্ণৌ, দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে রায়বেরেলি, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ফতেপুর ও কাণপুর জেলা। ইহার পরিমাণ ফল ১৭৪৭ বর্গ মাইল।

১১৯৩ খৃঃ অব্দে রাজপুত বংশের গৌরব রবি একবারে অস্তমিত হইল। মহম্মদ ঘোরি পৃথ্বিরাজকে রণে পরাভূত করিয়া, রাজপুত বংশ নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়েই যেন ভারতের সর্ব্বত্র অভিযান করিতে লাগিল। তুঙ্গ শৃঙ্গ অর্ব্বুদ পর্ব্বত, দুর্ভেদ্য গোয়ালিয়ার, সুপবিত্র কাশীক্ষেত্র, পুণ্যভূমি গয়া ধাম, বীর নিকেতন অজমির ও আনহলবারা পত্তন প্রভৃতি অনেক শোভনীয় নগর-গ্রাম এই দুর্দ্ধর্ষ যবন কর্ত্তৃক চূর্ণ বিচূর্ণিত ও পদদলিত হইয়াছিল। রাজপুত স্বভাবতঃ তেজস্বী। তাঁহার জলন্ত জাতীয় ভাব কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। এই নরাধম ম্লেচ্ছগণের নিকট অবনত মস্তকে থাকা রাজপুতের পক্ষে অসম্ভব। তজ্জন্য অনেক রাজপুত স্ব স্ব বাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা পার হইয়া, ওণাও জেলায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। ওণাও তখন সর্ব্বসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ভূভাগ। এরূপ ভূভাগে বাস করিলে দুরাচার মুসলমানগণ সহসা কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সক্ষম হইবে না, এই আশাতেই অনেক প্রধান প্রধান রাজপুত মহম্মদ ঘোরীর প্রাধান্য সময়ে এখানে অধিবাস সংস্থাপন করেন। তখন যে সকল রাজপুতগণ এখানে আসেন, তন্মধ্যে চোহান, দীক্ষিত, রায়কুয়ার, জুনোবার এবং গৌতম বংশীয়েরাই প্রধান। এই ঘটনার বহুকাল পরে দিল্লীশ্বর আকবর ও অন্যান্য মোগল সম্রাটদিগের শাসন সময়ে রাজপুতগণ রাজ্য মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। সম্রাট আকবরের দরবারে মুসলমান অপেক্ষা রাজপুত সামন্তদিগেরই অধিকতর আদর হয়। জাঁহাগীর ও সাজাহাঁর রাজত্ব সময়েও রাজদরবারে রাজপুতগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এই তিন জন সম্রাটের সময়ে অনেক রাজপুত সামন্ত ওণাও জেলায়

জাইগির প্রাপ্ত হন। সেই সকল সামন্তগণ ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া, এই জেলাতেই আসিয়া অধিবাস সংস্থাপন করেন। আজকাল এ জেলায় প্রায় সপ্তদশ শ্রেণীর রাজপুত দৃষ্ট হয়। বলরামপুরের রাজারা জনোবার বংশসমুৎপন্ন। ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া যাঁহারা এ জেলায় অধিবাস সংস্থাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে সেঙ্গুর, ঘিলোট গৌর, ও পরিহর বংশীয়গণই প্রধান। এই কয়েক শ্রেণীর রাজপুত ১৪১৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এই দেশে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন।

১০৩০ খৃঃ অব্দে মহম্মদ গজনভীর ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ সালার মসাউদ সসৈন্যে আসিয়া ওণাও আক্রমণ করে।

এ জেলায় যবনের উৎপাত এই প্রথম। এবার আক্রমণকারী যবনগণ যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ জেলায় মুসলমানগণের অধিবাস সংস্থাপনের সূত্রপাত হয়। জনশ্রুতি এই যে, সৈয়দ আলাউদ্দীন নামক এক জন ফকির নেবাল রাজ নল সিংহের নিকট নেবালে বসবাস করিবার জন্য কয়েক বিঘা ভূমি পাওয়ার প্রার্থনা করে। রাজা ফকিরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন এবং তাহাকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। রাগান্ধ ফকিরের অভিসম্পাতে নেবাল নগর বিধ্বস্ত ও তাহার অধিবাসীদিগের প্রাণ বিনষ্ট হয়। লোকে বলে নগরটী উলটাইয়া যায়। অনন্তর ফকির আলাউদ্দীন অচিরকাল মধ্যে নেবাল নগরের কয়েক ক্রোশ দূরে বাঙ্গারমৌ নামক একটী নগর সংস্থাপন করেন। এই স্থানে সৈয়দের যে সমাধি মন্দির আছে, তাহা খৃঃ অব্দ ১৩০২ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। সমাধি মন্দিরের গাত্রে ঐ সাল অঙ্কিত আছে। ইহার পর ১৪৩১ খৃঃ অব্দে মুসলমানগণ সফিপুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। আমাদের বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লেঃ গবর্ণর "ওণাওয়ের ইতিবৃত্ত" (১) নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে সফিপুর বিজয়ের এই গল্পটী বর্ণিত হইয়াছে। মোলানা সাহা একরাম নামক এক জন ফকীরকে পাঁচ জন হিন্দু রাজা আজান পড়িতে দেন নাই। জোনপুরের এব্রাহিম সাহা এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য সসৈন্যে গিয়া সফিপুর আক্রমণ করেন। এখানে রাজপুত ও মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মুসলমানদিগের এক জন প্রধান সেনাপতি এই যুদ্ধে নিহত হন। শেষে কিন্তু মুসলমানদিগেরই মনোরথ পূর্ণ হয়, তাহারাই যুদ্ধে জয় লাভ করে। যে যবন সেনাপতি নিহত হন, তাঁহার সমাধি মন্দির অদ্যাপি সফিপুরে বিদ্যমান আছে। যদি অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়, তবে এখানকার হিন্দুমুসলমান সকল অধিবাসীই একটী সুলক্ষণা গাভীর দুগ্ধ দশ মোণ ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত ও মসালাদি দিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করে। এই সমস্ত উপকরণে পিষ্টক প্রস্তুত হইয়া

(1) Chronicles of Unao by Sir C. Elliot.

সমাধি মন্দিরের সম্মুখে নিবেদিত হইতে না হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হয়। এরূপ অনেকবার পরীক্ষা করা হইয়াছে।

কপটী যবনগণের জঘন্য কাপট্যে ওণাও হিন্দু রাজগণের হস্ত বিচ্যুত হয়। বাহা, উদ্দিন নামক এক জন জেদি সৈয়দ সাহেবুদ্দিন ঘোরীর সেনাপতি ছিল। মহম্মদ ঘোরী যখন কণৌজ আক্রমণ করেন, সেই সময় বাহাউদ্দিন এক জন বিষিণ বংশীয় হিন্দু রাজার হস্তে নিহত হয়। ১৪৫০ খৃঃ অব্দে একজন জেদি সয়েদের হৃদয়ে পুরাতন প্রতিহিংসা বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সে বিষিণ বংশীয়দিগের প্রভুত্ব লুপ্ত করিতে কৃতসংকল্প হয় এবং কতকগুলি আত্মীয় কুটম্ব সঙ্গে লইয়া ওণাও রাজের নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা অশ্ব বিক্রেতা বলিয়া রাজসমীপে পরিচয় দেয়। রাজা এই দুরাত্মাগণের নিকট হইতে অনেক গুলি পারস্য ও কাবুল দেশজাত অশ্ব ক্রয় করেন। এই সমস্ত অশ্বের মূল্যের টাকা রাজা এক বারে দিতে অসমর্থ হন। মুসলমানগণ তজ্জন্য একটা পরগণায় দখল পাওবার প্রার্থনা করে, উহার মুনফা হইতে অশ্বের মূল্য পরিশোধিত হইবে ইহাই স্থির হয। কিছু দিন পরে ঐ প্রবঞ্চকগণ, স্বদেশ হইতে আপন আপন পরিবাববর্গকে আনাইবার জন্য লোক পাঠায। দেশ হইতে যখন তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণ ওণাওবে আসিয়া পৌছে, তখন রাজ ভবনে একটা মহা সমারোহের বিবাহ উপস্থিত ছিল। ঐ সমস্ত যবনরমণীদিগের সহিত দেশ হইতে অনেকগুলি পুরুষও তাহাদের শরীব রক্ষক ও পথপ্রদর্শক সাজিয়া আসে। মুশলমান অশ্ববিক্রেতাগণ রাজসন্নিধানে গিয়া নিবেদন করিল, তাহাদের পরিবারবর্গ এই উৎসব উপলক্ষে রাজন্তপুরে গিয়া মহারাণীকে অভিবাদন করিতে ও আমোদ আহ্লাদ দেখিতে চায়। রাজা অনুমতি দিলেন। রাত্রিতে বাহকগণ দুর্গমধ্যে শিবিকা লইয়া প্রবেশ করিল। দ্বার রক্ষকগণ রাজাজ্ঞা জানিয়া শিবিকা ছাড়িয়া দিল। ঐ সমস্ত শিবিকা মধ্যে যবনরমণীর পরিবর্ত্তে সশস্ত্র যবন যোদ্ধাগণ ছিল। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। বিবাহের আনন্দে সকলেই মত্ত। দুর্গ রক্ষক সৈন্যগণ সকলেই সুরাপানে হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। সুযোগ বুঝিযা নৃশংস যবনগণ রাজান্তপুরের সকলকে সংহার করিল। সেই কাল নিশায় বিষিণ বংশের ধংস হয়। এক জন রাজকুমার মৃগয়া উপলক্ষে দুর্গ হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন। তিনিই কেবল জীবিত ছিলেন, তদ্ভিন্ন নৃশংস যবনগণ সকলেরই প্রাণ বধ করে। এই রূপ নৃশংস ভাবে যবনগণ বিষিণ রাজ ও তাঁহার বংশধরগণের প্রাণ বধ করিয়া ওণাও অধিকার করে। এই সময় বৈশ রাজা তিলক চাঁদের ঔদ (অযোধ্যা) প্রদেশে অখণ্ড প্রতাপ। তিনি মনে করিলে এই দুর্বৃত্ত যবনগণের বিশেষরূপ দণ্ড বিধান করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি একবার মাহিলাবাদে পাঠানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া, উপস্থিত বিবাদে হিন্দুরাজার পক্ষাবলম্বন করিতে সাহস পান নাই।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ওণাওয়ের অধিবাসীগণ সকলেই বিদ্রোহীগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। কিছু দিন পর্য্যন্ত ওণাওয়ে ইংরাজদিগের শাসন পরিচালিত হইতে পারে নাই। ওণাওয়ের বিদ্রোহীগণ জেনারল হ্যাভলকের সৈন্যদিগের সহিত মহাবিক্রমে কয়েকটি যুদ্ধ করে। রাজা যশ সিংহই এখানকার বিদ্রোহীগণের অধিনায়ক ছিল। ইংরাজ বহু কষ্টে বিদ্রোহীগণের হস্ত হইতে ওণাও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ওণাও নগরই এজেলায় সদর।

এজেলায়, পরকা, মউরানবান, সফিপুর, বঙ্গারমো মোহন ও কুরসৎ এই কয়েকটি নগর আছে। নাবাল গঞ্জ, মহারাজ গঞ্জ এবং ওণাও এই তিন স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে।

ঔদ—(অথবা আউদ)। ত্রেতাযুগে সূর্য্য বংশীয় নরপতিগণের শাসন সময়ে যাহা কোশল রাজ্য অথবা অযোধ্যা বলিয়া প্রথিত ছিল, আজ কাল তাহা ঔদ নামে অভিহিত হইতেছে। এই জেলাটী এক জন চিফ্ কমিশনারের শাসনাধীনে অবস্থিত; যিনি ঔদের চিফ্ কমিশনার, তিনিই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেঃ গবর্ণর হন। ইহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রোহিলখণ্ড বিভাগ, দক্ষিণ পশ্চিমে পুণ্য-সলিলা গঙ্গা নদী, দক্ষিণ পূর্ব্বে বেনারস বিভাগ এবং পূর্ব্ব দিকে বস্তি জেলা। ঔদ জেলার সদর লক্ষ্ণৌ নগরে। ইহার পরিমাণ ফল ২৪,২৪৬ বর্গ মাইল।

এই বিশাল রাজ্যের উত্তর পূর্ব্বভাগে নেপালী হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী এবং দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গা নদী। ঔদে চারিটী নদীই প্রধান-গঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা এবং রাপ্তি। উত্তর পশ্চিমের পিলিভিৎ জেলায় গোমতীর উৎপত্তি স্থান। এখান হইতে নির্গত হইয়া লক্ষ্ণৌ, সুলতানপুর এবং জোনপুরের মধ্য দিয়া গিয়া ইহা গাজিপুর জেলাস্থিত সৈদপুরের নিকটে গঙ্গার সহিত সম্মলিত হইয়াছে। কাথ্না শরায়ন, শাই এবং নন্দ এই কয়েকটী গোমতীর শাখা-নদী। ঔদ জেলায় অনেক বিল্ ও ঝিল্ আছে। এই সমস্ত সুবৃহৎ জলাশয়ের দ্বারা এই জেলার মহোপকার সাধিত হয়; ইহারা জল-প্লাবন হইতে দেশকে রক্ষা করে, অনাবৃষ্টির সময় ইহাদেরই জলে ভূমি সমস্ত সিক্ত হয় এবং ইহাদেরই জল পান করিয়া গো মাহষাদি গৃহ পালিত পশুগণ পিপাসা নিবারণ করিতে থাকে। জেলার উত্তর পূর্ব্ব কোণাংশে রাপ্তি নদী, ইহা গন্ধা ও বারাইচ জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঘর্ঘরা নদীফয়জাবাদ জেলার উত্তরে। বারাইচ, গন্ধা এবং ফয়জাবাদ এই তিনটী জেলা লইয়া ফয়জাবাদ বিভাগ গঠিত। জেলার উত্তর পশ্চিম ভাগে সীতাপুর বিভাগ। খেরী, সীতাপুর ও হরদোই এই তিনটী জেলা এই বিভাগের অন্তর্গত। উত্তরে খেইরিগড়ের জঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া, সারদা ও গোমতী সলিল বিধৌত জনপদ সমস্ত লইয়া কাণ্যকুব্জের সম্মুখে গঙ্গানদীর তটভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানগুলি, সীতাপুর ডিভি-

জনের অন্তর্গত। লক্ষ্ণৌ ডিভিজনই ঔদ রাজ্যের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ঘর্ঘরা ও গঙ্গা-সলিল বিধৌত সমস্ত জনপূর্ণ প্রদেশগুলি (বরাবাঙ্কি, লক্ষ্ণৌ এবং উণাও) এই ডিভিজনের অন্তর্গত। রায়বেরেলি ডিভিজন তিনটা জেলা লইয়া গঠিত। (প্রতাপগড়, সুলতানপুর ও রায়বেরেলি।

য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে, ঔদ রাজ্য প্রাচীনকালে অতীব সমৃদ্ধিশালী ছিল। রামায়ণের আদিকাণ্ডে লিখিত আছে—(১) সরযূ-তীরে নিবিষ্ট প্রমোদান্বিত প্রভূত ধন-ধান্যশালী অতি বৃহৎ ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান কোশল নামক জনপদে সর্ব্বলোক বিখ্যাতা অযোধ্যা নাম্নী নগরী আছে। যে নগরীকে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে মহাপুরী সুবিভক্ত মহাপথে শোভিতা, দ্বাদশ যোজন আয়তা, ত্রিযোজন বিস্তৃত ও অতিশয় শোভাবতী এবং যাহার সুন্দর সুবিভক্ত বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ সকল সর্ব্বদা জলসিক্ত ও বিকশিত পুষ্প বিকীর্ণ। (ইত্যাদি)—

পৌরাণিক যুগের অবসান হইলে, ঐতিহাসিক-যুগের প্রারম্ভ সময়েই ঔদ রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। তখনও ইহার অতুলনীয় সমৃদ্ধি, অতুলনীয় সৌন্দর্য্য। শ্রাবস্তি নগর ইহার প্রাচীন রাজধানী। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শাক্যমুনি এই রাজ্যের প্রধান নগরেই প্রথম স্ব-মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রধান নগরে (শ্রাবস্তিতে) অনেক বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। (শ্রাবস্তি শব্দ দ্রষ্টব্য।)

ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত এই বিশাল রাজ্য ধন জন পূর্ণ ও মহা-সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল। বিক্রমাদিত্য (উজ্জয়িণীর বিক্রমাদিত্য নহেন) নামক এক জন অযোধ্যাপতি কাশ্মীরাধিপতি মেঘবাহনকে রণে পরাজিত করেন। এই বিক্রমাদিত্য নরপতিই বনাকীর্ণ প্রাচীন অযোধ্যা নগরকে পুনঃ প্রকাশিত করেন। ইহার পবিত্র তীর্থ সমুদায় তাহার দ্বারা নির্ণীত হয়, ইহার দক্ষিণে মাযুন্দের নামক এক জাতীয় অসভ্য লোক বাস করিত। তাহারাও কতকগুলি সুবিস্তীর্ণ জনপদের অধিকারী ছিল। পাটনায় তাহাদের রাজা বাস করিতেন। এই জাতি কালক্রমে অতীব পরাক্রমশালী হইয়া উঠে এবং অযোধ্যাপতি বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার বংশধরগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদের প্রভুত্ব বিলুপ্ত করে। অযোধ্যা

(১) কোসলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূত ধন ধান্যবান॥
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীত্ লোক বিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেন যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥
আয়তা দশ চ দ্বেচ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্ত মহাপথা॥
ইত্যাদি

প্রদেশে এইরূপ কিংবদন্তী অদ্যাপি আছে যে অধিবাসিগণের সহিত শ্রাবস্তি রাজ্যে একটা তুমুল সংগ্রাম হয়। সেই সংগ্রামে শ্রাবস্তিরাজ পরাজিত হন এবং তাঁহার বিশাল রাজ্য শত্রু-গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। চারি শত খৃষ্টাব্দে ফাহিয়ান নামক সুবিখ্যাত চীন দেশীয় বৌদ্ধ পর্য্যটক, শ্রাবস্তি নগরে আসিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি শ্রাবস্তির যে দুর্দ্দশা দেখেন তাহা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক সময় যে নগর পর্ব্বত তুল্য অত্যুচ্চ সহস্র সহস্র প্রাসাদ ও দেবমন্দিরে সুশোভিত ছিল, যে নগরী, কবাট-তোরণান্বিতা সুবিভক্ত ক্ষুদ্র পথ শোভিতা, সমস্ত যন্ত্রসমন্বিতা সর্ব্বায়ুধবতী ও অতি শ্রীমতী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তথায় তিনি কেবল দুই শত ঘর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জীর্ণ কুটীর দেখিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে যখন হুয়েন থেসাং এই নগর দেখিতে আসেন, তখন আর ইহার কিছুই ছিল না। নগর প্রবেশের পথ গুলি পর্য্যন্ত দুর্ভেদ্য জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছিল। অযোধ্যায় তখন মানবের বাস ছিল না, ইহা বন্য হস্তিগণের এবং অন্যান্য অরণ্যচারী পশু নিচয়ের বাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। পাটলিপুত্রাধিপতির অযোধ্যা অধিকারের পরই এ দেশের ইতিহাসের প্রাচীনত্বের উপসংহার হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহার পর অযোধ্যা প্রদেশ কাণ্যকুব্জ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়; কিন্তু কোন গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ দেখা যায় না। ক্ষত্রীয় রাজগণের প্রভুত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের সভ্যতাও এক প্রকার বিলুপ্ত হয়। সুসভ্য অধিবাসিগণ, অসভ্য বর্ব্বরগণের সঙ্গ পরিহার করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব বাসভূমি পরি-ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া অধিনিবাস সংস্থাপন করিতে লাগিল। সুতরাং অযোধ্যা অচিরেই ভর, থারু প্রভৃতি অসভ্য জাতীয় লোক দ্বারা অধ্যুষিত হইল। এ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই যে সমস্ত প্রাসাদ-পুঞ্জ ও ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইহার অতীত সমৃদ্ধির নিদর্শন। এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ মঠও রহিয়াছে।

অমরাবতী তুল্য উত্তর কোশল রাজ্যে যে সমস্ত মহামহিমান্বিত নরপতি-বৃন্দ, রাজত্ব করিয়াছিলেন, ভুবনবিদিত রাজা রামচন্দ্র যাঁহাদিগের কুলতিলক বলিয়া প্রথিত, তাঁহাদের মহনীয় চরিত, কবিগুরু বাল্মীকি কর্ত্তৃকই সর্ব্ব প্রথম গাথাবদ্ধ হয়। তাঁহার কুহকিনী বর্ণনার প্রভাবে আজিও সেই অমর পূজ্য ভূপালদিগের লীলানিচয়, জগতের লোক-লোচনের অক্ষয় ও অনন্ত বর্ণে বিরাজিত রহিয়াছে। রামায়ণ আদিকাণ্ড হইতে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল। "অনন্তর বাগ্মিপ্রবর রাজা দশরথ উপাধ্যায়, বান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত বৈদেহকে এই কথা বলিলেন, "হে মহারাজ! আপনি অবগত আছেন ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি, ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের কুলদেবতা-স্বরূপ। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সকল বিষয়েরই বক্তা হইয়া থাকেন। সুতরাং এই ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মতানুসারে মহর্ষি সকলের সহিত আমার বংশাবলী যথাক্রমে কীর্ত্তন করিবেন। রাজা দশরথ এইরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলে, বাক্য-বিশারদ ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি, বৈদেহ জনককে পুরো-

হিতের সহিত এই কথা বলিলেন,—"নিত্য শাশ্বত ক্ষয়রহিত ব্রহ্মা, মায়াসমন্বিত পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ব্রহ্মা হইতে মরীচি জন্মলাভ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ হইতে সূর্য্য উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার "মনু" বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়। তিনি পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু; তিনি অযোধ্যার পূর্ব্বতন রাজা, ইহা আপনি অবগত হউন। তাঁহার "কুক্ষি" এই নামে বিখ্যাত পুত্র হয়; তিনি অতীব শ্রীসমন্বিত ছিলেন। তাঁহার শ্রীসম্পন্ন বিকুক্ষি নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপবান্ বাণ। তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপ-সম্পন্ন অনরণ্য। অনরণ্য হইতে পৃথু উৎপত্তি লাভ করেন। পৃথু হইতে ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মহাযশস্বী ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজস্বী মহারথ যুবনাশ্ব উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র পৃথিবীপতি মান্ধাতা। মান্ধাতা হইতে শ্রীসম্পন্ন সুসন্ধি উৎপন্ন হন। তাঁহার ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ, এই দুই নামে দুই পুত্র হয়। পুরসন্ধি হইতে মহাযশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরত হইতে মহাতেজস্বী অসিত জন্ম লাভ করেন।

"সেই অসিত রাজার শৌর্য্যসম্পন্ন তালজঙ্ঘ, হৈহয় ও শশবিন্দুদেশীয় নরপতি সকল বিপক্ষ ছিলেন। একদা তাঁহারা তাঁহার শত্রুতা আচরণ করিতে উদ্যত হন। তখন সেই অসিত রাজা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন; কিন্তু অল্পবলপ্রযুক্ত সেই সকল নরপতি কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। অনন্তর তিনি দুই ভার্য্যার সহিত হিমালয়ে যাইয়া অধিবসতি করেন এবং কালক্রমে কালকবলে পতিত হন। ইহা শ্রবণ করা গিয়াছে যে, তৎকালে তাঁহার সেই দুই ভার্য্যাই গর্ভবতী ছিলেন। সেই অসিত রাজার এক পত্নী গর্ভ বিনাশ করিবার মানসে সপত্নীকে গরলমিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য প্রদান করেন।

"সেই সময়ে ভার্গব চ্যবন মুনি' রমণীয় শৈলবর হিমালয়ে তপস্যা-নিরত ছিলেন। যে মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশাক্ষী অসিতপত্নী সপত্নীদত্ত গরল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেবতুল্য তেজঃসম্পন্ন ভৃগুনন্দন চ্যবন ঋষিকে বন্দনা করেন,—সেই কালিন্দী দেবী অত্যুত্তম পুত্র লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া তাঁহার শরণাগতা হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। তখন সেই বিপ্রেন্দ্র ভৃগুনন্দ চ্যবন, পুত্রার্থিনী কালিন্দীকে পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে এই কথা বলেন, 'হে মহাভাগে! তোমার উদরে মহাতেজস্বী মহাবলশালী মহাবীর্য-সম্পন্ন শ্রীমান্ পুত্র আছে। অচিরকালেই তোমার সেই পুত্র গরলের সহিত উৎপন্ন হইবে; হে কমলেক্ষণে! তুমি তজ্জন্য শোক করিও না।'

"অনন্তর সেই পতিব্রতা পতিরহিতা রাজপুত্রী কালিন্দীদেবী চ্যবন ঋষিকে নমস্কার করেন এবং তাঁহার প্রসাদে পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভ বিনাশ করিবার মানসে তাঁহাকে গর (গরল) প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য সে 'সগর' এই নামে বিখ্যাত হয়।

"সেই সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান্ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র

দিলীপ। তাঁহার ভগীরথ নামে পুত্র হয়। ভগীরথ হইতে ককুৎস্থ উৎপত্তি লাভ করেন, তাঁহা হইতে রঘু উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র তেজস্বী কল্মাষপাদ; তিনি অভিশাপবশতঃ প্রবৃদ্ধ নামক রাক্ষস হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদ হইতে শঙ্খণ উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র শীঘ্রগ। তাঁহার পুত্র মরু। তাঁহার পুত্র প্রশুশ্রুক। প্রশুশ্রুক হইতে অম্বরীষ উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মহীপতি নহুষ। তাঁহার পুত্র যযাতি। তাঁহার পুত্র অজ। অজ হইতে দশরথ উৎপন্ন হন এবং এই দশরথ হইতে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতা উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। হে নরপাল! যাঁহাদিগের বংশ প্রথমাবধি অতি বিশুদ্ধ, ইক্ষ্বাকুবংশীয় সত্যবাদী বীর্য্যশালী অতি ধার্ম্মিক রাজাদিগের বংশে উৎপন্ন এই রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত আপনার দুই কন্যাকে বরণ করিতেছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি এই দুই সদৃশ পাত্রে সদৃশী কন্যাদ্বয় প্রদান করুন।"

মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণে অযোধ্যার ভূপালগণের উল্লিখিত রূপ তালিকা দিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের তালিকা অন্যরূপ। উক্ত গ্রন্থের ৯ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইক্ষ্বাকুবংশের যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশিত হইল।

ক্ষুত করিতে করিতে মনুর ঘ্রাণ হইতে মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর উৎপত্তি হয়। ঐ ইক্ষ্বাকুর শত সন্তান। তন্মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ডক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। সেই শত পুত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশতি জন বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত সম্মুখে সমুদ্র পর্য্যন্ত এক এক মণ্ডলে রাজা হন। সেই রূপ পশ্চাতেও পঞ্চবিংশতি জন এক এক মণ্ডলে ভূপাল হন। কিন্তু মধ্যস্থলে তিন জন আর দক্ষিণোত্তরাদি অন্যান্য ভাগে অন্যান্য পুত্রেরা রাজপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি। বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয়। ইনি ইন্দ্রকে বাহনত্বে বরণ করেন। ইন্দ্র, মহাবৃষভ রূপে তাঁহার সমীপ হইলে পুরঞ্জয় তাঁহার ককুদোপরি আরোহণ করিয়া দানবগণকে সমরে পরাস্ত করেন। তজ্জন্য পুরঞ্জয় ইন্দ্রবাহ ও ককুৎস্থ নামেও খ্যাত।

পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনাঃ। তাঁহার তনয় পৃথু। তাঁহা হইতে বিশ্বগন্ধি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সুত চন্দ্র। তাঁহার তনুজ যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। ইনি শ্রাবস্তী পুরী নির্ম্মাণ করেন। ঐ শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব। তাহার সন্তান কুবলয়াশ্ব। এই মহাবল রাজা উতঙ্কের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য বিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া ধুন্ধুনামা অসুরকে নিহত করেন; তজ্জন্য ইনি ধুন্ধুমার বলিয়া বিখ্যাত হন। ইঁহার দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও ভদ্রাশ্ব নামক কেবল তিনটী পুত্র সমরশেষে জীবিত ছিল আর সকলেই প্রবল অসুর ধুন্ধুর মুখাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব। তাঁহার তনয় নিকুম্ভ। নিকুম্ভের পুত্র বাহুলাশ্ব, তাহা হইতে কৃশাশ্ব উৎপন্ন হয়। সেই কৃশাশ্বের পুত্র সেনজিৎ, তাঁহার তনয় যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধাতৃ তনয় অম্বরীষ স্বীয় পিতামহ যুবনাশ্ব কর্ত্তৃক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। সেই

অম্বরীষের পুত্রের নামও যুবনাশ্ব। তাঁহার তনয়ের নাম হারীত। অম্বরীষ, যুবনাশ্ব ও হারীত এই তিন জন মান্ধাতৃ-গোত্রের প্রধান। মান্ধাতার ঔরসে শশবিন্দু দুহিতা ইন্দুমতীর গর্ভে পুরু-কুৎসের জন্ম হয়, পুরু-কুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু, তাহার তনয় অনরণ্য, তৎসুত হর্য্যশ্ব, তাঁহা হইতে পারুণ জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র ত্রিবন্ধন। ত্রিবন্ধনের সন্তান সত্যব্রত। তিনি ত্রিশঙ্কু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, হরিশ্চন্দ্রের তনয় রোহিতাশ্ব। রোহিতের তনয় হরিত। হরিত হইতে চম্প উৎপন্ন হন ইনি চম্পপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই চম্পের পুত্র সুদেব। তাঁহার আত্মজ বিজয়। বিজয়ের ঔরসে ভরুকের জন্ম হয়, তাহার পুত্র বৃক। বৃক হইতে বাহুকের জন্ম হয়। বৈরিগণ এই বাহুকের রাজ্য অপহরণ করিয়া লওয়াতে তিনি ভার্য্যা সহ অরণ্য-প্রবেশ করেন। সেই স্থানে বৃদ্ধ হইলে পর আয়ুঃশেষে তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মহিষী অনুমৃতা হইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে সগর্ভা জানিয়া সে উদ্যম হইতে নিবারণ করিলেন। ঐ রাজাঙ্গনার সপত্নীগণ তাঁহাকে অন্তরাপত্যা জানিয়া হিংসা-পরবশ হইয়াছিল এবং তদীয় গর্ভ বিনাশার্থ অন্নের সহিত গর (বিষ) প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে গর সহিত প্রসব হওয়াতে সে পুত্র সগর এই আখ্যায় আখ্যাত হয়। ঐ সগর মহাযশস্বী সম্রাট হইয়াছিলেন। সগর রাজার দুই বনিতা ছিল—সুমতি ও কেশিনী। সুমতির পুত্রগণ কপিলাশাপে ভস্মাসৎ হয়। কেশিনীর গর্ভে রাজা সগরের যে পুত্র হয়, তাঁহার নাম অসমঞ্জস, অসমঞ্জসের তনয় অংশুমান্। তাঁহার তনয় দিলীপ। দিলীপ পুত্র ভগীরথ। ভগীরথের আত্মজ শ্রুত। তাঁহার তনয় নাভ। তাঁহা হইতে সিন্ধুদ্বীপ উৎপন্ন হন। তাঁহার সুত অযুতায়ু। ইহাঁর তনয় ঋতুপর্ণ, তাঁহার তনয় সর্ব্বকাম। তৎপুত্র সুদাস। তাঁহা হইতে সৌদাসের উৎপত্তি। সৌদাসের অনুমতি অনুসারে বশিষ্ঠ মুনি তৎপত্নী দময়ন্তীর গর্ভাধান করিয়া দিলেন। ঐ গর্ভে অশ্মকের উৎপত্তি হয়।

উক্ত অশ্মক হইতে বালিকের জন্ম হয়। ঐ অশ্মক (প্রথম) দশরথের জনক। দশরথের পুত্র ঐড়বিড়। তাঁহার তনয় রাজা বিশ্বসহ; তৎপুত্র মহারাজ চক্রবর্ত্তী খট্বাঙ্গ। তাঁহার তনয় দীর্ঘবাহু। তাঁহা হইতে রঘুর জন্ম হয়। রঘুর তনয় মহাযশাঃ অজ। অজের পুত্র দশরথ। ব্রহ্মময় হরি, দেবগণের প্রার্থনায় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি সংজ্ঞায় চারি অংশে বিভক্ত হইয়া এই দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীরাম-তনয় কুশের অতিথি নামা যে পুত্র হইয়াছিল তাঁহা হইতেই নিষধের উদ্ভব হয়। তাঁহার সুত নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক। তাঁহার সন্তান ক্ষেমধন্বা। ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক। তাঁহার পুত্র হীন, তৎসুত পারিপাত্র। তৎপুত্র বনস্থল। তাঁহার পুত্র বজ্রনাভ। ইহাঁর তনয় সুগণ। সুগণ হইতে বিধৃতি। তাঁহা হইতে হিরণ্যগর্ভের উদ্ভব হয়। ইহাঁর পুত্র পুষ্প, তাঁহা হইতে ধ্রুবসন্ধির উৎপত্তি। তাঁহা হইতে সুদর্শন। তৎসুত অগ্নিবর্ণ। তাঁহার সন্তান শীঘ্র। শীঘ্রের ঔরসে মরু জন্মেন। মরুর সুত প্রসুশ্রুত, তাঁহার সন্তান সন্ধি। তাঁহার পুত্র অমর্ষণ। অমর্ষণের সন্তান প্রসেনজিৎ। তাঁহার পুত্র তক্ষক। তক্ষকের পুত্র বৃহদ্বল। কুরুক্ষেত্র

যুদ্ধে অভিমন্যু এই বৃহদ্বলের প্রাণ বিনষ্ট করেন। বৃহদ্বলের পুত্র বৃহদ্রণ। তাঁহার তনয় বৎসবৃদ্ধ,। তৎপুত্র প্রতিব্যোম। তৎসুত তামুক। তামুকের তনয় সেনাপতি দিবাক্। তাঁহার পুত্র সহদেব। সহদেবের পুত্র বীর বৃহদশ্ব। তৎসুত ভানুমান্। সেই ভানুমানের পুত্র প্রতীকাশ্ব, তাহা হইতে সুপ্রতীক জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর মরুদেব, তৎপশ্চাৎ সুনক্ষত্র তাঁহার পুত্র পুষ্কর উৎপন্ন হন। সেই পুষ্করের পুত্র অন্তরীক্ষ, তাঁহার আত্মজ সুতপা, তাঁহার সন্তান অমিত্রজিৎ। অমিত্রজিৎ হইতে বৃহদ্রাজ, তাঁহা হইতে বর্হি, বর্হি হইতে কৃতঞ্জয়ের উদ্ভব হয়। কৃতাঞ্জয়ের তনয় রণঞ্জয়, তাহা হইতে সঞ্জয় জন্মেন। সঞ্জয়ের সুত শাক্য, তাঁহার সুত শুদ্ধোদ, তৎসুত হঙ্গল। হঙ্গল হইতে প্রেসেনজিৎ তাঁহা হইতে ক্ষুদ্রক। ক্ষুদ্রক হইতে সুমিত্র উৎপন্ন হন। এই সমস্ত সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বিপুল বিক্রমে ভারত-রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে"—সুমিত্র রাজা হইলে পর কলিযুগে এই বংশ ধংস হইয়া যাইবে।" শ্রীমদ্ভাগবতে জগৎ-পূজ্য ব্যাসদেব, অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের এই তালিকা প্রদান করিয়াছেন। রামায়ণে কবিগুরু বাল্মীকি, যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা পুর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই উভয় তালিকায় অতি বিসদৃশ অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে অনৈক্য সামান্য নহে; এমন কি উভয়ের মধ্যে একবারে ২১ শ পুরুষের অন্তর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৈবস্বত মনু সূর্যবংশের আদি পুরুষ। সেই মনু হইতে ভগবান্ রাম পর্য্যন্ত সর্ব্ব সমেত ৩৬ জন নৃপতি বাল্মীকি কর্ত্তৃক এবং ৫৭ জন নৃপতি ব্যাস কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছেন। কি কারণ বশতঃ যে উভয়ের প্রকটিত তালিকার এত দূর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। যে পুরাণ আজি অতীত আর্য্য গৌরবের এক মাত্র ইতিহাস, অতীতের অন্ধতম গর্ভে প্রবেশ করিতে হইলে যাহাই এখন এক মাত্র পথ প্রদর্শক আলোক-স্বরূপ, সেই পুরাণের যদি এক একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এরূপ বৈষম্য ও অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে আর ভারতের অতীত বৃত্তান্ত উদ্ধার করিবার অবলম্বন কি? বোধ হয় মুল গ্রন্থের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন তাঁহাদের অধস্তন লিপিকারগণ কর্ত্তৃক এরূপ বৈষম্য ও অনৈক্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই বৈষম্যের সামঞ্জস্য বিধান করা সহজ সাধ্য নহে।

সূর্য্যবংশ বিলুপ্ত হইলে অযোধ্যা প্রদেশ, বহুকাল অরণ্যাকীর্ণ হইয়াছিল। অনেক কাল পরে কান্যকুব্জাধিপতি ইহা অধিকার করেন। সেই সময় (অনুমান অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে,) থারু নামক পাহাড়ীগণ এই প্রদেশের জঙ্গল কাটিয়া অনেকে সপরিবারে এখানে অধিবাস করিতে আরম্ভ করে। জঙ্গলি বা ম্যালেরিয়া জ্বরে এই জাতীয় লোকের স্বাস্থ্যের কোনই হানি হয় না। ইহারা তজ্জন্য এই প্রদেশে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকে।

ইহার প্রায় এক শত বৎসর পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে সোম-বংশীয় বীরগণ, থারুদিগের হস্ত হইতে অযোধ্যার শাসন-দণ্ড কাড়িয়া লন। ইহারা জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শ্রাবস্তি নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সুহেলদাল সোমবংশীয় ইহাঁদিগের

শেষ রাজা। অযোধ্যা প্রদেশে যে স্থানকে অদ্যাপি লোকে সাহেৎ মাহেৎ বলিয়া থাকে, জনশ্রুতি এই যে, সেই স্থানে সুহেলদালের দুর্গ ছিল। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাঠোর-বংশীয় কান্যকুব্জ-সম্রাট শ্রীচন্দ্রদেব, এই ক্ষুদ্র জনপদে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন করেন। এই স্থানটী প্রাসাদ, মন্দির ও মঠাদির ভগ্নাবশেষে পূর্ণ। অদ্যাপি জৈনগণ ইহাকে একটী পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। এখানে শম্ভুনাথ শিবের মন্দির আছে।

দুর্জ্জয় মহম্মদ গজনবীর আক্রমণে উত্তর ভারতের সকল নরপতিরই সিংহাসন কাঁপিয়া উঠে। তাঁহাদের অনেকেই রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন। এই মহাবিপৎপাতের অত্যল্প কাল পরেই কৃষ্ণ-কায়, অনার্য্য ভরজাতি অযোধ্যার দক্ষিণাংশে, দ্বাবায় এবং গঙ্গা নদী ও মালবা প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগে আধিপত্য সংস্থাপন করে।

ইহাদের আধিপত্য কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর নাসীরুদ্দিন মহম্মদ, তাহাদের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করেন। ভরদিগের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই অযোধ্যা প্রদেশে যে অভিনব সমাজের আবির্ভাব হয়, তাহাই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রদেশটীর মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় তালুক আছে। এই সমস্ত তালুকের অধিকারিগণ প্রকৃত পক্ষে যে জাতিই হউক না কেন, তাহারা সাধারণের নিকট ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভর অথবা অন্যান্য অনার্য্য জাতি সম্ভূত।

১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর একজন সেনাপতি অযোধ্যা বিজয় করে। অনন্তর বখ্তিয়ার খিলিজিই প্রথম ইহা সুশাসনের জন্য রীতিমত ব্যবস্থা করেন। তিনি যে যুদ্ধ সজ্জা করিয়া ব্রহ্মপুত্রের তটভাগে গিয়া বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার আয়োজন এই প্রদেশেই হয়। এই খানেই তিনি সৈন্য সংগৃহীত ও শিক্ষিত করেন। এই খানেই তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হয়। কুতবুদ্দিনের মৃত্যুর পর বখ্তিয়ার, দিল্লীশ্বরের শাসন অমান্য করিয়া তাঁহাকে কর দেওয়া বন্ধ করেন।

তাঁহার পুত্র গিয়াসুদ্দিন্ সুবে বাঙ্গালার গবর্ণরের পদ লাভ করেন। এই পদটীকে তিনি এক প্রকার মৌরুসী করিয়া যান—অর্থাৎ পিতার লোকান্তর হইলে তাঁহার পুত্র এই পদাভিষিক্ত হইবে, অন্য কেহ ইহা লাভ করিতে পারিবে না। অযোধ্যা প্রদেশ কিছুকাল বাঙ্গালার গবর্ণরদের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু কালক্রমে দিল্লীশ্বর ইহাকে খাস্ করিয়া লন।

ভরদিগের প্রভুত্ব বিনষ্ট হইলে, জৌনপুরে যবনরাজ্য সংস্থাপিত হয়। ইব্রাহিম সার্কি জৌনপুরের এক জন সুবিখ্যাত শাসন-কর্ত্তা। ইনি সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশে মুসলমান প্রভুত্ব সংস্থাপিত করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন তিনি অনেক পরিমাণে সিদ্ধি লাভও করেন। ইহাঁর কঠোর শাসনে ও অত্যাচারে অনেক প্রধান প্রধান হিন্দু তালুকদার, ঔদ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যান। ইব্রাহিমের জীবদ্দশায় ঔদের সর্ব্বত্রই এক প্রকার যবন-প্রভুত্ব

সংস্থাপিত হইয়াছিল। হিন্দু অধিবাসিগণ যাবনিক আচার ব্যবহার ও শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার লোকান্তর হইলে ঔদে হিন্দুভাবের পুনরুদয় হয়; রাজা তিলক চাঁদ ইব্রাহিমের প্রধান প্রধান যবন কার্য্য-সচিবদিগকে পরাভূত করেন এবং তাঁহার আন্তরিক যত্নে ও চেষ্টায় ঔদ পুনরায় হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

এক শত বৎসর ঔদে এই প্রকার হিন্দু শাসন ও হিন্দুভাব প্রবল ছিল। পরে প্রথম মোগল সম্রাট্ বাবর, এখানে আসিয়া অযোধ্যা আক্রমণ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানের উপর একটী মসজীদ নির্ম্মাণ করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু হিন্দু সামন্ত ও বীরগণের প্রাণপণে ঐ সুপবিত্র স্থান রক্ষা করায় তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই; তিনি ঐ স্থানের নিকট একটী ক্ষুদ্র মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া ক্ষান্ত হন। এই ঘটনা ভিন্ন ইতিহাসে বাবরের ঔদ বিজয়ের অন্য কোন বৃত্তান্ত উল্লিখিত হয় নাই। বাবরের মৃত্যুর পর ঔদের সমস্ত হিন্দু সামন্তগণ, ভারত হইতে মোগলদিগকে বিতাড়িত এবং মোগল শাসনের মূল উৎপাটিত করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হন। অকবর, ভারত-সাম্রাজ্য লাভ করিয়া স্বীয় অসীম বুদ্ধি ও কৌশল প্রভাবে এই প্রদেশে শান্তি সংস্থাপিত করেন। সুতরাং ইহা সত্বরেই তাঁহার বিপুল রাজ্যের একটী অতি প্রধান ও সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠে। তাঁহার শাসন-সময়ে ঔদের কোন কোন প্রধান হিন্দু সরদার ও সামন্ত, সম্রাটের দরবারে এক একটী প্রধান কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন; কেহ বা সৈন্যের অধ্যক্ষতা লাভ করিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রবণ-সুখকর সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ উপাধি পাইলেন। সম্রাট্, এইরূপ কৌশল অবলম্বনে দেশের প্রায় সমস্ত রুক্ষ স্বভাব সামন্তগণকে পরমাত্মীয় করিয়াছিলেন।

সম্রাট আরঙ্গজীবের কঠোর শাসনে ভারত সম্রাজ্যের যে দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে মারহাট্টাগণের অভ্যুদয়ে মোগল সম্রাটগণের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়ে। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে যখন ফেরোখ্সিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রভুশক্তি চারি পাঁচটী ওমরাহ দ্বারা পরিচালিত হইত। পাতসাহা ইহাদের হস্তের ক্রীড়া পুতুল ছিলেন মাত্র। এই ওমারহগণের মধ্যে সাদাত খাঁ একজন প্রধান। ইনি একজন পারস্য দেশীয় সওদাগর। খোরাসান প্রদেশের নসীপুর হইতে বাণিজ্য করার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আসেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহার রাজত্ব কালে সাদাত্ ঔদের সুবাদার নিযুক্ত হন। ইঁহার বংশীয়গণই ভারতবর্ষে "লক্ষৌয়ের পাতসাহা" বলিয়া বিখ্যাত। ইনি সুবাদার নিয়োজিত হইলে ঔদের অনেক প্রধান প্রধান সামন্ত আপত্তিকারী হয়। গোন্দার রাজা নবাব সাদাতের সৈন্যদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দিয়া আপন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে। নবাব সাদাত দিল্লীশ্বরের উজীর ছিলেন। তজ্জন্য তৎকালে তিনি নবাব উজীর বলিয়া প্রথিত ছিলেন। ঔদের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া সাদাত, স্বীয় বিচক্ষণতায় ও বুদ্ধি প্রাখর্য্যে শীঘ্রই রাজ্যমধ্যে একজন প্রধান লোক হইয়া উঠিলেন। তিনি যাহার দিকে কৃপা-কটাক্ষ

করেন, সেই অতুল সম্পদের অধিকারী হয় এবং যিনিই তাঁহার বিরাগভাজন হন তাহার বিপদের সীমা থাকে না। আউদের প্রধান তালুকদার দৌণ্ডিয়া খেরার বৈশ্যগণ প্রথম হইতেই সুবাদারের বড় পক্ষপাতী ছিল। তজ্জন্য তাহারা যৎপরোনাস্তি যশঃ ও সম্পদ লাভ করে। ফৈজাবাদে সাদাতের রাজধানী ছিল; কিন্তু তিনি সে নগরে প্রায়ই থাকিতেন না। যুদ্ধাভিযানাদির জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদাই বাহিরে বাহিরে ফিরিতে হইত। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে সাদাতের মৃত্যু হয়। তাঁহার জামাতা সাফদার জঙ্গ তৎপদে অভিষিক্ত হন। ইনি একজন অতি সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। সফদারজঙ্গের মৃত্যুর পর (১৭৫৩ খৃঃ অব্দে) তদীয় পুত্র প্রথিত নামা সুজাউদ্দোলা আউদের সিংহাসনে অধিরোহণ করে। এই সময় বাঙ্গালার নবাব মীর কাসিমের সহিত ইংরাজদিগের তুমুল বিবাদ বাধিয়াছিল। সুজাউদ্দোলা সুযোগ উপস্থিত ভাবিয়া পাতসাহা সাহ লম ও মীর কাসিমকে সঙ্গে লইলেন এবং বিহার পুনরধিকার করিবার অভিসন্ধিতে পাটনাভিমুখে অভিযান করিলেন। তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় তিনি পাটনা হইতে বকসারে চলিয়া যান। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে মেজর মনরো নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন সৈন্যাধ্যক্ষ সসৈন্যে বকসারে আসিয়া উপনীত হন। এখানে সুজাউদ্দোলার সৈন্যের সহিত মেজর মনরোর সৈন্যদিগের অতি ভয়ানক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মনরো বিজয় লাভ করেন। সুজা উদ্দৌলা বেরিলীতে পলাইয়া যান। পাতসাহা সাহালাম ইংরেজ শিবিরে আনীত হন। অনন্তর ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দৌলার সহিত কোম্পানির এক সন্ধি হয় সেই সন্ধিসূত্রে নবাব উজির স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ পাতসাহার সম্ভ্রম রক্ষার্থে ও তাঁহার আবশ্যকীয় ব্যয়াদি নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তিন বৎসর পরে নবাব সুজাউদ্দোলা সম্রাটের নিকট হইতে কোড়া ও আলাহাবাদ পুনঃপ্রাপ্তির [illegible] ষড়যন্ত্র করেন। ইংরাজগণ তাহা জানিতে পারেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত একটি সন্ধি হয়। এই সন্ধির মর্ম্মানুসারে নবাব, পঞ্চত্রিংশৎ সহস্রের অধিক সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। এবং ঐ সমস্ত সৈন্যের শিক্ষাদি য়ুরোপীয় ধরণে হইতে পারিবে না, এইরূপ লেখাপড়া হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মারহাট্টাদিগের প্রবল প্রতাপ, দিল্লির সিংহাসনে তাহারাই সম্রাট অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার দোহাই দিয়া সর্ব্বত্র আপনাদের প্রভুত্ব পরিচালিত ও করাদি গ্রহণ করিত। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর আলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া যান। যাইবার সময় তথাকার দুর্গ উজিরের হস্তে সমর্পণ করেন। অতঃপর মারহাট্টাদিগের প্রপীড়নে সম্রাট তাহাদিগকে কোড়া ও আলাহাবাদ অর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই কারণে চুণার ও আলাহাবাদের দুর্গ সংরক্ষণের জন্য নবাবকে ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য লইতে হয়। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে এই সমস্ত কার্য্যোদ্ধারের জন্য সুজাউদ্দোলা ইংরাজদিগের সহিত আর একটা লেখাপড়া করেন। সম্রাট, মারহাট্টাদিগের হস্তে কোড়া ও আলাহাবাদ অর্পণ করিয়া দখল ছাড়িয়া দিলে নবাব সুজাউদ্দৌলা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মুল্য দিয়া ঐ দুই প্রদেশ মার-

হাট্টাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লন। এই সময় নবাব উজীর ইংরেজদিগের নিকট হইতে যুদ্ধ সময়ে সৈন্যবল পাইলে প্রত্যেক ব্রিগেডের জন্য প্রতি মাসে তাহাদিগকে দুই লক্ষ দশ সহস্র সিক্কা টাকা দিবেন এইরূপ চুক্তি করেন।

১৭৭৫ খৃঃ অব্দে নবাব উজীর সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। অনন্তর তাঁহার পুত্র আসাফুদ্দৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি ইংরাজগণের সহিত নূতন প্রকার সন্ধি সংস্থাপন করেন। ইংরাজগণ তাঁহাকে কোরা ও আলাহাবাদের অধিকার পাকা করিয়া দেয় তিনি ব্রিটিস সৈন্যের মাসহারা বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে বেনারস, গাজিপুর, জোনপুর এবং রাজা চেৎসিংহের সমগ্র জমীদারী অর্পণ করেন। নানা দিকে নানা প্রকারের ব্যয়ে আসাফুদ্দৌলার ধনাগারে অর্থশূন্য হইয়া পড়ে তিনি তজ্জন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন ও অর্থাভাব বিদূরিত করিবার জন্য স্বীয় মাতা বাহু বেগমের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন। বেগম সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের তদন্তে প্রবৃত্ত হন। নবাব সত্বরেই তাহার মাতার নিকট এই মর্ম্মে একটি লেখাপড়া করিয়া দেন যে তিনি আর কখন তাঁহার অধিকৃত জায়গীর, জমীদারী বা কোন প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে হস্ত ক্ষেপণ করিতে পারিবেন না। বেগম সাহেব ফয়জাবাদে থাকিয়া নির্ব্বিবাদে আপন সম্পত্তি শাসন সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন, নবাবকে ফয়জাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌয়ে গিয়া অবস্থিতি করিতে হইল।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে চুণারে গবর্ণর জেনারল হেষ্টিংসের সহিত নবাব আসাফউদ্দৌলার সাক্ষাৎ হয়। এখানে পুনরায় একটি নূতন সন্ধি পত্র লেখা পড়া করিয়া দেন। ইহার মর্ম্মানুসারে নবাব সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়, কেবল যে সমস্ত জায়গীরের জন্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট দায়ী আছেন তাহাদিগকে রীতিমত বৃত্তি (Pension) দিতে হইবে। এই সন্ধির মর্ম্মে নবাব ইংরেজ সৈন্যগণের খরচা বহনের ভার হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। এই সন্ধির লেখা পড়া শেষ হইলেই নবাব স্বীয় জননী ও পিতামহীর জায়গীর সর্ব্বারম্ভে বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। তাঁহারা চেৎসিংহকে বিদ্রোহিতাচরণে সহায়তা করিয়া ছিলেন বলিয়া হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়াছিল; তজ্জন্য তাহাকেও ইংলণ্ডে অনেক গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করিতে হয়। অল্পকাল পরে বেগমগণের কতক জায়গীর তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল।

আসাফুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাদাতালি খাঁ ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি জেমান খাঁর ভয়ে ভীত হইয়া ১৮০১ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের সহিত যে একটি নূতন সন্ধি সংস্থাপিত করেন তদনুসারে ইংরাজগণের হস্তে রোহিলখণ্ড সমর্পিত হয় এবং তাঁহার আপদুদ্ধারের জন্য ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট যথোচিত সৈন্যবল বৃদ্ধি ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া দেন। এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ার পর সাদাত খাঁ কিছুদিন স্বরাজ্য মধ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র গাজিউদ্দিন

হাইদার শাসন দণ্ড গ্রহণ করেন। ইনিই প্রথম ১৮১৪ খৃঃ অব্দে অযোধ্যার রাজা (King of Oudh) এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁর মৃত্যুর পর ১৮২৭ খৃঃ অব্দে নাসেরুদ্দিন হাইদার, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে মহম্মদ আলি সাহা এবং ১৮৪১ খৃঃ অব্দে আমজাদ আলি সাহা ক্রমান্বয়ে রাজ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ঘোরতর বিলাসিতায় নিমজ্জিত হন এবং অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন। ইহাদের পর প্রথিত নামা ওয়াজেদ আলি সাহা ১৮৪৭ খৃঃ অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনিই অযোধ্যার শেষ যবন রাজা। বহুকাল হইতে অযোধ্যার শাসন বিশৃঙ্খলা চলিয়া আসিতেছিল। ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট ১৮৩১ খৃঃ অব্দে একবার অযোধ্যারাজকে স্বরাজ্য মধ্যে সুনিয়ম সংস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধে কোনই ফল হয় না। এই ঘটনার বিংশতি বৎসর পরে কর্ণেল শ্লিমান অযোধ্যায় ব্রিটিস রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়া একবার সমস্ত রাজ্যটি পরিদর্শন করেন। তাঁহার রিপোর্টে অযোধ্যায় শাসন বিশৃঙ্খলার কথা যেরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে ভয়, ঘৃণা এবং ক্রোধের যুগপৎ উদয় হয়। রিপোর্টের উপসংহারে শ্লিম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে অযোধ্যা রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের যে দুর্গতি তাহা নিবারণ না করিয়া গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত থাকিলে লোকের প্রতি প্রধান শাসনশক্তির যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালন করা হয় না।

রাজ অত্যাচারে প্রপীড়িত ও নিদারুণ করভার গ্রস্ত হইয়া অযোধ্যার প্রজাগণ যার পরনাই বিপন্ন হইয়া পড়ে। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। দেশের রাজার দ্বারা কোন প্রতিকারেরই আশা ছিল না; এখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই অরাজক জনপদকে স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেই প্রজাগণ রক্ষা পায়। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ওয়াজেদ আলিকে নিম্ন লিখিতরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন। ঐ সন্ধির সর্ত্ত এই কয়েকটি—

(১) রাজ্যের বিচার ও যুদ্ধ বিভাগের কার্য্যভার সমস্তই চিরদিনের জন্য ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইবে।

(২) ওয়াজেদ আলির বাদসাহ উপাধি থাকিবে। তাহার ধর্ম্মপত্নির গর্ভজাত পুত্র-সন্তান ও তাঁহাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণও ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

(৩) বাদসাহ সর্ব্বপ্রকারে সম্মানিত ও যথাযোগ্যরূপে অভ্যর্থিত ও সংবর্দ্ধিত হইবেন। লক্ষ্ণৌয়ের রাজভবনে, এবং দেলখোসবাগ ও বিবিপুরের প্রমোদ কুঞ্জে তাঁহার একাধিপত্য থাকিবে। কঠিন দণ্ডবিধান ছাড়া ঐ তিন স্থানে তিনি সকল কার্য্যই করিতে পারিবেন।

(৪) বাদসাহ ওয়াজেদ আলি বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন। ইহা ছাড়া তাঁহার রাজভবনের পাহারা চৌকির খরচার জন্য বৎসর বৎসর আরও তিন লক্ষ টাকা

(৫) বাদসাহার উত্তরাধিকারীগণও বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন এবং তাঁহার নিকটসম্পর্কীয়গণ ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যথাযোগ্য ভরণ পোষন পাইবেন।

বাদসাহার নিকট এই সন্ধি পত্র প্রেরিত হয়। তাঁহাকে তিন দিন সময় দেওয়া হইয়াছিল। ওয়াজেদ আলি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন না। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট চিরদিনের জন্য ঔদের শাসন ভার গ্রহণ করেন। ওয়াজেদ আলিকে গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে সম্মত হইলে বাদসাহ ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে তাহা লইতে সম্মত হন। তিনি আজীবন অযোধ্যার বাদসাহ এই উপাধি ধারণ করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কেহই আর সে উপাধি পাইবে না।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ঔদ প্রদেশ ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত হইয়া শাসন সংরক্ষনের জন্য এক জন চিফ্ কমিসনারের হস্তে সমর্পিত হয়।

পর বৎসরই সিপাহীগণের ঘোর বিদ্রোহে সমগ্র ভারতবর্ষ বিকম্পিত হইয়া উঠে। যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হয়। সেই বৎসর হইতে দিন দিন এ প্রদেশের সকল বিষয়ই উন্নতি হইতেছে। রেল পথ বিনির্ম্মিত হওয়ায় এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য সস্তার বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হইতেছে। বিচারালয় সমস্ত সংস্থাপিত হওয়ায় প্রজাপুঞ্জের (জান্‌মাল্) শরীর ও সম্পত্তি নিরাপদ হইয়াছে। ঔদের অধিবাসিগণ স্বভাবতঃ অতীব বুদ্ধিমান; আজকাল বিদ্যালয় সমূহে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহারা নানারূপে স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতেছেন।

ঔদ প্রদেশে এই কয়েকটি প্রধান নগর—যথা লক্ষ্ণৌ, ফয়জাবাদ, বারাইচ, সীতাপুর, সাহাবাদ, খৈরাবাদ, শাণ্ডিলা, নবাবগঞ্জ, বলরামপুর, টাণ্ডা, রুদৌলী, গোণ্ডা, বেলগ্রাম, রোখাজৈস, মাল্লানবান, রায়বেরেলি, লাহারপুর, অযোধ্যা, হারদোই, উনাও, পরবা, এই সমস্ত নগরের প্রত্যেকটিতে অধিবাসীর সংখ্যা দশ সহস্রেরও অধিক।

ঔদের ভূমির পরিমাণ-ফল ধরিয়া অধিবাসীর সংখ্যার হিসাব করিলে দেখা যায় যে এরূপ ঘন বসতি ভূমণ্ডলের অন্য কোন স্থানেই নাই। এ প্রদেশটি বহুকালাবধি মুসলমান রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল বটে কিন্তু এখানে ইসলাম ধর্ম্মের তাদৃশ প্রভাব বা বিস্তার দৃষ্ট হয় না; পূর্ব্বে একশত অধিবাসীর মধ্যে ১২ জন মাত্র মুসলমান পাওয়া যাইত এখন কিঞ্চিদুন শতকরা ২০ জন মুসলমান হইবে। কয়েকটি বড় বড় হিন্দুরঘর স্বার্থের জন্য ধর্ম্মের জন্য নহে, ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে হোসেনপুর বদ্ধুওয়ার রাজারাই প্রধান। এখানকার অনেক বড় বড় গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী জাতিতে মুসলমান, লক্ষ্ণৌ নগরে অনেকগুলি ভাল ভাল মুসলমান উকীল ও ব্যারিষ্টার আছেন। সমগ্র ঔদ প্রদেশে মোট ৭৮ ঘর মুসলমান তালুকদার আছে। এদেশের মুসলমানগণের ভাল জমীদার

বলিয়া সুখ্যাতি নাই, ইহাদের অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে এবং ইহারা প্রায়ই বড় মামলাবাজ হয়।

ঔদে ব্রাহ্মনদিগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অধিবাসীর সংখ্যা কিঞ্চিদুন দেড় লক্ষ। ইহার ১০।১২ ঘর বড় বড় তালুকদার। অনেকে যোত্রবান যোতদার। ব্রাহ্মণগণ সৈন্যদল ভুক্ত হয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যও করে। সমগ্র অধিবাসীর অষ্টমাংশ ব্রাহ্মণ। ইহাদের পরেই ক্ষত্রিয়জাতি। ইহাদের অনেকে জোতদার ও তালুকদার বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষত্রীয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এমন কি অনেককে উদরান্নের সংস্থানের জন্য যারপরনাই কষ্ট পাইতে হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয় এবং মুসলমান এই তিন জাতিই ঔদের সমগ্র অধিবাসীর এক চতুর্থাংশ; অবশিষ্ট তাবতই কায়স্থ, বৈশ্য, কূর্ম্মি ও মুরাও প্রভৃতি নীচ জাতীয় হিন্দু। কূর্ম্মি ও মুরাও এই উভয় জাতির সংখ্যা এক কোটির অধিক। এই দুই জাতিই এদেশের কৃষিবল। এই কয়েক জাতি ছাড়া নট, ভর, ধা[illegible], কোরি, এবং চামার ইহারাও কৃষিজীবি।

ঔদের তৌজিভুক্ত ভূমি তালুকদারী, জমীদারী এবং পট্টিদারী এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশ খাস করিয়া লওয়ার পর অনেক বড় বড় তালুকদারের অবস্থা যাবপরনাই মলিন হইয়াছে। মহারাজা মানসিংহ নামক একজন প্রধান তালুকদার ৫৭৭ খানি গ্রামের ভূস্বামী ছিলেন। ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। তাঁহার আয় ছিল দুই লক্ষ টাকা এখন তাঁহার সম্পত্তি হইতে তিন হাজার টাকা মাত্র আদায় হয়। এ প্রদেশে ভূমির রাজস্বে গভর্ণমেণ্টের প্রায় দেড় কোটি টাকা আয়। ভূতপূর্ব্ব বাদশাহার রাজত্বে ভূমির রাজস্বের এক কোটি ঊনচাল্লিশ লক্ষ টাকা তলব ধরা হইত কিন্তু তাহা আদায় হইত না। ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট পাঁচ আনা ছয় আনা নিরীখে এখানে জমাবন্দি করিয়া দেন।

মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে এ দেশে আদৌ ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না। তখন এখান হইতে কেবল মাত্র সোরা ও লবণ রপ্তানি হইত। আমদানীর মধ্যে বাদশাহের বিলাস লালসা পরিতৃপ্তির জন্য যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আবশ্যক তাহাই ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ্ণৌ নগরে আসিত। এখন এপ্রদেশে তিন চারি শত মাইল রেল ও পাঁচ ছয় হাজার মাইল পাকা রাস্তা প্রস্তুত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। লক্ষ্ণৌয়ের সমৃদ্ধি কিছু হ্রাস হইয়াছে সত্য কিন্তু অন্যান্য অনেকগুলি বাণিজ্য স্থানের সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে। আজ্ কাল এখানে নীলের চাষ হইতেছে। য়ুরোপীয়গণই এই চাসের প্রবর্ত্তক ও মূলধনী। নীল কুঠির সংখ্যা প্রায় ৫০টী। লক্ষ্ণৌ নগরে একটী কাগজের কল হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ ছাড়া ঔদের অন্য কোন স্থানে কোন প্রকার শিল্প কার্য্যের কল কারখানাদি দৃষ্ট হয় না।

এ প্রদেশের প্রধান প্রধান সমস্ত নগর গুলিতেই মিউনিসিপ্যালিটীর বন্দোবস্ত আছে। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা এ প্রদেশের আব্ হাওয়া অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা। বর্ষাকালেই গ্রীষ্মের

প্রকোপ অধিকতর কষ্টদায়ক হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যকালেই বর্ষাঋতুর প্রারম্ভ এবং কার্ত্তিক মাসেই তাহার শেষ। কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুণ মাস পর্য্যন্ত শীতকাল এবং চৈত্র মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দ্ধেক সময় গ্রীষ্ম।

নন্ রেগুলেশন প্রদেশ সমুদয়ে যেরূপ শাসন প্রণালী প্রচলিত ঔদ প্রদেশেও সেই প্রণালীতে শাসিত ও সংরক্ষিত হয়। এখানকার ১২টি জেলা ১২টি ডেপুটি কমিশনারের অধীন। তাঁহারাই জেলার জজ ও কালেক্টার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেফট্‌নেনণ্ট গভর্ণরই ঔদের চিফ্ কমিশনার। যে হাইকোর্টে এ প্রদেশের মোকর্দ্দমার আপীল আদি রুজু হয় তাহার প্রধান বিচারক একজন জুডিশীয়্যাল কমিশনার।

ঔদে প্রায় দেড়হাজার ইস্কুল আছে। লর্ড ক্যানিং সাহেবের নামে লক্ষ্ণৌ নগরে একটি উৎকৃষ্ট কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে। মুনশি নাবাল কিশোরের প্রতিষ্ঠিত একটি উৎকৃষ্ট মুদ্রা যন্ত্র আছে। তাহাতে অতি অল্প ব্যয়ে সাহিত্য সম্বন্ধীয় অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক সমস্ত মুদ্রিত হয়। লক্ষ্ণৌ হইতে লক্ষ্ণৌ একস্‌প্রেস্ নামক একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ক

ককরাউল—একটি গ্রাম। দ্বারভাঙ্গার ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত হয়, নেপালে এই কাপড় বহুল রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানকার লোকের মুখে শোনা যায় যে এই স্থানে কপিলমুনি বাস করিতেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে একটি বেশ বড় মেলা হয়।

ককরাল—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বদাউন জেলার অন্তঃপাতি দাতাগঞ্জ তহশীলের একটি নগর। বদাউন হইতে উষাহাট যাইবার যে কাঁচা পথ আছে তাহারই পার্শ্বে এই নগর অবস্থিত। ইহা বদাউন হইতে ৬ ক্রোশ।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় জেনারেল পেনি সৈন্য সামন্ত লইয়া যখন বিদ্রোহীগণকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন সেই সময় এই স্থানে কতকগুলি মুসলমান গাজি তাঁহাকে আক্রমণ ও নিহত করে। তাহারা এই নগরপ্রান্তে লুকাইয়াছিল, পেনি সসৈন্যে নগর প্রবেশ করিলে তাহারা চারি দিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। জেনারেল সাহেবের প্রাণ বিনষ্ট হইল দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণ কিছুমাত্র সাহস হারা হয় নাই বরং দ্বিগুণ উৎসাহ ও সাহসে শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পরাভূত করিল। এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় বদায়ুনের সমস্ত বিদ্রোহীগণ একবারে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

কঙ্করওলী হ্রদ—ইহার আর একটি নাম রাজসমুদ্র। এটি মেবারাধীশ্বর সুবিখ্যাত রাজসিংহের একটী প্রধান কীর্ত্তি। তিনি এক কোটী পনর লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই বিশাল

হ্রদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে শেষ হয়। রাজস্থানে এই সরোবরের বিবরণ এইরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে—"জাতীয় মহতী প্রতিষ্ঠার ও রাজপুত কীর্ত্তির সুবিশাল প্রমাণক্ষেত্র এই রাজ সমুন্দ সরোবর রাজধানীর সার্দ্ধ দ্বাদশ ক্রোশ উত্তর এবং আরাবল্লির পাদ প্রস্থের এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গোমতি নামে একটি বক্রগতি গিরিতরঙ্গিণীর স্রোত একটি বিশাল বাঁধ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করিয়া উক্ত হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছিল। রাণা আপনার নামানুসারে তাহার নাম "রাজসমুদ্র" (রাজসমুন্দ) রাখিয়াছিলেন। হ্রদের ঈশান ও বায়ুকোণ ভিন্ন আর সকল দিকেই উক্ত বাঁধ বিস্তৃত। সরোবরটি অত্যন্ত গভীর; ইহার পরিধি প্রায় ছয় ক্রোশ হইবে। বাঁধের আদ্যোপান্ত শ্বেত মর্ম্মরে সংগঠিত; তাহার শীর্ষদেশ হইতে সরোবরের গর্ভ পর্য্যন্ত একটি বিশাল সোপান পংক্তি সমুৎকীর্ণ; সোপান সরোবরকে বেষ্টন করিয়া সংস্থিত। তাহাও মর্ম্মরময়। বাঁধ উচ্চ মৃৎপ্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। যদি রাজসিংহ আর কিছুদিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে সেই প্রাকারশির শ্যামল বিটপিরাজির দ্বারা পরিশোভিত হইত। সরোবরের দক্ষিণ পার্শ্বে রানা একটি নগর ও দুর্গ নির্ম্মান করাইয়াছিলেন। নগরটী তদীয় নামানুসারে রাজনগর নামে আখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত বাঁধের উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণের একটি শোভনীয় মন্দির সংগঠিত। মন্দিরটিও শ্বেত মর্ম্মরময়। ইহার এবং বাঁধের সর্ব্বাঙ্গে তৎকালোপযোগী নানাপ্রকার মনোহর চিত্র উৎকীর্ণ। তন্মধ্যে একস্থানে বৃহৎ ও সুস্পষ্ট অক্ষরে তৎপ্রতিষ্ঠাতার ধারাবাহিক বংশ বিবরণ লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃহতী প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিতে রাণা ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার সমৃদ্ধ সরদ্দার ও প্রজাগণ অনেক সাহায্য করেন। তবে ইহার উপকরণাদি নিকটস্থ শৈল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। যে রাশীকৃত মর্ম্মর শিলা প্রযুক্ত হইয়াছিল, রাণাকে যদি তাহাও ক্রয় করিতে হইত তাহা হইলে যে আরও কত অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু মিবার ভূমি রত্নগর্ভা। এরূপ মর্ম্মর শিলা তাহার মেখলারূপিণী অনেক শৈলমালা হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। রাজ সমুন্দ সরোবর শোভনীয়, বহু ব্যয় সাপেক্ষ ও প্রয়োজনীয় বটে, এ সকলই ইহার সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক; কিন্তু যে কারণ বশতঃ ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই কারণ অনুশীলন করিলে ইহার অভ্যন্তরে যে আর একটি গভীর সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সে সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় আর আর সমস্ত সৌন্দর্য্যই অধঃকৃত হইয়া পড়ে। সে কারণ অতি হিতগর্ভ। রাণা রাজসিংহের শাসন সময়ে মিবারভূমি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দ্বারা আক্রান্ত হইলে দীন হীন অসংখ্য প্রজাবৃন্দ কঠোর ক্ষুৎপিপাসা ও যম যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া শমনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। স্বীয় প্রকৃতিবর্গের সেই হৃদয় বিদারী শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে রাণা অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং যাহাতে প্রজাবর্গ দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের একটি মহোপকার সাধিত হয়, অথচ দেশে একটি অনন্ত কীর্ত্তি স্থাপিত হয়; তাহাই সাধন করিতে রাণার

বাসনা জন্মিল। তিনি সেই বিশাল রাজসমুদ্র সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই তিনটি উদ্দেশ্যের সাফল্য এবং আপনার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিলেন।"

কচ্—গুজরাটের অন্তর্গত একটি রাজ্য। ইহা বোম্বে গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে পরাক্রান্ত জারজবংশীয় নরপতিগণের দ্বারা শাসিত ও সংরক্ষিত হইতেছে। এই দেশের সংস্কৃত নাম কচ্ছ। এই শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ জল নিকটবর্ত্তি স্থান।

কচ্ প্রদেশটি সমুদ্রতীরবর্ত্তি। ইহার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্বদিকে সিন্ধুদেশ, পূর্ব্বে পালনপুর পশ্চিম এজেন্সির তত্ত্বাবধানভুক্ত দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য, দক্ষিণে কাঠিবার উপদ্বীপ ও কচ্ছ উপসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগর। এই দেশের উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে যে সুবিশাল উষরভূমি আছে তাহাকে সকলে রণ্ বলিয়া থাকে। এই রণ্ ছাড়া কেবল ইহার ভূমির পরিমাণ ফল প্রায় ৬৫০০ বর্গ মাইল। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮০ মাইল, প্রস্থ ৫০ মাইল। এই রাজ্যের প্রধান নগর ভূজ এই নগরেই রাজ্যাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের বাসভবন।

নদী ও জলা সমূহের ব্যবধানে কচ দেশটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। উত্তরদিকে রণ্ নামক সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি পূর্ব্বভাগে ঐ রণের ক্ষুদ্রাংশ, দক্ষিণ দিকে কচ্ছোপসাগর এবং পশ্চিমভাগে সিন্ধু নদের পূর্ব্বদিগস্থ মোহানা। এখানে বৃক্ষ বিটপি কিছুই নাই বটে কিন্তু ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য যে একবারে সৌন্দর্য্য বিহীন তাহা বলা যায় না। স্থানে স্থানে ফল শস্য সুশোভিত উপত্যকা এবং অত্যুর্ব্বর ক্ষেত্রনিচয়, সুগভীর নদীখণ্ড, অনুন্নত পর্ব্বতশ্রেণি এবং দিগন্তবিস্তৃত উষর ভূমির মধ্যে মধ্যে অত্যুন্নত নিভৃত শৈলশৃঙ্গরাজি যে প্রাকৃতিক শোভার মনোহর বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রণ্ সহিত সমগ্র কচ্ছ প্রদেশের পরিমাণ ফল নয় সহস্র বর্গ মাইল।

কচের দক্ষিণদিকে একটি অত্যুচ্চ বালুকাময় বাঁধ আছে, ইহা সমুদ্র উপকূলের সহিত সমান্তরাল ভাবে বিলম্বিত। এই বাঁধের পশ্চাতে বিশ ত্রিশ মাইল প্রশস্ত উত্তম উর্ব্বরাভূমি। এই ভূখণ্ডের সীমান্তে ডোরা নামক পর্ব্বতাকীর্ণ ভূমি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে বিলম্বিত আছে।

ডোরার পশ্চাৎভাগে একটি অতি উর্ব্বরা উপত্যকা। এই উপত্যকার উত্তরে চারিবার, নামক শৈলশ্রেণি। চারিবার শৈলের সীমান্তে অনুমান ৭ মাইল প্রস্থ একখণ্ড অত্যুর্ব্বর ক্ষেত্র রণের উত্তরাংশে বিলম্বিত আছে। রণের দক্ষিণদিকে চারিটি পর্ব্বতাকীর্ণ দ্বীপ, এই দ্বীপের একটির উপর পচ্চম পীরনামক সার্দ্ধচতুর্দ্দশ শত ফিট্ উচ্চ একটি গিরিশৃঙ্গ আছে। এইটিই এখানকার উচ্চতম পর্ব্বত। ইহা ছাড়া নান্নু ও ইন্দ্রিয়া নামক আরও দুইটি পর্ব্বত আছে, ইহার প্রথমোক্তটি আট শত ও দ্বিতীয়টি নয় শত ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতগুলির বর্ণ এক রূপ নহে, কোন কোনটি ঈষৎ ধূসরাভ পাণ্ডু কোন কোনটি শুভ্র।

বর্ষা ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে কচ্ছে নদীর বড়ই অপ্রতুল, কিন্তু বর্ষারম্ভে পর্ব্বত-গাত্র হইতে

কতকগুলি সুবৃহৎ তরঙ্গিণী বহির্গত হইয়া খরতর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। অন্য ঋতুতে এই সমস্ত স্রোতস্বতীর স্রোতবেগ রুদ্ধ হইয়া তাহারা স্বল্পতোয়া বিল বা খালে পরিণত হয়। বর্ষা ভিন্ন অন্যান্য সময়ে কূপ ও পর্ব্বতোপরিস্থ জলাশয়ের জলে অধিবাসিগণের প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে।

রণ্ নামক সুবিশাল উষরভূমি পূর্ব্বে সমুদ্রের এক অংশ ছিল, ভূমিকম্প কি অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে এই অংশ সমুদ্রগর্ভ হইতে অনেকটা উর্দ্ধ ও সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই মরু কচ্ছদেশকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত করিয়া আছে। রণের উত্তরাংশ প্রস্থে ২৫ হইতে ৩৫ মাইল হইবে, পূর্ব্বাংশ কেবল মাত্র ২ মাইল প্রস্থ। রণ্ দুইটি, বড় রণ্ ও ছোট রণ্। ছোটটি কচ্ছের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত বড়টি উত্তরাংশ ব্যাপিয়া আছে। বড়টি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে বিলম্বিত, ইহার দৈর্ঘ্য ১৬০ মাইল, উত্তর দক্ষিণে প্রস্থ ৮০ মাইল; মোট পরিমাণ ফল ৭০০০ সাত হাজার বর্গ মাইল। ছোটটির পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকের প্রস্থ অনুমান ৭০ মাইল, ইহার পরিমাণ ফল ২০০০ দুই হাজার বর্গ মাইল।

রণের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ। সূর্য্যের উত্তাপে ভূপৃষ্ঠস্থ লবণাম্বু রাশি স্ফোটকাকারে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কোন কোন সময় রণের পূর্ব্বদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ লবণরাশি দ্বারা সমাচ্ছাদিত হয়। এই সুবিশাল মরু প্রদেশের ইতস্ততঃ দুই চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ঐ সকল দ্বীপেই উদ্ভিজ্য জগতের নিদর্শন স্বরূপ দুই এক প্রকার গাছ গাছড়া ও তৃণাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কুত্রাপি একটি লতা বা গুল্ম দৃষ্ট হয় না। এক জাতীয় বন্য গর্দ্দভ এই সমস্ত দ্বীপে বিচরণ করে। এই সকল দ্বীপ ভিন্ন তাহাদের ভক্ষণোপযোগী তৃণাদি অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না।

বর্ষাকালে দুইটি রণই সমুদ্র জলে প্লাবিত হইয়া যায়। তখন ইহাদের মধ্য দিয়া গমনাগমন করা ভয়ানক বিপদজনক। কার্ত্তিক মাসের শেষে ইহাদের মধ্য দিয়া যাতায়াত করা যায়। বর্ষাজলপ্লাবিত রণের গর্ভের কোন স্থান পঙ্কিল হয় না।

এই স্থানের প্রাকৃতিক গঠন ও অবস্থা দেখিয়া ভূতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে এখানে বহুদিন পূর্ব্বে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইত। এখন আর সে উৎপাত নাই বটে কিন্তু সময় সময় অতি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে কচ্ছে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয় তাহাতে ভুজে মহারাওয়ের রাজভবন ও সাত হাজার বাড়ী ভূমিসাৎ হয়। এই দুর্ঘটনায় ১১৫০ জন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। ১৮৪৪, ১৮৪৫, এবং ১৮৬৪ খৃঃ অব্দেও ভূমিকম্প হয়। ১৮১৯ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পে রাজ্য মধ্যে একটিও দুর্গ ছিল না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়া যায়। এই মহা প্রাকৃতিক বিপ্লবে শিন্দরী নামক দুর্গ-সুরক্ষিত একটি মালগুদামের উভয় পার্শ্বে ১৬ মাইল পরিমাণ স্থান পাঁচ হইতে আট হাত পর্য্যন্ত বসিয়া গিয়া একটি বিল হইয়া পড়িয়াছে। আবার শিন্দরীর উত্তরদিকে ৫০ মাইল ভূমি ১০।১২ হাত উচ্চ বাঁধে পরিণত হইয়াছে।

এই বাঁধ সহসা উৎপন্ন হওয়ায়, সাধারণ লোকে ইহারে আল্লা বা ঈশ্বরের বাঁধ নাম দিয়াছে।

কচ্ছদেশে খনিজের মধ্যে পাথুরীয়া কয়লা ও লৌহ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এখানে লোহা গলান হইত, কিন্তু এখন লৌহখনি বন্ধ আছে। চারবার পাহাড়ের কয়লা অতি নিকৃষ্ট, এরূপ কয়লা খনি হইতে তুলিয়া কারবার করিলে, খরচাই পোষায় না।

এখানে প্রায় তিন চারি লক্ষ হিন্দু, সওয়া লক্ষ মুসলমান, একশত খৃষ্টান, ছয় সাত হাজার ঘর জৈন, পঞ্চাশ ঘর পারসী, বিশ ঘর ইহুদি ও ত্রিশ চল্লিশ ঘর শিকের বাস। শতকরা ৮.৯ জন রাজপুত ও ৬।৭ জন ব্রাহ্মণ, কৃষক, শিল্পী ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীরা হিন্দু শতকরা ৪৮ জন। রাজপুতগণের মধ্যে কচ্ছের রাও ও তাঁহার ভায়াদ্ অর্থাৎ স্বজাতীয় জ্ঞাতি কুটম্বগণ জারজ শ্রেণীভুক্ত। জমীদারগণের মধ্যে অনেকে বাঘেল রাজপুত। এ দেশের ভাষা দুই প্রকার, কচ্ছী ও গুজরাটী। কচ্ছী ভাষায় লোকে কথা বার্ত্তা কহে, কিন্তু কার্য্য কর্ম্মে ও সাহিত্যাদির চর্চ্চায় গুজরাটীই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কচ্ছের রাজা যিনি রাও উপাধিতেই সুপরিচিত, তিনি জারজ রাজপুত-বংশ-সম্ভূত। এই শ্রেণীর রাজপুতগণ সুম্মা জাতি হইতে সমুৎপন্ন, এই সুম্মা জাতি উত্তর প্রদেশ হইতে এখানে আগত হয়। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহারা সিন্ধুদেশ হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করিতেছে। জামলাকা নামক একজন বীরপুরুষ তাহাদের অধিনায়ক ছিল, এই জামলাকা জার নামক একজন প্রধান বীরের পুত্র। এই জারের নামেই এই রাজপুতবংশের নামকরণ হইয়াছে। ১৫৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জামবংশীয়গণ নির্ব্বিবাদে এই রাজ্য ভোগ করিয়াছিল। এই বৎসর খেঙ্গর আহামদাবাদের যবন রাজার সাহায্যে সমগ্র কচ্ছদেশ অধিকার করিয়া লন, এবং তদ্বংশীয় রাজপুতগণের অধিনায়কের পদ প্রাপ্ত হন। খেঙ্গরের পিতৃব্য জামরাওল ইতিপূর্ব্বে এ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। খেঙ্গরের সম্পূর্ণ অভ্যুদয়ের সময় তিনি কাতিয়ারে পলায়ন করেন। অদ্যাপি নব-নগরে যে রাজবংশ আছে, এই জামরাওলই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। খেঙ্গর হইতে ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত কচ্ছের রাওগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া আসেন, কিন্তু রাও [illegible]নের মৃত্যুর পর এই চির প্রচলিত উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। কারণ [illegible]নের তৃতীয় পুত্র প্রাগজী স্বীয় অগ্রজদের প্রাণবধ করিয়া সিংহসন অধিকার করেন। হত [illegible]র পুত্রকে আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য, রাও তাঁহাকে মর্ভীর [illegible] অভিষিক্ত করেন। অদ্যাপি তাঁহারই বংশধরগণ ইহার রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছেন। [illegible] স্বীয় কন্যাকে গরকুমারের ও স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী কাম্বাবাইকে আহামাদাবাদের অধিপতির করে সমর্পণ করেন। রাও লাখপত্ দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার ১৬ জন পত্নী তাঁহার সহিত সহমৃতা হয়, তাঁহাদের সুন্দর সমাধি মন্দিরগুলি অদ্যাপি কচ্ছের বৃটিশ রেসিডেন্সি ভবনের সন্নিকটে বিদ্যমান রহিয়াছে। জারজ রাজপুতগণ সূতিকাগৃহেই কন্যা সন্তানগণের প্রাণবধ

করিত। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ তার উপযুক্ত পাত্রাভাবে বিবাহ দিতে না পারিয়া, ক্রমান্বয়ে সাতটী কুমারী কন্যার প্রাণ সংহার করেন।

এই রাজ্যে তিন প্রকারের সম্পত্তি আছে। প্রথম রাওয়ের খালসা সম্পত্তি। দ্বিতীয় ভায়াদ, অর্থাৎ রাওয়ের স্বজনবর্গের সম্পত্তি, এবং মর্ভির ঠাকুরের সম্পত্তি এই দেশ, সাতটী জেলা ও আটটি সবডিভিজনে বিভক্ত। সবডিভিজন আটটীর নাম আবদাসা, (নাকত্রাণা ইহার সামিল) আউজার ভাজন ভুজ, (খাভুদা ইহার সামিল) লাখপত, মাণ্ডবী, মুন্দ্রা এবং রাপার (খাদির ইহার সামিল)। অনুমান আট শত দ্বাদশ বর্গ মাইল ভূমি উল্লিখিত প্রত্যেক সবডিভিজনের অন্তর্ভুক্ত।

মহারাজ মির্জ্জা, মহারাও শ্রীখেঙ্গরজি ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে কচ্ছের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহাঁর পিতা প্রাগমলজি ঐ বৎসরেই সর্গারোহণ করেন। কচ্ছের রাওগণ ১৭ তোপ পাইয়া থাকেন। এই রাজ্য হইতে ১৮৮১ খৃঃ [illegible] লক্ষ ষাইট হাজার তিন শত পাঁচ পাউণ্ড অর্থাৎ ষোল লক্ষ তিন [illegible]

স[illegible]

[illegible] রাজ্যে কোন বিপদ উপস্থিত [illegible]

[illegible] কচ্ছে ভায়াদ [illegible]

[illegible] হইয়াছিল।

[illegible] অবস্থা একবারে মন্দ নহে।

[illegible] গম, তুলা, ভুট্টা ও নানাবিধ কলাই

[illegible] নের দ্বারাই চাষের কায চলে। কচ্ছের উট ও

[illegible] ক্যার্থ সেনানিবেশ স্থান। উড়িষ্যা বিভাগের একটী জেলার নাম। [illegible] লার লেঃ গবর্ণরের শাসনাধীন। এই সমগ্র জেলার ভূমির পরিমাণ ফল তিন [illegible] পাঁচ শত সতের বর্গ মাইল, ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দুই কোটী। এই জেলাকে উড়িষ্যার কেন্দ্রস্থল বলা যাইতে পারে। ইহারউত্তরে বৈতরণী নদী ও ধামড়ার মোহানা, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে পুরী জেলা এবং পশ্চিমে উড়িষ্যার করদ রাজ্যসমূহ। কটক নগরই এই জেলার সদর ও প্রধান নগর।

এই জেলার তিন প্রকার বিভিন্ন ভাবের ভূমি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বিল, জলা ও বনাকীর্ণ উপকূল; এই ভূভাগ স্থানে স্থানে তিন হইতে ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত প্রশস্ত, দ্বিতীয় প্রাচীন বদ্বীপ মধ্যস্থিত সরস আবাদী ধেনো জমী এবং তৃতীয় জেলার পশ্চিমভাগস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালাবৃত বন্ধুর-ভূমিনিচয় প্রথম প্রকারের ভূভাগটী বাঙ্গালাদেশের সুন্দরবনের ন্যায় জলা, গভীর জঙ্গল ও দূষিত এবং ব্যাধিকর বায়ুসমাকীর্ণ; কিন্তু সুন্দরবনের ন্যায় ইহার বন প্রদেশের দৃশ্য রমণীয় নহে। গাঙ্গাভাগটী অসংখ্য স্রোতস্বতী ও খাঁড়ি সমাবৃত, ইহাদের জল হইতে পলিমাটী জমিয়া বিস্তর জলাভূমি সংগঠিত হইয়াছে। এই বিশ্রী ভূভাগ অতিক্রম না করিলে, চাষ আবাদের ব্যাপার দেখা যায় না, আবাদোপযোগী ভূমি জেলার মধ্যভাগে প্রায় চল্লিশ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহা পশ্চিমদিগস্থ পর্ব্বতমালা নিঃসৃত অসংখ্য প্রবাহিণীর সলিল দ্বারা বিধৌত হইতেছে। পাহাড় সমাকীর্ণ প্রদেশটী উড়িষ্যার করদ রাজ্য হইতে বন্দবস্তি অংশসমূহকে ব্যবচ্ছিন্ন করিতেছে। এই প্রদেশ হইতে নানাপ্রকার আরণ্য বৃক্ষ ও দ্রব্য রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে শালগাছ, ধূনা, লা, তসর, মোম, হরেক প্রকার রঙের জিনিস এবং সূত্রই প্রধান। শালগাছগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাহা জ্বালানি ভিন্ন অন্য কোন কাযে লাগে না। জেলার পূর্ব্বাংশেই পাহাড়গুলি অবস্থিত। ইহাদের কোনটীই আড়াই হাজার ফিটের অধিক উচ্চ নহে, এই সমস্ত পাহাড়ের অনেকগুলিতে দেবমন্দির ও দুর্গাদি সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে নালটিগিরি, উদয়গিরি এবং আসিয়াগিরিই প্রধান। নালটিগিরিতে চন্দনবৃক্ষ ও অনেক বৌদ্ধ ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, উদয়গিরিতে প্রকাণ্ড এক বুদ্ধমূর্ত্তি, পবিত্র কুণ্ড, এবং বহু গুহা ও ভগ্ন মন্দির আছে, আসিয়াগিরি পাঁচিশ শত ফিট উচ্চ, উপর মুসলমানদের একটী পুরাতন মসজিদ আছে।

কটক জেলার নদীনিচয় ইহার সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক। জেলার পশ্চিম দিগ্বিভাগস্থ পর্ব্বতাকীর্ণ প্রান্ত সীমার তিনটী গিরিশঙ্কট ভেদ করিয়া, তিনটী বিপুলকায়া তরঙ্গিণী পৃথক্ পৃথক্ তিনটী ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। তন্মধ্যে হিন্দুদিগের পুণ্যসলিলা বৈতরণি কিউঞ্জর রাজ্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, কটক ও বালেশ্বরের সীমা রেখা স্বরূপে প্রলম্বিত রহিয়াছে। দক্ষিণে মহানদী; কটক সহরের সার্দ্ধ তিন ক্রোশ পশ্চিমে নারাজের গিরিশঙ্কটে ইহার জন্ম। জেলার বদ্বীপটী এই মহানদীর পবিত্র সলিলে বিধৌত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত নদীদ্বয়ের আধা আধি পথে ব্রহ্মাণী আসিয়া জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মাণী ও বৈতরণি সাগরগর্ভে নিপতিত হইবার পূর্ব্বে উভয়ে ধামড়ার মোহানায় মিলিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় এই স্থানকে পয়েণ্ট পালমিরাস্ (Point Palmyras) বলে। এই তিনটী নদীর বহু শাখা প্রশাখা কটকের নানা স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তাহার মধ্যে কাঠজুরী, দেবী, পাইকা, বিরূপা এবং চিত্রতালাই উল্লেখযোগ্য।

বর্ষাকালে উল্লিখিত নদীনিচয়ের জলরাশি দ্বারা কৃষকের ক্ষেত্র প্লাবিত, গৃহ ভূমি ও শস্য উৎসাদিত না হয় এবং গ্রীষ্মকালে একবারে জলাভাবে চাষবাসও ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ না

থাকে, উড়িষ্যা দেশের এই বিষম সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।

মধ্যভারতাভিমুখী যে সমস্ত গিরিপ্রদেশ উড়িষ্যায় আছে, তাহার পরিমাণ ফল প্রায় চৌষট্টি সহস্র বর্গ মাইল। এই সুবিশাল গিরিপ্রদেশের জলরাশি পাঁচটি মাত্র প্রবাহিণী পথে নিসৃত হইয়া প্লাবনের সময় ভীমবেগে আসিয়া কটক এবং বালেশ্বরের ক্ষুদ্রকায় বদ্বীপটীতে (ইহার পরিমাণ ফল পাঁচ সহস্র বর্গ মাইল মাত্র) আপতিত হয়; আবার গ্রীষ্মাগমে এই সমস্ত তরঙ্গিণীর কলেবর বিশীর্ণ ও স্রোতবেগ একবারে মন্দীভূত হইয়া যায়। এই বিশাল জলরাশির গতি ও ভীষণ ভঙ্গী রুদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা কৃষি এবং বাণিজ্যের সৌকর্য্য বিধান করিবার জন্য, কতকগুলি কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী (Canal) কাটিবার প্রস্তাব হয়। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ইরিগেশন কোম্পানি উড়িষ্যা দেশকে পুনঃ পুনঃ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ও জল সেচন দ্বারা এ দেশের কৃষির উন্নতিবিধান করিবার উদ্দেশ্যে বহু টাকা মূল ধন লইয়া ক্যানাল কাটিবার কার্য্য আরম্ভ করেন [illegible] ন্তু এই কোম্পানি আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলে ১৮৬৮ খৃঃ [illegible] হস্তে উহার ভার গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্টের বহু চেষ্টা ও অর্থব্যয় [illegible] ক্যানাল খোদিত হইয়া লোকের অশেষ কল্যাণ সাধিত [illegible]

[illegible] এই সমস্ত কৃত্রিম পয়ঃ [illegible] ড়া ক্যানাল, [illegible] উলুবেড়িয়া [illegible] আরব্ধ হয়, [illegible] াই এবং বঙ্গদেশের [illegible] ষ হইয়াছে।

[illegible] মেণ্ট নিশ্চিন্ত হন নাই। জলপ্লাবন [illegible] গে বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছেন। এদেশে এইরূপ [illegible] তে প্রচলিত আছে। একমাত্র কটক জেলায় মোট [illegible] মিত করিবার জন্য লোকসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট ৬৮০ মাইল [illegible] প্রস্তুত করিয়াছেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত [illegible] সায় বাঁধ প্রস্তুত ও মেরামতের কার্য্যে ১০,৫৭৬৭৬৲ দশ লক্ষ সাতান্ন [illegible] ছেয়াত্তর টাকা ব্যয় হয়। গবর্ণমেণ্টের হিসাবে ইহা লিখিত হইয়াছে। [illegible] খৃঃ অব্দের আদম সুমারে দেখা যায় কটক জেলায় ক্ষুদ্র পল্লী ও বৃহৎ সহরের সংখ্যা [illegible] ার হাজার আট শত একচল্লিশ এবং অধিবাসীর সংখ্যা সতর লক্ষ আটত্রিশ হাজার এক শত পঁয়ষট্টি। ইহার মধ্যে হিন্দু ১৬,৮৭৬০৮, মুসলমান ৪৭২৫৯, খৃষ্টান ২৩৬১, শিখ ১০৪, বৌদ্ধ ৩, ব্রাহ্ম ৬ এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ৮৫৭, ইহাদের অধিকাংশই অসভ্য আদিম নিবাসী।

উচ্চ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার এক শত তিরানব্বই, রাজপুত দশ হাজার সাত শত বিরাশী, এবং খণ্ডাইৎ তিন লক্ষ উণচাল্লিশ হাজার চারি শত পঁচিশ। এই খণ্ডাইৎ জাতি প্রাচীনকালে রাজাগণের সামরিক বিভাগে সৈনিকের কার্য্য করিত। ইহাদের অনেকে রাজদত্ত জায়গীর ভোগ করিতেছে। পূর্ব্বভাব পরিহার করিয়া এখন খণ্ডার পরিবর্ত্তে ইহারা হলচালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ জেলায় গোয়ালার সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আট শত সৌত্তর। পান নামক জাতির সংখ্যা প্রায় আশী হাজার। ইহারা মজুরের কার্য্য করে। বাঙ্গালায় যেমন কায়স্থ উড়িষ্যায় তদ্রূপ করণ নামে একটী জাতি আছে। ইহাদের অনেকে মসিজীবি ও গবর্ণমেণ্ট আফিসে পেয়াদা ও চাপরাসীর কার্য্য করিয়া থাকে। করণ, বানিয়া, শূদ্র, কুম্ভার, ধোপা, নাপিত, কণ্ডু (ময়রা) লোহার, তাঁতি, চামার এবং বাউড়ি প্রভৃতি জাতি ও বহু আছে। এ জেলার অধিকাংশ হিন্দুই বৈষ্ণব, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই শৈব।

সভ্যজনসমাজে সমাদৃত হইতে পারে এরূপ কোন শিল্পজাত দ্রব্য কটকে হয় না, তবে এখানকার চাঁদির ও সোণার তারকুশী কাজের দ্রব্য ও অলঙ্কারাদি সর্ব্বত্রেই সমাদৃত হয়, ইহা ভিন্ন উল্লেখযোগ্য অন্য কোন দ্রব্য বা বস্ত্রাদি নাই।

জলপ্লাবন ও অনাবৃষ্টির জন্য সময় সময় এ দেশে যে মহা অনর্থপাত হইতে ক্যানাল ও বাঁধাদি প্রস্তুত হওয়ায়, তাহা কিছু পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। এখন জেলাটী দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে এই জেলা হইতে দশ লক্ষ একুশ হাজার নয় শত চারি টাকা ভূমির সরকারী রাজস্ব আদায় হয়। আজ কাল রাজস্বের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। কটক, জাজপুর ও কেন্দরাপাড়ায় মিউনিসিপ্যালিটী আছে। পুলিশ বিভাগের ৯টী থানা আছে। এ জেলায় ৪টী জেলখানা।

কটক জেলার সদর কটক সহরটী অতি প্রাচীন। উৎকলের কেশরীবংশীয় রাজাগণের দ্বারা এই নগরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। যেখানে মহানদী হইতে কাটজুড়ি নদী বাহির হইয়াছে, সেই উপদ্বীপের উপর নগরটী অবস্থিত। উড়িষ্যার পার্ব্বতীয় রাজ্যনিচয়ের প্রবেশ দ্বার এবং জেলার সমস্ত ক্যানালগুলির কেন্দ্রস্থল বলিয়া সামরিক ও বাণিজ্য উভয় দিকেই নগরটীর গুরুত্ব আছে। কাটজুড়ির দক্ষিণ তটে কটকের প্রাচীন দুর্গ। ইহাকে দেশীয়গণ বড়বাটী বলিয়া থাকে। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ইহা হস্তগত করেন। আজ কাল ইহার ভগ্নাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে।

কডাপা।—মান্দ্রাজ প্রদেশের একটী জেলা। এ জেলার প্রধান নগরের নামও কডাপা। ইহার পরিমাণ ফল ৮৭৪৫ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা এগার লক্ষ একুশ হাজার আটত্রিশ। এখান হইতে গবর্ণমেণ্টের ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য প্রকারে বিশ লক্ষ তের হাজার দুই শত দশ টাকা আয় হয়।

ইহার উত্তরে কর্ণুল ও পূর্ব্বে নেলুর জেলা, উত্তরে উত্তর আর্কট এবং কোলার জেলা, পশ্চিম বেলেরী জেলা।

ইহা পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতশ্রেণির পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ত্রিপতি-নাথের পবিত্র মন্দির ত্রিপতি পর্ব্বতে বিরাজিত রহিয়াছে। কড়াপা নগর ও পনেয়ার নদীর অতি সন্নিকটে পাইকোণ্ডা (দুগ্ধধবল পর্ব্বত) ও শেষাচলম পর্ব্বত। এই পর্ব্বত-মালা প্রায় দেড় হাজার ফিট উচ্চ। এই দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী জেলাটীকে দ্বিধা বিভক্ত করি-য়াছে, ইহার একটী ভাগ নিম্ন ও অপর ভাগ উচ্চ। উচ্চ ভাগটীর কতকাংশ কৃষ্ণবর্ণ ভূমি সমাবৃত, তাহাতে তুলা ভিন্ন অন্য কিছুই উৎপন্ন হয় না, কতকাংশ ঘন বনরাজি সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণীর দ্বারা আচ্ছন্ন। বর্ষাকালে এই সমস্ত পাহাড়ের গাত্র হইতে ভীমবেগে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া পনেয়ার নদীতে পতিত হয়। নিম্নভাগটীর পূর্ব্ব ও উত্তর পূর্ব্বদিকে শেষাচল শ্রেণী, এই ভাগটী পর্ব্বতমালার নিম্নদেশ হইতে ক্রমে ঢালু হইয়া গিয়া মহিশূরের মালভূমিতে মিলিয়াছে, এই অংশের ভূমি অত্যন্ত বন্ধুর, এখানে এক মাইল ভূমিও সমতল দেখা যায় না। এই জেলার মধ্যে গুড়ামকোণ্ডা নামক পর্ব্বত ও গিরিদুর্গ অবস্থিত। এই পর্ব্বতের নিকটস্থ স্থানটী বড়ই রমণীয় এবং প্রকৃতির ভীমকান্ত ভাবব্যঞ্জক। এই প্রকার একটী মাত্র পর্ব্বত পরিশোভিত রমণীয় স্থান কড়াপায় অনেক আছে।

পনেয়ারই এখানকার বৃহৎ নদী, তাহা ছাড়া পাপঘ্নী, চিত্রবতী, চেয়ার, কুণ্ডেয়ার, শাগালেয়ার প্রভৃতি আরও কতকগুলি নদী আছে, ইহারা ক্ষুদ্র হইলেও, জেলার নানাপ্রকার কল্যাণ সাধন করিতেছে। এখানকার খনি হইতে লৌহ, শিশা, তামা, চুণাপাথর, শ্লেট এবং ইমারত নির্ম্মানোপযোগী বেলে পাথর প্রাপ্ত হওয়া যায়। কড়াপা নগরের সাত আট মাইল উত্তরে পনেয়ার নদীর তটে হীরা পাওয়া যায়। বনে ভাল ভাল বাহাদুরী কাষ্ঠ জন্মে।

ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-রেণুস্পর্শে এই জেলা পবিত্র হইয়াছিল। তাঁহার পর যখন তিন জন হিন্দু নরপতি অভ্যুত্থিত হইয়া দক্ষিণাপথের সমস্ত রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন, তখন এই জেলায় তাঁহাদের এক জনের অধিকার দৃঢ় বদ্ধ হয়। সে সময়ের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। মুসলমানগণের সময় হইতেই ইহার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। বিজয় নগরের হিন্দু নরপতিগণই এ জেলার অধিপতি। ১৫৬৫ খৃঃ অব্দের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে দাক্ষিণাত্যের তিন জন যবন রাজা (বিজাপুরের আদীলসাহ, বিদারের কুতবসাহ, আহম্মদ নগরের নিজামসাহ) একত্র সৈন্য সমবেত করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুরাজ বিজয় নগরাধিপতির প্রভুত্ব বিলুপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত তালি-কোটা ক্ষেত্রে গিয়া মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। রাজা সেই যুদ্ধে পরাভূত হইলে, দক্ষিণাপথ হইতে কিছু কালের জন্য হিন্দু প্রভুত্ব অন্তর্হিত হয়। সীতাবেল সামন্তগণ বিজয়নগরাধিপের অধীনে এই জেলা ভোগ দখল করিতেছিলেন। তৎপরে যবনগণ আসিয়া ইহা অধিকার করে। গোলকোণ্ডার অধিপতি তাঁহার কয়েকজন অধীনস্থ সরদারকে এই জেলা ভাগ

করিয়া দেন। তাহাদের সকলের মধ্যে গুড়ামকোণ্ডার নবাবই অত্যন্ত প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। তিনি স্বনামাঙ্কিত মুদ্রাদি প্রচলিত করিয়া একজন স্বাধীন রাজার ন্যায় প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। ১৬৪২ খৃঃ অব্দে এই সম্পত্তি মহারাষ্ট্রগণের হস্তগত হয়। তদানীন্তন যবন সরদার প্রাণভয়ে নিজামের নিকট পলাইয়া যায়; নিজাম তাহাকে স্বতন্ত্র একটী জায়গীর দেন। অনন্তর শিবজি এই জেলা লুঠ করিবার আদেশ দেন। এই লুণ্ঠন ব্যাপারে এ জেলায় একটী ধূলা গুঁড়াও বাকী ছিল না, মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছিল। ইহার পর কয়েক বৎসর ইতিহাসে কডাপার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবদুল নবী নামক জনৈক পাঠান "কডাপার নবাব" নামে অভ্যুত্থিত হইয়া বড় মহালের পালিগরদিগের নিকট কর আদায় করিতে লাগিল। এখানকার তৃতীয় নবাবের সহিত ১৭৩২ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণের সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। সেই বৎসর হইতেই নবাব বংশের পতনের সূত্রপাত।

কাডাপা নগর কাডাপা জেলার সদর। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃত "কৃপা" শব্দ হইতে এই শব্দটীর উৎপত্তি হইয়াছে। কাহার কাহার মতে ইহা ত্রৈলিঙ্গ "গদাপা" শব্দের রূপান্তর মাত্র। গদাপার অর্থ প্রবেশ দ্বার, এই স্থান দিয়া ত্রিপতিনাথ মহাদেবের শৈল মন্দিরে যাইবার পথ, তজ্জন্য ইহাকে গদাপা বা কডাপা বলা হইয়া থাকে। আজ কাল এই নগরে জেলার জজ; কালেক্টার মুনসেফদিগের কাছারী এবং জেলখানা। এখান হইতে প্রায় চব্বিশ পঁচিশ হাজার টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স আদায় হয়। য়ুরোপীয়গণ যে অংশে থাকেন, তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর বটে, কিন্তু দেশীয়গণ যে অংশে বাস করে, তাহা অত্যন্ত কদর্য্য। এই নগরের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। ইহা মান্দ্রাজ হইতে ১৬১ মাইল দূরে অবস্থিত। মান্দ্রাজ হইতে বরাবর রেলযোগে এ নগরে যাওয়া যায়। নগর হইতে পনেয়ার নদী ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

লোকে বলে বিজয়নগরাধিপতিগণের শাসন সময়ে এ সহরটির অবস্থা কিছু ভাল ছিল, কিন্তু এই নগরের পার্শ্বেই পুরাতন কডাপা নামক নামক যে ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহার কোন স্থানেই কোন হিন্দু প্রাসাদ বা মন্দিরাদির চিহ্নও দৃষ্ট হয় না, তজ্জন্যই ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

মরে সাহেব বলেন, ইহা পূর্ব্বকালে বিজয়-নগরাধিপতিগণের সামন্ত রাজা সীতাবেল নরপতিগণের অধিকারে ছিল, তাহার পর গোলকুণ্ডার যবন রাজা কুলিকুতুব সাহ ইহা অধিকার করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মিরজুমলা কর্ণাটিক বিজয়াভিলাষে এখানে আসিয়া নিকুয়াম খাঁ নামক একজন সর্দ্দারের হস্তে চিন্নুর তালুকের শাসনভার অর্পণ করেন। সেই যবন সর্দ্দার গণ্ডিকোট, সিদ্ধাবত্ প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম অধিকার করিয়া, কডাপা সহর পত্তন করেন। তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া যবনগণের প্রভুত্ব সময়ে ইহাকে নিকুয়ামাবাদ বলিত, পরে ইহা পূর্ব্ব নামে অর্থাৎ কডাপা কোভিল নামে আখ্যাত হয়। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে

ফরাসীগণ নিজাম নাজিরজঙ্গকে চেজিয়া নিকট আক্রমণ করিলে, কডাপার নবাব উপাংশু হত্যায় নিজামের প্রাণবধ করেন। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে হাইদার আলি এখানকার নবাব হালিম খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নগর অধিকার করেন এবং নবাবকে বন্দী করিয়া স্বীয় রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে লইয়া যান। অনেকে অনুমান করেন, হাইদার ইঁহার প্রাণ-সংহার করিয়াছিল। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে নগরটি নিজামের হস্তে সমর্পিত হয়। নিজাম স্বীয় সহকারী ফরাসী সৈন্যের খরচ সরবরাহের জন্য এই নগর ম'সের রেমণ্ডের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই জেলা ও নগর সমস্ত প্রাপ্ত হন।

কড়া।—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার শিরাথু তহশীলের একটী নগর। ইহা গঙ্গার দক্ষিণ তটে আলাহাবাদের ২১ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

১২৮৬ খৃঃ অব্দে মইজুদ্দিন এবং তাঁহার পিতা নাজীরুদ্দিন উভয়ে কড়া নগরের সম্মুখে নদীবক্ষে একটী সভা করিয়া উভয়ে স্ব স্ব সৈন্য সম্মিলিত করিয়া দিল্লি আক্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নিম্ন দ্বাবার মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ এই নগরেই বাস ও দরবারাদি করিতেন, এইখানেই তাঁহাদের সদর কাছারী হইত। ১২৯৫ খৃঃ অব্দে আল্লা উদ্দীন এইখানেই তাঁহার পিতৃব্য ফিরোজ সাহার প্রাণবধ করে। ১৩৩৮ খৃঃ নিজাম মইন এই নগরে রাজবিদ্রোহীর পতাকা উড্ডীন করে, কিন্তু আইন উল্‌মুলুক তদ্দণ্ডেই ইহাকে গ্রেপ্তার করিয়া, জীবিতাবস্থাতেই ইহার গাত্রচর্ম্ম উঠাইয়া লয়। গুজরাটের সুবিখ্যাত বিদ্রোহী তোকী চামাড় ১৩৪৬ খৃঃ অব্দের বর্ষার সময় এই নগরে আসিয়া আপতিত হয় ও ইহা অধিকার করে, কিন্তু মহাম্মদ সাহা অচিরেই আহমাদাবাদ হইতে আসিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে কড়া, মাণেবা ও দালামৌ এই তিনটী মহালকে মালিক উলশর্ক এই উপাধিধারী একজন শাসনকর্ত্তার অধীনে রাখা হয়। আকবার এই নগর হইতে গবর্ণরদের সদর কাছারী আলাহাবাদে উঠাইয়া লইয়া যান। সেই হইতে কড়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। এই নগরে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ছিল। অযোধ্যার নবাব আসফদ্দৌলা সেই ইমারতগুলি ধ্বংস করিয়া, তাহাদের মাল মসালা দ্বারা লক্ষ্ণৌ নগরে স্বীয় বাস ও প্রমোদ ভবনগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও কতকগুলি সমাধি মন্দিরের ধ্বংসরাশি অদ্যাপিও কড়ার পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অদ্যাপিও এখানে পাঁচ ছয় হাজার লোক বাস করে। এখানকার হাটের সহিত অযোধ্যা ও ফতেপুরের ভুষি মালের, কাপড়ের ও কাগজের কারবার চলিতেছে। পূর্ব্বে এখানে কাগজ প্রস্তুত হইত, কিন্তু কলিকাতার সন্নিকট শ্রীরামপুরে কাগজের সুবৃহৎ কারখানা সংস্থাপিত হওয়ার পর কাগজ প্রস্তুতের কার্য্য একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এখানকার কম্বল অতি উৎকৃষ্ট। এখনও এই কম্বলের জন্য কড়া নগরের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত রহিয়াছে। এখানে ডাকঘর, পুলিশ, থানা এবং The great Trignometrical survey এবং ষ্টেশন আছে।

কডেলোর — মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত দক্ষিণ আর্কট জেলার একটী তালুক। ইহার পরিমাণ ফল ৪৫৯ বর্গ মাইল, ইহার মধ্যে ৯৬ বর্গ মাইল কেবল পতিত, তদ্ভিন্ন সমস্ত আবাদী। এই তালুকের দুইটী সহর ও দুইশত একুশ খানি পল্লিগ্রামে ২৯৮৫২৩ লোকের বসতি। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সেন্সস্ কাগজ-দৃষ্টে ইহা লিখিত হইল। ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ৩৯২৭৯০ টাকা ভূমির রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

কদালোর ও পানরুটি এই দুইটী এই তালুকের প্রধান নগর। এখানকার ১৮খানি গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটী আছে। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স আদায় হয়।

১৬৮২ খৃষ্টাব্দে জিঞ্জির খাঁর নিকট ব্রিঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই স্থানে কারবার ও বসবাস করার জন্য ভূমি পাওয়ার প্রার্থনা করেন। তৎপর বৎসর খাঁ তাঁহাদিগকে এক খণ্ড পাট্টা প্রদান করেন। ঐ পাট্টার লিখিত ভূমির উপর বর্ত্তমান বন্দর ও দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ইহার দশ বৎসরের মধ্যে এই স্থানে কোম্পানির কারবার এরূপ জমিয়া যায় যে, তাঁহার এই বন্দর ও তাঁহাদের মাল-গুদাম সমুদয় সুরক্ষিত করিবার জন্য ফোর্টসেণ্ট ডেভিড নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন হয়।

১৭৪৬ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজ সহর শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে কোম্পানির লোকজন কদালোরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানকার দুর্গ এরূপ সুগঠিত ও সুরক্ষিত ছিল যে, ফরাসী গবর্ণর দুপ্লে ইহাকে দুইবার আক্রমণ করিয়াও কোন প্রকারে দখল করিতে পারেন নাই। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সদর এই স্থানেই ছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে কদালোরে ক্লাইব সাহেব ব্রিটিশ সৈন্য সমূহের অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে ফরাসীগণ এই নগর অধিকার করিয়া দুর্গটী বিনষ্ট করে; কিন্তু ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বন্দিবাসের যুদ্ধাবসানে ব্রিটীশগণ ইহা পুনরধিকার করিয়াছিলেন। ইহার বাইশ বৎসর পরে টিপু সুলতানের সাহায্যে ফরাসীগণ আবার একবার এই নগর অধিকার করে। টিপু এখানকার দুর্গের পুনসংস্কার করিয়াছিলেন বলিয়াই পর বৎসর ইংরাজদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ ও অবরোধ ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কদালোর অবরোধের সময় ইংরাজ ও ফরাসীতে এখানে ঘোরতর জলযুদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৮৫ খৃঃষ্টাব্দে রীতিমত লেখাপড়া করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ইহা সমর্পিত হয়। এই নগর সমুদ্রের অতি নিকটস্থ। নূতন কডালোরে এখন রেল-ষ্টেসন হইয়াছে। ইহা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লাইনের অন্তর্গত। কদালোরের উত্তর দিকে সমুদ্র তীরে ফোর্টসেণ্ট ডেভিড দুর্গ অবস্থিত ছিল। এখন কেবল তাহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। দুর্গের সম্মুখে একটী বাঙ্গালা আছে, লোকে এটীকে ক্লাইব সাহেবের বাঙ্গালা বলে—এখানে ক্লাইব থাকিতেন।

এই নগরে তিরুপাপুলিয়ুর শিব-মন্দির আছে, মন্দিরে পড়গেশ্বর শিব আছেন। সহর-টীর পথ ঘাট অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুপ্রশস্ত। রাস্তার দুই পার্শ্বেই বৃক্ষ সমস্ত রোপিত হওয়ায় নগরের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কড়ি—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বান্দা জেলা কড়ি মহখুমার সদর, বান্দা হইতে ২২ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে এবং আলাহাবাদ হইতে ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমে। এখানে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার হিন্দুর বাস। কড়ি ও তীরোহন দুইটী গ্রামে সম্মিলিত হইয়া একটী মিউনিসিপ্যালিটি সংগঠিত হইয়াছে।

এখানকার জলবায়ু স্বাস্থকর বলিয়া ১৮০৫ খৃঃ অব্দে এখানে ইংরাজ সৈন্যগণের একটী ক্যানটনমেণ্ট হয়। ১৮২৯ অব্দে পেশবার বংশধর নারায়ণ রাও আসিয়া মহা ধূমধামে এখানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি এখানে সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করাইয়াছেন। তাঁহার আগমনের জন্য দক্ষিণ হইতে অনেক ব্যবসায়ী এখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সিপাহী বিদ্রোহীর সময় বিদ্রোহীগণ বান্দার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ককরেল সাহেবকে হত্যা করার পর নারায়ণ রাও আট মাসকাল স্বাধীনভাবে দেশের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালন করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ অবসানে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের গচ্ছিত যে অসংখ্য ধনরত্ন তাঁহার রাজপ্রাসাদের বড়া নামক গম্বুজওয়ালা প্রকোষ্ঠে বদ্ধ ছিল তৎসমুদয় ইংরাজগণ হস্তগত করিয়া লন ও ঐ বিপুল অর্থ গবর্ণমেণ্ট আপন সৈন্যগণকে পুরস্কার স্বরূপে বিতরণ করেন। বিদ্রোহের পর হইতে কড়ির অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেকটা মলীন হইয়াছে।

কণারক—ইহার সংস্কৃত নাম কোনার্ক। উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলার একটী দেব মন্দির এই নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহা পুরী হইতে সাড়েনয় ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। অতি প্রাচীনকালে সৌর সম্প্রদায় অর্থাৎ সূর্য্য উপাসক-দিগের একটী অতি প্রধান তীর্থস্থান ছিল। পুরুষোত্তমতত্ত্ব নামক ধর্ম্মগ্রন্থে ইহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে "কোনার্কের [১] সমুদ্রতীর ভক্তি, মুক্তি, ফল প্রদ তথায় সাগরে স্নান করিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ প্রদান ও প্রণাম করিলে কি নর কি নারী সকলেই সকল কামনার ফল লাভ করে। অনন্তর পুষ্প হস্তে ব্যাকালাপ না করিয়া সূর্য্য মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই ভানু দেবতাকে পূজা ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। ইহাতে মানব দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া সূর্য্যোপাসনা এবং সূর্য্যোপাসনা ভাঙ্গিয়া বিষ্ণু ও তৎপরে কালক্রমের পুরুষোত্তমের জগন্নাথের উপাসনায় যে পরিণত এই মন্দিরটী তাহার একটী অপূর্ব্ব স্মৃতি-

---

"কোনার্ক স্তোদধেস্তীরং ভক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্।
স্নাত্বৈব সাগরে সূর্য্যায়ার্ঘং দত্বা প্রণম চ।
নরো বা যদি বা নারী সর্ব্বকামং ফলং লভেৎ।
ততঃ সূর্য্যালয়ং গচ্ছেৎ পুষ্পমাদায়বাগতঃ।
প্রবিশ্য পূজয়েন্তানুং কুর্য্যাত্তং ত্রিপ্রদক্ষিণম।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।"

চিহ্ন। উড়িষ্যার ঐতিহাসিকগণ বলেন এই মন্দির ১২৩৭ এবং ১২৮২ খৃঃ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার এখন অতি ভগ্নদশা তথাপি ইহার শোভা বা সৌন্দর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার ভাল প্রস্তর ও অন্যান্য উপকরণ পুরীর মন্দির নির্ম্মাণের জন্য লওয়া হইয়াছে। এই মন্দিরটী দেখিলে বোধ হয় যেন কোন বিরাট পুরুষ মহাকালের অসীম প্রভাব দেখিয়া স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া শূন্যদৃষ্টে সাগরের দিকে চাহিয়া আছেন। এই মন্দিরগাত্রে যে সমস্ত মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে তাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য শিল্পীগণ শতমুখে হিন্দুদিগের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের প্রশংসা করিয়ছেন। সম্পূর্ণাবস্থায় ইহাতে চারটি প্রকোষ্ঠ ছিল, এখন কেবল একটী মাত্র বিদ্যমান আছে—এটী দরবার প্রকোষ্ঠ ইহার সুবৃহৎ প্রবেশ দ্বার পূর্ব্বমূখী, ইহা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ও লতা নিচয়ের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে বাহিরের জগমোহনের ভগ্নস্তূপ পর্ব্বতাকারে জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে। বাহিরের প্রাচীর সকলের গাত্রে যে সমস্ত মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে সে গুলির ভাস্কর্য্য অতীব প্রশংসনীয় হইলেও মূর্ত্তি সমস্ত নিতান্ত অশ্লীল ভাবের। অপ্সরী-দিগের মূর্ত্তি অতি সুন্দররূপে খোদিত হইয়াছে, গজেন্দ্রগণ স্বভাবসুলভ মন্দ পাদবিক্ষেপে গমন করিতেছে, জীবন্ত হস্তী যে প্রকার জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হয় খোদিত ভাস্কর্য্যেও ঠিক সেইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। লাঠিয়াল, পক্ষবিশিষ্ট বিচিত্র পশুমূর্ত্তি, সুসজ্জিত অশ্ব যোদ্ধৃপুরুষকে লইয়া স্বগর্ব্বে গ্রীবা বক্র করিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়াছে, প্রভৃতি নানা ঢঙ্গের ও নানা ভঙ্গীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সমস্ত স্থানে স্থানে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম এই চারিটী প্রবেশ দ্বার, ইহার প্রত্যেকটীতেই দুই দুইটী করিয়া ক্লোরাইট অর্থাৎ নীলাভ অতীব কঠিন এক জাতীয় প্রস্তরের চৌকাঠ আছে। এই চৌকাঠের উপর অতিশয় মোটা মোটা লোহার বীম উর্দ্ধে প্রাচীরের আধার স্বরূপ বিলম্বিত রহিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকের প্রবেশ দ্বারের উপর এক খণ্ড সুবৃহৎ ক্লোরাইট মার্ব্বেলের প্রস্তরে সাতটী বারের অধিষ্ঠাত্রী সাতটী গ্রহ এবং রাহু ও কেতুর মূর্ত্তি খোদিতছিল। ইহার ভাস্কর্য্যের পারিপাট্য ও বিচিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া কতক-গুলি য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ এই প্রস্তর খানিকে কলিকাতায় মিউজিয়মে আনিয়া রাখিতে সঙ্কল্প করেন। আনিবার অন্য কোন সুবিধা নাই, একমাত্র জাহাজে করিয়া আনা যাইতে পারে, এই ভাবিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রস্তরখানি বাহিত হওয়ার ব্যয় জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রীহিত হইল। চাঁদার যে টাকা উঠিল, তাহাতে সেই সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডকে মন্দির হইতে দুইশত গজমাত্র সরাইয়া রাখার খরচ সঙ্কুলান হয়। এখন এই প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সমুদ্র ও মন্দিরের মধ্যপথে পড়িয়া আছে লোকে ইহাকে দেবমূর্ত্তি জ্ঞানে তৈল ও সিন্দুর দ্বারা বিলেপিত করিয়া ইহার বিচিত্র ভাস্কর্যের নানা প্রকার দুর্দ্দশা করিয়াছে।

অতি সুন্দর সম্মর প্রস্তরের বিচিত্র ভাস্কর্য্য শোভিত তিনটী চত্তালের উপর মোচার ন্যায় আকারের একটী ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার চূড়াটী প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে

সংগঠিত, ইহার সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য হস্তী অশ্ব ও পদাতি মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে ফারগুসাম সাহেবের গ্রন্থে এই মন্দিরের বর্ণনা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন প্রাচীনকালে হিন্দু ভাস্কর্য্যের কতদুর উন্নতি হইয়াছিল।

কনোজ—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ফরাক্কাবাদ জেলার একটী অতি প্রাচীন নগর। কালা নদীর পশ্চিম তটে, গঙ্গা ও কালী নদীর সম্মিলন স্থানের পাচ ক্রোশ উজানে ইহা অবস্থিত। রামায়ণে ইহার এইরূপ বর্ণনা আছে।

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই সমৃদ্ধ বন শোভিত দেশটী কোন প্রদেশ তাহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি আপনি যথা তত্ত্ব নির্দ্দেশ করুন। তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন—হে রাঘবনন্দন। (১) সদ্‌ব্রতানুষ্ঠায়ী মহা তপস্বী মহাত্মা সজ্জনপূজক কুশ নামক একজন প্রধান ব্রহ্মনন্দন ছিলেন। তিনি সদৃশী কুলীনা ভার্য্যা বৈদর্ভীতে কুশাম্ব, কুশনাভ অসর্ত্তরজস ও বসু নামক আত্ম-তুল্য মহাবলসম্পন্ন চারিটী পুত্রোৎপাদন করিলেন। সেই দীপ্তিশালী সত্যবাদী মহোৎসাহসম্পন্ন ধর্ম্মিষ্ঠ পুত্রদিগকে কুশ ক্ষাত্রধর্ম্মের বৃদ্ধি করণাভিলাষে কহিলেন, তোমরা প্রজাপালন কর, তাহা করিলে তোমাদিগের বিপুল ধর্ম্ম হইবে। (১) তৎকালে সেই চারি জন লোক সত্তম নরপাল কুশের বাক্য শ্রবণ কবিয়া সকলেই নগর সন্নিবেশ করিলেন। কুশাম্ব কৌশাম্বী, কুশনাভ মহোদয়, অসূর্ত্তরজস ধর্ম্মারণ্য ও বসুরাজা গিরিব্রজ নামে শ্রেষ্ঠ নগর, সকল নির্ম্মান করিলেন। কুশনাভের সংস্থাপিত এই মহোদয়নগবের আর একটী নাম কন্যাকুব্জ। এই নামের অপভ্রংশে কনৌজ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মহোদয়নগরের কান্যকুব্জ নাম হওয়ার উপাখ্যান বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রামায়নে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—“হে রঘুনন্দন! ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচী অপ্স-

---

(১) অথ রামো মহাতেজা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম।
পপ্রচ্ছ মুনি শার্দ্দূলং কৌতুহল-সমন্বিতঃ।
ভগবন্ কোম্বয়ং দেশঃ সমৃদ্ধ বনশোভিতঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রস্তে বক্তু মর্হসি তত্ত্বতঃ।
নোদিতো রামবাক্যেন কথায়ামাস সুব্রতঃ।
তস্য দেশস্য নিখিল মৃষিমধ্যে মহাতপাঃ।
ব্রহ্মযোনির্ম্মহা নাসীৎ কুশো নামো মহাতপাঃ।
অক্লিষ্টব্রত ধর্ম্মজ্ঞ সজ্জন প্রতিপূজকঃ।
স মহাত্মা কুলীনায়াং যুক্তায়াং সুমহাবলান্।
বৈদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্।

(১) কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অসূর্ত্তরজসম্ বসুম।
দীপ্তি যুক্তান্মহোৎসাহান্ ক্ষত্র ধর্ম্ম চিকির্ষয়া॥
তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ।
ক্রিয়তাং পালনং পুত্রা ধর্ম্মং প্রাপ্স্যথ পুষ্কলম॥

ষ্নাতে এক শত শ্রেষ্ঠ কন্যা উৎপাদন করেন। হে রাঘব! ক্রমে সেই সমস্ত রূপবতী কন্যারা যৌবনশালিনী হইলেন। একদা উত্তমাভরণে ভূষিতা হইয়া তাঁহারা উদ্যানে গমন করেন। বর্ষাকালে বিদ্যুৎ যেমন তিমিরাচ্ছন্ন জগৎ বিদ্যোতিত করে, তাঁহারাও সেইরূপ উদ্যান আলোকিত করিয়া তথায় নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, গুণশালিনী, নবযৌবনা কন্যাগণ পরম প্রমুদিতা হইয়া, যেরূপ মেঘ মধ্যে তারাগণ বিরাজিতা হয় সেইরূপ সেই উদ্যানে বিরাজমানা রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া সর্ব্বাত্মা বায়ু তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, "আমি তোমাদের সকলকে ভার্য্যা অভিলাষ করিতেছি, তোমরা মানুষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও, দীর্ঘ আয়ুলাভ করিবে, তোমাদিগের মৃত্যু হইবে না; বিশেষতঃ মনুষ্যদিগের যৌবন নিয়ত চঞ্চল, তোমরা অক্ষয় যৌবন লাভ করিবে।

সেই কন্যাগণ বায়ুর কথা শ্রবণ করিয়া—তাঁহাকে উপহাস করিলেন ও বলিলেন;—

হে সুরসত্তম! সকলেই তোমার প্রভাব অবগত আছি। তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ কর মাত্র, এই ত তোমাব প্রভাব! তবে কেন আর আমাদিগের অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের তনয়া, ইচ্ছা করিলে আমরা এই দণ্ডেই তোমাকে স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত করিতে পারি, কেবল তপস্যা সংরক্ষণ জন্য তাহা করিতেছি না। হে দুর্ব্বুদ্ধে! পিতাই আমাদের সকলের প্রভু ও পরম দেবতা; তিনি যাঁহার হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিবেন তিনিই আমাদিগের ভর্ত্তা হইবেন। আমাদের যেন এমন সময় উপস্থিত না হয় যখন কামবশতঃ আমরা সত্যবাদী পিতার অবমাননা করিয়া স্বয়ংবরা হইতে প্রবৃত্ত হই।

ভগবান প্রভু বায়ু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদিগের শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত অবয়ব ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহারা তদবস্থাপন্ন হইয়া নরপতি কুশনাভের নিকট গিয়া সলজ্জা ও সাশ্রুলোচনা হইয়া থাকিলেন। তখন রাজা সেই পরম শোভনা দয়িতা কন্যাদিগকে তদ্রূপ ভগ্না ও দীনা দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে পুত্রীগণ এ কি ব্যাপার, তোমরা যে চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছ না কে ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া তোমাদিগকে কুব্জা করিয়াছে তাহা বল। তিনি এইরূপ

কুশস্তবচনং শ্রুত্বা চত্বারো লোকসত্তমাঃ।
নিবেশঞ্চক্রিরে সর্ব্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা।
কুশাম্বস্তু মহাতেজা কৌশাম্বীমকরোৎপুরীম।
কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্।।
অমূর্ত্তরজসো নাম ধর্ম্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্নাম গিরিব্রজম্।।
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ।।

জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক নিস্তব্ধভাবে থাকিলেন। অনন্তর কন্যাগণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা কুশনাভ সম্মুখে নিবেদন করিলে তিনি কন্যাগণের ক্ষমাশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কিছুদিন পরে নরপতি কুশনাভ কাম্পিল্য রাজ ব্রহ্মদৈত্তকে এই শত কুব্জা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। সেই দেব পতি তুল্য প্রভাব সম্পন্ন মহীপাল ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন। তিনি সেই কন্যাগণের পাণিস্পর্শ করিবা মাত্র তখন তাঁহারা বিকুব্জা ও বিগতজ্বরা ও পরম শোভা সম্পন্না হইয়া প্রকাশমান হইলেন। রাজা কুশনাভের প্রতিষ্ঠিত মহোদয়নগরের কন্যাকুব্জ নাম হওয়ার এই ইতিবৃত্ত বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধগণ কিন্তু অন্য প্রকারে এই গল্প বর্ণনা করিয়াছেন। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন স্যাং কনোজ গিয়াছিলেন, তিনি এই নগরের কন্যাকুব্জ নাম হওয়ায় এইরূপ কারণ লিখিয়াছেন। "কন্যাকুব্জের প্রাচীন রাজধানী কুসুমপুর নগরে ব্রহ্মদৈত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার একশত পুত্র ও এক শত কন্যা জন্মে। কন্যাগণ পরমা সুন্দরী, তাহাদের রূপের সীমা ছিল না। (২) তৎকালে গঙ্গাতীরে একজন ঋষি যোগমগ্ন হইয়া বাস করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার শরীরে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ জন্মিয়াছিল।

---

(২) কুশনাভস্তু রাজর্ষি কন্যাশতমনুত্তমম্।
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ঘৃতাচ্যাং রঘুনন্দন॥
তাস্তু যৌবন শালিন্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতা।
উদ্যান ভূমি মাগম্য প্রাবৃষীব শতহ্রদাঃ।
গায়ন্ত্যো নৃত্য মানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব।
আমোদং পরমং জগ্মুর্বরাভরণ ভূষিতাঃ॥
অথ তাশ্চারু সর্ব্বাঙ্গ্যো রূপেণা প্রতিমা ভুবি।
উদ্যান ভূমি মাগম্য তারা ইব ঘনান্তরে॥
তাঃ সর্ব্বা গুণ সম্পন্না রূপ যৌবন সংযুতাঃ।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বাত্মকো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ।
অহং বঃ কাময়ে সর্ব্বা ভার্য্যা মম ভবিষ্যথ।
মানুষস্ত্যজতাং ভাবো দীর্ঘ মায়ুর বাপ্স্যথ।
চলং হি যৌবনং নিত্যং মানুষেষবিশেষতঃ।
অক্ষয়ং যৌবনং প্রাপ্তা অমর্য্যাশ্চ ভবিষ্যথ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বায়োরক্লিষ্ট কর্ম্মণঃ।
অপহাস্য ততো বাক্যম কন্যাশতমথাব্রবীৎ॥
অন্তশ্চরসি ভূতানাং সর্ব্বেষাং সুরসত্তম।
প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে সর্ব্বাঃ কিমর্থমবমন্যসে॥
কুশনাভসুতা দেব সমস্তাঃ সুরসত্তম।
স্থানাচ্চ্যাবয়িতুং দেবং রক্ষামস্তু তপো বয়ম্।
মা ভূৎস কালো দুর্ম্মেধ পিতরং সত্যবাদিনম

তাঁহার তপোবন নিরীক্ষণ করিয়া সকলে তাঁহাকে মহাবৃক্ষ ঋষি বলিত। একদিন ধ্যানাবসানে তিনি কন্দ মূলাদি অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় গঙ্গার উপকূলে দিব্য রূপধারিণী শত রাজকুমারীকে দেখিতে পাইলেন। রাজকন্যাগণের অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে ঋষির মন টলিল, ছার সংসার সুখের ইচ্ছায় তাঁহার মন কলুষিত হইল, ঋষি বিলম্ব না করিয়া কুসুমপুরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রাজা ঋষির আগমন বার্ত্তা শুনিয়া স্বয়ং আসিয়া— যথা নিয়মে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিনয় নম্র বচনে তাঁহাকে কহিলেন—মহর্ষে! আপনার কুশল ত, আপনার ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই? ঋষি উত্তর করিলেন, রাজন আমি বিজন অরণ্যে বহুদিন সুখে ছিলাম, ধ্যান ভঙ্গ হইলে বেড়াইতে বেড়াইতে আলোকরূপ সম্পন্না আপনার কন্যাগণকে নরীক্ষণ করিলাম, সেই অবধি আমার হৃদয়ে কামেচ্ছা বলবতী হইয়াছে। রাজন আপনি একটি কন্যা আমাকে সম্প্রদান করুন, এইমাত্র আমার অনুরোধ। রাজা এই সকল শুনিয়া ঋষিকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আপনার আশ্রমে গিয়া এক্ষণে বিশ্রাম করুন, শুভ সময়ে আপনাকে সংবাদ দিব, এই আমার প্রার্থনা. ঋষি আপন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে রাজা ব্রহ্মদত্ত একে একে সকল কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইলেন, কিন্তু কেহ ঋষিকে বিবাহ করিতে চাহিল না। রাজা ঋষির ভয়ে অত্যন্ত ভীত ও মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, বাবা! আপনার দুঃখ দূর করুন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি ঋষির প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

তাহার সুমিষ্ট কথায় রাজা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন এবং বিবাহের দ্রব্য লইয়া ঋষির আশ্রমে গিয়া তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে। আপনার সেবা সুশ্রুষা করিবার জন্য আমার কন্যাকে আনিয়াছি। ঋষি সেই অল্পবয়সী কন্যাকে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজন্ দেখিতেছি এই বৃদ্ধকে ঘৃণা করিয়া এক অপোগণ্ড শিশুকে

অবমন্ত স্বধর্ম্মেণ স্বয়ংবরমুপাস্মহে ॥
পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমঞ্চ সঃ।
যস্য নো দাস্যতি পিতা সনো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥
তাসাং তুবচনং শ্রুত্বা হরিঃ পরম কোপনঃ।
প্রবিষ্য সর্ব্বগাত্রাণি বভঞ্জ ভগবান্ প্রভুঃ ॥
তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশুনৃপতে র্গৃহম।
প্রবিশ্য চ সুসম্ভ্রান্তাঃ সলজ্জা সাস্রলোচনাঃ।
স চ তা দয়িতা ভগ্নাঃ কন্যাঃ পরম শোভনাঃ।
দৃষ্ট্বা দীনাস্তদা রাজা সম্ভ্রান্ত ইদমব্রবীৎ।
কিমিদং কথ্যতাং পুত্র্যাঃ কো ধর্ম্ম মবমন্যতে।
কুব্জাঃ কেন কৃতাঃ সর্ব্বা শ্রেষ্টন্তোনাভিভাষথ ॥
এবং রাজা বিনিশ্বস্য সমাধিং সন্দধে ততঃ।

আমায় সম্প্রদান করিতে আসিয়াছ। রাজা বিনীত ভাবে কহিলেন, মহর্ষে! আমি আমার সকল কন্যাকেই কহিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইল না, কেবল আমার এই কনিষ্ঠা কন্যা আপনার সেবা করিতে অভিলাষী হইয়াছে। তখন ঋষি অত্যন্ত রোষ পরবশ হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, যেন সেই ৯৯ই জন কন্যা এই মুহূর্ত্তে কুব্জা হয়, সেই বিকৃতাঙ্গীদিগকে এজগতে কেহ যেন আর বিবাহ না করে। রাজা কন্যাদিগের নিকট অতি সত্বরে দূত পাঠাইলেন, দূত আসিয়া দেখিল, রাজকন্যাগণ বিকৃতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই নগরের নাম কন্যাকুব্জ হইল।"

কনৌজের নামকরণ সম্বন্ধে এই দুইটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ফেরেস্তা ও অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাসে ইহার বিবরণ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

১০১৬ খৃঃ অব্দে যখন মামুদ গজনভী আসিয়া কনৌজ আক্রমণ করেন তখন তিনি ইহার যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন তাহা ফেরেস্তা স্বীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন মামুদ গগনস্পর্শী প্রাসাদ পুঞ্জ (৩) পরিশোভিত এক নগর দেখিলেন। নির্ম্মাণ পারিপাট্য ও দৃঢ়তার জন্য ইহা যথার্থই অদ্বিতীয় বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিত। ইহার ঠিক এক শত বৎসর (৯১৫) খৃঃ অব্দ পূর্ব্বের লিখিত মৌসদীর গ্রন্থে কনৌজ এক জন হিন্দু নরপতির রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আবার ৯০০ খৃঃ অব্দে আরব দেশীয় ঐতিহাসিক ইবনওয়াহেবের লিখিত বর্ণনা প্রামাণ্য করিয়া আবুজাহেদ কনৌজকে গোজার রাজ্যের একটী সুবৃহৎ নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার আরও পূর্ব্বে ৬৩৪ খৃঃ অব্দে হোয়েন সাঙ এই নগর দেখিয়া (৪) স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে এই নগরের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন মাইল এবং বিস্তার তিন পোয়া মাইল। ইহা দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং সুগভীর পরীখা পরিবেষ্টিত ও পূর্ব্বদিকে গঙ্গা সলিল দ্বারা বিধৌত। হোয়েঙসাঙের শেষোক্ত কথাটী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পরিব্রাজক ফাহিয়ানের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। তিনি ৪০০ খৃঃ অব্দে যখন এই নগর দেখেন তখন ইহা গঙ্গা তীরে অবস্থিত ছিল। বীল সাহেব কৃত ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ গ্রন্থে এই কথা দেখা হইয়াছে।

টলোমি ১৪০ খৃঃ অব্দের গ্রীক ঐতিহাসিক, ইনি কনৌজকে কানোগিজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চীন পরিব্রাজক হোয়েনসাঙ যে সময় কনোজে আসিয়াছিলেন তখন প্রবল পরাক্রান্ত

---

(3) He there saw a city which raised its head to the skies and which in Strength and Structure might justly boast to have no equal (Briggs Feris taha).

(4) Twenty li or three half miles in length, and four or five li or three quarter of a mile, in breadth. The city was surrounded by Strong walls and deep ditches and was washed by the Ganges along its eastern face. Julien Page 343.

রাজা হর্ষবর্দ্ধন তথাকার অধিপতি ছিলেন। নৃপতি হর্ষবর্দ্ধনকে পরিব্রাজক বৈশ্যবংশ-সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এরূপ করা যে তাঁহার মহাভুল হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি বায়সে রাজপুতকে বৈশ্য বুঝিয়াই এরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন। বৈশ্য হইলে হর্ষবর্দ্ধন কি প্রকারে মানব ও বল্লভী রাজপুতবংশের সহিত বৈবাহিকসূত্রে সম্বদ্ধ হইতেন। বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ নগরের উপকণ্ঠ হইতে খারামাণিকপুর পর্য্যন্ত অযোধ্যা প্রদেশের সমগ্র দক্ষিণাংশ বায়সওয়ারা রাজপুতগণের অধিবাসস্থল। প্রথিতনামা শালিবাহন নরপতি এই শ্রেণীর রাজপুতগণের আদি পুরুষ। গঙ্গার উত্তর তীরে দাউন্দিয়া খারা নামক নগরী শালিবাহনের রাজধানী। এই বংশায় রাজপুতগণের পূর্ব্বপুরুষেরা যে দিল্লি হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমগ্র আন্নুগাঙ্গ দ্বাবা প্রদেশের অধিপতি ছিলেন তাহাদের অধিবাসস্থান কনোজের অতি সান্নিধ্য হওয়ায় সেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাভারত পাঠে দেখা যায় যে কনোজ পূর্ব্বে পাঞ্চাল রাজ্য বলিয়া আখ্যাত হইত। মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোকে লিখিত আছে (১) কুরুক্ষেত্র, মৎস্যদেশ, পাঞ্চাল ও মথুরা এই কয়েকটী দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে, ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট।

মহাভারত আদিপর্ব্বের একশত উনচল্লিশ অধ্যায়ে লিখিত আছে (২) দ্রোণ বলিলেন—"হে যজ্ঞসেন এই কারণে তোমাকে পুনরায় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের অধিপতি হইলে এবং আমিও উত্তর কূল শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম।"

দ্রুপদ বিষণ্ণ মনে গঙ্গার (৩) উপকূলে জনপদসম্পন্ন মাকন্দীনগরী ও কাম্পিল্য পুরী শাসন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাভব করিয়া চর্ম্মণ্বতী (অধুনা ইহাকে চম্বল বলে) নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ পাঞ্চাল দেশ আপন অধিকারে আনিলেন।"

---

(১) কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥

(২) অরাজা কিল নোঃ রাজ্ঞঃ সখা-ভবিতুমর্হতি।
অতঃ প্রযতিতং রাজ্যে যজ্ঞসেন ময়াতব॥
রাজাসি দক্ষিণে কূলে ভাগীরথ্যাহমুত্তরে।
সখায়ং মাং বিজানিহী পাঞ্চল যদি মন্যসে॥

(৩) মাকন্দীমথ গঙ্গায়া স্তীরে জনপদাযুতাম্।
সোহধ্যাবসদ্দীনমনাঃ কাম্পিল্যঞ্চ পুরোত্তমাম্
দক্ষিণাংশ্চাপি পাঞ্চালান্ যাবচ্চর্ম্মণ্বতী নদী
দ্রোণেন চৈবং দ্রুপদ পরিভূয়াথ পালিতঃ॥

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে পাঞ্চাল দুইভাগে বিভক্ত,উত্তর-পাঞ্চাল যাহার আধিপত্য দ্রোণাচার্য্য স্বহস্তে রাখিলেন। এই প্রদেশের মধ্যে সাহাবাদ, সাহজেহানপুর, বদাওন ও বেরেলি ছিল। দ্রুপদরাজ্য দক্ষিণ-পাঞ্চালের মধ্যে এখনকার ফরক্কাবাদ, কনৌজ, এটোয়া সিন্ধিয়ারাজ্য, ও বুন্দেলখণ্ড অবস্থিত ছিল। (পাঞ্চাল শব্দ দ্রষ্টব্য)

চীনপরিব্রাজকের প্রকাশিত প্রাচীন কনোজের বৃত্তান্তে, যে সমস্ত কথা লিখিত হইয়াছে সুযোগ্য কনিংহ্যাম সাহেব বর্ত্তমান কনোজে তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত হৃদয়ে লিখিয়াছেন—"আমি বাধ্য হইয়া দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমি পরিব্রাজকের বর্ণিত একটী স্থানের সহিত বর্ত্তমান কনোজের একটী স্থানও মিল করিতে পারিলাম না। মুসলমানেরা হিন্দু-অধিকারের চিহ্ন সমূলে বিলুপ্ত করিয়া (১) ফেলিয়াছে। এদেশের অধিবাসিগণের মুখে শুনা যায় যে প্রাচীন নগর উত্তরে বর্ত্তমান রাজঘাটের সন্নিহিত হাজি হার্ম্মায়ানের সমাধি স্থান হইতে দক্ষিণে মিরাঙ্কধ-সর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বোক্ত উভয়স্থানের ব্যবধান তিন মাইল।

ইহার পূর্ব্বসীমা গঙ্গার প্রাচীন খাত যাহাকে লোকে এখন ছোটগঙ্গা বলিয়া থাকে, কিন্তু য়ুরোপীয়গণের প্রকাশিত মানচিত্রে ইহাকে কালীনদী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এদেশীয়গণ বলে পূর্ব্বে কালীক কালীন্দি নদী সংগ্রামপুরের নিকট গঙ্গার সহিত সম্মিলিত ছিল কিন্তু বহু শত বৎসর অতীত হইল গঙ্গা এই পূর্ব্ব প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূর উত্তরে সরিয়া গেলে কালীনদী, একাকী গঙ্গার পরিত্যক্ত খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এখনও কালীনদী ও সংগ্রামপুরের মধ্যে ঐ খাত বিদ্যমান আছে তজ্জন্য ঐ জনশ্রুতি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য বটে। যে প্রবাহিনী এখন কনোজের নিম্নে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে আজ কাল কেবল কালীনদীর সলিল স্রোতই দৃষ্ট হয় সত্য কিন্তু অতি পূর্ব্বে পূতসলিলা গঙ্গা এই খাত দিয়া প্রবাহিত হইতেন। ফাহিয়ান ও হোয়েঙ সাঙ উভয় চীনপরিব্রাজকই কনোজ গঙ্গাসলিল বিধৌত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা প্রথমতঃ জনশ্রুতি দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে এবং দ্বিতীয় পূর্ব্বোক্ত ছোট গঙ্গার খাত অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকায় পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

১০১৮ খৃঃ অব্দে মামুদ গজনাভী কনোজ আক্রমণ ও বিলুণ্ঠিত করেন; তাহার পর মহম্মদ ঘোরীর হস্তেও ইহার নানা প্রকার দুর্দ্দশা ঘটে। ১৫৪০ খৃঃ অব্দে সের-সা পাঠান, বাদসাহ হুমায়ুনকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে

In Comparing Heven Thsang's description of ancient Kanoj with the existing remains of the City, I am obliged to confess with regret that I have not been able to identify even one solitary site with any certainity, so completely has almost every, trace of Hindu occupation been obliterated by the Musulmans, (Cunminghom)

ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড আচ্ছিন্ন করিয়া লন। এখন পাঁচটী গ্রাম আচ্ছাদিত করিয়া প্রাচীন কনোজের ধ্বংসাবশেষ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দুইক্রোশ ব্যাসের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। প্রাচীন প্রাসাদগুলি প্রায়ই ইষ্টকনির্ম্মিত, অদ্যাপি এই সমস্ত প্রাসাদের ভিত খুঁড়িয়া অধিবাসিগণ ইট বাহির করিয়া লয় এবং তাহারা নূতন ইমারত প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সহরটী অত্যুন্নত মৃত্তিকাস্তূপ ও স্থানে স্থানে ঢালু জমির উপর সংস্থাপিত আছে। যাওয়া আসার পথগুলির থাড়াই অত্যন্ত অধিক, মহল্লা ও বস্তি সমস্ত অতি সঙ্কীর্ণ নিম্ন ভূমির উপর সংগঠিত। প্রাচীন সহরের প্রাসাদপুঞ্জের উপর এখনকার অধিবাসিগণ গৃহাদি নির্ম্মাণ করায় সহরটী দেখিতে কেমন এক প্রকার বিশ্রী ভাঙ্গর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আধুনিক সহরের মধ্যে তুরাবালির বাজার ও বড় বাজার এই দুইটী বেস গুলজার। ১৮৭১ সালে এখানে সতর হাজার তিরানব্বই জন লোকের বাস ছিল। এখনকার অধিবাসিগণের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ১০,০৫৭, মুসলমান ৬১২৩, জৈন ৪৬৬ মোট অধিবাসী ১৬,৬৪৬। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের সেনসস রিপোর্ট হইতে অধিবাসী সম্বন্ধীয় বিবরণ সংগৃহীত হইল।

এখানকার প্রাচীন প্রাসাদ, মন্দির, সমাধিস্থান ও দুর্গাদির সম্বন্ধে কনিংহাম অনেক কথা লিখিয়াছেন। এখানে তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

এখানে যে সমস্ত প্রাচীন প্রাসাদ, রাজভবন, সমাধি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

(১) রাজভবন যাহাকে এখানকার অধিবাসিগণ রঙ্গমহল বলে।

(২) জুম্মা মসজীদের যে সমস্ত হিন্দুস্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৩) মকদ্দম জাহানীয়ার মসজীদের হিন্দু স্তম্ভ শ্রেণী।

(৪) সিংহভবানী গ্রামে যে সকল প্রস্তর মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

রঙ্গমহল্লের প্রাসাদ রাজা অজয়পালের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ ইহাঁকে জয়পাল নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মামুদ গজনাভী যথন কনোজ আক্রমণ করেন তথন ইনিই রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এই প্রাসাদের এখন আর কিছুই নাই কেবল পুরাতন দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি দুই শত চল্লিশ ফিট্ দীর্ঘ কঙ্কর বিলেপিত অতি দৃঢ় প্রাচীর আছে। প্রাচীরটী পঁচিশ ফিট উচ্চ। ইহার সম্মুখে চারিটী ১৪ ফিট প্রস্থ বুরুজ আছে। বুরুজগুলি একষট্টি ফিট করিয়া ব্যবধানে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীরটা উর্দ্ধে সাত ফুট পুরু, ইহার পশ্চাদ্ভাগে দশ ফুট তফাতে আর একটী পাঁচ ফিট পুরু, আবার তাহার সাড়ে নয় ফুট অন্তরে আর একটী সাড়ে তিন ফুট পুরু প্রাচীর আছে। প্রাচীরগুলির ব্যবধান দেখিলে পুরাতন রাজভবনের কতকগুলি কক্ষের আয়তনের কথা স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়। এই সমস্ত প্রাচীরাদি

দেখিয়া অনুমান করা যায় যে রাজভবনটী দুইশত চল্লিশ ফিট দৈর্ঘ্য ও একশত আশী ফিট প্রস্থের একটী ক্ষেত্রোপরি অবস্থিত ছিল। গত ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে এই রাজবাটীর দক্ষিণপূর্ব্বদিকের বুরুজের নিকট একস্থানে ১৯ খণ্ড সোণার থামী পাওয়া গিয়াছিল। ইহার প্রত্যেক থামী ওজনে একসের হইয়াছিল। কানপুরের কালেক্টার এই থামীর ৯ খণ্ড প্রাপ্ত হন, অবশিষ্টগুলি যে সব লোক থামী বাহির করে, তাহারই আত্মসাৎ করিয়াছিল। এখানকার পোদ্দারগণ বলে যে, যে নয় খানা থামী কানপুরের কালেক্টারের নিকট দাখিল করিয়া দেওয়া হয় সেইগুলির ওজনই পোনে উনিশ সের ছিল।

(২) জুম্মা বা দীন্ মসজীদটী প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম ও স্তম্ভাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মসজিদ যে উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে তথায় পূর্ব্বে "সীতাকারসুই" নামে একটী অতি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত অট্টালিকা ছিল। জোনপুরের যবন রাজা ইব্রাহিম সাহা সেই অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া তাহারই উপকরণে এবং তাহারই অবস্থান ক্ষেত্রের কিয়দংশের উপর এই মসজিদ নির্ম্মাণ করান। মসজিদের দ্বারের প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে, ইহা হিজরা ৮০৯ শকে ইব্রাহিম সাহার শাসন সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদটী ১০৮ ফিট দীর্ঘ ও ২৬ ফিট প্রস্থের একটী কক্ষ। ইহার ছাদ সমতল, চারটী স্তম্ভশ্রেণী ঐ ছাদকে ধারণ করিয়া আছে। মসজিদের সম্মুখে একটী সুবিস্তীর্ণ আঙ্গিনা আছে এবং ইহা ছয় ফুট পুরু প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত।

ছোট গঙ্গার অদূরে পুরাণ কেল্লার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে শীখানা মহল্লায় মকদ্দম জাহানীয়ার মসজিদ। একটী উচ্চ স্তূপের উপর ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্তূপটীর উচ্চতা ৪০ ফিট এখানে অনেক তন্তুবায় বাস করিয়া থাকে।

মকদ্দমের মসজিদ একটী সাধারণ রকমের ইমারত্। ইহা ৩৫ ফিট্ স্কোয়ারের ক্ষেত্র যুড়িয়া অবস্থিত। ইহার নিকটে মকদ্দমের বংশধরগণের আরও দুইটী সমাধি আছে মসজিদের দ্বারে লেখা আছে " সৈয়দ জেলাল মকদ্দম জেহানীয়ার শবের উপর তদীয় পুত্র রাজু ৮৮১ হিজিরা শকে অর্থাৎ ১৪৭৬ খৃঃ অব্দে জোনপুররাজ হোসেন সাহার রাজত্বকালে এই সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করান। এই সমাধির চতুর্দ্দিকে একটী প্রাচীর ও চারিটী বুরুজ আছে। দক্ষিণ দিকে প্রবেশ দ্বার। প্রবেশ দ্বারের একটি ধাপের উপর একটী ষষ্ঠী দেবীর মূর্ত্তি ও একটী স্তম্ভের মূলভাগ দৃষ্ট হয়। স্তম্ভমূলে "সংবৎ ১১৯৩" এই অক্ষরগুলি খোদিত আছে। লোকে বলে ইহার নিকট একটী বৃক্ষমূলে আর একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি ছিল। এই সমস্ত কথা পর্য্যালোচনা করিলে এই উন্নত স্তূপটীও যে এক সময় একটি সুবৃহৎ হিন্দু-অট্টালিকা ছিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

এক শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, সিংহভবানী নামক পল্লির একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্র

গৃহের সন্নিহিত একখানি ক্ষেত্রের মধ্য হইতে দুইটী প্রস্তর মূর্ত্তি বাহির হয়। ঐ দুইটী এখনও পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহেই রক্ষিত হইয়াছে। এই দুইটী মূর্ত্তিই অষ্টভুজবিশিষ্ট। একটীর মস্তকোপরি বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও সিংহ অবতারের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এখানে এ দুইটী রামলক্ষ্মণের মূর্ত্তি বলিয়া পূজিত হয়। এ দুইটী তিন ফিট উচ্চ। অন্যান্য আরও কতকগুলি মূর্ত্তির মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের উপাস্য দেবতা বজ্রবারাহী-দেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। গৃহের বাহিরে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা এবং হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে।

কনোজের মধ্যে সূর্য্যকুণ্ড স্থানটী অতি বিখ্যাত। ইহা মকরন্দ নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। কুণ্ডটী এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে এখন আলু রোপিত হইয়া থাকে। কুণ্ডের পার্শ্বে মহাদেবের মন্দির আছে। প্রত্যেক ভাদ্র মাসে এখানে একটী করিয়া মেলা হয়।

এখানে বৌদ্ধরাজগণের আধিপত্য ছিল। তাঁহাদের সময়ের নির্ম্মিত অসংখ্য বিহার, মঠ ও প্রাসাদের কথা হোয়েন সঙ ও অন্যান্য পরিব্রাজকদের গ্রন্থে দেখা যায় কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহার একটীরও চিহ্ন নাই। বর্ত্তমান ডাকবাঙ্গালার নিকট কপোতেশ্বরীতে অনেক বৌদ্ধমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

কপিল মুনি—বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তঃপাতী কালনা জেলায় কপোতাক্ষ নদীর তীরে এই গ্রামখানি অবস্থিত। কপিল নামক একজন সাধু পুরুষ এখানে বাস করিতেন তজ্জন্য ইহার কপিল মুনি নাম হইয়াছে। সগরবংশধ্বংসকারী সেই অমিত তেজস্বী কপিলের সঙ্গে ইহাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। এই সাধু এখানে কপিলেশ্বরী নাম্নী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; অদ্যাপিও সেই দেবীর পূজা হয়। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি বারুণি স্নানের দিন এখানে বৃহৎ একটী মেলা হয়। কপিল-দেবের পুণ্যপ্রতাপে সেই দিন কপোতাক্ষ নদীর জল জাহ্নবী জলের ন্যায় পূত ও পবিত্র এবং সর্ব্বপাপক্ষয়কর হইয়া থাকে। এখানে জাফর আলি নামক একজন মুসলমান ফকিরের সমাধি স্থান আছে, উহা বঙ্গীয় মুসলমানগণের একটী পুণ্যতীর্থ। কতকগুলি লাখরাজভোগী ফকিরগণের হস্তে এই সমাধি মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত আছে।

কপোতাক্ষ—বাঙ্গালা প্রদেশের একটী নদী। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চাঁদপুর গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া যে শাখা বক্রভাবে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া কতক দূর গিয়া পরে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে ও যাহা একদিকে নদীয়া জেলা ও চব্বিশ পরগণা ও অন্যদিকে যশোহর জেলার সীমা রেখারূপে বিলম্বিত আছে সেই নদীটীই কপোতাক্ষ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। চব্বিশ পরগণার মধ্যে আশাশুনি নামক যে একটী গ্রাম আছে, তাহার আড়াই ক্রোশ পূর্ব্বে মরীছাপ গাঙ্গ কপোতাক্ষে সম্মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলন স্থানের এক ক্রোশ ভাটীতে এই নদী হইতে চাঁদখালি খাল বাহির হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই খাল যশোহর জেলায় প্রবিষ্ট

হইয়াছে, ইহার ভিতর দিয়া ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করা যায়। কপোতাক্ষ পরে দক্ষিণে বহুদূর গিয়া খোলপেতুয়ার সঙ্গে মিলিত হইয়া, পাঙ্গাসী, বড় পাঙ্গা, নামগড়, সমুদ্র প্রভৃতি নানাস্থানে নানা নামে আখ্যাত হইয়া অবশেষ মালঞ্চী নাম ধারণ করিয়া সাগর বক্ষে স্বীয় সলিলরাশি বিসর্জ্জিত করিতেছে।

কমোরীণ—ইহার দেশীয় নাম কন্যাকুমারী। এখানে ভগবতীর কুমারী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রীকদেশীয় ভৌগোলিকগণ এই দেবীর স্নানযাত্রায় মহোৎসবের কথা তাঁহাদের গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এই নামের যে অন্তরীপ মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ত্রিবাঙ্কুর জেলার সুদূর দক্ষিণ সীমায় বিদ্যমান আছে, গ্রামটীও তাহারই নিকট। কমোরীণ অন্তরীপ হইতে পশ্চিম ঘাটগিরি শ্রেণী উত্তরাভিমুখী হইয়াছে। এখানে পূর্ব্বে একটী বন্দর ছিল, কিন্তু এই স্থানে সমুদ্র সময় সময় বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া তীরস্থ প্রদেশ আত্মসাৎ করে, তজ্জন্য সে বন্দরটী ধ্বংস হইয়াছে। এখনও মিঠা জলের একটী কূপ সমুদ্র সমীপে পর্ব্বতের মধ্যে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে যে এখানে বন্দর ছিল এই মধুর জলের কূপটী অদ্যাপি তাহার প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়া ছে।

কর্ণাট।—বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎ সংহিতাগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে (১) "দক্ষিণে কর্ণাট, মহাটবী চিত্রকূটগিরি, নাসিক্য, কোল্ল ইত্যাদি দেশ"। বাল্মীকি রামায়ণে চিত্রকূটের উল্লেখ আছে কিন্তু কর্ণাট দেশের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। "পিতৃসত্য পালনার্থে রামের বনগমন প্রসঙ্গে অযোধ্যা হইতে চিত্রকূট পর্য্যন্ত বাল্মীকি এইরূপ পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ মুখে আসিয়া তমসা নদী (বর্ত্তমান Rivier Tons) পার হইয়া কোশলদেশের সীমা সন্নিকট করিয়া, বেদশ্রুতি নদী পার হওনান্তর দক্ষিণমুখে গিয়া গোমতী নদী পার হইলেন। তথা হইতে স্যন্দিকা নদী পার হইয়া কোশলদেশ অতিক্রম করিলেন। তথা হইতে গমন করিয়া নিষাদরাজ গুহ-কর্ত্তৃক শাসিত শৃঙ্গবেরপুর প্রাপ্ত হইলেন। তথায় গঙ্গা পার হইয়া বৎ[illegible] হইতে প্রয়াগাভিমুখে গমন করিলেন। সেখান হইতে পশ্চিমমুখে যমু[illegible] কতকদূর গিয়া, উহার পরপারে দশ ক্রোশ অন্তরে চিত্রকূট পর্ব্বত[illegible] এখনকার বুন্দেলখণ্ডের কামত পাহাড়ই চিত্রকূট। ইহার দৃশ্য অতি[illegible] পর্য্যন্ত যে পথের বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অতি সুন্দর ও অভ্রান্ত [illegible] রামের দক্ষিণ গমনের পথ সেরূপে বর্ণিত হয় নাই। তাহাতে কোন[illegible] মাত্র দৃষ্ট হয় না। কেবল রাক্ষস ও ভয়ঙ্কর জন্তুবর্গসঙ্কুল ভীষণ ব[illegible] রামকে লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় বাল্মীকির সময়ে [illegible] অসভ্য-নিবাস ছিল, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী আর্য্য ঋষির আশ্রম[illegible] তজ্জন্য কর্ণাট দেশের নাম রামায়ণে দৃষ্ট হয় না।

(১) কর্ণাট মহাটবি চিত্রকূট নাসিক্য কোল্লগিরি চোলাঃ। (বৃহৎ সং)

কন্যা কুমারী হইতে উত্তর সরকার পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং চোরমণ্ডল উপকূলে ঘাট পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিগবর্ত্তী ভূভাগ যাহা সমুদ্র তট পর্য্যন্ত বিলম্বিত তাহাই কর্ণাটদেশ বলিয়া বর্ণিত। এই দেশের মধ্যে প্রাচীন চোল, পাণ্ড্য এবং চের রাজ্যের কতকাংশ অবস্থিত ছিল এবং বর্ত্তমানকালে আর্কট, মাদুরা ও তাঞ্জোর রাজ্য ইহার মধ্যে অবস্থিত। অতি পূর্ব্বকালে চালুক্য, চের, গঙ্গা ও পল্লভ বংশীয় ভূপালগণ কর্ত্তৃক এই দেশ শাসিত হইত। দশমশতাব্দী পর্য্যন্ত চোল নরপতিগণ এই দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময় অপর তিনটী রাজবংশ বিলুপ্ত হইলে কালাচুরিগণ আসিয়া কর্ণাটরাজ্যের উত্তরাংশ অধিকার করিয়া লয়। অনন্তর দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দ্বার সমুদ্রাধিপ সমস্ত কর্ণাটরাজ্য অধিকার করেন। এই বংশীয় নরপালগণ ১০৩৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৩২৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ শাসন করেন। পরে মুসলমানগণ রাজা বল্লালদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এই দেশ অধিকার করিয়া লয়।

১৭৫৪ খ্রীঃ অব্দে মোগল সম্রাটগণের গৌরব সূর্য্য একেবারে অস্তমিত হয়। নিজাম-উল্-মুলকের পৌত্র চতুর্থ গাজিউদ্দিনই এই সময়ে রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠে। একজন সুবিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন (১) দরবারের আমীর ওমরাহগণ গাজিউদ্দিন কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া সম্রাট আহম্মদ সাহাকে রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। সম্রাটকে অন্ধ করিয়া কারাবদ্ধ রাখা হইল। এই কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর মোগল রাজ্যের যারপর নাই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। গুজরাট, বাঙ্গালা, বেহার আউদ, রোহিল খণ্ড, পঞ্জাব, দাক্ষিণত্য ও কর্ণাট প্রভৃতি দেশ সকল দিল্লীশ্বরের হস্ত স্খলিত হইয়া পড়িল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে কর্ণাটের নবাব হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগেকে "নওয়াইতে নবাব" বলে। অষ্টম শতাব্দীতে "নওয়াইত" সম্প্রদায় আরবদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিমে সমুদ্র-তট-ভাগবর্ত্তী দেশে অধিবাস সংস্থাপন করে। "নওয়াইত" [illegible]। এই সম্প্রদায়ের নবাবের মধ্যে সাদাতুল্লা খাঁ—১৭১০ খৃঃ অব্দ হইতে [illegible]ন্ত কর্ণাটের নবাব ছিলেন। তিনি দোস্ত আলি ও বাকের আলি [illegible]স্পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর [illegible]টের নবাব ও বাকের আলি ভেলোরের গবর্ণর হন। দোস্ত আলি [illegible]জন প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন। তিনি দিল্লির সম্রাট মহম্মদ সাহার [illegible]সিগণের সাপক্ষে অনেক কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে মুদ্রা প্রস্তুত করিবার

[illegible]s then (1754 A. D.) at the instigation of Ghazi-ud-din IV, pro- [illegible]unworthy to reign. He was blinded and consigned to prison, when

[illegible]empire was now in a wretched State; Guzrat, Bengal, Bahar, Orissa, [illegible]d, the Panjab the Dakhan and the Cornatic were fairly severed [illegible]Pope)

ক্ষমতা আনাইয়া দেন। চান্দা সাহেব দোস্ত আলির জামাতা এবং তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। সে সময় কর্ণাট রাজ্যের চান্দা সাহেবই সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহাঁর প্রকৃত নাম ছিল হোসেন দোস্ত খাঁ। অম্বরের যুদ্ধে দোস্ত আলি নিহত হইলে ১৭৪২ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র সফদার আলি কর্ণাটের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন কিন্তু তাঁহার ভগ্নিপতি মর্ত্তেজালি গোপনে তাঁহার প্রাণবধ করে। সফদার আলির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈয়দ মহম্মদ খাঁ নবাব হন। এই বালক নবাবের শাসন সময়ে সমস্ত কর্ণাটরাজ্য অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়। এই সময় এই বালক নবাবের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজাম আনোয়ারুদ্দিন নামক তাঁহার এক জন অতি সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন। নৃসংশ আনোয়ার গোপনে এই শিশুর প্রাণ সংহার করে। অনন্তর অনোয়ারই নবাবের সিংহাসনে অধিরোহণ করে। ইনি ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে নবাব হন এবং ১৭৪০ খ্রীঃ অম্বরের সমরক্ষেত্রে ১০৭ বৎসর বয়ক্রমে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর পুত্র মহম্মদ আলি যুদ্ধাবসানে ত্রিচিনপল্লীতে পলাইয়া যান। এখন দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব কয়েকদিনের জন্য "কর্ণাটের নবাব" উপাধি গ্রহণ করেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নিজামের পদ ও কর্ণাটের নবাবী এই দুইটী পদ লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। নিজামেব পৌত্র মজফ্যর জঙ্গ তাঁহার পিতামহের উইলের বলে নিজামের ধনরত্ন ও রাজ্য পাইবার দাবী করেন, কিন্তু নিজামের দ্বিতীয় পুত্র নাজির জঙ্গ তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দী হইলেন। নাজির জঙ্গ সহসা আসিয়া নিজামের তাবৎ ধনরত্ন আত্মসাৎ করিয়া লইলেন পরে সৈন্য সামন্তগণকে প্রচুর উৎকোচ দিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। মজফ্যর জঙ্গ ব্যর্থমনোরথ হইয়া সাতারায় গিয়া মহারাষ্ট্রদিগের সাহায্য প্রার্থী হইলেন।

দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব এবং আনোয়ারুদ্দিনের [illegible]
দুই জনের মধ্যে কর্ণাটের নবাবী লইয়া বিবাদ নিজামের পৌত্র মজফ[illegible]
ফরাসীদিগের সাহায্যে তাঁহাদের অভীষ্ট সুসিদ্ধ করিয়া লইতে চাহে[illegible]
গবর্ণর ডুপ্লেকে পত্র দ্বারা সমস্ত কথা জানাইলেন। ডুপ্লে তাঁহা[illegible]
তাঁহাতে সম্মত হইলেন এবং চাঁদা সাহেবকে মহারাষ্ট্রদিগের হ[illegible]
তাঁহাকে সৈন্যসাহায্য প্রদান করিলেন। প্রথমতঃ আনোয়ারুদ্দিন[illegible]
কর্ণাটের সিংহাসন হইতে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে চাঁদা সাহে[illegible]
তৎপরে নিজাম পুত্র নাজির জঙ্গকে ব্যর্থ মনোরথ করিয়া মজফ্যর জ[illegible]
অভিষিক্ত করাই ফরাসীগণের উদ্দেশ্য ছিল এবং সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধও[illegible]
সাহেব ছয় হাজার মজফ্যর জঙ্গ ত্রিশ হাজার ও ফরাসী সেনাপতি চ[illegible]
অম্বরের রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ১৭০ বৎসরের বৃ[illegible]
আনোয়ারুদ্দিন বিংশতি সহস্র সৈন্য ও পুত্র মহম্মদ আলিকে লইয়া প[illegible]